দি ইন্ডিয়া ডক্ট্রিন

এম.বি.আই. মুন্সী

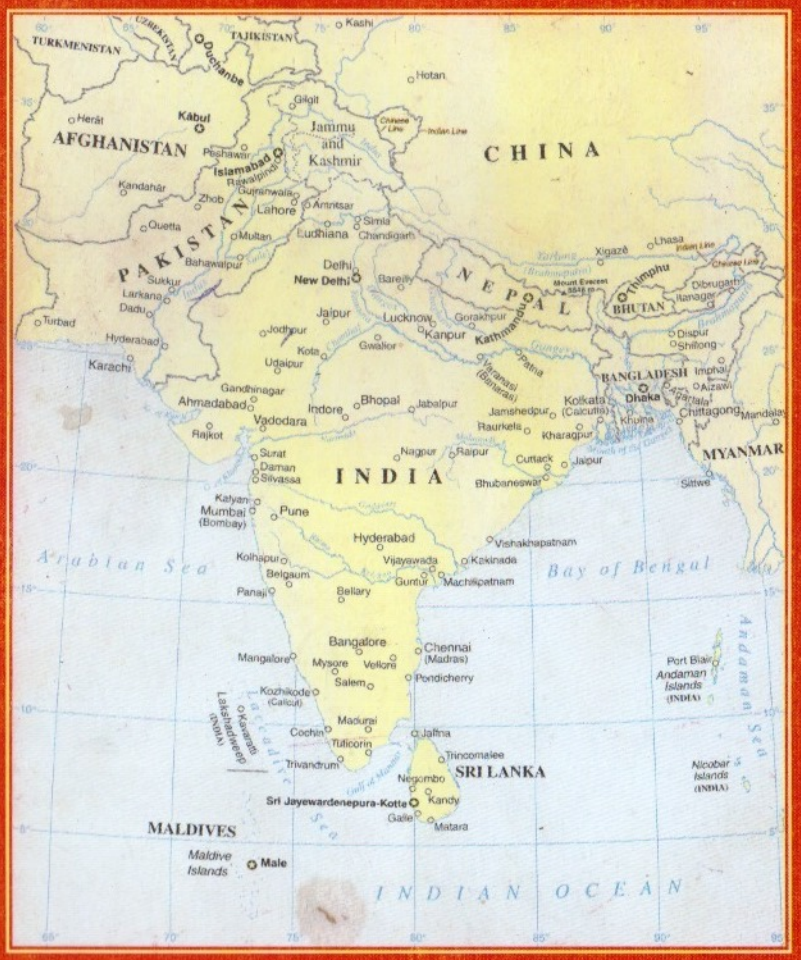

বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজিক এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম

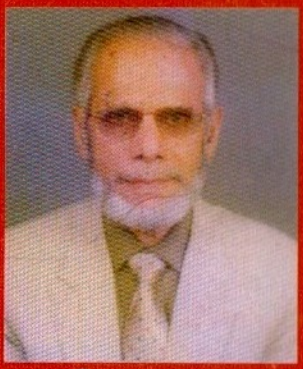

মোঃ সাহাবুদ্দিন খান

মোঃ সাহাবুদ্দিন খান ১৯৪১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার লালবাগ থানার অন্তর্গত খাজেদেওয়ান ১ম লেনে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি কেরানীগঞ্জ থানার অন্তর্গত আটির বিখ্যাত ভাওয়াল খানবাড়ি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার ও অন্য বিজ্ঞানে এম, এ, ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মময় জীবনে তিনি রেজিস্ট্রারার অব পাবলিকেশন্স, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি, পরবর্তী সময়ে সরকারি কর্মরত ছিলেন। চাকুরী জীবনে তিনি লন্ডন, ওয়েলস, স্কটল্যান্ড মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা এবং ভারত ভ্রমণ করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। ইউনেস্কোর সহযোগিতায় 'জাতীয় গ্রন্থাগার সমস্যা ও সমাধান' পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত দ্বিতীয় পুস্তক আরকাইভস প্রশাসন ও ইতিহাস'।

www.pathagar.com

এম.বি.আই.মুন্সী

এম.বি.আই. মুন্সী বৃহত্তর যশোর জেলার কালীগঞ্জ শহরে (বর্তমানে ঝিনাইদহ) ৫ আগস্ট ১৯৭২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। মি. মুন্সীর পিতা ১৯৭৩ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে লন্ডন থেকে উচ্চ শিক্ষা এফ,আর,সি,এস, ডিগ্রি লাভের জন্য ১৯৭৩ সালে লন্ডন গমন করলে সপরিবারে চলে যান। মি. মুন্সীও পিতার সাথে শিশুকালেই চলে গিয়েছিলেন এবং ২৪ বছর সেখানে থাকার পর ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে চলে আসেন। লন্ডনে থাকাকালে তিনি তাঁর শিক্ষা জীবনের উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৯৪ সালে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস থেকে আইন বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৯৬ সালে লিংকন ইনস্ থেকে ব্যারিষ্টারী ডিগ্রি অর্জন করেন। মি. মুন্সীর পিতা ও মাতা এখনও লন্ডনে বসবাস করছেন। তাঁর পিতা বর্তমান ইংল্যান্ডের রাণীর নামে স্থাপিত হার্ট ফোর্ডশায়ার কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালের অর্থপ্যাডিক এর সহযোগী প্রফেসার হিসেবে কাজে নিযুক্ত আছেন। মি. মুন্সী ১৯৯৮ সালে ঢাকা হাইকোর্ট এ আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়া তিনি ঢাকায় লন্ডন কলেজের আইন শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এল.এল.বি এক্সটার্নাল কোর্সের শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং ইন্টারনেটে প্রবন্ধ লিখে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। তিনি বাংলাদেশের অনেক সমাজ সেবা ও আইন সংস্থার সঙ্গে জড়িত আছেন। মি. মুন্সী এক পুত্র সন্তানের জনক।

www.pathagar.com

ভারতীয় মতার্দশ

(The India Doctrine)

সম্পাদনায়
এম, বি, আই, মুন্সী

বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজিক এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম

www.pathagar.com

ভারতীয় মতার্দশ

এম, বি, আই, মুন্সি

প্রথম প্রকাশ ইংরেজী ২০০৬
পুনঃ মুদ্রণ ২০০৭
প্রথম প্রকাশ বাংলা ২০০৭

প্রকাশকঃ
বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজিক এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম
BANGLADESH STRATEGIC & DEVELOPMENT FORUM
Shah Mohammed Saifuddin
P.O. Box 93524
City : Toranto
State : ON
Postal Code: M4C 5R4
Country : Canada
Phone: (416) 686-4905
Canada http://www.bdsdf.org
bd_sdf@yahoo.ca

House No. F-86
Road No. 5
Chairman Bari
Banani, Dhaka-1213
Bangladesh
http://www.deshchalling.blogspot.com
MBIMunshi@gmail.com

মূদ্রাকরঃ
রে-প্রিন্টার্স লিঃ
২০৫ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

মুল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা মাত্র
6.00 US Dollar only

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বাংলাদেশের সকল
দেশ প্রেমিক জনগণের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

প্রারম্ভিক মন্তব্য

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে আধিপত্যবাদী হিসেবে এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর প্রতি প্রকাশ্যভাবে এবং লুকিয়ে লুকিয়ে বিরতিহীন হুমকি প্রত্যক্ষকরণ বিষয়ে কয়েক দশক পূর্ব থেকে ভারতের ভূমিকা নিয়ে অনেক লেখালেখি ও আলোচনা হয়েছে। ভারত দক্ষিণ এশিয়াকে কৌশলগতভাবে একমাত্র একক হিসেবে, ভারতীয় মতাদর্শের প্রতি বিশেষ জোর দিয়ে ভারতীয় আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে আগ্রহী। জাতীয় স্বার্থ সুসঙ্গত ও তাঁর নিজস্ব মূলনীতি অনুযায়ী ভারত আঞ্চলিক কৌশলগত নীতি গঠন করতে চায়। প্রকৃত ঘটনা হল বিদ্যমান আশঙ্কা, অবিশ্বাস, উত্তেজনা অবিরামভাবে থাকার ফলে ভারত এবং বাংলাদেশসহ অন্যান্য ছোট প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তার অভিপ্রায়ে বিরূপ প্রভাব পড়বে। বিপরীতমুখি অবস্থা অনবরত চলছে, এমনকি আজকের দিনে এ অঞ্চলের দেশগুলি বিশ্বায়ণের আন্দোলন প্রত্যক্ষ করছে এবং নূতনভাবে নিরাপত্তার বলয়ে সকলকে আটকানোই উদ্দেশ্য।

এ সময়ের প্রেক্ষিতে ব্যারিস্টার এম, বি, আই মুন্সীর এ বইটিতে নূতন শক্তি আছে, তথ্য সমৃদ্ধ এবং কিছু মর্ম নিরীক্ষণ, ও উপলব্ধি করার অন্তর্দৃষ্টি আছে। বইটিতে সম্ভাব্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বার্থের দুর্বোধ্য মর্মবস্তু ভারতীয় মতাদর্শের ভিত্তিতে নির্মাণ করবে, এর ফলে বিশেষ করে বাংলাদেশের সঙ্গে কিভাবে তাঁরা সখ্যতা বজায় রাখবে? ১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামের সময় থেকে, চলতি অগ্রগতির ধাপ পর্যন্ত ভারতের উচ্ছাভিলাষী দেশরক্ষা ও বিদেশনীতি সম্পর্কে লেখক অত্যন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে তথ্য বের করেছেন যে, ভারতের উপলব্ধি কি হবে, প্রতিবেশী দেশসমূহ বিশেষ করে বাংলাদেশের সঙ্গে কি আচার আচরণ করবে এবং কার্য সম্পাদন করবে? ভারত বিভিন্ন কৌশলে তাঁদের নিজের ইচ্ছাকে বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দিয়ে আধিপত্য বিস্তার করে দেশে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করতে চায়, লেখক বিষয়টি বিস্তারিতভাবে দেখাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছেন।

লেখকের সঙ্গে কারও মতের পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু তাঁর যুক্তি এত বেশি শক্তিশালী যে, নির্ভরযোগ্য তথ্য এবং উপাত্তের কারণে মত পার্থক্য করা খুব কঠিন হবে। ব্যারিস্টার মুন্সীর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, জাতি হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারত কতটুকু সম্পৃক্ত তা খুঁজে বের করেছেন। সত্য ঘটনা এবং শক্তিশালী অনুসন্ধানের আওতায় আনীত বিষয়বস্তুর অবস্থান থেকে বিকল্পস্বরূপ বুঝা যাচ্ছে ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে কেন সমর্থন করে ছিল। এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের প্রতীকস্বরূপ এবং এর ফলে ভারত সংঘবদ্ধ রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে বৃহৎ শক্তি হিসেবে গণ্য হতে সক্ষম হয়েছে। ভারত বহু বিস্তৃত ভাবে অভিযোগ করেছে যে, বাংলাদেশ ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নি। কিন্তু লেখক অত্যন্ত জোরালো ভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, কোন কোন সময় ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এটা ভারতের স্বার্থকতা, যা কোন অংশে কম নয়, লেখক বিশেষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহের কথা উল্লেখ

www.pathagar.com

করেছেন, আরও উল্লেখ করেছেন যে, ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্র এবং গোয়েন্দা সংস্থা এ অঞ্চলে যেভাবে প্রক্রিয়া চালিয়েছে তা বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী। লেখকের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ও প্রক্রিয়াগত বিশ্লেষণ অসাধারণ। তিনি অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু গবেষণা করে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিকে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

লেখক ব্যারিস্টার মুন্সী ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ও সংবাদ মিডিয়াগুলো কিভাবে বিদেশে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য অনবরতভাবে প্রচারযুদ্ধে ব্যস্ত রয়েছে তা পুঙ্খানুপঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি অসংখ্য উদাহরণ উপস্থাপন করে বলেছেন ভারত বাংলাদেশকে মৌলবাদী এবং পশ্চাদগামী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রক্রিয়া চালিয়েছে। লেখক "অখণ্ড ভারত" এর স্বপ্নের কথা বলেছেন, এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুকৌশলে সম্বন্ধস্থাপন করছে। এ সমস্ত অস্বাভাবিক অর্থহীন বিষয়গুলো ব্যর্থ হলে ভারত প্রয়োজনে বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তার প্রাচীন ভারতীয় মতাদর্শ এবং জাতীয় স্বার্থকে আরও বেশী আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে প্রলুব্ধ করে স্পষ্ট ও উন্মুক্তভাবে ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদের সঙ্গে স্বীয় সত্ত্বা অন্যের সত্ত্বায়লীন করে দিয়ে পরস্পর বোঝাপড়া করে কাজ করবে।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে লেখকের বিশ্লেষণ, ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত বাস্তব ঘটনা, একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করবে। সম্ভবত তিনি ইউ, এস এর নূতন নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যা দক্ষিণ এশিয়ান অঞ্চলে অবতারণা করতে চায়, এতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো থেকে অতিরিক্ত সুবিধা আদায় করতে পারবে। লেখক বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারত পরবর্তী কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। ভারত চেষ্টা করছে গণতান্ত্রিক শাসন সংকোচিত করে নিয়ন্ত্রণ করতে। আমি মনে করি বর্তমান প্রসঙ্গটি স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্ত, যা লেখকের পূর্বের আলোচনাই প্রমাণ করে যে, ভারত কিভাবে প্রতিবেশী দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ প্রগতিশীল নীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করছে। আমার মনে হয় গ্রন্থাকারের লেখাগুলো অত্যন্ত প্রাঞ্জল, নির্মল এবং অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, তাছাড়া উদ্দীপনাদায়ক যা ব্যাপক পড়ার দাবী করতে পারে। পাঠক রচনাগুলো উপভোগ করতে পারবে এবং সামগ্রীক ভাবে নিজেরা একটি উপসংহার টানতে পারবে।

পুস্তকটির প্রারম্ভিক অধ্যায়গুলোর অসম্পূর্ণতা পূর্ণ হয়েছে, খোদেজা বেগম এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) সাখাওয়াত হোসেনের প্রদত্ত লেখা দিয়ে। প্রথম উল্লেখিত ঘটনা যুক্তবাংলার প্রচারণার জরিপ কার্যটি অনুসন্ধান করা হয়েছে, গোয়েন্দা প্রতিবেদন এবং তদানুযায়ী প্রচারণার ক্রিয়াকলাপ থেকে, এবং পরে উল্লিখিত ঘটনা হল অত্যন্ত দৃঢ়, ঘোষণাকারী ভারত ভূকৌশলের নিহিতার্থের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করেছে। উভয় ক্ষেত্রে এ সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে বাংলাদেশে অত্যন্ত কম গবেষণা করা হয়েছে যা দুর্ভাগ্যজনক, অধিকতর আঞ্চলিক উন্নতিকল্পে দেশের নিরাপত্তার এর সঙ্গে বিজড়িত। পুস্তকটি যদি বাংলাদেশে বিরাজিত অবস্থার মধ্যে সীমিত থাকত তাহলে অত্যন্ত পক্ষ পাতিত্বপূর্ণ ও মনোনীত হিসেবে নিন্দিত হত।

শ্রীলঙ্কান এবং নেপাল এ দেশ দু'টির সম্মানিত ও বিখ্যাত লেখক এবং রাজনৈতিক মন্তব্যকারদের অভিমত পুস্তকটিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এটা পাঠকদের

www.pathagar.com

জন্য মঙ্গলময়। উভয় দেশই নিস্তেজ বিরোধে বিজড়িত যা কোন কোন পরিপূর্ণ যুদ্ধের স্বরূপ ধারণ করে প্রচুর মানুষ হতাহত হচ্ছে এবং সম্পদ ও অবকাঠামোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। নেপালের কথা বলতে হয় যে, এটা ছিল আদর্শগত বিরোধ এবং শ্রীলঙ্কার বিষয়টি হল স্পষ্ট জাতিগত যা সরকার এবং এলটিটিই এর গেরিলাদের মধ্যে বিরোধ। বিরোধসমূহের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারতের সরাসরি অথবা অন্য পথে হস্তক্ষেপের ব্যাপারে পাঠকগণ ভিন্ন মাত্রার স্বাদ পাবে। দু'টি বিদ্রোহের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়ই ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করে অথবা এড়িয়ে যায়, এতে প্রতীয়মাণ হয় যে, রাজনৈতিক সংস্কার অপ্রয়োজনীয়। এতে ভারতের অসন্তুষ্ট অনুভূতিকে পরিহার করে চলার চেষ্টা করা যায়।

দক্ষিণ এশিয়ান চিত্রপটে ভারতের উপস্থাপনের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে এ পুস্তকটি অদ্বিতীয়। পাকিস্তান ব্যতীত, পররাষ্ট্র নীতির বিশ্লেষণে ভারতের আগ্রাসী নীতির বাস্তবতা যেখানে প্রতিফলিত হয়, বাংলাদেশের নাগরিক আলোচনায় তা অনুপস্থিত। এ পুস্তকটি প্রবণতাকে দূর করে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের বিষয়ে সুন্দর নূতন এবং মূল বিষয় নিয়ে গবেষণা করার উৎসাহ সৃষ্টি ও সুযোগ বৃদ্ধি করেছে।

পুস্তকটি বিদ্যমান রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত দলিলাদির সঙ্গে মূল্যবান একটি সংযোজন, এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে বিতর্কে ও আলোচনায় এক নূতন মাত্রা যোগ করবে।

এম, আতাউর রহমান
এম,এ, পিএইচডি (সিকাগো)
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি

www.pathagar.com

অবতরিণিকা
(Introduction)

ভারতীয় মতাদর্শ এম, আতউর রহমান এম,এ পি,এইচ, ডি (চিকাগে) অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ পলিটিক্যাল এসোসিয়েশন বর্তমান প্রকাশনাটি তৃতীয় বারে পদার্পণ করল। এ পুস্তকটি ২০০১ সালে ইন্টারনেটে প্রথম মুক্তিপায় এবং ২০০৩ সালের আরও সমৃদ্ধ করা হয়েছে (উভয়টি পৃথক শিরোনামে)। ভারতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অভিসন্ধি সম্পর্কে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহারের জন্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমান প্রকাশনাটি নূতন এবং বিস্তৃত আকারে, যে সমস্ত ঘটনা বাংলাদেশের অনুভূতিতে আঘাত করেছে, এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের অপ্রীতিকর ঘটনার অভিজ্ঞতা এবং এতদাঞ্চলকে প্রভাবিত করার বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার সম্মানিত এবং খ্যাতিমান লেখকদের কথা মনে রেখেছিলাম এবং এ পুস্তকটিতে তাঁদের লেখা দিয়ে অংশ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, তাঁদের অংশগ্রহণ ছাড়া হয়তো এ পুস্তকটি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হত না। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ব্রিগেডেয়ার জেনারেল (অব) সাখাওয়াত হোসেন, খোদেজা বেগম, নিশ্চল বসন্ত, ডঃ শাস্ত্রদত্ত পন্থ, মদন প্রসাদ খানাল, সঞ্জয় উপাধ্যায়, ডঃ রোহান গুনরত্না এবং অরবিন্দু আচার্য, এ কাজটির জন্য তাদের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে যে মহৎ কাজ করেছেন সে জন্য আমি ঋণী।

সবশেষে আমি আমার সহধর্মিণী মাহমুদা ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ জন্য যে, তিনি পুস্তকের অনেক অংশ বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিয়েছেন। তাঁর অশেষ ধৈর্য্য ও মেধা এ প্রকাশনাটি সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে বিশেষভাবে কাজ করেছে।

এম, বি, আই, মুন্সী
বার-এ্যাট-ল এন্ড এ্যাডভোকেট (সুপ্রিম কোর্ট)
ঢাকা, বাংলাদেশ।
১৫ জুলাই, ২০০৬

www.pathagar.com

বিষয় সূচি

ক্রম	বিবরণ ও লেখকের নাম	
	প্রারম্ভিক মন্তব্য (Foreword) অবতারণিকা (Introduction)	
	বাংলাদেশী লেখকগণ	
১.	**এম,বি,আই,মুন্সী**	
i.	ভারতীয় মতার্দশ - মুখবন্ধ The Indian Doctrine - Preface	১৩
ii.	ভারতের উত্থান ও পুনঃযুক্ত করণ নীতি – অধ্যায়-১ The Emergence of India and the Policy of Reunification (Part-I)	২৬
iii.	১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর – অধ্যায়-২/এ The 1971 war of Liberation and after (Part 2.A)	৪০
iv.	১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর – অধ্যায়-২/বি The 1971 war of Liberation and after (part 2B)	৫০
v.	ইতিহাসের পরিধি রেখা বা পরিকেন্দ্র – অধ্যায়-৩ The Circle of History (Part-3)	৫৯
vi.	শত্রুহস্তে সম্পর্ক-বাংলাদেশ – অধ্যায়-৪ The Betrayal of Bangladesh (Part-4)	৭৪
vii.	পরবর্তীকালীন পরিণাম অধ্যায়–৫/এ The Aftermath (part 5A)	৮৯
viii.	পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহের কারণ–অধ্যায়-৫/বি Causes of the CHT insurgency (Part 5B)	১০০
ix.	শেখ মুজিবুর রহমান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম–অধ্যায়-৫/সি Sheikh Mujibur Rahman and the CHT (part 5c)	১১১
২.	**খোদেজা বেগম**	
x.	যুক্ত বাংলার মাধ্যমে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার ভারতীয় আন্দোলন Indian move to establish United India through United Bengal	১৩১
৩.	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাখাওয়াত হোসেন (অবঃ)**	
xi.	চীন-ভারত-ইউ.এস. কৌশলগত জটিলতা-বাংলাদেশের জন্য সঙ্কেত ধ্বনি China-India-US strategic Tangle Challenge for Bangladesh	১৩৭
xii.	হিমালয়ে বিপ্লব ঃ নেপালের অগ্নিপরীক্ষা Himalayan Revolution-Testing time for Nepal	১৬৫

www.pathagar.com

নেপালী লেখকগণ

৪. **নিশ্চল এম, এস, বসন্ত**

xiii. নেপালঃ হিমালয়ে নৈরাজ্য এবং অকীর্তিত ভারতের সংশ্লিষ্টতা ১৭৩
Nepal: The Himalayan chaos & the unsung Indian Involvement

৫. **মদন প্রসাদ খানাল**

xiv. মাওবাদী বিদ্রোহ নেপালে বিরোধের আগুন জ্বালাতে ভারতের কৌশল। ১৮৬
Maoist insurgency-India's Incendiary Device in Nepal

৬. **সঞ্জয় উপাদ্বয়**

xv. নেপালে ভারতের নীতির মতবাদ ১৯৩
India'a Policy tenet in Nepal

৭. ডঃ শাস্ত্র দত্ত পন্থ

xvi. নেপালের অব্যক্ত মর্মযন্ত্রনা – ২০২
The Untold Pains of Nepal – Dr. Shastra Dutta Pant

xvii. মাওবাদ এবং ভারত ২১৮
Maoists and India

শ্রীলংকান লেখক

৮. **রোহান গুনীরত্না এবং অরবিন্দু আচারিয়া**

xviii. শ্রীলঙ্কার জাতিগত বিরোধে ভারতের ভূমিকা ২৩৫
India's role in the Ethnic Crisis in Sri Lanka

সংলগ্নি

a. দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্র (Map of South Asia) ২৫১

b. ১৯৭১ সালে ৩১ মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাব ২৫২
Rosolution of the Indian Parliament 31 March 1971:

c. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২৫ বছরের বন্ধুত্ব চুক্তি ২৫৩
25 year Friendship Treaty between Bangladesh and India.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভারতীয় মতাদর্শ – মুখবন্ধ

(The India Doctrine – Preface)

- এম, বি, আই, মুন্সী

প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে মূল রচনাটি লেখা হয়েছে (বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলে) এবং ইন্টারনেটে প্রকাশিত হয়েছে, এর কোন ফলপ্রসূ জবাব পাই নি, এমনকি আমি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতো হতে যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপন করেছি সেগুলোর বিরুদ্ধে কেউ কোন যুক্তি দেখায় নি, বিশেষ করে, যদি বাংলাদেশের প্রতি এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর প্রতি তাঁদের অনুরাগ থেকে থাকে তবে একই ধারায় অবিরত প্রবাহিত হতে থাকুক। এ রচনাটি লন্ডনের এক ভদ্রলোকের প্রত্যুত্তর হিসেবে (আমার সন্দেহ হয় সম্ভবত জোরপূর্বক তাঁর নিকট থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করেছে, এটা তার নাম দেখে বুঝা যায় এবং রাজনৈতিক আনূকুল্যও থাকতে পারে) লেখা হয়েছে। তিনি আমার দৃঢ় ঘোষণাতে আপত্তি করেছেন, ভারতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং উপমহাদেশের সাম্রাজ্যবাদী আচরণ অথবা অন্যভাবে বলা যায় অখণ্ড ভারত এর (অর্থাৎ যুক্তভারত) দাবী তাঁরা ন্যায্য বলে মনে করে।

বাংলাদেশের অনুভূতিতে আঘাত করেছে এ ধরনের ঘটনাই প্রাথমিকভাবে এ প্রবন্ধের উৎস এবং দক্ষিণ এশিয়ার যে সমস্ত দেশে একই ধরনের ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীতার ঘটনা ঘটেছে সেগুলোলে রেফারেন্স হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লন্ডন থেকে উত্তর দাতা দাবী করেছেন যে, ভারত প্রকাশ্যভাবে এ ধরনের কোন নীতির প্রস্তাব করে নি, এবং ভারতের এ ধরণের নীতি ছিল কিনা তা সত্য বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের লাফান উচিৎ হবে না এবং অতীতে এ ধরনের কোন নীতি তাঁরা গ্রহণ করেছিল কিনা তা না জেনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাচ্ছে না। গত পঞ্চাশ বছর ধরে দক্ষিণ এশিয়ায় বিরাজিত প্রগতিশীল কার্য কলাপের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় পূর্বে উল্লেখিত ধারণাটি বিকৃত যুক্তি। এ পর্যায়ে বলা যাচ্ছে যে মধ্যপ্রাচ্য অথবা কোরিয়াতে যে কোন ধরনের যুদ্ধ হলে ভারত বাংলাদেশকে হয়রানি এবং প্রতারণা করার সুযোগ গ্রহণ করবে এবং সে সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমনকি সামরিক আগ্রাসনের সাহায্যে তা কমানোর চেষ্টা করবে অথবা আসামের জনগণকে অবরুদ্ধ করবে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ভারতের শাসক গোষ্ঠী আমাদের জনগণকে অবরুদ্ধ করতে চায় যা এখন ভারতের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০০৩ সালে এ প্রবন্ধ লেখা হয় এবং ২য় সংস্করণের সময় বর্তমান বাংলাদেশ সরকার (বি, এন, পি এবং জামাত মৈত্রী এবং দু'টি ছোট জাতীয়তাবাদী ও ইসলামিক প্রতিনিধিত্ব দল নিয়ে গঠিত) এবং বহু বিস্তৃত ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আশা ছিল যে ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে, ভারত কেন্দ্রীক প্রশাসন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হবে, উগ্র এবং সম্প্রসারণবাদী প্রবণতার প্রতি সহজে প্রভাবিত হবে। সরকারকে ফেলে দেবে। ভাগ্যক্রমে এ সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, তখন আমাদের সম্মুখে ছিল

www.pathagar.com

২০০৭ সালের সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও একটি আইনসম্মত কর্তৃপক্ষ কাঠামো আরোপ করার চেষ্টা করে যারা ভারতের দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে দেশের ভিতর দিয়ে পরিবহন ব্যবস্থার অধিকার দেবে ও গ্যাস রপ্তানি করবে, তাদের উভয় দাবী বাংলাদেশ গ্রহণ করে নি কারণ জাতীয় অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে কোনরূপ আপোষ মীমাংসা চলবে না, অন্য দিকে আমাদের অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ বিদেশে দেয়া হলে প্রকৃতপক্ষে কোন লাভ নেই, কারণ ভারতীয় কোম্পানিগুলোর প্রাকৃতিক গ্যাস ক্রয়ের জন্য যে মূল্য প্রস্তাব করেছিল (যেমন টাটা, তাঁরা চেয়েছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাঁদের যে সমস্ত শিল্প কারখানা থাকবে, কেবল সে সমস্ত শিল্প কারখানাগুলোতে গ্যাসের দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে, একবার সরকার তাঁদের বিনিয়োগ অনুমোদন করলে ভবিষ্যৎ প্রশাসনের ভারতে কম দামে উপর গ্যাস রপ্তানি করতে চাপ প্রয়োগ করবে না) এমন কোন লিখিত অঙ্গীকার নেই, আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্যের চাইতে অনেক কম ছিল এবং চুক্তির মধ্যে যে সমস্ত শর্তাবলী প্রস্তুত করেছিল তা দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিত, তবে ভারতের আশীর্বাদ নিয়ে নির্বাচনে নিশ্চিত জয়ী হওয়ার জন্য সরকার অথবা বিরোধীদল বিধি বহির্ভূত ভাবে তাঁদের সঙ্গে সমঝোতা করতে পারত। দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা করতে যেয়ে ভারতের ভোক্তাদের দায়ী ও বৃহৎ প্রয়োজনকে মেটাতে বাংলাদেশীদের জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনের কথা বলে সামরিক শক্তির কথা বিবেচনায় আনতে হবে এবং বেসামরিক সরকার সব কিছু ভালোর জন্য নয়, বরং পারম্পরিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধার বিষয়ে মিথ্যা প্রচার চালাবে না এ ধরনের কোন অঙ্গীকার নেই।

এ সমস্ত কারণে আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা থেকে পতনের পর বাংলাদেশে ২০০১ সালের নির্বাচনে বি,এন,পির জয়ে আমাকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে, "অখণ্ড হিন্দুস্থান" প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশ করে এবং ভারতের কথা বিবেচনায় রেখে যেন আরও প্রচন্ডভাবে কলহ বাঁধানোর ভঙ্গি করে মিথ্যা গুজব প্রচার করি। ইসলামি দলের সঙ্গে সমঝোতা করে ২০০৭ সালের নির্বাচনে বি,এন,পি পুনরায় বিজয় অর্জন করতে পারে ভেবে শুধু ভারতের পক্ষ থেকে নয় আওয়ামী লীগ ও মিত্র দলগুলো যারা অপরের দুষ্কর্মের হোতা তাঁরা (ভারত এ সমস্ত দলের মাধ্যমেই প্রক্রিয়া চালাচ্ছে কিন্তু এ সমস্ত দলের অগ্রবর্তী সংস্থার কার্যক্রম বাংলাদেশে অধ্যাবধি চলছে), এবং ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান মানবাধিকার ও দাতা সংস্থাগুলোর মাধ্যমে হস্তক্ষেপের চেষ্টা চালাচ্ছে।

এ ব্যাপারে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্যরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর, বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক বিষয়ে একমাত্র অভিজ্ঞ ও আইনসম্মত মুখপত্র হিসেবে তাঁরা নিজেদেরকে বিশেষ দূত মনে করে এবং দেশকে তাদের অসৎ উপদেশ দিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ ও অনৈক্যের দিকে নিয়ে যায়, এবং কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক দলের ভারত সমর্থক কর্মসূচির প্রতি বিশেষভাবে পক্ষপাতিত্ব দেখায়। আওয়ামী লীগ কুটনৈতিক উৎসাহ নিয়ে সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার মনোনয়ন ও নিয়োগদানকে প্রত্যাখ্যান করে এবং দৃঢ়তার সাথে প্রধান নির্বাচন

www.pathagar.com

কমিশনারের পদত্যাগ দাবী করেন। শেষোক্ত বিষয়ে যাই হোক, সিইসি নির্বাচন বিধি সংক্রান্ত কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফলে, বিভিন্ন দিক থেকে প্রচণ্ডভাবে নিন্দা করছে, কিন্তু এটা অস্পষ্ট রয়েছে যে, অভ্যন্তরীণ সঙ্কট ও বিরোধের মধ্যে নির্বাচন কমিশন এককভাবে সবকিছু করবে নাকি? যুক্তিযুক্তভাবে আসন্ন নির্বাচনের জন্য নূতন ভোটার অন্তর্ভূক্ত করার উদ্যোগ নিবে। যে কোনভাবেই হোক বিরোধী আওয়ামী লীগ স্থায়ী সিইসির জন্য গ্রহণ যোগ্য হলেও কোন অসুবিধা হবেনা, অথবা অন্য কোন নূতন ব্যক্তি হলেও আওয়ামী লীগের কোন লাভ হবেনা, বরং ভারতের জন্য সুযোগ উৎসাহ সৃষ্টি হবে এবং ভারত নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করবে।

এ ঘটনাগুলো সাধারণত রাজনৈতিক এবং কুটনৈতিক পর্যায়ে নির্দেশ দান করে থাকে যে, আমরা আগত মাসগুলোতে কি আশা করতে পারি? যদি না হয় তবে আগামী বৎছর এ অধ্যায়টি হালসন পর্যন্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়বে, এবং জাতির ইতিহাসের এই সংকটময় যুগসন্ধিক্ষণে মূল বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে হবে। যে সকল পাঠক এ প্রবন্ধের সঙ্গে পরিচিত তাঁদের জন্য বলছি যে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ২০০১ সালের মত প্রবন্ধটি মূল আকারেই রাখব, কেবল মাত্র কয়েকটি পরিবর্তন করা হবে এবং মুখবন্ধ থাকবে, শিরোনামে অবশ্যই পরিবর্তন করা হবে যা "অখণ্ড হিন্দুস্থান" অথবা "অখণ্ড ভারত" এর ধারণা এবং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যাদি মনে রেখে এ দুটি কল্পিত বিষয় প্ররোক্ষভাবে প্রকাশ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় "ইন্ডিয়ান ডক্‌ট্রিন" এর ধারণা যা দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের সম্প্রসারণ বাদী ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্ব সহজে বুঝতে সক্ষম হবে। এ সমস্ত ঘটনাদির হালনাগাদ বর্ণনার সঙ্গে সমসাময়িক বিষয়বস্তু এবং যে সমস্ত ঘটনাদি পরে ঘটেছে তদসংক্রান্ত দলিলাদি, ২০০৩ সালের সংস্করণে লেখার পর আরও কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা সহ তিনটি সম্পূর্ণ নূতন অংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ভারতের প্রতিক্রিয়া
Indian Reaction

সম্ভবত ভারতীয় হাইকমিশনও প্রবন্ধটির ব্যাপারে এখন সতর্ক হয়ে গিয়েছে এবং রাজনৈতিক আভাস ও এর ধারাবাহিক জনপ্রিয়তায় ২০০৩ সালে ভারতীয় হাই কমিশনার মনি লাল ত্রিপাথি বিদায়কালে অত্যন্ত উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছেন। ২০০৩ সালের ২৪ অক্টোবর তাঁর সম্মানে দেয়া আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত বিদায়ী ভোজসভায় তিনি বলেছিলেন, "ভারতের সাথে সুসম্পর্কের গুরুত্ব বিষয়ে যাদের বাস্তবধর্মী উপলব্ধি আছে, এ দেশের সে সমস্ত রাজনৈতিক দলও নেতাদের প্রতি ভারতের সহানুভূতি আছে যা জনসম্মুখে কাহারও পক্ষে বলতে অনিচ্ছুক। মনে হয় যেন ভারতের বন্ধুত্বের বন্ধন কিছুটা বিহ্বল করে ফেলে, কিছুটা এড়িয়ে চলে। ভারতের প্রতি ভিত্তিহীন অভিযোগ অগ্রগমনে বাধার সৃষ্টি করছে, একে অন্যের প্রতি কঠোর হচ্ছে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষেত্র অবসর বিনোদনের মত জনপ্রিয়। এ ধরনের বিষয় হতাশাজনক।

আমাদের দেশের বিশাল সীমারেখা আল্লার দান। আমরা প্রতিবেশীদের এক ইঞ্চি জায়গাও দখল করি না। বাংলাদেশের সার্বোভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং অখণ্ডতার প্রতি

www.pathagar.com

কোন হুমকি দেয়া হয় নি। ভারতীয় জনগণ যখন শুনে যে এখানকার সরকারের কোন লোক জনসম্মুখে বলে যে, ভারত এখনও অখণ্ড (অবিভক্ত ভারত), খাইবার পাশ থেকে চট্টগ্রাম এবং হিমালয় থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত অঞ্চলকে সংযুক্তিতে বিশ্বাস করে তখন তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করে। এ ধরনের মন্তব্য দায়িত্বজ্ঞানহীন। এ ধরনের আলোচনা দায়িত্বজ্ঞান শূন্য।

মহামান্য হাই কমিশনারের সম্মানে এ দেশেরই একটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক আয়োজিত সভায় এ ধরনের বক্তৃতা দিতে সাহস পেয়েছেন যেখানে অনেক জঘন্য কথা তিনি এদেশের বিরুদ্ধে বলেছেন। আমি তাঁর এ অপ্রত্যাশিত বক্তব্যকে সমর্থন করি না কারণ, বাংলাদেশের জনগণ ভারতের প্রতি সন্দেহ প্রবণ নয়। প্রতারণাপূর্বক ভারতের সঙ্গে নদী সংযোগ প্রকল্প মূলতবি রেখে দেশের উপর দিয়ে যোগাযোগ ও গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং তিন বিঘা করিডোর, মুহুরিচর ও তালপট্টি দ্বীপের সমস্যা অমীমাংশিত রাখা হয়েছে। এগুলো হল বাংলাদেশের প্রতি ভারতের সম্পূর্ণভাবে অশ্রদ্ধার সংকেত– ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ বিষয়ে এদেশে থেকে বাংলাদেশের প্রতি সদ্ভাবের কথা বলার কোন সুযোগ নেই।

মত ও নীতির প্রচার ও প্রসারের জন্য যুদ্ধ
(The Propaganda War)

ভারতীয় সংবাদপত্র এবং গণমাধ্যম বাংলাদেশ এ অঞ্চলের দেশগুলোকে আক্রমণ করে প্রচার চালাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ নেটওয়ার্ক সমূহ এদেরকে সহায়তা করছে, দক্ষিণ এশিয়াতে ভারতের কর্তৃত্বও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমার মতামতকে সমর্থন দিয়েছে। শেখ হাসিনার ভারত ভ্রমণ (নভেম্বর ২০০২) এবং তাঁকে দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ, কে, আদভানী কর্তৃক অসৎ মন্তব্য, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী যশোবন্ত সিন্‌হা'র বাংলাদেশে ইসলামিক মৌলবাদীদের জাগরণ এবং সন্ত্রাসীদের অভয়াশ্রম হিসেবে মন্তব্য একটি ষড়যন্ত্র বলে আমার সন্দেহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছে। ভারতের জেষ্ঠ্য মন্ত্রীদের এ ধরনের নিন্দনীয় মন্তব্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সহ্য করেছেন, কিন্তু তিনি কোন প্রতিবাদ করেন নি অর্থাৎ তার তথাকথিক ভ্রমণকে সংক্ষিপ্তও করেন নি, যা দুষ্কর্মে সহযোগিতা, বিতর্কমূলক ও ভর্ৎসনামূলক বক্তৃতার প্রতি মৌন সম্মতিই প্রতিফলিত হয়েছে। ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের সমালোচনার ব্যাখ্যা (দেশের রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ প্রভাবিত করার পরিকল্পিত ও পরস্পরের সহযোগিতায় উদ্ভাবিত অভিসন্ধি) কে বাংলাদেশের বিশিষ্ট কিছু সাংবাদিক সমর্থন যুগিয়েছেন।

ভারতের সংবাদপত্রের একটি অংশ অন্যায়ভাবে সুযোগ গ্রহণ করে পুরাপুরিভাবে ভারতের "র" এর কর্মসূচিতে সক্রিয় হয়ে উঠে, এবং বাংলাদেশে আল-কায়েদার কার্যাবলি সম্পর্কে সময়ে সময়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে প্রচার পত্র তৈরি করে। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোর লেখকরা গুপ্তভাবে বাংলাদেশে এসে ঐ সমস্ত প্রতিবেদনগুলো সত্য বলে স্বীকার করে উত্তেজনাপূর্ণ শিরোনাম দিয়ে টাইম, ফার ইষ্টার্ণ রিভিউ, ওয়াল স্ট্রিট জার্মান ইত্যাদিতে খবর ছাপা হত। যুক্তরাজ্যের চ্যানেল ৪ টিভি এর একজন ঠিকাদার বাংলাদেশে আল-কায়েদার আন্দোলনের ছবি তোলার জন্য গুপ্তভাবে একটি দল প্রেরণ করে। পুলিশের হস্তক্ষেপের ফলে তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসতি হয়

www.pathagar.com

এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিদেশী সদস্যদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়। বোম্বেভিত্তিক ভারতীয়দের নির্দেশে তাঁরা এখানে এসেছিল, এবং ঢাকাভিত্তিক শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল বলে জানা গেছে।

উল্লেখযোগ্য যে, ২০০৭ সালে জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এবং তাঁর অঙ্গ দলগুলো যাতে জয়ী হতে পারে সে ব্যাপারে পথ সুগম করার জন্য ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেখ হাসিনা পুনরায় ভারত ভ্রমণে যান। অনুমান করা যায় যে, শেখ হাসিনাকে ভারতের কৌশল সম্পর্কে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং বি,এন,পি, সরকারের সমস্যাগুলোর সুযোগ গ্রহণ করে জে, এম, বি (জামাতুল মুজাহেদিন বাংলাদেশ) এর পুনরুত্থান ঘটিয়ে কাজ করার উপদেশ দিয়েছিল, এবং এ সন্ত্রাসী সংস্থার সদস্যদের গ্রেফতার হওয়া তাদের ব্যর্থতা যা কিনা দু' বছর যাবত তাঁদেরকে সক্রিয় করে তোলার সকল প্রচেষ্টার শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে। শেখ হাসিনা মাদার তেরেশা খেতাবে ভূষিত করায় ভারতীয়দের পুনরায় একটি সুযোগ করে দেয় এবং সমন্বতি পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ২০০৭ সালের নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা হয়। তাঁরা দু' দেশের মধ্যে এমন সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান যা বাংলাদেশীদের নিকট অবশ্য গ্রহণযোগ্য হবে যা এখন পরিত্যক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে অকেজো। তাঁরা অন্যায়ভাবে আর,এম,জি সেক্টরের অস্থিতিশীলতা ও হিংসার বিষয়ে আলোচনা করেন, গুজব রটেছিল যে, বিদেশীর হস্তক্ষেপে ঘটনাকে আওয়ামী লীগ পুঁজি করে আসন্ন নির্বাচনে তৎপরতা চালাবে এবং যদি আওয়ামী লীগ পুনরায় নির্বাচনে পরাজয় বরণ করে তবে অস্থিতিশীলতার আগুন জ্বালাবে এবং তা পরিণামের আগেও হতে পারে।

ভারত তাঁর কৌশল বাস্তবায়নের জন্য এখন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং আর, এম, জি সেক্টরে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টির বিষয়টি এক মন্তব্যকার আর্নাড ডি ব্রোচগ্রেব ওয়াশিংটন টাইমসে ফাঁস করে দিয়েছে, তিনি কোন সমালোচক নহেন এবং না ভাবিয়া চিন্তিয়া ভারত সরকারের প্রচারণার পথে অংশ গ্রহণ করেছেন। ভারত এবং ইউ,এস,এর নব্য কনজারভেটিস এবং ইসরায়েলী গোয়েন্দাদের সঙ্গে সাজান বিষয়টি এ প্রবন্ধে ফাঁস করে দেয়াতে সত্যিকার উদ্ভিগ্নতা দেখা দিয়েছে, কারণ দক্ষিণ এশিয়া এবং মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে স্পষ্টভাবে এ পরিকল্পনা বিজড়িত। মিঃ আর্নাড ডি ব্রোচগ্রেব যদি পুরাতন মৌলবাদীদের সংগ্রামের জন্য বাংলাদেশকে অভিযুক্ত করত তবে আশংকা করার কিছু ছিল না কিন্তু তিনি চালিয়ে গেছেন।

ট্রান্স আটলান্টিক ঐক্যের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পিত মনোভাব প্রকাশ করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা সম্পূর্ণভাব সদৃশ হওয়ার জন্য মিসেস রোকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে এবং বাংলাদেশের নেতাদেরকেও একই বার্তা প্রেরণ করে, এ বছর অক্টোবরে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য দৃঢ় থাকতে হবে অথবা অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে যার কোন নির্দিষ্ট মাত্রা থাকবে না। বিরোধী আওয়ামী লীগ বলেছে নির্বাচন কমিশন এবং নীতিসমূহ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বি,এন,পি এবং তাঁর ইসলামিক গ্রুপের প্রার্থীদের লাভের জন্য অন্যায় ভাবে প্রভাব বিস্তার করার সকল ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

ইসরায়েল, গাজা এবং পশ্চিম তীর এর চেয়ে বাংলাদেশে আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং গ্রেনেড মেরে হত্যা করা এখন সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে। এগুলোর কদাচিৎ

www.pathagar.com

হিসেবে দেয়া হয়। টাইম ম্যাগাজিনের দক্ষিণ এশিয়ান ব্যুরোর প্রধান সে দেশ থেকে নিষিদ্ধ হয়েছিলেন ২০০২ সালে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়ার পর, কারণ তিনি আলকায়েদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ইসলামিক সন্ত্রাসী গ্রুপের গঠন সম্পর্কে বলেছিলো যেখানে সরকার দুর্বলতার কারণে কোন সাড়া দেননি।

জে,এম,বি এর নেতৃত্ব এখন ভবিষ্যতের প্রতিক্ষায় তাদের পরিচালনা কাঠামো ভেঙ্গে দেয়ার কাজ প্রায় শেষ, ওয়াশিংটন টাইম এবং মিঃ আর্নাড ডি ব্রোচগ্রেব এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা চাওয়া অনেক দিনের পাওনা। এই মনোরম কাহিনীর বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত একজন বাংলাদেশী কুটনীতিক দৃঢ়তার সাথে অত্যন্ত তড়িৎগতিতে এবং নির্মল ও প্রাণজুড়ান আচরণের মাধ্যমে মন্তব্যের জবাব দিয়েছিলেন এভাবেঃ- "বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ সামাজিক ঐক্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এ বোধগম্য থেকে সরকার উগ্রপন্থীদের ধ্বংস করে দিয়েছে, সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্ত:বিশ্বাস সমন্বয় সাধন সম্মেলনে পরিষ্কারভাবে মনোভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার কর্মশক্তি প্রয়োগ করছে, অভ্যন্তরীণভাবে এবং আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সাথে একাত্ব হয়ে উভয় দিকে কাজ করছে, যা বিপুলভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশ সম্পতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নিকট প্রেরিত চিঠিতে যতটুকু সম্ভব লিখেছেন এবং ইউ, এস এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারী অব স্টেট ক্রিশটিনা রোকা ব্যক্তিগতভাবে পৌঁছে দিয়েছেন।

অতএব, মি. ব্রোচগ্রেবকে বলা যাচ্ছে যে, ইউ,এস এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারী অব ষ্টেট জানুয়ারীর শেষে ঢাকা এসেছিলেন সরকারের নেতাদের নিকট বিপদ সংকেত জানাবার জন্য যে কঠোর নির্দেশ দিয়ে "ইউ, এস ট্যারোরিষ্ট ফাইনান্সিং এ্যাক্ট" এমন কিছু নয় শুধু উদ্ভট খেয়ালকে বিভক্ত করে দেয়া, বিশেষ করে তিনি নিজে স্বশরীরে বাংলাদেশে উপস্থিত ছিলেন না। ইউ,এস এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারী শুধু তাঁর সরকারের প্রশংসাই পৌঁছান নি, তিনি বাংলাদেশকে অন্যতম মুসলিম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তিনি আরও বলেছেন যে বাংলাদেশ বিশ্বের এ অংশের অনুকরণীয় দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে।

সরকার সমন্বিতভাবে জে,এম,বির সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়ার চূড়ান্ত চেষ্টা চালায়, আওয়ামী লীগ পুনরায় নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিতর্কের প্রতি পুনঃকেন্দ্রভূত হয় এবং জে, এম, বি'র শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতারে ভারত এতটুকু শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নি। টুইস ডে গ্রুপ মৌলবাদী সন্ত্রাসী কার্যকলাপ থেকে দূরে সরে এসে সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের দিকে ফিরে আসে যদিও তাঁদের হস্তক্ষেপ কুটনৈতিক হুকুম অতিক্রম করে গিয়েছিল তা সরকার কর্তৃক উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

নূতনভাবে কাতারে শামিল হওয়া
New Alignments

"অখণ্ড হিন্দুস্তান" সম্পর্কে ২০০১ সালে প্রবন্ধটি লেখার পর দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক চিত্রের কৌশল নাটকীয়ভাবে ভারতের অনুকূলে চলে যায়। প্রেসিডেন্ট বুশ ২০০৬ সালের মার্চ মাসে ভারত ভ্রমণে আসেন এবং দু'দেশের মধ্যে পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষর করার ফলে বাংলাদেশ এখন একটি স্পষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়ে যায়।

প্রেসিডেন্ট বুশ এ চুক্তির জন্য যে পরিমাণে চাপ প্রয়োগ করছেন তাতে আমেরিকার ভূমিকায় প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করে, বিশেষ করে বিবেচনায় রেখে যে, ভারত চারটি দেশের মধ্যে একটি দেশ যে পারমাণবিক নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে (এন,পি,টি) স্বাক্ষর করেনি, যা ১৮৮টি দেশ অনুমোদন করেছে। বুড়ো আঙ্গুলে না স্পর্শ করে বিশ্বকে তাচ্ছিল্য করে ভারত আণবিক বোমার পরীক্ষা চালায় এবং কুশলীরা বিশ্বাস করে ভারত ৫০ থেকে ১০০টি আনবিক বোমার অধিকারী হয়েছে। এন,পি,টির শর্তাবলীতে আছে অন্যদেশে আণবিক প্রযুক্তি রপ্তানি করা নিষিদ্ধ, কিন্তু তাঁরা আন্তর্জাতিক আণবিক কর্মসূচি পরিদর্শককে গ্রহণ করে নি। উপরন্ত ইউ,এস, আইন আণবিক প্রযুক্তি অন্যদেশে স্থানান্তরিত করাকে নিষিদ্ধ করেছে, কিন্তু তা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছে। ইউ,এস আইন আরও নিষিদ্ধ করেছে যে এ ধরনের প্রযুক্তি এন,টি,পিভুক্ত নয় এবং যারা আণবিক পরীক্ষা চালিয়েছে, সে সব দেশে প্রযুক্তি স্থানান্তরিত করা যাবে না। ভারতের প্রতি ব্যতিক্রমধর্মী অতি পক্ষপাতিত্ব দেখান হয়েছে ফলে ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার অভিযোগকে স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল করে দিয়েছে এবং চুক্তিতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান আণবিক চুক্তি নিষিদ্ধকরণ শর্তগুলো দুর্বল করে দিয়েছে যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তান উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে এ কাজের প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং দাবী করেছে যে, এ ব্যবস্থা আঞ্চলিক অস্থিরতাকে প্রণোদিত করবে এবং তাতে দামী অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ব্রতী করবে এবং ভারতকে যে সুযোগ দেয়া হয়েছে পাকিস্তানকেও অনুরূপ সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। খোদ যুক্ত রাষ্ট্রেরই আশঙ্কা করা হচ্ছে যে পারমাণবিক বিস্তাব রোধকরণ চুক্তির প্রচেষ্টার বিশ্বমাত্রায় অকার্যকর হবে। একজন বিশেষজ্ঞের মতে এই ব্যাপক পরীক্ষা নিষিদ্ধ চুক্তিতে ভারতের স্বাক্ষর করার প্রয়োজন নেই, এই চুক্তি আণবিক প্রতিযোগিতা থেকে নিবৃতি করার জন্য ভারত ইতোপূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যেমনটি এন,পি,টি এর ধারা ৬ তে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য অনুমোদিত দেশগুলোর এ ব্যাপারে প্রয়োজন আছে। অন্যান্য দেশও মন্তব্য করেছে যে, ভারতকে গ্রহণযোগ্য আনবিক অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করায় এবং পাকিস্তান, ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে সমাজচ্যুত করে রাখা হলে এরা নিরাপত্তাহীন ও অস্থিতিশীল বিশ্ব সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান।

এ প্রবন্ধটিতে চুক্তির নির্দিষ্ট শর্তাবলীর প্রতি খুব গুরুত্ব দেয়া হয় নি, কিন্তু সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তাতে তাঁর বেসামরিক আণবিক সুযোগ সুবিধাকে সামরিক আণবিক সুযোগ সুবিধা থেকে পৃথক করতে পারবে, বেসমরিক সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আই,এ,ই,এ) নিকট ঘোষণা দিয়ে আই, এ, ই, এ'র নিরাপত্তা দিবে এবং একটি অতিরিক্ত আচরণ বিধি স্বাক্ষর করবে। একজন বিশ্লেষকের মতে ভারতকে যত

www.pathagar.com

ইচ্ছা আণবিক অস্ত্র তৈরির অনুমতি দিয়েছে এবং তা নিজেদের আনবিক সরবরাহ থেকে হতে হবে এবং একটি নিরাপত্তাহীন সুযোগ চালনা করে উৎপাদন এবং অপরিমিত সমদ্বিভাগে বিভাজনীয় উপকরণ অস্ত্রের কর্মসূচির মওজুত করতে পারবে। কাউন্সিল অন ফরেন এফেয়ার্স (সি,এফ,আর) বিষয়টি সত্য বলে স্বীকার করেছে এবং কাউন্সিল বিশেষ প্রতিবেদন (সি,এস,আর) এ পাওয়া গিয়েছে, ভারত তাঁর নিজের অস্ত্র পরীক্ষার সম্ভাবনাকে বা চেষ্টা করাকে বাদ দেয় নি, অন্য রাষ্ট্রগুলো প্রথম পরীক্ষা করবে। ভারত তাঁর ২২টি আণবিক চুল্লীর মধ্যে ১৪টি আণবিক চুল্লী আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদেরকে পরিদর্শনের সম্মতি প্রকাশ করেছে বাকী আটটি শক্তিশালী যা আণবিক অস্ত্র তৈরির উপকরণ প্রস্তুত করতে সক্ষম, ভবিষ্যতে এ সমস্ত চুল্লী পরিদর্শনের জন্য অনুমতি দেয়া হবে কিনা এ ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি ভারত দেয় নি, অথবা অস্ত্র তৈরীর জন্য ব্যবহার করা হবে, অথবা অস্ত্রের উপকরণ তৈরি বন্ধ করে দিবে এ ধরনের কোন অঙ্গীকারও প্রদান করে নি। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন আন্তর্জাতিক আইনে অনুমোদন প্রাপ্ত আণবিক অস্ত্রের অধিকারী রাষ্ট্র আণবিক অস্ত্রের উপকরণ তৈরির কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

ভারতের অনেক মন্তব্যকার আগেই এ বিষয়টিকে ভারতের স্কোটনোম্মুখ আণবিক শিল্পের জন্য আশীর্বাদ বলে বর্ণনা করেছেন, ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য পিছু হটার কোন সত্যিকার কারণ নেই। সি,এস,আর'র জন্য এটা সমাপ্তি হতে পারে। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ চুক্তি গরুত্বপূর্ণ এবং আমূল পরিবর্তন আনবে, সুকৌশলী অংশীদার হিসেবে গোয়েন্দাগিরি করে এশিয়াতে চীনের রাজনৈতিকও সামরিক উত্থান ও প্রভাবকে ব্যাহত করাই তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য। শক্তিশালী এবং অতি প্রভাব বিস্তারকারী কাউন্সিল অব ফরেন এফেয়ার্স এর অন্য একটি প্রতিবেদনে ইস্থারপ্যান সত্যকরণ করে আমাদেরকে অবগত করেছেন, এ কাজের পিছনে অনুপ্রাণিত করার উপাদান ছিল।

এ অঞ্চলে চীনের উত্থানে যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগত কারণে ভারতের সঙ্গে দ্রুত সম্পর্ক স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়। ফারগুসন বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার জন্য তার সম্পর্ককে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করতে চেষ্টা করছে। সোকোলইস্কি বলেছেন, বুশ প্রশাসন আশা করছে যে, এশিয়ার উদিয়মান দেশ হিসেবে ভারতের সঙ্গে যোগদান করা হলে চীনকে পরিচালনা করা হলে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু অন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলছেন যে, ভারত এবং চীনের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক চরম সঙ্কটপূর্ণ, চীনের সঙ্গে দিল্লীর স্বার্থকে কোনভাবেই হুমকির সম্মখীন করা যাবে না, অথবা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য কোন চুক্তিদ্বারা প্রতিস্থাপন করা যাবে না। রবার্ট ব্লাক উইল ভারতে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ২৩ ফেব্রুয়ারি এক কাউন্সিল সভাতে বলেছেন যে, চীনকে অন্তর্ভুক্ত রাখার জন্য যে কোন চেষ্টা করা হোক না কেন ভারতীয়দের নিকট সে ব্যাপারে কোন গুরুত্ব নেই, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করে যে এটা নিজের স্বার্থ পূরণের ভবিষ্যৎ বাণী। তাঁদের সরকারের নীতিই হল চীনের সঙ্গে যতটুকু সম্ভব ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ভারতকে আণবিক সহায়তা প্রদান চীন এবং ভারতের মধ্যে বিপজ্জনক আণবিক দ্বন্দ্ব হতে পারে এবং অন্যান্য অভিজ্ঞরা খুব উৎকণ্ঠায় আছেন। যদিও ভারত চীনের

www.pathagar.com

সঙ্গে শক্তভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্ব বেশী দিচ্ছে তবুও এ অঞ্চলে সামরিক দিক দিয়ে চীন শক্তিশালী বিধায় নূতন দিল্লী চিন্তিত। আমেরিকার আধুনিক কনজারভেটিভ নীতি নির্ধারক ও ভারতের সেরা ব্রাহ্মনদের মধ্যে যোগাযোগের সখ্যতায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে দক্ষিণ এশিয়াতে ভারতের নেহেরু মতবাদের অখন্ড ভারত কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দক্ষিণ এশিয়াতে একটি অখন্ড ভারত গঠনের জন্য নেহেরুর উদ্দেশ্যকে সক্রিয় করার জন্য আমেরিকার আধুনিক সংরক্ষণশীল নীতি নির্ধারক এবং ভারতের সেরা ব্রাহ্মনদের মধ্যে স্পষ্টভাবে যোগাযোগের সখ্যতা প্রতীয়মান হয় এবং সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সংক্ষিপ্ত করে চীনের শক্তিকে অন্তর্ভূক্ত করে রাখতে চায়। যদিও নেহেরু দর্শনের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দেখতে পাওয়া যায় যা এ অভিলাষের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে আজকের ভারতের অর্থনৈতিক দৃশ্য অখণ্ড ভারতের ধারণাকে বৃদ্ধি করবে এবং ধনতান্ত্রিক ও সামরিক যন্ত্রাদির শিল্প এ উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল (এন,এস,এস) এবং দেশরক্ষা বিভাগের চার বছর স্থায়ী পক্ষ সমর্থক সমালোচনা (কিউ,ডি,আর) ভারত স্বীয় স্বার্থ সাধনে অখণ্ড ভারতের কর্ম পরিকল্পনা এগিয়ে নেয়ার জন্য তা অস্বীকার করতে পারে যা ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্তে জ্বলন্তও সুস্পষ্ট হয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল নিয়ন্ত্রিত (স্টার্টকাম) যোগাযোগ পদে সামরিক কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য ভারতকে আমন্ত্রণ জানান হয়।

ভারত এবং ইসরাইলের সঙ্গে অত্যন্ত গুপ্তভাবে সামরিক সহযোগিতা সম্ভবত দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত অশুভ তথ্য, সরাসরি ভারতের নিজের দেশের মুসলমান জনসংখ্যার প্রতি বৈরী আচরণ এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্য তাই ছিল। ১৯৯২ সালে ভারত ইসরাইল কর্তৃক পূর্ণ কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং ২০০৩ সালে প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শেরণকে লালগালিচা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান থেকেই দুটি জাতির পরস্পর বোঝা পড়ার গভীরতা উপলব্ধি করা যায় যা ছিল জইনিষ্টদের বৃহত্তর ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের লালিত "অখণ্ড ভারত" স্বপ্ন বাস্তবায়নের পায়তারা। উভয় জাতির মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় আর তা হল উভয় দেশ গণতান্ত্রিক, উভয়ে অতিরিক্ত সাম্প্রদায়িক এবং তাদের দেশের মুসলিম জনগণের প্রতি উৎকট স্বদেশভক্ত নীতি অনুসরণ করে জোর করে জমি দখল করাই নয়, হিংসাত্মক ও নৃশংসভাবে অধিকারচ্যুত করে তাদের শাসনাধীনে আনা হচ্ছে। একইভাবে উভয় দেশেই মুসলিম নাগরিকদের নিয়ে ভুল যুক্তি কার্যকরিভাবে প্রদর্শন করছেন এবং যখন তাঁরা প্রতিবাদে দুঃসাহসী ও বীরত্ব দেখায় তখনই সুবিধাজনকভাবে তাঁদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দেয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারত আণবিক কূটনীতিক দৈন্যতা ঃ কিছু মন্তব্য (A Few Remarks on U.S- India Nuclear Diplomacy)

ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রে এখনও কিছু মন্তব্যকার আছেন যারা আণবিক চুক্তির ভিত্তি কি তা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেছেন। একার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করায় ব্যর্থতার প্রাথমিক কারণ অবশ্যই পারস্পরিক অবিশ্বাস যা ইতোমধ্যে রাশিয়া কর্তৃক ভারতের নিকট আনবিক জ্বালানি বিক্রির প্রস্তাব থেকে নূতন প্রলেপের চিহ্ন

www.pathagar.com

দেখতে পাওয়া যায় এবং দেশটি ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার ফলে আরও সন্দেহ হচ্ছে, এতে অতি সম্প্রতি লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে আমেরিকা প্রতিযোগিতা করে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মধ্যে এশিয়াতে আরও একটি যুদ্ধ বাধাতে। এগুলোই হল প্রধান কারণ, যার ফলে আণবিক চুক্তিটি আমেরিকান কংগ্রেসে থেমে গিয়েছিল, অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দেরি হওয়াতে ২০০৭ সালের প্রথমদিক পর্যন্ত স্থগিত ছিল।

এখানে উল্লেখ করা উচিত যে কংগ্রেসের অনুমোদন হল অন্যতম প্রতিবন্ধক, কার্যক্রম প্রক্রিয়া কর্মকর্তাদের দ্বারা সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বেই কংগ্রেসে উপস্থাপন করার বিধান, দু' দেশের মধ্যে একটি আণবিক সহযোগিতা চুক্তি (অথবা বাস্তবায়িতব্য চুক্তি) বন্দোবস্ত করতে হলে আনবিক বাণিজ্যের আইনগত কাঠামোর মধ্যে করতে হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন আণবিক সরবরাহকারী গ্রুপকে (এন,এস,জি) বোঝাতে চেষ্টা করবে যে বিধিসমূহ শিথিলকরতে হবে, কারণ অধিকাংশ বিধি ভারতের সাথে আণবিক ব্যবসার বাধা সৃষ্টি করছে। উভয় প্রতিবন্ধকতা আরও প্রতিবাদের সূত্রপাত করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রে (এবং ভারতে) এর স্থিতিকরণ শর্ত সম্পর্কে সন্দেহের ক্ষেত্রে তৈরি হতে পারে এবং বিশ্বব্যাপী আণবিক বিস্তারের সংশ্লিষ্টদেরকে এবং এশিয়াতে আমেরিকান নিরাপত্তা স্বার্থ কিভাবে পরিতুষ্ট করা হবে তাই বিবেচ্য।

যদি ভারত আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালায় তবে যুক্তরাষ্ট্রকে আণবিক সহযোগিতার বাস্তবায়িতব্য চুক্তির ধারাতে আইনগতভাবে স্থগিত করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, এতে ভারতের পক্ষ থেকে সন্দেহ প্রকাশ করছে। আণবিক চুল্লী এবং জ্বালানিসহ প্রযুক্তির প্রবাহ যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে ব্যাপারে ভারত নিশ্চয়তা চায়, এ কারণে বিশেষ ধারাটি বিলুপ্ত করা প্রয়োজন। ভারতের কিছু বামপন্থী রাজনৈতিক বিশ্লেষক যুক্তরাষ্ট্রের সমসাময়িক বৈদেশিক নীতির পিছনে যে চালিত শক্তি আছে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ অবান্তর প্রতিবাদ করেছে, বিশ্বাস বা প্রত্যয় উৎপাদন না করে বিশ্বকে সামরিক শক্তি দিয়ে আক্রমণ করে পুনর্গঠন করে আয়ত্ত করতে চায়। ভারতের বুদ্ধিজীবী মহলের অন্য আর একদল বলছে আমেরিকা সামরিক শিল্প শক্তিতে সর্বোৎকৃষ্ট হিসেবে সমঝোতা করতে অনিচ্ছুক। অতএব জরুরী শক্তিশালী প্রতিযোগিতাকে সাফল্যের সঙ্গে বাধা দিতে চেষ্টা করবে অথবা বিকল্প শক্তি কেন্দ্র এবং ভারতের সুপার শক্তির কার্যক্ষমতা এবং উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে চুক্তিতে আমেরিকাকে কিছু মাত্র সুবিধাজনক মিথ্যা ওজরের শর্ত দেয়া হবে।

সকল তত্ত্বকথা, বিশ্লেষণ ব্যর্থ হয়, ভারতকে আঁকড়িয়ে ধরার জন্য সেরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদেরকে নূতন রক্ষণশীল কর্মসূচি দিয়ে বশ করে ফেলা হয় এবং দক্ষিণ এশিয়াতে অখণ্ড ভারতের মত সম্প্রসারণের সুযোগ আসে। ভারত পূর্ণ বিস্তৃত পরিসরে তার পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশগুলোর উপর সংশ্লিষ্ট কৌশল খাটিয়ে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে সর্বাঙ্গীন নিয়ন্ত্রণ থাকবে আমেরিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন এ পর্যবেক্ষক হিসেবে সদস্য হওয়ার দরখাস্ত যুক্তরাষ্ট্রের নিকট থেকে পেলে বুঝে নেয়া যাবে। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কে নিরাপদে বুঝা যাবে যে ভারত তাঁর মর্জিমাফিক ক্ষমতা বিস্তৃত ভাবে

www.pathagar.com

প্রয়োগের অনুমতি দিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ক্রিয়াকলাপ চালাবে এবং শেষ পর্যন্ত নূতন সংরক্ষণনকারীদের সঙ্গে একীভূত করে ফেলবে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধকরণের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল স্পষ্টভাবে সি,এস,আর-কে অধিকার (উপরে উল্লেখিত হয়েছে) দেয়া হবে। যেখানে প্রতিবেদনের লেখক চীনকে সনাক্ত করেছে উভয় গণতান্ত্রিক দেশের জন্য হুমকিস্বরূপ, আরও গুরুত্বের সাথে বলা যায় যে, কোন সন্দেহ বা আবিশ্বাস যা এখনও দু দেশের মধ্যে বিদ্যমান, তা শুধু সর্বাঙ্গীনভাবে ভারতের সাথে সম্পর্ককে দুর্বলই করবে না, ভারতের আমেরিকা সমর্থন সংখ্যালঘু সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী হবে, যা সম্প্রতি রাজ্য নির্বাচনে আমেরিকান বিরোধী বামপন্থী বিদ্রোহীদের দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে পরাজিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, অতঃপর আণবিক ক্রিয়া কলাপের মৃত্যু ঘটিয়েছে, খুব সম্ভবত ইউ, এস কংগ্রেস আণবিক ক্রিয়াকলাপ অনুমোদন (সংশোধন আকারে) দিয়েছে এবং দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ে একটি নূতন এবং আরও বিপদজ্জনক অবস্থা নিপতিত করার চেষ্টা করছে বাকী এশিয়াকে গ্রাস করার সম্ভাবনা এবং তাতে সারা বিশ্ব আদর্শ ও স্বার্থের সংকটে জড়িয়ে পড়বে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ভারতের মনোভাব এবং মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন এ পথে একমাত্র চরম দুর্দশা হয়ে দাড়িয়েছে এবং অদৃশ্য পুনঃসারিবদ্ধ সামরিক শক্তি এবং এশিয়াতে তাদের স্বার্থে ভারতের উচ্চাকাঙ্খা পরিত্যাগ এ অঞ্চলে সেরা শক্তিতে পরিণত করবে (অর্থাৎ এশিয়ার অন্য অতি শক্তিশালীদের পথ তৈরি করে দিচ্ছে) যা এ সময়ে অত্যন্ত আপছন্দ বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০০৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার শীর্ষ (এস,সি,ও) সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর অনুপস্থিতি ব্যর্থতাকে প্রভাবিত করবে, নূতন দিল্লী ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করছে অন্য দিকে রাশিয়া এবং চীন এস, সি, ও থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে কুটনৈতিক আক্রমণ চালানোর প্রধান মঞ্চ বানাতে চায়। এ বিশ্বাস থেকে আরও প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত উভয়ের লক্ষ্য দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত থাকার বিষয় এড়ান বর্তমানে অসাধ্য, প্রধান এ দু'শক্তির নূতন প্রতিযোগিতার স্থান, শেষে দেশ নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করছে, কিন্তু আত্মসমর্পন নয়, তাঁদের দৃষ্টি অখণ্ড ভারতের দিকে যা তাদের নিয়ন্ত্রণেও শাসনাধীন এলাকায় সমন্বয় সাধন করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নীতির পরিবর্তন
The Unitedstates Policy Shift

১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ার এবং পেন্টাগনে আঘাত হানার পর যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রতি নীতির পরিবর্তন করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের এ সিদ্ধান্তে বাংলাদেশে আঘাত আসে এবং আরও চারটি দেশের প্রতি অভিবাসী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করে। বাংলাদেশের জন্য এটা অপমানকর পরিণতি, এর কারণ বাংলাদেশের প্রশাসনে আল-কায়েদা এবং তালেবান আছে এবং দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণ ছাউনি আছে বলে ভারত বারবার অভিযোগ করতে থাকে। ২০ কোটি সংখ্যালঘু মুসলমান বেশ বড় সংখ্যা নিয়ে ১০০ কোটি লোকের দেশ ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশকে লক্ষ্য করে মুসলমানদের নিবন্ধ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেয়। এ দেশগুলোর নীতি নির্ধারকদেরকে বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে যে, যুক্তরাষ্ট্র কি ভারতকে তাঁর রাজ্যাংশের

www.pathagar.com

সীমা বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় উৎসাহিত করছে, এ ধরনের পক্ষপাতমূলক অভ্যাস ছাড়া আর কোন কারণ নেই, বিশেষ করে কাশ্মীর এবং গুজরাটে ভারত যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এ তারই প্রমাণ। অন্য আর একটি বিষয়বস্তুর অবস্থান ও আকৃতি অনুযায়ী বলা যাচ্ছে যে, ভারত কৃতকার্যতার সাথে মুসলমানদেরকে যেভাবে শাসনাধিকারে এনেছে তাতে যুক্তরাষ্ট্রে ভারত কে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে না।

মুসলমানদের প্রতি ভারতের অমার্জিত ব্যবহারের এবং বুশ প্রশাসন এর দুষ্কর্মে সাহায্য তাদেরকে উৎসাহিত করছে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বে সরকার এর আগ্রাসন ও সম্প্রসারণবাদ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে ভারত ইতোমধ্যে উদ্যমী হয়ে দক্ষিণ এশিয়াকে নূতন সংরক্ষণাবাদে আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। এ প্রবণতার সংশ্লিষ্টতা মওদুদ আহম্মেদ এর লিখিত পুস্তক "ক্রাইসিস অব ডেভেলপমেন্ট দি কেইস অব বাংলাদেশ" এর সমালোচনায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ (প্রাক্তন উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল), যিনি উভয় সংকটের পরিকল্পনার কথা লিখেছিলেন, এখন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সম্মুখীন হচ্ছে।

"মওদুধ আহমেদ জানতেন যে এগুলো সুপ্রাচীন ভারতীয় সমাজের চরিত্র। আর,এস,এস,এর বিখ্যাত নেতা মাধব সদাশিব গোলওয়ালকার বলেছেন যে, তার কথা মনে করলে বুঝা যাবে তখনও বি,জে,পি-র জন্ম হয় নি" হিন্দুস্তান হিন্দুদের দেশ এবং এর শক্ত মাটি হিন্দু জাতির জন্য, সমৃদ্ধি অর্জন করবে আজকে ভারতের দৃষ্টি দক্ষিণ এশিয়ার দিকে, ভারতের উদ্দেশ্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং ভারত মহাসাগরের প্রান্ত পর্যন্ত যেতে চায়। এটুকু করার জন্য এবং অর্জন করার জন্য ভারত কোন সহযোগিতার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন বরং ভারত প্রতিবেশী দেশগুলোকে তাঁর সম্প্রসারিত সীমান্ত বলে মনে করে, অতএব তাঁদের আক্রমণাত্মক ভঙ্গি এবং আত্মরক্ষামূলক অবস্থান সুস্থিত"।

এ সমস্ত সতর্কবাণীগুলোকে যদি বাংলাদেশে সামরিক কুশলীরা এবং নীতি নির্ধারকরা গুরুতরভাবে চিন্তা না করে তবে বাংলাদেশকে পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার মত একই অবস্থা বরণ করতে হবে, ঐ সমস্ত দেশগলো সর্বশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, ইন্দো-ইউ,এস, এর যুক্ত প্রচেষ্টায় দেশগুলো তাঁদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থাকে পরিবর্তন করতে হয়েছে যা তাঁদের দেশের স্বার্থের জন্য নয় এবং জনগণের আশাও মিটবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে এ সমস্ত দেশের জাতিগত, ধর্মীয় অথবা আঞ্চলিকতাকে উদ্দীপ্ত করে তদানুযায়ী দেশের সীমান্ত অখণ্ডতা পূনর্বিবেচনা করে শ্রেণীবদ্ধ লোকদের অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করার অভিমত এবং দক্ষিণ এশিয়াতে তাদের ভূ-কৌশল প্রক্রিয়া বেশী অনুকূল এবং সহানুভূতিপূর্ণ।

পাকিস্তানের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আই, এস, আই) এর নিকট যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোকে দোষী সাব্যস্ত করার মত যথেষ্ট প্রমাণ আছে, সংকটময় মুহূর্তে অন্ধভাবে ভারতের চেষ্টার স্বপক্ষে বেলুচিস্তানে বিদ্রোহের আগুন জ্বালানোর জন্য ভারতের চেষ্টাকে সমর্থন করে। নতুন দিল্লী বেলুচিস্তানের হস্তক্ষেপকে অস্বীকার করেছে। আই, এস, আই, কর্মকর্তাগণ বিশ্বাস করেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র এবং আফগান কর্মকর্তাগণ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে অনুমতি দিয়ে দক্ষিণ আফগানিস্তানে পুস্তুন উপজাতিদের নিকট অতুলণীয় প্রবেশাধিকার দিয়ে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে

www.pathagar.com

দিয়েছে। যেখান থেকে পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করা যায়, অনুমানসিদ্ধভাবে বলা যায় প্রক্রিয়া চালাতে সক্ষম হবে। একই ধরনের সম্ভাব্য ঘটনার জন্য বাংলাদেশকে তৈরি থাকতে হবে (সি,এইচ,টি সম্পর্কে ঘটনা ঘটতে পারে) মেজর জেনারেল সৈয়দ আহমেদ বাংলাদেশ আর্মি জর্নালে প্রমাণস্বরূপ পুনঃপ্রকাশ করে পরামর্শ দিয়েছেন যে রাজনৈতিক নেতাদেরকে প্রথাগত নীতি অনুসরণ করে কাজ করতে হবে।

আমাদের ভৌগোলিক কৌশলের বাস্তবতার দাবী অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়াতে ক্ষমতার ভারসাম্যের অবস্থা বিবেচনায় এনে সে অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ভয়ানক শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য একটি ছোট রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে ছেড়ে দিয়ে অন্য একটি বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে আঁতাত করা সম্ভব নয়। শত্রুর শত্রু হয় বন্ধু এ ধরনের বিচক্ষণতা সামরিক মিত্রতার ভিত্তি হয় এবং ইতিহাস অনুযায়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা হয়েছে। নিজের অস্থিত্বের জন্য সংগ্রামে বাংলাদেশকে সকল সুযোগ কাজে লাগাতে হবে, সেক্ষেত্রে মিত্রতার সম্ভাবনার পথও খোলা আছে।

ইন্দো-ইউ, এস আণবিক প্রক্রিয়া এবং ভারত ইসরাইল সামরিক সহযোগিতার আলোকে বলা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের টিকে থাকা সংকটপূর্ণ হওয়াতে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের সকল দেশ উভয় সংকটে আছে। বাংলাদেশের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে কৌশলগত সুযোগ কাজে লাগানো এবং ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বন্ধু রাষ্ট্রগুলোকে আকর্ষণ করা হলে পারস্পারিক স্বার্থে দক্ষিণ এশিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রেখে সম্প্রসারণ বাদী আদর্শ সম্পূর্ণ অঞ্চলকে গ্রাস করার হুমকিদেয় এবং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পুনঃযুক্ত হওয়ার জন্য সীমাহীন যুদ্ধ চালাতে চায় যা হিটলারের "ল্যাবেনসেরাম" এর অনুসন্ধান, প্রবল আগ্রহ ও ক্রোধকে মনে করিয়ে দেয়।

রেফারেন্সঃ

১. সুব্রামানিয়ান স্বামী- দি ডেমোগ্রাফিক ডিটোনেটরস।
২. মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন- শেখ হাসিনা'স ট্রিপ টু ইন্ডিয়াঃ রিলিজিয়াস অর পলিটিক্যাল।
৩. ইউ, এন, বি- হাসিনা টু রিসিভ মাদার তেরেসা এওয়ার্ড অন জুন ২৪।
৪. পরিতোষ পাল- মিসনারিস অব চ্যারিটি ডিসক্লেইম মাদার তেরেসা এওয়ার্ড।
৫. ইউ,এন, বি- হাসিনা মিটস্ বাজপী, গুজরাল, আদভানি।
৬. এ্যালেক্স প্যারি- রেইনিং ইন দি ক্যাডিক্যালস (২০০৫)।
৭. আরন্যউর্ড ডি ব্রোচগ্রেইব- ক্রাই টু মি, বাংলাদেশ (২০০৬)।
৮. অববিন্দু অধিগা- ষ্টেট অব ডিস্গ্রেস (২০০৪)
৯. সোয়াতী পারাশার- এনগেজ বাংলাদেশ বিফোর ইট ইজ টুলেট (২০০৬)।
১০. আই, এন, এস- বাংলাদেশ মিলিটেন্টস সেন্টেন্স টু ডেথ।
১১. সেরণ স্কোয়াসনি- ইন্ডিয়ানস নিউক্লিয়ার সেপারেশন প্লান, ইসুজ এন্ড ভিউজ (সি, আর, এস রিপোর্ট ২০০৬)
১২. লিওনার্ড ওয়েস- এ হাই ষ্টেকস নিউ ক্লিয়ার গ্যামবল (২০০৫)
১৩. ডেভিড্ সেলবি- ইউ এস সিকস্ টু ব্রিং ইন্ডিয়া ইনটু নিউক্লিয়ার নন প্রোলিফিরেশন রিজিম (২০০৬)।
১৪. ভ্যান রবিনসন- অপোনেন্টস অব ইউ এস ইন্ডিয়া নিউক্লিয়ার ডেল আরজ্ বুশ টু রিকনসিডার
১৫. প্রফুল বিদওয়াই- এ গ্লোবা বুলি এজ্ এ ফ্রেন্ড (২০০৫)
১৬. রাম পুন্যাইয়ানি- ইউ, এস ইন্ডিয়া এলায়েন্স এন্ড গ্লোবাল সিনারিও (২০০৬)।

www.pathagar.com

ভারত দর্শন

অধ্যায়- ১

ভারতের উত্থান ও পুনঃযুক্তকরণ নীতি

সূচনা ঃ ১৯৪৭ সালের পূর্বে ব্রিটিশ শাসনের আওতায় ভারতের যে সীমানা ছিল, কিছু সংখ্যক জ্ঞানসম্পন্ন ও বিশেষজ্ঞমহল যাকে অখণ্ডভারত অথবা যুক্তভারত বলে জানতেন তা পুনঃযুক্তকরণের নীতি সর্ম্পকে ভারত সরকারিভাবে কোন বিবৃতি দেয় নি। কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞের ধারণা হল অখণ্ডভারতের ভৌগোলিক সীমারেখা প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু সাম্রাজ্যসহ সম্প্রসারিত হবে যতটুকু ভারতের ইতিহাস, ধর্মীয় মতবাদ ও সাহিত্যের মূল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত আছে। একটি অখণ্ডভারত গঠনের মত বির্তকমূলক নীতি বাস্তবায়নের কাজ করার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কোন বিবৃতি ছিল না যা এই গ্রন্থের লেখক ইতোপূর্বে ইঙ্গিত দিয়েছে (লেখক ২০০০-২০০১ সালে তাঁর লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন)। ভারত সরকারের নীতিতে একটি অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন বেসরকারিভাবে বিরাজিত, যা প্রতিবেশী দেশসমূহের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে এবং এ নীতি ১৯৪৭ সাল থেকেই আছে।

বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে লেখকের মূল প্রস্তাবনায় যা উল্লেখ করা হয়েছে তা এখন অতি নিকটবর্তী এবং অসংখ্য পাঠক দেখতে পেয়েছে যে এটা অবিশ্বাস্য রকমের ঘটনা। ২০০১ সালে লিখিত গ্রন্থাকারের একটি প্রবন্ধে দাবী করেছিল যে ভারত তাঁর প্রতিবেশী দেশের সার্বভৌমত্ব পরিকল্পিতভাবে লঙ্ঘন করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে এবং এটা একটি মাত্র অনুচ্ছেদের প্রতিক্রিয়া। বি. এস. এফ এবং বি. ডি. আর এর সঙ্গে অবিরত দাঙ্গা এবং বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত এলাকায় একটানাভাবে বাংলাদেশী বেসামরিক লোকদের হত্যাই প্রমাণ করে তাদের সম্প্রাসরণশীল আক্রমণাত্মক নীতি যার মধ্যে প্রশমনের কোন চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না এবং ১৯৪৭ সালের পর দক্ষিণ এশিয়ার বাস্তবতাকে ভারত মেনে নিতে পারে নি, এটা হল একটি উদাহরণ। বিশেষভাবে এবং স্পষ্টরূপে এ আচরণ নেপাল, শীলংকা এবং ২০০৬ সালের প্রথম ছয় মাসে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে অশান্তির সৃষ্টি করেছে এবং ২০০৭ সালে বাংলাদেশের সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য একই নীতি কাজ করেছে।

দ্বি-জাতি তত্ত্ব (টু ন্যাশনস থিওরি)

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে বহু মানুষ জানে না কি কারণে ভারত দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারণা গ্রহণ করে নি, ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এটা সর্বজনবিধীত যে উপ-মহাদেশের সবগুলো দেশে তাঁরা কিছু দুষ্কর্মের হোতা ও বিদেশী শত্রুপক্ষের লোকদেরকে নিয়োগদান করে দ্বি-জাতি তত্ত্বকে ধর্মভিত্তিক বলে মিথ্যা প্রচারণা চালায়। লেখক এ ধারণার সঙ্গে একমত হবেন, কিন্তু ভারতের নিজস্ব ঐক্য বিনষ্ট, কেন্দ্রের শক্তিকে অক্ষুণ্ন রেখে তাঁরা পাকিস্তানকে সহজভাবে আরো খণ্ড খণ্ড করার অভিপ্রায়,

www.pathagar.com

প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আচরণ এর প্রতি বাস্তববাদী হওয়া এবং মূল্যায়ন করতে উৎসাহিত হওয়া, এসব কিছুই অখণ্ড ভারতের ভাবতত্ত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে সমভাবের অভাবকে দু'টি বিশেষ বইয়ে সম্পূর্ণরূপে ফাঁস করে দেয়া হয়েছে। জিন্নার ভয় ছিল যে হিন্দু প্রভাবিত সংস্কৃতি যা পূর্ব পাকিস্তানে উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে, দ্বি-জাতি তত্ত্ব দ্বারা তা সমাধান হবে না। দু'টি জাতির ধারণা সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় ভাবধারার উপর নির্ভর ছিল বলে কাজ করা সহজ ছিল না।

ভারতে দু'টি ধর্মীয় জাতি থাকলেও সেখানে বহু ভাষাভাষী ও সাংস্কৃতির জাতি আছে। ইউ,পি'র মুসলমানদের কথাই ধরা যাক, পূর্ব ভারতীয় মুসলমানগণ সমধর্মীয় হওয়া সত্ত্বে তাঁরা এক নয়, যদিও একই ধর্মে বিশ্বাসী। ইউ,পি'র সাংস্কৃতি মোগলদের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং মূল উর্দু ভাষার দ্বারা প্রভাবিত, অন্যদিকে পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিতে উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলমান শাসনামলের প্রভাবের চেয়ে বাংলা সাংস্কৃতির প্রাধান্য বেশী দেখা যায়। প্রথমোক্ত গোষ্ঠী কুর্তা ও পায়জামাকে মুসলমানদের উপযুক্ত পোশাক বলে মনে করত, শেষোক্তরা তাঁদের হিন্দু প্রতিবেশীদের মত ধুতি পরিধান না করলেও লুঙ্গি ব্যবহার করত যা শিষ্টাচার বলে মনে করত। প্রথমোক্তরা উর্দু ভাষাকে মুসলমানদের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করত, অন্যদিকে শেষোক্তরা উর্দুর কোন শব্দও জানতো না।

১৯৭১ সালের ঘটনায় দ্বি-বিভাজন পরিকল্পনার বাস্তবায়নের চিত্রই সম্পূর্ণরূপে ফুটে উঠেছে, কিন্তু তারপরও পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘুও মুসলমান উভয়ের ভাল দিক হচ্ছে বর্তমানে ভারতের মনোভার কি তা সহজে বুঝতে সক্ষম হওয়া, কারণ কংগ্রেস সরকার এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এ দু'টি দেশের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে কাজ করছে যার ফলে বেলুচিস্তানের অস্থিতিশিলতা সৃষ্টি করেছে এবং ২০০৭ সালে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসমস্ত ঘটনাগুলো বি.জে.পি এবং আর.এস.এস এর অবিরত ও সক্রিয় কার্যকলাপ এবং আচরণ, স্পষ্টভাবে সম্প্রাদায়িক প্রেরণা যোগাচ্ছে, এতে সহজেই বুঝা যায় যে ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ কর্তৃক ভারত বিভাগের দাবীর মূলে এ সমস্ত কারণই নিহিত ছিল।

মুসলিম বিরোধী কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থানের ফলে মুসলমানদের মনে এক অস্বস্থিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, সংগ্রামরত জাতীয়তাবাদী হিন্দুরা মুসলমানদের বাগ্মিতা বিরোধী ছিল, ঐতিহাসিকভাবে এটা জানা যায় বৈদেশিক শাসনের কৃপা থেকে অনিয়মতান্ত্রিকভাবেই হিন্দুদের পতন ঘটে। মুসলমানদেরকে ঘৃণাভরে বিদ্বেষী, হিংসুক ও গোলামী প্রবণতার মানুষ বলে অভিহিত করা হতো, এছাড়া হিন্দু জাতীয়তাবাদী সাহিত্যে এবং হিন্দু প্রতীকগুলো ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রচারের উৎস ছিল।

লেখকের মতে, দ্বি-জাতি তত্ত্বকে শুধুমাত্র দ্বি-জাতির তত্ত্ব বলা উচিত নয়, এটা বহুজাতি তত্ত্ব ছিল এবং ১৯৪৭ সালেই ভারত বিভাজনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এটার জন্য কোন দূরদৃষ্টির প্রয়োজন হয় নি। সাম্প্রদায়িক ও সাংস্কৃতিক বিভাজনের জন্য এটাই ছিল সবচেয়ে ভাল সমাধান। পরবর্তীতে পাকিস্তানের সঙ্গে অনেকগুলো যুদ্ধের ফলে দেখা যায় হিন্দুদের অন্ধগোড়ামির উৎপত্তি, সেভেন সিষ্টারে

www.pathagar.com

গৃহযুদ্ধ, ভারত সরকারের বেহায়া আচরণ, জোর করে সীমান্তে লোক ঢুকানো এবং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে অন্যায়ভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নীতিতে নাক গলানো, এ এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে বর্ণনাতীত দূর্দশার সৃষ্টি করেছে।

এ সমস্ত অবস্থা দৃষ্টে ভাইসরয় লুইস মাউন্টব্যাটন ভারতের প্রতি মুগ্ধ হয়ে ভারতের ঐক্য সাধনে তৎপর হলেন যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক (এখানে উল্লেখ্য যে এগুলো সবই নেহেরুর ধারণা ও মতবাদ যা তাদের উভয়ের একান্ত আলোচনাকালে বহুবার বলা হয়েছিল) এবং তিনি ভারতের অভ্যন্তরে বিশেষ করে কাশ্মীর ও উত্তর পূর্বাচলের স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে উপেক্ষা করেছেন। এটা সত্য যে মাউন্টব্যাটন অন্যায়ভাবে জওহারলাল নেহেরু কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন, প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি ত্রিজাতি তত্ত্বকে সমর্থন করেন যা কলিনস এবং নেপিয়ার এর লিখিত " ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট" (১৯৮১) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান এবং ভারতের ইতিহাসবিদগণ ইচ্ছাকৃতভাবে একথাগুলো ভুলেগেছেন অথবা সতর্কতার সাথে এড়িয়ে গেছেন।

পরিকল্পনার নিহিতার্থ অর্থ সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করেই (মাউন্টব্যাটেন) লন্ডনে প্রস্তাব প্রেরণ করেছিল যে বৃহৎ ভারতীয় উপ-মহাদেশকে দু'টি নয় তিনটি স্বাধীন জাতিতে ভাগ করা হবে। মাউন্টব্যাটেন তার পরিকল্পনায় আরও একটি ধারা সংযোজন করেছিল যে বাংলার পঁয়ষট্রি মিলিয়ন হিন্দু মুসলমান একত্রে একটি সক্ষম রাষ্ট্রে বাস করতে পারবে এবং যার রাজধানী হবে বন্দর নগরী কোলকাতা।

হঠাৎ একটি প্রেরণা মাউন্টব্যাটনের মনে রেখাপাত করল। তিনি নিজকে নিজে পুনঃআশ্বস্ত করলেন, তাঁর কর্মচারীদের চরম দুদর্শার বিষয়ে আলোচনার জন্য বিধিবহির্ভূতভাবে অবকাশ যাপন স্থান শিমলায় ভারতীয় নেতাদের আমন্ত্রণ জানালেন। জিন্নাহকে না জানিয়ে তিনি তার পরিকল্পনা নেহেরুকে দেখালেন যা ছিল মুসলিম নেতাদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসঘাতকতা। জিন্নাহ যদি জানতেন তাহলে মাউন্টব্যাটনের সকল পরিকল্পপনা ধূলিসাৎ হয়ে যেতো।

সেই রাত্রে মাউন্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনা নেহেরুর অবগাতির জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং একগ্লাস মদ দিয়ে আপ্যায়ন করেন। ধীরে ধীরে তিনি পরিকল্পনার অনুলিপি কংগ্রেস নেতাদের নিকট প্রেরণ করেন। জওহারলাল নেহেরু গভীর সতর্কতার সাথে তাঁর দেশের ভবিষ্যৎ মূল নকসা পরীক্ষা করেন। পরিকল্পনা পড়ে তিনি আতংকিত হন। পরিকল্পনায় ভারতের প্রত্যাশা সঠিকভাবে প্রতিফলিত না হওয়ায় তিনি বাকশক্তি হারানোর মত অবস্থায় পড়েন, কারণ ভারত দু'ভাগে ভাগ হবে না, বরং এক ডজন টুকরা করা হবে। পরিকল্পনা দেখে তিনি বিশ্বাস করেন ভারতীয়দের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হবে, ঐক্য ভাঙ্গবে, ভাষাগত, সাংস্কৃতির এবং জাতিগত বিদ্বেষ উপ-মহাদেশকে হিংসাত্মক, দুর্বল ও মিশ্ররাষ্ট্রে পরিণত করবে।

১৯৪৭ সালের মে মাসে মাউন্টব্যাটনের মূল পরিকল্পনার পরিণতিতে পাকিস্তানও ভারত ছাড়াও অন্য একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে যার নাম হবে যুক্তবাংলা অথবা বাংলাদেশ। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের নিকট এ ধারণা গ্রহণযোগ্য হবে না তা নিশ্চিন্তভাবে বলা যায়, কারণ এ পরিকল্পনা সত্যিকারভাবে কার্যকরি হলে পাকিস্তানের ঐক্যের বিষয়টির ন্যায্যতা বুঝান কঠিন হবে। জওহারলাল

www.pathagar.com

নেহেরুর জন্য এটা উদ্বিগ্নের বিষয় ছিল এবং তাঁর ভয় ছিল যে, যদি এ ধারণা ভারতের অন্য অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করে তবে জাতিগত অথবা ধর্মীয় আদর্শের উপর ভিত্তি করে পৃথক রাষ্ট্রগঠনের দাবি উত্থাপিত হবে, এতে ভারতে শক্তিশালী কেন্দ্র গঠন করে অখণ্ড ভারত টিকে থাকবে না। যদি ১৯৪৭ এর মে মাসের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় এবং নেহেরুর ভবিষ্যৎ বাণীর প্রতিকূল হয় তাহলে ১৯৪৭ সালের পূর্বের ভারতকে ভাঙ্গতে দেয়া হবে না, কংগ্রেস সরকার কয়েক মাসের মধ্যে নতুন বাংলা আক্রমণ করবে, এবং তাদেরকে কোন অবস্থাতেই টিকে থাকতে দেয়া হবে না। এটা হলে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাতে তাদের ভাগ্যে আরও দুর্ভোগ ঘটবে এবং পাকিস্তানকে পতঙ্গ খাওয়ার মত গিলে ফেলবে যাদের কোন স্বাধীনতা থাকবে না।

সংকট নিরশনে এর চেয়েও ভাল সমাধান ছিল যা পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণে মাউন্টব্যাটনের নিকট উপস্থাপন না করে ভারত থেকে পৃথক স্বাধীন বঙ্গদেশের রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি দুর্বল কনফেডারেশন গঠনের চিন্তা করা হয় (১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এর অনুরূপ বিবেচনা করার মত), যার অস্থিত্ব টিকে থাকবে, যেমন- সেভেন সিস্টারের সত্যিকারের কোন জাতিত্ত্ব ভারতের নিকট নেই বা তুচ্ছ, সম্প্রতি তাঁরা স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবী তুলেছে। এতদসত্ত্বে ও বাংলাদেশের অনেক মন্তব্যকার এখন বঙ্গদেশের রাজ্যগুলোর মত একতার কথা বলছে, যদি তাদের এ প্রত্যাশা কার্যকরি হয় তবে বাংলাদেশ ও ভারতীয় ইউনিয়নের অধীনে সিমিত স্বায়ত্ত্বশাসন দিয়ে একটি প্রদেশ হিসেবে থাকবে।

যাইহোক, এই বিষয়টি পুস্তকের বর্তমান অংশের নয়, তবে যুক্তবাংলা বা অখণ্ড বাংলার প্রশ্নটি পুস্তকের ৩য় ও ৫ম খণ্ডে লিখা হয়েছে। ভারতের রাজ্যবিস্তার এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই এ অংশটির বিষয়বস্তু যার বিস্তারিত বর্ণনা ২য় অংশে দেয়া হয়েছে। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য দেয়ার পিছনে ভারতের কি উদ্দেশ্য ছিল তাও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এ পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে। এ রচনার অবশিষ্টাংশে (দ্বিতীয় অংশে) বাংলাদেশের উপর বিশেষভাবে ভারতের হস্তক্ষেপের নির্দিষ্ট উদাহরণগুলো তুলে ধরা হয়েছে, এতে ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমাদের দেশের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তৃত ইতিহাস জানা যাবে।

জওহার লাল নেহেরু- ভারতে অবাস্তব চিন্তাশীল ব্যক্তি
(Jawharlal Nehru-India's Ideologue)

"মেইন ক্যাম্প" না পড়ে হিটলারের জার্মানিকে বুঝা যেমন অসম্ভব, ঠিক একই কথা বলা যেতে পারে যে ভারতকে বুঝতে হলে জওহারলাল নেহেরুর রচনা কৌশল ও প্রকাশনা পড়তে হবে। এই দু'ব্যক্তিত্ত্বের মধ্যে নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলনা করার প্রচেষ্টা নয়, বরং তাদের মধ্যে ও প্রাথমিক পর্যায়ে বহু বিষয়ে পার্থক্য আছে যা শুধুমাত্র বুঝার জন্য উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। তথাপি অতীতের বি,জে,পি সরকার নাজি জার্মানি এর সঙ্গে তুলনা করতে যুক্তিসঙ্গতভাবেই উপযুক্ত। অন্যদিকে তাঁদের অবাস্তব চিন্তাশীলতার উপলব্ধিকে তুলনা করা অত্যুক্তি হবে না, কারণ কংগ্রেস সরকার ও বুশ প্রশাসন উভয়ের আদেশব্যঞ্জক কার্যকলাপ বর্তমানে বহুক্ষেত্রে আণবিক

www.pathagar.com

কর্মসূচিতে অংশীদারিত্বে স্থার্থ সংশ্লিষ্ট, উভয়ের মধ্যে নতুন কিছু গ্রহণে অস্বীকৃতি, রাজনৈতিক শ্রেষ্টত্ব এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার সুযোগে আগ্রাসীনীতি প্রয়োগ করাই উদ্দেশ্য।

এখন ভারতের বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্য ও অভিলাষ প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। এ সমস্ত বিষয়গুলো জওহারলাল নেহেরু লিখিত "ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া" (প্রথম সংস্করণ ১৯৪৬) পুস্তকে অবিকশিত অবস্থায় আছে, সেখান থেকে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হল, "যদি ভারত দুই অথবা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং এককভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাজ আর কখনও না করতে পারে তাহলে ভারতের উন্নতি গুরুতরভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে। বিশেষ করে যারা ভারতকে পুনঃযুক্তকরণের পক্ষে এবং যারা বিপক্ষে তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের অবনতি ঘটবে। অনৈক্যতার চেয়ে ঐক্য অধিকতর ভাল, কিন্তু বল প্রয়োগের ঐক্য একটি ধোঁকাবাজি এবং বিপদজ্জনক বিষয়, বিস্ফোরকপূর্ণ। মন ও হৃদয়ের ঐক্য সবচেয়ে বড়।

এই চেতনা একিভূত করতে হবে এবং যারা এই চেতনায় আঘাত করবে তাঁদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। আমি দৃঢ়প্রত্যয়ী যে প্রমাণ ও যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা ভারতে ঐক্য সৃষ্টি করতে সফল হয়েছি, কিন্তু অন্য শক্তি এ ঐক্যকে কিছু পরিমাণ লুকিয়ে আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। পরবর্তীর এগুলো অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী এবং কৃত্রিম , ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলা যাবে, কিন্তু এখন এগুলো গ্রাহ্য করা হচ্ছে এবং কোন মানুষ তাঁদেরকে ভুলবে না। যদিও বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান ভাবপ্রবণতায় উদ্রেক হয়ে বিভক্তির ধারায় সম্পৃক্ত হয়েছে, এর ফলাফল কি হবে তা চিন্তা করে নি। আমি মনে করি এই ভাবপ্রবণতা কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যার কোন শিকড় মুসলমানদের মনে নেই। ভারতকে কয়েকভাগে বিভক্ত করতে বল প্রয়োগ করছে, অতি সূক্ষ্ম দাসত্বাবদ্ধ কিছু লোক বিভক্ত অংশে যোগ দিচ্ছে। এমন যদি ঘটে, তবে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ী যে ঐক্যের মূল অনুভূতি এবং বিশ্বের উন্নতির জন্য পরবর্তীতে বিভক্ত অংশগুলো একটি অন্যটির কাছাকাছি আসবে, যার ফলাফল হবে প্রকৃত ঐক্য। এটা স্পষ্ট যে ভারতের ভবিষ্যৎ যাই হোক, যদি ভাগ হয়েই যায়, তবে বিভিন্ন অংশ একে অন্যের সঙ্গে শতভাবে সহযোগিতা করবে। এমনকি স্বাধীন দেশগুলো একে অন্যের সাথে সহযোগিতা করতে সংযুক্ত করা হবে অথবা অবনতি ঘটিয়ে খণ্ড খণ্ড করা হবে এবং তাতে স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবে।

অতএব আমরা এমন অপরিহার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যা এড়ান যায় না, পাকিস্তান হোক বা না হোক যদি ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকে তবে, দেশের কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক কার্যাবলীর জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। বিকল্প হিসেবে সার্বিকভাবে ভারত এবং বিভিন্ন বিভক্ত অংশে নিশ্চল অবস্থা সৃষ্টি করে পতন ঘটিয়ে নানা বিভাজন অংশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বধীনতার ক্ষতির পথ করতে হবে। একজন বিখ্যাত বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেছেন: বিভিন্ন বিকল্প উপায়ে এযুগের অপ্রতিরোধীয় দর্শন দেশকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আমূল সংস্কারকামী মতবাদ দিতে পারে, আর তা হোল ঐক্য এবং স্বাধীনতা, অথবা অনৈক্য এবং পরনির্ভরশীলতা। পৃথকীকরণ এর সম্ভাবনা থেকে বিভাজন আরম্ভ হলে বিপদজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হবে। এধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলে একটি স্বাধীন দেশ

www.pathagar.com

গঠনের প্রারম্ভ থেকেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এটা কল্পনা করা কঠিন যে কোন বিক্ষোভের কারণে একটি স্বাধীন দেশের উত্থান হয়, এবং এমন কিছু যদি ঘটে তবে তা হবে দুঃজনক, উপহাস, এবং বিসদৃশপূর্ণ ও সমাধানের অসাধ্য। এটাই হল অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা যা ১৯৪৭ সাল থেকে সকল ভারতীয় প্রশাসনের কেন্দ্রীয় বৈদেশীক নীতির শেষ সীমারেখা এবং দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্র প্রাথমিক চিন্তাধারা। জওহারলাল নেহেরু কর্তৃক সমগ্র যুক্তভারতের জন্য যে কর্মসূচি তৈরি করেছিলেন, প্রাথমিকভাবে পিছনের দিকে তাকালে দেখা যায় এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পূর্বে ভারত বলে কোন দেশের অস্থিত্ব ছিল না। এটাই বাস্তবতা, তৎসত্ত্বেও ভারত বিভক্তির সময় থেকে অখন্ডভারতের ধারনা পুনঃসৃষ্টিতে ভারতের নীতি নির্ধারকেরা প্রতিরোধ করে নি, বরং তাদের চমৎকার কৌশল যথোচিতভাবে দক্ষিণ এশিয়ান অঞ্চলে কার্যকর করার প্রয়াশ পেয়েছে, তাদের নীতিভ্রংশ, পৌরাণিক দর্শন ও অতীত ইতিহাস ১৯৪৭ সালের বিভাজন থেকে বুঝা যায়।

ঐতিহাসিক অভিপ্রায়
(Historical Intentions)

অখণ্ডভারত সম্পর্কে মূল দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রভাব ভারত বিভাজন এর ব্যাপারে তাঁদের মতামত মৌলিকভাবে বদলায় নি। উপরন্তু সাম্প্রতিক দশকে আরও বেশী কট্টর অবস্থান নিয়েছে। জওহারলাল নেহেরু ১৯৪৭- ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এ সময়ে বিস্ময়কর ও পরিব্যাপক প্রভাব খাটিয়েছেন এবং উত্তরকালীন প্রজন্মকে মাথায় হাত বুলিয়ে দেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এটা একটা পর্যবেক্ষক যা অসম্ভাব্য প্রশ্নাবলীর সম্মুখীন হতে পারে, অথবা স্পষ্টভাবে পরস্পর বিরোধী হতে পারে, অথবা পর্যবেক্ষণ থেকে দৃষ্টিগোচর হয় যে তাঁর মেয়ে, নাতি, নাতনিদের দ্বারা রাজনৈতিক বংশ সৃষ্টির প্রয়াশে তিনি সকলকে একই ধারায় কংগ্রেসের কাজে সম্পৃক্ত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর এ সমস্ত অভিব্যক্তি কাজে রূপান্তরের অর্থ হচ্ছে প্রতিবেশীদেরকে দুর্বল ও দুর্নীতিপরায়ণ করার প্রচেষ্টা। উদাহরণস্বরূপ বলা যাচ্ছে যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্রিটিশ রাজত্বের আর্থিক ও বস্তুগত সম্পদের বাটোয়ারা চুক্তি। পাকিস্তান ভাগের অংশ হিসেবে ২০০ মিলিয়ন রুপি অগ্রীম গ্রহণ করে এবং বাকী অংশ ৫৫০ মিলিয়ন রুপি পাওয়ার কথা। ভারত যুক্তি দেখালো যে এই অর্থ দ্বারা পাকিস্তান অস্ত্র ক্রয় করে ভারতীয় সৈন্যদের মারার ব্যবস্থা করবে। তাই ভারত ঐ টাকা দিতে অস্বীকার করলো এই অজুহাতে যে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত টাকা দেয়া হবে না। অন্যদিকে পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ করপোরেশনকে একটি চেক প্রদান করে যা অপর্যাপ্ত টাকার অভাবে ব্যাংক কর্তৃক ফেরত পাঠানো হয়। সরদার প্যাটেল এই কুটনীতির জন্য দায়ী এবং জওহারলাল নেহেরু এবং সমস্ত মন্ত্রিসভা এ প্রস্তাব অনুমোদন করে, যদিও মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব চূড়ান্ত করার জন্য বহুদিন চেষ্টা করেছেন। মাউন্টব্যাটেন ভারতের এ আচরণকে অদক্ষতাপূর্ণ, মূর্খতাপূর্ণ এবং অসম্মানজনক বলে আখ্যায়িত করেছেন। শেষ পর্যন্ত এ

www.pathagar.com

বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী হস্তক্ষেপ করেন এবং হুমকি প্রদান করেন যে ভারত যদি সম্মানজনক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তবে তিনি আমরণ অনশন করবেন ফলে ভারত পাকিস্তানকে চূড়ান্তভাবে টাকা ছাড় করতে বাধ্য হয়।

১৯৭০ সালের ৩০ নভেম্বর পণ্ডিত জওহারলাল নেহেরুর মেয়ে ইন্দিরাগান্ধী এক জনসভায় ভারত বিভাগ এবং পাকিস্তানের প্রতি তাঁদের আচরণ সম্পর্কে এক বক্তৃতা দেন, সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন "ভারত কোনদিনই পাকিস্তানের অস্তিত্বকে স্বীকার করবে না। ভারতের নেতৃবৃন্দ সব সময় বিশ্বাস করে যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হওয়া উচিত হয়নি এবং পাকিস্তানের বেঁচে থাকার অধিকার নেই"। এ ভাষণে বাংলাদেশকে বিজড়িত করেছে, যদিও এই দেশের কোন মানুষ এটা কখনো স্বীকার করে নি। স্বভাবিকভাবেই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ছিল সম্প্রাসারণবাদী নীতি এবং চিন্তায় ছিল বল প্রয়োগে অখণ্ডভারতের আদর্শ ও ধারণা বাস্তবায়ন।

পাকিস্তানের প্রতি বৈরীভাবের কারণে ভারত বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। ভারতের স্বাভাবিক ইচ্ছা হল এই উপমহাদেশে তাঁর বিরোধী শক্তিগুলো রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেখা। এটা গণতন্ত্রের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল না, অথবা বাংলাদেশের জনগণের প্রতি ভ্রাতৃত্ব বোধও নয় যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ইন্দিরাগান্ধী বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন জানায়। তৎকালীন ভারত সরকার তাদের বিবেচনা অনুযায়ী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজ করেছেন। বাঙালিরা যুদ্ধ করছে এবং তাঁরা সম্পূর্ণভাবে ভারতের নিয়ন্ত্রণাধীন আছে দেখে ভারত কৌতূহলী হয়ে উঠে এবং যুদ্ধে বিজরিত হয়। ভারত সরকার নিশ্চিত হতে চাইল যে পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্ব অপসারণ হলে বাংলাদেশে তাদের পছন্দমত ও কার্যকরি সরকার গঠিত হবে।

ভারত সরকার এটা অর্জনের জন্য কতদূর পর্যন্ত প্রস্তুত ছিল এবং কতটুকু চেষ্টা করেছিল তা এই রচনার ৩-৫ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হবে যা জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাসঙ্গিক সময়ে করা হয়েছে।

নেহেরু মতবাদ এবং ভারতের অগ্রবর্তী নীতি
(The Nehru Doctrine and India's Forward Policy)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে ভারতের দাদাগিরি করার প্রয়াশ, ১৯৭১ সালের ঘটনায় কিছুটা আভাস পাওয়া যায় এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ দেখতে পায় যে ভারত কর্তৃত্ব প্রয়াশী, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এবং পণ্ডিত নেহেরুর চিন্তাধারা ও ভারতের অগ্রবর্তী নীতির ভবিষ্যৎ চূড়ান্ত রূপদানের কার্যকলাপ। এই অগ্রবর্তী নীতির একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, এটা কোন অপ্রত্যাশিত বিষয় নয়, আর তা হল নেহেরু মতবাদ। নেপালের ঘটনা থেকে অনুধাবন করা যায় যে এটা ভারতের প্রতিবেশী দেশসমূহের জন্য প্রতিধ্বনি। ১৯৫০ সালের ১৭ মার্চ পার্লামেন্টে পণ্ডিত নেহেরু খোলাখুলিভাবে বলেছেন, "ভারত উপমহাদেশে কোন বিদেশী দেশ কর্তৃক কোন অংশ বিদেশী শক্তি দ্বারা আগ্রাসন হলে তা দমন করা ছাড়া কোন প্রকারেই সহ্য করা হবে না" নেপাল দখল করার উদ্দেশ্য যে কোন সম্ভাব্য আক্রমণ এর সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীভাবে ভারতের নিরাপত্তা জড়িত।

www.pathagar.com

২০০৬ সালের প্রথম কয়েক মাসের প্রমাণিত তথ্য থেকে বুঝা যায় যে নেপাল ও শ্রীলংকা উভয়দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাই ইঙ্গিত করে ভারত বিদেশী আগ্রাসনকে বহু ব্যাপক অর্থে বুঝিয়েছে এবং ব্যাখ্যা দিয়েছে। ভারত তাঁর প্রতিবেশী উভয় দেশ নেপাল ও শ্রীলংকার বিষয়ে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের স্বার্থান্বেষী ইঙ্গিত প্রতিভাত হলে অন্যায়ভাবে বর্জন করার উপলব্ধিকে নিজের আঘাত মনে করে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত- চীন (ক্ষুদ্রতর ব্যাপ্তিতে আমেরিকানস্) প্রভাব বিস্তারে সরাসরি এই দেশগুলোর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনে অস্বাভাবিক উৎসাহ সৃষ্টি করলে তাঁদের সামরিক শক্তি এবং সর্বোৎকৃষ্ট সুকৌশল দক্ষিণ এশিয়ায় হ্রাস হওয়ার কারণে ভারত সরকারের উদ্বিগ্নতা বেড়ে যেতে থাকে। একটি দুর্দ্রান্ত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রতিযোগীর সম্মুখে এটি আশ্চার্যজনক ফলাফল যাকে গুজরাল মতবাদ বলা হয়, কিন্তু এ অঞ্চলের অধিকাংশ দেশের জন্য এটা আর কিছু নহে, শুধু মাত্র নেহেরু মতবাদের সম্প্রসারণ, একই ধরনের কথা ইন্দিরা গান্ধীও যথাযথভাবে কুটনৈতিক কৌশলে এ কাঠামো তৈরি করেছিল। নেহেরু মতবাদের আরও সুনির্দিষ্ট স্থায়ী ও প্রাসঙ্গিক বর্ণনা দেয়া যেতে পারে। ২০০৬ সালের প্রারম্ভে নেপালের অবস্থাকে কেহ তুলনা করলে তা বুঝতে পারবে এবং ১৯৭৩-৭৫ সালের সিকিম এর ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য আছে, যা কিনা নেহেরু মতবাদের চর্চাবজায় রাখার সবচেয়ে উত্তম উদাহরণ। সিকিমে যে সমস্ত ধারাবাহিক ঘটনা ঘটেছে এবং ভারত সরকারের পরোক্ষ হস্তক্ষেপে যেভাবে সেখানের রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করা হয়েছে তাঁর সঙ্গে নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতার সাদৃশ্য আছে তা স্বীকার করতে হবে। একই ঘটনা রাজাজ্ঞানেন্দ্র এর ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য, ভারতের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা, পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া, দু'বার দেশে জরুরি আইন জারি যা কাঠমুন্ডতে আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছে, পরিণামস্বরূপ রাজাকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়েছে। নেপালের এ সমস্ত ধারাবাহিক ঘটনা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভারত সরকার সফলভাবে বিরোধের মধ্যে নিক্ষেপ করতে পেরেছে, গণতন্ত্র উত্তর শক্তি, সেই সঙ্গে মাওগেরিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে রাজাকে অপসরণ করার জন্য বলপ্রয়োগ সব কিছুই পরিকল্পিত। ভারত এখন সম্ভবতঃ আশা করছে যে নেপালের রাজনীতি তাদের রাজ্যাংশের মত চলবে, কিন্তু সার্বভৌমত্বের অধিকারকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আনুষ্ঠানিক পদমর্যাদা ও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া চালানোর সুযোগ দেয়া হবে। ঠিক একই ধরনের ফলাফল সিকিমের ক্ষেত্রেও হয়েছে, কিন্তু ভারতের ওকালতি চালানোর উদ্দেশ্য ছিল যে চোগিয়াল (ধর্মরাজা অথবা ন্যায়পরায়ণরাজা) স্থির করেছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করবে যার পৃথক জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত থাকবে, যা ভারত সরকার ও সিকিম প্রতিনিধিদের পরস্পর সমঝোতার মাধ্যমে করা হয়, ভারত ১৯৫০ সালে দেশটিকে আশ্রিত রাজ্য হিসেবে আখ্যা দেয়, তবে এতে কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না, যে কোন পক্ষ একতরফাভাবে বিষয়টি সংশোধন করতে পারবে। ভারত দাবী করে যে তাঁদের কাছে প্রমাণ আছে সি,আই,এ চোগিয়ালকে স্বাধীনতার জন্য উৎসাহিত করেছে, সে কারণে ভারত তাঁদের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা "র" কে অশান্ত অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য প্ররোচিত করতে নির্দেশ দিয়েছে। দেশের শীর্ষ নেতাদের এবং সরকারি কর্মকর্তাদেরকে কৌশলে গুপ্তভাবে হত্যা করার জন্য চোগিয়ালকে জড়িয়ে 'র'

www.pathagar.com

বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করে যা বিদ্যুত বেগে জনগণকে শাসকের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে ফলে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৩ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী চোগিয়ালকে রক্ষা করার নামে হস্তক্ষেপ করে। সেনাবাহিনী চোগিয়ালকে ভয় দেখিয়ে প্রতি চার বছর অন্তর পার্লামেন্ট নির্বাচন করার শর্তে জনপ্রিয় সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করতে রাজি করান হয়, এবং ১০ এপ্রিল সিকিম গণপরিষদ ঘোষণা করতে সক্ষম হয় যে, "চোগিয়ালের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম আইন প্রভৃতি বিলোপ করা হল এবং এখন থেকে সিকিম হবে ভারতের অংগরাজ্য। ভারতের যুক্তিছিল ভাসাঁভাসা এবং ভিত্তি ছিল গণতন্ত্র ও মানবাধিকার এর ধারণার উপর, কিন্তু সত্যিকার প্রেরণা এসেছে নেহেরু মতাদর্শ ও অগ্রবর্তী নীতি থেকে যা সিকিমের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ স্বার্থের কথা উপলব্ধিকরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ভারত অস্থিতিশীল সিকিম এর বিষয়ে সামান্যতম হলেও সমর্থন যোগাতে পারত, অথবা কোন বিদেশী দেশকে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দিতে পারত– এটা স্পষ্ট যে অস্থিতিশীল প্রতিবেশী ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গভীর ভীতিকর– অতএব সিকিম গণপরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন দিয়ে, ১৯৭৫ সালে ২৬শে এপ্রিল সিকিমকে ভারতীয় ইউনিয়ন এর ২২তম রাজ্য হিসেবে অর্ন্তর্ভুক্ত করে সংবিধানের (৩৮তম সংশোধন) আইন পার্লামেন্টে পাশ করা হয়। রাজাশাসিত একটি রাষ্ট্রকে রক্তপাতহীনভাবে ভারতের একটি গণতান্ত্রিক রাজ্যে পরিবর্তন করার জন্য "র" সাহায্য করে। চোগিয়াল ব্যক্তিগতভাবে জনপ্রিয় নেতাদের ধ্বংস করার জন্য কতটুকু দায়ী ছিলেন এবং সিকিমের সর্বময় ক্ষমতা কতটুকু গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তা রহস্যজনকই আছে।

চার বছর পর "র" সমস্ত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থা ঝেরে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করে। কিছু লোক সেখানে ছিল যারা সেবকের কাজ করেছে তাদেরকে কিছু পরিশ্রমিক দিতে হবে এবং তা দিতে বিলম্বিত করা হয়েছে এই অজুহাতে যে আইনসম্মত অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তহবিল ছাড় করবে এবং মঞ্জুরী প্রদান করবে। কিন্তু তা আর কখনও হয় নি। বিজেপি ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক চুক্তি, সম্প্রতি চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়ন সন্দেহজনক ভেবে যে কেউ ভারতের শক্তিশালী বিরোধী দলকে ডেকে আনতে পারে। যে কোন মৈত্রীচুক্তি এ অঞ্চলে ভারতের আধিপত্যবাদের প্রতি হুমকিস্বরূপ মনে হলে মতাদর্শ অনুযায়ী তা পরিবেষ্টন করে প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে প্রতিহত করার প্রস্তুতি গ্রহণ, প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, অথবা অভ্যন্তরীণ চাপ সৃষ্টি করে, যেমন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতি দ্বারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাতে হবে। উপরোল্লিখিত উদাহরণগুলো থেকে এটা অস্পষ্ট যে নিয়ম কানুন লঙ্ঘন করে চতুরতার আশ্রয় নিয়ে একটি সার্বভৌম দেশের অধিকার কে নেহেরু মতবাদ প্রয়োগ করে আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার হস্তক্ষেপ করবে। যদি নিয়ন্ত্রণ ন্যায়সম্মত না হয়, তবে অবশ্যই বল প্রয়োগ করতে হবে, এ থেকে ভারতকে প্রতিরোধ করা যাবে না, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আইনগত চুক্তি বা দলিলাদির বন্ধন দ্বারা ভারতকে নির্বৃত করা যাবে না, বরং দুর্বল ও ক্ষুদ্র দেশগুলোর সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করে দিবে এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌন সম্মতি আদায় করবে।

www.pathagar.com

ভারত "ইন্‌ভেশনস" শব্দটির ব্যাখ্যা তাঁর নিজের পাণ্ডিত্যপূর্ণ পন্থা ও চিন্তার প্রক্রিয়া দ্বারা প্রদান করে আর্ন্তজাতিক মতামতকে অগ্রাহ্য করে অবিরতভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংবাদ মাধ্যমকে সহজেই প্রচার কাজে নির্দেশ দিবে। এ বিষয়টি সেক্রেটারি অব স্টেট কিসিংগার যেভাবে দেখেছেন," "নিজদেশের জনগণ অথবা প্রতিবেশী দেশসমূহের প্রতি সংবেদনশীল অনুপম কোন অনুভূতি ভারতের ইতিহাসে এবং ভারতীয় আচরণে দেখতে পাই নি"। এই অভিমতটি এমন একজন মানুষের মুখ থেকে বের হয়েছে যিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় আমেরিকার নীতি দেখাশুনা করেছেন এবং নিজেকে স্পষ্টভাবে নৈতিক কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে অভিযুক্ত করেছেন, এটাকে কপটতা বলা যাবে না, একজন বিজ্ঞ কুটনীতিক এর অন্তর্দৃষ্টির বর্ণনা যার মতামত বিভ্রান্তি ও ভাবপ্রবণতা দ্বারা বিকৃত করা হয় নি। এ থেকে পাঠক এই উপমহাদেশে ভারতের অভিলাষ কি তা পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে।

১৯৭১ সালে অত্যন্ত নিকটবর্তী দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অগ্রবর্তী নীতি এবং নেহেরু মতবাদ কাজ করেছে, এ বিষয়ে সেক্রেটারী অব স্টেট কিসিংগার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "ইয়াহিয়া ক্ষমা ঘোষণা করা সত্ত্বেও ভারত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে উদ্ধবাস্তুদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত পাঠায়। কিন্তু ভারত তাঁর সার্বভৌম প্রতিবেশীর সঙ্গে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কি হবে তা যথাযথভাবে স্থির করার অধিকার সংরক্ষিত রাখে।" এই নীতিতে মৌলিকভাবে গত ৩৫ বছরে পরিবর্তন হয়েছে এ রকম চিন্তা করার কোন কারণ নেই, এমনকি কংগ্রেস দল ক্ষমতায় না থাকলে বৈদেশিক নীতি পরিবর্তনের নির্দেশনা দেয়ার সুযোগ অন্য দলেরও আছে, কিন্তু এ ধরনের চর্চা কখনও হয় নি।

এটা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলা যায় যে ভারতের পূর্ববর্তী সকল সরকারের আমলে রাজনৈতিক নেতা এবং সুধীজনদের আচরণ একই রকম অটল ছিল, শুধুমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং বিশেষ রাজনৈতিক আনুকুল্যে কার্যাদি সম্পাদনের প্রণালী পরিবর্তন করা হত। ২০০৫ সালে এক হিন্দু সাময়িকীতে মন্তব্য করা হয়েছে যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রীতি ভবিষ্যতে কি হবে সে বিষয়ে কল্পিত অখন্ড ভারতের শক্তিশালী সমর্থকরা মনোভাব ব্যক্ত করেছে (নেহেরু কি করতালি দিয়ে প্রশংসা করবে, সেকি জীবিত যে সে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অতিশয় গোড়ামি ও ভাবাবেগে কাজ হচ্ছে তা দেখবে?)

আর,এস,এস কখনও বিভক্তিকে মেনে নেয় নি এবং সব সময় অখণ্ড ভারতের (এক ভারত) সমর্থক, যা হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে (হিন্দুজাতি) থাকবে। আর,এস,এস চিরকাল পাকিস্তান এবং ইসলামকে "সার্বজনীন শত্রু" হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আর,এস,এস এর প্রতিষ্ঠাতা পরিষ্কারভাবে ভারত বিভক্তিকে প্রত্যাখান করেছে। মাধব সদাশীব গোলওয়ালকার তাঁর "গুচ্ছবদ্ধ চিন্তাধারায়" বলেছে "আমাদের নেতাদের মধ্যে যারা পাকিস্তান সৃষ্টির অংশীদার ছিল, তাঁরা দোষ ঢাকার জন্য দেশকে ভাঙ্গার দুঃখজনক ঘটনাকে ভ্রাতৃত্বসুলভ ভাগাভাগি বলে বর্ণনা করেছে। কিন্তু এটা ন্যাক্কারজনক তথ্য, একটি আক্রমণকারী মুসলিম রাষ্ট্র আমাদের মাতৃভূমিকে ভেঙ্গে ফেলেছে। যে দিন থেকে তথাকথিত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেদিন থেকে আমাদের সংঘ ঘোষণা করেছে যে এটা পরিষ্কারভাবে ধারাবাহিক "মুসলিম আক্রমণ"।

www.pathagar.com

পুস্তকের অন্যস্থানে গোলওয়ালকার বলেছেন পাকিস্তান "স্বঘোষিত দেবতা প্রদত্ত ইসলামিক রাষ্ট্র"।

পাকিস্তানকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালে আর,এস,এস কর্তৃক বিবৃতিতে দৃঢ় উক্তি ব্যক্ত করে। সেখানে বলা হয়েছে "যতদিন পাকিস্তান টিকে থাকবে, ততদিন ভারতের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ ও আক্রমণাত্মক থাকবে।" ভারতের ঘৃণাই পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছে। তাই কৃত্রিমভাবে ভারতের প্রাকৃতিক ও জাতীয় অখণ্ডতা চূর্ণবিচূর্ণ করতে চায়। অতএব কে, কে, এম (কেন্দ্রীয় কার্যকরি মণ্ডলী) দৃঢ় প্রত্যয়ী যে অখণ্ডভারত ব্যতীত শান্তি ও স্থিতিশীলতা অচিন্তনীয়।

কেহ কেহ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করতে চায় যে আর, এস, এস, এবং সংঘ পরিবার ভারতের রাজনীতিতে কেবলমাত্র নীতি ভ্রষ্টতা আনতে পারবে, বাস্তবে সংবিধানের ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ অকার্যকর হবে। ভারতের রাজনৈতিক চর্চায় সম্ভবত একটি সঠিক ও প্রধান বিষয় অনুপস্থিত থাকার কারণে ১৯৪৭ সাল থেতে অখণ্ডভারতের ধারণা প্রাধান্য পায়, কিন্তু ভারত অথবা দক্ষিণ এশিয়ার বুদ্ধিজীবীগণ কোথায়ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে নি। তৎপরিবর্তে অখণ্ড ভারতের ধারণাকে নীতির ছদ্মবেশের আবরণে প্রতারিত করা হয়। এই অধ্যায়ে অগ্রবর্তী নীতির যেমন আলোচনা করা হয়েছে তাই অনুসরণ করতে হবে অথবা বন্ধুত্বের ভান করে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হবে, যেমনটি ঘটেছে ২০০১ সালের ১৮ এপ্রিল বড়ইবাড়ি এবং রৌমারি উপজেলা সিলেট এর ক্ষেত্রে, ফলে অনধিকার প্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সাধারণ গ্রামবাসী বিদ্রোহী হয়ে উঠে। দুর্ভাগ্য যে সাহসী বি,ডি,আর গণ যারা সম্মুখসমরে জীবন দিয়েছেন তাঁদের উৎসর্গের জন্য উপযুক্ত সম্মান দেয়া হয় নি।

অখণ্ডভারত এবং বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতা
(Akhand Bharat and the Implications for Bangladesh)

উপরোল্লিখিত আলেচনার প্রেক্ষিতে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের স্বভাবজাত অবিশ্বাস, স্বাভাবিকও সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। ঐতিহাসিক নজির থেকে দেখা যায় ১৯৭১ সালের পর থেকে ভারতের মনে বাংলাদেশের জন্য কোন প্রকার আগ্রহ নেই, কারণ তাঁরা যদি বুঝতে পারতো যে বাংলাদেশকে সুযোগ দিতে হবে অথবা অর্ধেক হলেও সুযোগ দেয়ার পথ করতে হবে তাহলে এদেশের জন্মক্ষণেই টুটি টিপে মেরে ফেলতো। আন্তর্জাতিক নিন্দা, সমালোচনা ইত্যাদি হবে যেনে অবরোধ আরোপ একটি প্রত্যক্ষ আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা চিন্তা করে ভারত তা থেকে বিরত থাকে । এই পুস্তকের ২-৫ অধ্যায়ে দেখা যাবে যে ভারত বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্য ১৯৭১ সালে থেকে বিরতিহীনভাবে তাদের নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। অখণ্ড ভারতের দর্শন তাদের বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্যর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে বিরাজিত যা দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি আচরণই তা প্রমাণ করে এবং বিশেষ করে ভারতের এ আচরণ বাংলাদেশের অনুভূতিতে আঘাত করেছে।

১৯৭১ সালের পর থেকে সম্মুখদিকে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ককে অত্যন্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে দিল্লীর প্রভাবে এবং ব্যাপক সমর্থনে

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত হয়ে যখন ক্ষমতা গ্রহণ করে তখন ভারত তার সদ্ধিচ্ছাকে দূরে রেখে জমিদার সদৃশ ব্যবহার শুরু করে। যদি অন্য কোন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসীন হত, তাহলে ভারত তাদেরকে দখলদার হিসেবে বিবেচনা করত এবং বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ বিরোধী মনে এদেশকে নিজেদের ভূসম্পত্তি হিসেবে মনে মনে বিচার করত। কোন পূর্বপ্রস্তুতি না নিয়ে উপস্থিত মতামত অনুযায়ী কল্পিত অখণ্ডভারতের ব্যাখ্যা অন্যভাবে আমাদের করা উচিত, কারণ ভারতের বহির্বিশ্ব বিষয়ক সচিব রাজীব সিক্রি ইন্দো-বাংলাদেশ সম্পর্কের ন্যাক্কারজনক বিবরণ দিয়েছে। "বাংলাদেশ ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী এবং আঞ্চলিক অংশীদার। আমি বলতে চাই যে ভারতের জন্য" বাংলাদেশ এক অদ্বিতীয় ও বিশেষ প্রতিবেশী, কারণ ভারতের পশ্চিম বাংলা, বাংলাদেশ এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল ঐতিহাসিকভাবে অখণ্ড অংশরূপে গঠিত"।

এ অঞ্চলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এটা অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে অপব্যাখ্যা, যা মূলতঃ মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি বিশ্বাস করতেন দু'বাংলার সংস্কৃতি সার্বজনীন, যেমনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখায় বাস্তব রূপে রূপায়িত করেছেন এবং এর মূল উপনিষদের দর্শনে নিহিত আছে, তার মতে সমগ্র ভারতে একই সংস্কৃতি প্রচলিত। এটা অখণ্ড ভারতের নিগূঢ় অভিব্যক্তি, ভারত মাতার সমপ্রকৃতির গূঢ় রহস্যের ব্যাখ্যাপূর্ণ, পৌরানিক কাহিনী প্রচারে সহায়ক। যদিও বাঙালি হিন্দুও বাঙালি মুসলমানদের প্রথা, অভ্যাস, পোশাক, এবং খাদ্যে বহু মিল পাওয়া যায়, তবুও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমান মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করে জীবন দর্শনে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মূর্তিপূজা ও উপনিষদের উপর ভিত্তি করে হিন্দু সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক তাঁরা ছিন্ন করেছে।

এছাড়া ধর্মীয় অথবা সংস্কৃতিক পার্থক্য, তত্ত্বমূলক ও ধারণাগত আরও অনেক ভাল কারণ রয়েছে আর তা হোল কেন তাঁরা ভারতের সাথে সীমান্ত এলাকা ভাগ করেছে, ভাবগত অভিপ্রায় সম্পর্কে অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত , বিশেষ করে ইতোমধ্যে প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা সীমানা লঙ্ঘন করেছে যেমনটি করেছে তালপট্টি দ্বীপকে নিয়ে এবং অতি সম্প্রতি ভারত এককভাবে বঙ্গোপসাগরের ১৯০০০ বর্গকিলোমিটার বাংলাদেশের এলাকা তাদের প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক গ্যাস উত্তোলনের জন্য পরিবেষ্টিত সীমানার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। এ ধরনের কার্যকলাপের পেছনে যে উদ্দেশ্য ও প্ররোচণা আছে সে সম্পর্কে একজন ব্যবসাদারি মনোবৃত্তি সম্পন্ন জার্মান লেখক ভন হরল্লিক পর্যবেক্ষণ করে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "বর্তমানে একটি দেশ শক্তিশালী হোক বা না হোক , ধনী হোক বা না হোক, প্রাচুর্য থাকুক বা না থাকুক, শক্তির দ্বারা নিরাপত্তা নির্ভর করে না, কিন্তু নীতিগতভাবে কমবেশী তাঁর প্রতিবেশীর উপর নির্ভরশীল"।

অখণ্ড ভারতের ধারণা অর্জনেচ্ছায় ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা চালায়, তখন ছোট প্রতিবেশীর প্রতি ভিক্ষুকের আচরণ করে। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গত ৩৫ বছর ধরে ভারত কঠোরভাবে এ চেষ্টাই করেছে। নতুন দিল্লী খুব সহজভাবে বিবেচনা করেছিল যে সার্বভৌম নূতন ও অপরিপক্ক প্রতিবেশীকে ধ্বংস করে তাদের ধন সম্পদ বৃদ্ধি করবে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান পরাজিত হলে

www.pathagar.com

ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢাকা অধিকার করে যে সম্পদ লুণ্ঠন করেছে তা থেকে সহজেই বুঝা যায় বাংলাদেশের পরিণতিতে অর্থনৈতিক সাম্রজ্যবাদ ও কর্তৃত্ব করার পরিকল্পনা, এদেশের শিল্প ও বাণিজ্যকে সমূলে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা, তৃতীয় দেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক নষ্ট করাসহ ভারত সবকিছু আরম্ভ করেছিল ।

২০০৬ সালের মে মাসে প্রায় ৩০০ পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং পোষাক শিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এ ধরনের অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে সম্ভবত ভারতের বেতনভুক্ত তালিকার লোকদের দ্বারা আতঙ্ক সৃষ্টি ও হত্যার মত জঘন্য কার্যকলাপ করানোই প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল । ভারত সমর্থক কিছুসংখ্যক কলামিষ্ট যারা বাংলাদেশের সংবাদপত্র এবং সাময়িকীতে লিখে থাকেন তাঁরা দৃঢ়ভাবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং সকল সময়ে স্বার্থের প্রতি নজর রেখে আনুগত্য সহকারে একটি বিদেশী শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছে, ১৯৪৭ সাল থেকে এ অবস্থা চলছে যা এদেশের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবের প্রমাণ । দুর্ভাগ্যজনক যে এ ঘটনাগুলো বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং ভারতের প্রতি কোন প্রকার বিরোধী মনোভাব দেখায় নি এবং দিল্লীর সঙ্গে ক্রীতদাসসুলভ বশ্যতার সম্পর্ক স্থাপনে দলের আচরণ এর জন্য দায়ী । ভারতের রাজনীতি গোয়েন্দাগিরি এবং সেরা ব্যবসায়ীদের প্রবণতা হচ্ছে অসাধু উপায়ে শোষণ করা, উদ্ধতভাবে আদেশ প্রদান, দক্ষতার সঙ্গে অসম্পূর্ণতা পূরণকরণ এবং বাংলাদেশে সর্বক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে অলক্ষ্যে অনুপ্রবেশের সুযোগ গ্রহণ করে, এমন কি তাঁদের পছন্দের দল যদি জাতীয় নির্বাচনে হেরেও যায়, তথাপি যৎপরোনাস্তি দুরভিসন্ধি পূর্ণ কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া ।

ফলস্বরূপ ভারত সরকার এককভাবে এই দুর্ভাগা দেশের বিষয়ে নিন্দাজ্ঞাপন করে যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা অশোভনীয়, অংশভাগ করে দেয়ার কিছু ত্রুটি, নাগরিক সভ্যতা, শিক্ষিত সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্ব তাঁরা নেতা পছন্দে বিচক্ষণতা দেখায় নি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে পরিপূর্ণ অভাব আছে । যদি দেশের মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য হয়, তবে শহরের সকল সচেতন ও শিক্ষিত ছিন্নাংশ নাগরিক পরিশ্রম বিমুখ হবে, সুযোগ সন্ধানী হতে পছন্দ করবে অথবা জড়বাদী হবে, দেশ প্রেমের কোন অনুভূতি তাঁদের থাকবে না, তা হলে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে ভারত তাঁর প্রতিবেশীর এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করবে , কারণ আন্ত র্জাতিক সম্পর্ক এমনই হয়, বন্ধুপূর্ণ দেশগুলোর এটাই স্বাভাবিক নিয়ম ।

একটি জাতির ও দেশের শক্তি শুধুমাত্র সামরিক শক্তি নয়, বরং অর্থনৈতিক ও প্রায়োগিক সম্পদকেও বুঝায়, দক্ষ, দূরদর্শী বৈদেশিক নীতি পরিচালনা সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্থার দক্ষতাকে বুঝায় । এই সমস্ত গুণাবলী জাতিকে নিজস্বভাবে অর্জন করতে হয়, দেশের সাধারণ মানুষ এবং তাদের দক্ষতা কর্মশক্তি আকাঙ্ক্ষা, শৃঙ্খলা, উদ্যম, তাদের বিশ্বাস এবং শাস্ত্রীয় কাহিনী দ্বারা একটি জাতি সংগঠিত হতে হয় । অধিকন্ত, এ সকল উপাদান একটির সঙ্গে অন্যটি সম্পৃক্ত । এছাড়া জাতীয় শক্তিকে বিবেচনা করতে হবে শুধু মাত্র সার্বভৌম সীমানার মধ্যে নয়, বরং রাষ্ট্রীয় বৈদেশিক নীতিতে, সাম্রাজ্য বাদী বিরোধিতার সঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের শক্তির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে ।

www.pathagar.com

২০০১ সালে ইন্টারনেটে যখন এই মূল রচনা সংক্ষিপ্তভাবে লেখা হয়েছিল তখন কি এর প্রমাণ ছিল না, ছিল, যদি বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে তার বৈদেশিক নীতি গ্রহণ, এমনকি চেষ্টাও করত তবে ভারত সরাসরি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বাংলাদেশ সরকারকে তাদের মতে নিয়ে আসত। সম্প্রতি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে বাংলাদেশে সন্ত্রাসিদের মূলঘাটি আছে এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে পুনঃপুনঃ প্রচার করা হয়েছে, কিন্তু এই অভিযোগের কোন প্রমাণ এখনও দেয়া হয় নি, ফলে পশ্চিম বাংলায় এবং সীমান্ত এলাকার রাজ্যগুলোতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জাতিগত বিরোধ দেখা দেয়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা ভারতের পছন্দমত না হলে একটা প্রচণ্ড সামরিক সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এ ধরনের শত্রুতাপূর্ণ ও উত্তেজনাকর আচরণ করলে বাংলাদেশের বিরোধিতা করা উচিত এবং স্বাধীন চিন্তা ধারার উন্নতি কল্পে অটল থেকে দেশের বৃহৎ স্বার্থে তা ব্যবহার করা উচিত।

www.pathagar.com

অধ্যায়- ২/এ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর
(The 1971 war of Liberation and after)

আমার মনে হয় এ্যাথেনিয়ানরা মনে করে নিজের জন্য না হলেও একজন মানুষকে চালাক হওয়া উচিত। যতদিন পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান অন্যকে শিক্ষা দেয়ার কথা চিন্তা না করবে ততদিন চালাক বানানো সম্ভব হবে না। যত তাড়াতাড়ি চিন্তা করবে ততই মঙ্গল। কিন্তু মানুষ যখন চালাক হবে তখন এ্যাথেনিয়ানরা বলবে এটা হিংসা করে হয়েছে। (সক্রেটিস),

আমি প্রমাণ করব যে আমি কোন অবস্থাতেই বক্তা হিসেবে চালাক নই। একজন বক্তা যাকে চালাক বলা হয়, তিনি যদি সত্য কথা বলেন তবে তিনিই প্রকৃতপক্ষে চালাক (সক্রেটিস)।

হেনরি কিসিংগার এবং ভারতের উভয় সংকট
(Henry Kissinger and the Indian Dilemma)

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং প্রাক্তন সেক্রেটারি অব স্টেট হেনরি কিসিংগার এর মত একজন উচ্চ পদাধিষ্ঠিত এবং বিশ্লেষক স্পষ্টভাবে ভৌগোলিক কৌশলকে বিজড়িত করে সংঘাতের কারণ অনুধাবণ করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং বলেছেন, ভারত তাঁর নিজের স্বার্থে প্ররোচিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে সহযোগিতা করেছে, তাঁদের স্বপ্নছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা শাসিত সম্পূর্ণ এলাকা দাবী করা। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভারতে অবর্ণনীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তাছাড়া সুদূরপ্রসারী নীতির সংকট সহজে উপলব্ধি করতে পারে ওয়াশিংটনে বসবাসরত কিছু লোক তা সমর্থন করেন, তাঁদের মধ্যে সেক্রেটারি অব ষ্টেট খুব প্রত্যক্ষদর্শী এবং তাঁর দৃঢ় ঘোষণা দিব্য প্রেরণা প্রাপ্ত শিক্ষকের কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সম্প্রতি একজন পাকিস্তানী বিশ্লেষক বর্তমান ইন্দো-বাংলাদেশ সম্পর্ক বিষয়ের বিতর্কে জড়িয়ে ব্যঙ্গাত্মক মূল্যায়ন করে বলেছেন ১৯৭১ সালে ভারতের সহজাত পরস্পর বিরোধী নীতির প্রতিফলনই এতে দেখতে পাওয়া যায়।

সার্বভৌম বাংলাদেশের বর্তমানে উন্নতমানের প্রশিক্ষিত সাত ডিভিশন পদাতিক সৈন্যবাহিনী, দু'টি স্বাধীন পদাতিক ব্রিগেড, এবং একটি আর্মার ব্রিগেড আছে। ভারত সীমান্ত এলাকায় ৯০% রাখা হয়েছে (মাত্র ১০% অথবা তারচেয়ে কম বার্মা সীমান্তে রাখা হয়েছে)। কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন বাংলাদেশের এই শক্তি কার বিরুদ্ধে প্রয়োজন হবে? কখনও রাগান্বিত হয়ে গুলি ছুড়লে তা ভারতীয়কে আঘাত করবে– এখন আমরা পুনরায় সূচনায় ফিরে আসি, বাংলাদেশ যখন "পূর্ব পাকিস্তান" ছিল তখন পাকিস্তান যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে, এখন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সমস্যা আরও বেশী।

স্বাধীন বাংলাদেশ ভারতের জন্য যে জটিলতা সৃষ্টি করে তা ছিল ইন্দিরা গান্ধী ভারতের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে নানা অংশে ভাগ করে দেয়ার প্রস্তুতি নেয়ার

www.pathagar.com

ফলাফল। কিন্তু একজন বিচুক্ষণ রাজনীতিক হিসেবে তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে যখন কোলকাতায় ছিলেন তখন জোর করে প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে যুদ্ধত্তোর বাংলাদেশ সরকার দিল্লীর প্রশাসনের বশ্যতা স্বীকার করে চলবে। এই লিখিত দলিল হাতে পাওয়ার পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানীদের বশ্যতার স্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে যুদ্ধের পথে অগ্রসর হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনার পর বাংলাদেশে এ সমস্ত বাধা বিপত্তি এবং অনেক প্রতিশ্রুতি থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়, এজন্য কঠোরভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়েছে, ফলে ইন্দিরা গান্ধীকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, এবং হেনরি কিসিংগার কর্তৃক সনাক্তকৃত যুদ্ধপূর্ব অবস্থার সম্মুখীনও হতে হয়েছে। এটা বুঝার জন্য যে ঔদার্য, সুযোগ ও জটিল বাক্য এবং বিচার্য বিষয় জড়িত তা কিসিংগারের কথা থেকে উদ্ধৃত করা হল, "অপরিহার্যভাবে বাংলাদেশের উদ্ভব,- আমরা স্বীকৃত পক্ষরূপে ভারতকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে সুদূর প্রসারি প্রচণ্ড সমস্যার কথা। বাংলাদেশের পরিবর্তে পূর্ব-বাংলা হওয়ার কথা। ভারতের অত্যন্ত বদমেজাজী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিকট থেকে কেবল মাত্র ধর্ম ভিত্তিতে পশ্চিম বাংলা থেকে পৃথক হয়েছে। ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সর্বোপরি প্রাণবন্ত জাতীয় চরিত্র তাঁদের প্রায় একই। জাতিগত বৈশিষ্ট্য অথবা ভিত্তিগত পরিবর্তন হোক বা না হোক, ভারতের উগ্র প্রবণতা থেকে বের হয়ে বাংলাদেশ তাঁর অধিকার আদায়ে তৎপর হয়েছে। ভারতের বাহিরে আরও মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য এটা উদাহরণ হয়ে থাকবে। একবার স্বাধীন হয়ে গেলে তাঁদের মুসলিম ঐতিহ্য রক্ষার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা হতে পারে। এধরনের সকল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য নতুন দিল্লীর অনাবেগাত্মক পরিকল্পনাকারীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়, উপমহাদেশের উপর ভারতের প্রাধান্য বিস্তারের কারণে নাটকীয়ভাবে এদেশের জন্ম সহজতর হয়েছে এবং এটাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যুদ্ধে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি, এটা মিসেস গান্ধীকে বোঝাতে সক্ষম হওয়াতে তিনি যুদ্ধ করতে রাজি হন, কারণ আমাদের সাফল্যে তিনি ভয় পেয়েছিলেন।

যে কারণে এই সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা উপেক্ষা করে ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের ইতিহাস সম্পর্কে এক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি পাকিস্তানের অস্থিত্বের বিরোধিতা করেছেন একথাটি অস্বীকার করেন, কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণ কোন মতেই অস্বীকৃতিকে স্বীকার করে না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে তাঁর পিতা ভারত বিভক্তিকে মেনে নেওয়াতে নিন্দিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, সত্য হল কদাচিৎ বলতে শুনা যায় যে, স্বদেশী নেতাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমেই ভারত এসেছে, আর পাকিস্তান হয়েছে ব্রিটিশদের সহযোগিতায় কাজ করার ফলে, তাই স্বাধীনতার পর পরই স্বাধীনতার জন্য যারা যুদ্ধ করেছে তাদেরকে বন্দি করা হয়েছিল। পাকিস্তানের কাঠামো অল্প সময়ের মধ্যে নড়বড়ে অবস্থায় তৈরি হয়েছিল, সেই সঙ্গে ভারতের প্রতি ঘৃণা থেকে তার জন্ম, যা পরবর্তী প্রজন্মের পাকিস্তানী নেতাদের মনে ইন্ধন যুগিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা পাকিস্তানের সর্বত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বেলুচিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সত্যিকারভাবে পাকিস্তানের অধিকারে ছিল না, তাদের ইচ্ছা ছিল অধিকতর স্বায়ত্তশাসন, তাঁরা কখনও মূলচুক্তির অংশ ছিল না। ইতিহাসের এ শিক্ষা ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য খুব কমই গণ্য করা

www.pathagar.com

হয়েছে। এটা বিচার্য বিষয়ের সঙ্গে খুববেশী সম্পৃক্ত ছিল না, তবে পশ্চিম পাকিস্তানের একত্র থাকার প্রতি অত্যন্ত কঠিন হুমকি ছিল। মিসেস গান্ধী পাকিস্তান সৃষ্টির বিষয়টি অসম্পূর্ণ মনে করে, তিনি দৃঢ়ভাবে কঠিন চাপ প্রয়োগ করে পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করার দাবীতে অনঢ় থাকেন, ভারতের দমননীতি চলতে থাকে, পশ্চিম পাকিস্তানের উপস্থিতিতে ভারতের নিবৃতি প্রতিফলিত হয়।

যুদ্ধ হওয়ার কারণ কি? আমার ও নিক্সনের অভিমতে উদ্বাস্তু সমস্যাকে ব্যবহার করে ভারত উপমহাদেশের সেরা শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। আমি যুক্তি প্রমাণ প্রভৃতি দ্বারা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি যে মিসেস গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা দৃষ্টে প্রাথমিক পর্যায়ে অনুপ্রাণিত হয় নি, সমস্যা সমাধানের অনেক পথ ছিল, অপরিহার্যভাবে স্বায়ত্ত্বশাসনের মধ্যে নিহিত ছিল, অনেক ধারণা দেয়া হয়েছিল–

পূর্ব-পাকিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীকে প্রতিহত করার কোন ইচ্ছাই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। আমরা এ ব্যাপারে অনেক প্রস্তাব রেখেছিলাম, কিন্তু প্রক্রিয়াকরণের সময় বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা অর্জন হোক, একটি দেশকে অপ্রীতিকরভাবে প্রচন্ড আঘাত করে নয় যাতে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও বিশ্বসমাজকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসতে হবে (যেমনটি দেখা গেছে জাতিসংঘের ভেটো প্রয়োগ) যেভাবে তাঁরা বিপন্ন অবস্থার কথা অনুভব করেছিল, অথবা সরাসরি আইনের অমান্য করার ফলে বাঁচার তাগিদে বিশ্বকে পথ খুঁজতে হয়েছিল। নভেম্বরের শেষে ভারত আঘাত করল, আমরা ইয়াহিয়াকে প্রস্তাব গ্রহণ করতে এবং সামরিক আইন তুলে নিতে বলেছিলাম এবং ডিসেম্বরের শেষে একটি অসামরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবে। এটা নিশ্চিত ছিল যে এতে স্বায়ত্ত্বশাসনের দিকে যাবে এবং পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হবে। সম্ভবতঃ অতিরিক্ত পশুবৎ আচরণ, সঙিন দিয়ে বিদ্ধ করে সাধারণ মানুষ মারার কারণে, ঢাকায় তাঁদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গেরিলারা এবং মুক্তিবাহিনী এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

এই শেষ সংকট মুহূর্তে মিসেস সরমিলা বোস পুনঃপরিদর্শন করে যে প্রতিবেদন ১৯৭১ সালের যুদ্ধ সম্পর্কে লিখেছিলেন তা ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়। অধ্যায় ২/এ এর বিষয়টি তাই।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভারত যুদ্ধ সম্পর্কিত স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিবেদন (State Department report Focuses on 1971 India- Pakistan war)

দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে ১৯৬৯-৭২ পর্যন্ত সময়ে নিক্সন প্রশাসনের নীতি সংবলিত একখন্ড দলিল গোপনীয় শ্রেণী থেকে ২০০৫ সালে পৃথক করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের সংকট সম্পর্কে নিক্সন প্রশাসনের মনোভাবের মর্ম উপলব্ধি ও নিরীক্ষণ করার জন্য দলিলের সূচিপত্রে পরিষ্কারভাবে তথ্য দেয়া হয়েছে এবং স্নায়ুযুদ্ধ কিভাবে বৃহৎ পরিসরে রূপ নিচ্ছিল তা জানা যাবে। যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের প্রতি নিকসন প্রশাসনের সমর্থন অনেকের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে, এবং দক্ষিণ এশিয়ার "শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করার জন্য রাশিয়া থেকে সামরিক সাহায্য প্রাপ্ত শক্তিশালী ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে হবে। উপরোন্ত, চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে পাকিস্তানের ভূমিকা ছিল, পরিণামে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আদর্শ ও সমর্থনকে আলাদা করার ব্যাপারে ক্রুশ্চেভ এবং মাও এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়।

যদি দুই পরাশক্তি ও চীনের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক কৌশল সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তা হলে দেখা যাবে যে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করাই তাদের অভিপ্রেত ছিল এবং ২৫ বছবের শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তির (ভারত ও ইউএস এস আর) অনুমোদন করা হয় এবং চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের উদ্দেশ্যছিল স্বশস্ত্র বিরোধে অংশ গ্রহণ করা. কোন তৃতীয় পক্ষকে সাহায্য না দিয়ে বিরত থাকা এবং উভয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল যে যদি, কোন পক্ষকে কেহ আক্রমণ করে অথবা আক্রমণের হুমকি প্রদান করে তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁরা আলোচনা করবে। অন্যদিকে একটি প্রধান বাঁধা হল সামরিক সংকটের সময় চুক্তি অকার্যকর থাকবে, কারণ ভারতীয় সামরিক পরিকল্পনাকারীদের মতে যুদ্ধের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন অনুমোদন নাও দিতে পারে, যদি ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে তবে পরিণতি যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এর উপর বর্তাইবে। তারপর পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপ করতে ভারতের একমাত্র বাঁধা থাকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব। তাদের সঙ্গে ৭ দফা চুক্তি স্বাক্ষর হয়, চুক্তি অনুযায়ী ভারতকে নিশ্চয়তা দিতে হয়েছে যে সংকট উত্তোরণের পর দিল্লীর অধিকারকে অবিরতভাবে সর্মথন করবে।

ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি ও পূর্ব সংকেতের কথা নাটকীয়ভাবে ভুলে গিয়ে যুদ্ধের চেহারা দেখে তাদের মন মানবাধিকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানে নিযুক্ত থাকা সংক্রান্ত দলিলাদি পুনরায় গোপনীয় শ্রেণী থেকে পৃথক করে ২০০২ সালে ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রকাশ করে। এবিষয়টি পূর্ব পাকিস্তানীদের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়াতে সুবিধা হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধের পর অতিবক্ষতিকর জট বেঁধে যায়, কারণ ভারত একচেটিয়াভাবে যুদ্ধের মূল্যায়ন বিষয়টিকে বাংলাদেশ ও বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপনের প্রয়াশ পায়। যুদ্ধ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকার বাংলাদেশীদের ছিল না, তবে সংকটকালে ভারতের ভূমিকা এবং ভারতের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী কিছু বলার অনুমতি ছিল।

ভারতের পুনঃঐক্যসাধনের নীতির অন্তর্দৃষ্টি
(Insight into India's Reunification Policy)

ভূরাজনীতির বিশ্লেষণ এবং বাস্তব ঘটনার বিবরণ কিসিংগারের লিখিত পুস্তকে এবং ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের দলিল এই উভয়টির মধ্যে যে তথ্য পাওয়া যায় এবং উপরোল্লিখিত অংশে যেভাবে দেখেছি, এ সর্ম্পকে ভারতীয় ব্যাখ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, কারণ সকল বিচার্য বিষয় বাদ দিয়ে যুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গিকে মানবাধিকারের প্রতি ধাবিত করা হয়েছে। প্রকৃত সত্য ঘটনা হচ্ছে কিসিংগার সংশ্লিষ্ট সকল দিক বিবেচনা করেই ভারতের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছে এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধ সংক্রান্ত তাঁর মতামত থেকে দৃশ্যমান হয় যে প্রতিপক্ষের চেয়ে তাঁর অভিমতই বিশ্বাসযোগ্য এবং যথার্থ। ভারতের বর্তমান অধিকর্তা কিসিংগারের পুস্তকের উল্লেখিত যুক্তিতর্ক ও ব্যাখ্যাকে এককভাবে নস্যাৎ করার চেষ্টা চালিয়েছে কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। জে,এন, দীক্ষিত একজন পেশাদার কূটনীতিক এবং ভারতের গোয়েন্দা

www.pathagar.com

সংস্থার প্রধান ছিলেন, তিনি ২০০৫ সালে মৃত্যুর পূর্বে "লিবারেশন এন্ড বিয়ণ্ড" পুস্তকে একথা লিখেছেন।

কিসিংগার ১৯৭১ সালের সংকটকে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কাঠামোতে উপযুক্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দীক্ষিত নিজকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন, তিনি মনে করেন এটা সম্পূর্ণভাবে ভারতের বহু পূর্বেকার কাহিনীর অন্তর্গত উপাখ্যান, তাই ঘটনাটি অভ্যন্তরীণ, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের জন্য কোন গুরুত্ব বহন করে না। এমনকি যদি কিসিংগারের অভিযোগ পক্ষপাত পূর্ণ হয় এবং অসংখ্য বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পূর্বের ও যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের চরিত্র চিত্রন বর্ণনা দেয়া হয় তা হলেও দু'টি বইয়ের অনৈক্যের সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দিবে না। এছাড়া বাস্তব অবস্থা হল মিঃ দীক্ষিত মি কিসিংগারের বই থেকে প্রচুর অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছেন যা মূল বিষয়ের সাথে কোন যোগসূত্র নেই এবং কোন বর্ণনাও দেন নি, তা হলে উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য কি? তিনি যা বুঝাতে চেয়েছেন তাতে নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। মিঃ কিসিংগার অত্যন্ত সুবুদ্ধিসম্পন্ন বলে তিনি পাকিস্তান সম্পর্কে কোন কালিমা লেপন করেন নি, পক্ষান্তরে মিঃ দীক্ষিত নিজেকে পরিষ্কারভাবে ভারতের পক্ষপাতির মনোভাবকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বই দু'টির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে তাঁদের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা যা থেকে যুদ্ধ সময়কালে আমেরিকান প্রশাসন ও ভারত সরকারের পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়। একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত উদাহরণ। "লবারেশন এন্ড বিয়ণ্ড" পুস্তকে পাওয়া যায় যেখানে সার্বভৌমত্ব এবং মুক্তি সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগকে বাংলাদেশীরা এখনও সন্দেহ পোষণ করে বলে উল্লেখ করেছেন লেখক এখানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। যদিও জেনারেল ওসমানি এবং জেনারেল জগৎজিৎ সিং অরোরার যৌথ নেতৃত্বে সামরিক অভিযান শুরু হয়েছিল কিন্তু ঢাকায় পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের সময় জেনারেল ওসমানি উপস্থিত ছিলেন না। দীক্ষিত এটাকে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ভুল বলে বর্ণনা করেছেন এবং জেনারেল ওসমানির পারিপার্শ্বিক অবস্থা বাংলাদেশীদেরকে বিপুলভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে ভারতের "আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাওয়া" একটি দুর্ভাগ্যজনক ঈপ্সিত লক্ষ্য পরিচালনা করছে, কারণ বাংলাদেশীরা বিশ্বাস করত যে বাংলাদেশের আত্মত্যাগের মধ্যে ভারত তাদের ভূমিকাকে সবার চোখে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল যা আপতদৃষ্টিতে এড়িয়ে যায়।

দীক্ষিতের বইতে যুদ্ধ সম্পর্কে লেখা বেশীর ভাগই ভারতের লেখকদের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং নিছক সমস্যার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয় নি। জেনারেল ওসমানির উপস্থিতি নিশ্চিত করার দায়িত্ব যদি ভারতের ক্ষমতায় ছিল তা হলে কেন সে ব্যবস্থা করা হয় নি? কেন কথা বার্তায় বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা দেয়ার ফলে পাঠক আরও রহস্য আছে জেনে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের বিবরণ সত্যের অপলাপ এবং বাকচাতুরী, ভারত বাংলাদেশকে একটি অধীনস্ত রাজ্য বলে বিবেচনা করে এবং পাকিস্তানের নিকট থেকে নিছক একটি ভূখণ্ড লাভ করেছে। দীক্ষিত বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, "ভারত পাকিস্তান অধুষ্যিত কাশমীর

www.pathagar.com

কখনও ছাড়বে না"। একথাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ, সৎ এবং যথার্থ উপলব্ধি যা থেকে মুসলিম প্রতিবেশীদের প্রতি ভারতের আচরণ বুঝা যায় এবং বাংলাদেশের প্রতি তাঁর উপলক্ষ্য একই।

এ অধ্যায়ের শেষে লেখক ১৯৭১ সালের যুদ্ধ সম্পর্কে অনেকগুলো সংবাদ বিজ্ঞপ্তি সংযোজন করেছেন যা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে যে নৃশংসতা চালিয়েছিল তা প্রকাশ পেয়েছে। সংবাদপত্র থেকে কেটে রাখা রচনা ৯০% ভারতীয়। এর অর্থ হল বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা চালানোর দায়িত্ব ভারত পালন করেছে, অথবা লেখকের গবেষণার ধারণা সীমিত অথবা তিনি ইচ্ছা করেছেন যে ভারত বাংলাদেশকে যে সমর্থন দিয়েছে তার উপর জোর দেয়া। আমি মেনে নিচ্ছি যে ভারতের স্বার্থ হল পাকিস্তানকে নীতি বিরোধী, পূর্বাংশে সামরিক অভিযানে কি ঘটছে সে বিষয়ে অমনযোগী আখ্যায়িত করা। পূর্ব পাকিস্তানের উপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আগ্রাসনের ঘৃণ্য কার্যকলাপ ও নৃশংসতাকে আমি অস্বীকার করছি না কিন্তু সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে মুক্তিবাহিনী এবং মুজিব বাহিনীও অনুরূপ আক্রমণ ও নিষ্ঠুরতার প্রতি সংবেদশীল ছিল।

লেখক এ অধ্যায়ে যে পদ্ধতিতে মুক্তি যুদ্ধ সম্পর্কে রচনা লিখেছেন তাতে ভারতকে তিনি একটি ভাল স্থানে বসিয়েছেন, কিন্তু "দি হোয়াইট হাউস ইয়ার্রস" পুস্তকের মধ্যে ঘটনার ধারাবাহিকতায় বিশৃঙ্খলা ও অসংগতি দেখা যায়। আমি মিঃ কিসিংগারের বর্ণনাকে মনোযোগের সঙ্গে বিশ্বাস করি, কারণ তাঁর বর্ণনা বিন্যাস যুক্তি সঙ্গত। স্বাধীনতা এবং পরবর্তী পর্যায়ে জুলফিকার আলী ভুট্টোর অতিরিক্ত ভূমিকার প্রবণতাই সামরিক শক্তি প্রয়োগে সহায়ক হয়। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পরাজয় একটি প্রধান ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করে ভূট্টোর আবির্ভাব ঘটে এবং পরবর্তীতে ইয়াহিয়াকে উৎখাত করার সুযোগ গ্রহণ করে। পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলার জন্য ভুট্টো সম্পূর্ণরূপে দায়ী এবং তাঁর নিজস্ব সমর্থকদের মধ্যে তাঁকেই সবচেয়ে বেশী অপছন্দ করত, কিন্তু অনেকের মতে ইয়াহিয়া খান কর্তৃক সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে তিনি অজ্ঞাত ছিলেন। মিঃ কিসিংগার বিচুক্ষণতার সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাপারে ভুট্টোর কথা এড়িয়ে গেছেন এবং ইয়াহিয়া খানের কার্যাবলীর উপর মনকে কেন্দ্রীভূত করেছেন।

এ পুস্তকের একটি অংশে মিঃ কিসিংগার ভূট্টোর উচ্চশ্রেণীর কর্মক্ষমতা ও বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন বলে তাঁর প্রশংসা করেছেন, কিন্তু অত্যধিক প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং আবেগ প্রবণতা দ্বারা ভারসাম্য রক্ষা করতেন যা সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার নিকট থেকে আড়াল করে রাখা হয়েছিল। জুলফি সন্দেহ করেছিল যে ইয়াহিয়া ও মুজিবের মধ্যে এবং পশ্চিমের ইসলামি মৌলবাদীদের সঙ্গে ইয়াহিয়ার দ্বন্দ্ব হতে পারে তাই তিনি ভীত ছিলেন---------- জুলফি অনুধাবন করেন যে যাকে তিনি লারকানায় অত্যধিক আতিথিয়তা প্রদান করেছেন সেই বেঁটে জেনারেল ইয়াহিয়া তাকে অবজ্ঞা করছে, পীরজাদাকে তিনি দক্ষ কুটনীতিক হিসেবে ধন্যবাদ জানান, তিনি কখনও আক্রমণ করে কথা বলেন নি যেভাবে আইয়ুব খানকে আক্রমণ করা হয়েছিল। ইয়াহিয়ার ও শীঘ্রই সময় আসবে, যাইহোক তিনি হটকারিতা করে মুজিবকে "প্রধানমন্ত্রী" বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

www.pathagar.com

রচনার বিষয়বস্তু ও যুক্তিতর্ক পরস্পর বিরোধী, তবে হেনরি কিসিংগার এবং স্টেনলি ওলপার্ট এর বর্ণনা "লিবারেশন এন্ড বিয়ন্ড" থেকে সার সংক্ষেপ করা হলে তা হবে নিম্নরূপঃ "জে, এন দীক্ষিত এর মতে পাকিস্তান চক্রান্ত করে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অবনতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ওজর দেখিয়ে ভারতের জাতীয় অওতার উপর আকস্মিক আঘাত হানতে চেয়েছিল। অন্যদিকে, ভারতকে বিভিন্ন অংশে ভেঙ্গে দেয়ার ইচ্ছা পাকিস্তানের ছিল। ভারত প্রতিবেশী দেশকে টুকরা টুকরা করে ধ্বংস করতে চায় নি, পাকিস্তান কর্তৃক নগ্নভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর আগ্রাসনকে মানবিক কারণে প্রতিহত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে নি। ভারত এই বিরোধকে কুটনৈতিক ও সমঝোতার মাধ্যমে মিমাংসা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু পাকিস্তানের অনমনীয়তার কারণে তা সম্ভব হয় নি। যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের উপর আপোষমূলক দৃষ্টি ভঙ্গির জন্য চাপ সৃষ্টি না করে অসহযোগিতা করে এবং অস্ত্র সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দিতে থাকে। জুলফিকার আলী ভুট্টোকে এ বিরোধে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল এবং পাকিস্তানের স্বপ্ন ছিল ভারতকে দূর করে দিবে। ভারত বিভক্তকে উলট-পলট করতে চায় না এবং ঐ সমস্ত অংশকে পুনঃ একত্রিতকরণ ও চায় না, কিন্তু সে খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে ধর্ম ভিত্তিতে কোন জাতি হতে পারে না। একটি অবিদ্বেষী বাংলাদেশ বিদ্বেষী পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক ভাল এবং বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সাড়া দেয়া হলে ভারতের যে সমস্ত রাজ্য স্বায়ত্বশাসনের দাবী করছে তাদের সুযোগ কমে যাবে। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তনী মিলিটারি এত শক্তিশালী ছিল যে স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারত সক্রিয় সমর্থন না করলে পরিণামে ক্রমে নিঃশেষিত হয়ে যেতো।

আমি এই সংক্ষিপ্তসারে আরও অনেক কিছু যুক্ত করতে পারতাম কিন্তু উদাহরণের জন্য আমার এতটুকু উদ্দেশ্যই যথেষ্ট। উপরের সমগ্র স্তবকটি ১৯৭১ সালের যুদ্ধে জড়ানোর ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানগত কিসিংগারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ওলপার্টের লিখিত জুলফিকার আলী ভুট্টোর জীবনীর কিছু অংশ সম্পূর্ণরূপে দ্বন্দ্বপূর্ণ। আমি আরও যুক্ত করতে চাই যা সাধারণ জ্ঞান অথবা বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না, কিন্তু এগুলো একজন ভারতের অভিজাত শ্রেণীর লোকের নিকট বিবেচ্য নয়, ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তিকে উলটে ফেলা হলে ইচ্ছাপূরণ হতো, কারণ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

এই অনুশীলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে মিথ্যা ইতিহাস আমাদের জাতীয় জীবনে আমূল প্রত্যক্ষ করছে তা দেখানো, বিশেষ করে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে আরও বেশী কার্যকরি হয়েছে। এটা কোন পরামর্শ দেয়া নয়, মিঃ কিসিংগারের বর্ণনা জাতীয় আনুগত্যের সঙ্গে অথবা ব্যক্তিগত বিবেচনায় ত্রুটিযুক্ত নয়, কিন্তু যতক্ষণ আমরা আমাদের ইতিহাস না লিখব, ততক্ষণ আমাদের সাম্প্রতিক অতীত সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে থাকব। যুক্তগুলো বুঝার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, এবং আমি স্পষ্টভাবে বলছি যে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জরিপ প্রয়োজন এবং আশা করি ১৯৭১ সালের ইতিহাস ভারতীয়দের দ্বারা লিখিত হবে এবং বাংলাদেশে এর ব্যাপক প্রচারের একটি উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট লক্ষ্য হবে অখণ্ডভারতের পরিকল্পনা এবং সমগ্র আলোচনার একটি উপবৃত্তাকারের ধারণা দেয়া হয়েছে যা আরও বড় আকারে হবে।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের বিপরীত ধর্মীতা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং ৯/১১ উত্তোরকালের বাস্তবতা (Reminders of 1971 polarities and post 9/11 realities)

রচনাটির এ অংশে আমার যুক্তি, অন্য অংশের বিষয়ও হতে পারে, ১৯৭১ সাল থেকে ভারত অবিরতভাবে আমাদেরকে ঘুষি মারছে এবং আমাদের পক্ষে ব্যাপক প্রচার করছে যাতে আমরা কিছু অর্জন করার জন্য চেষ্টা করি, স্বাধীন জাতীয় পরিচয় অর্জনে অসহায় ও অক্ষম হলে পরিণামে ভারতের অনিচ্ছাকৃত নির্দেশ আমাদেরকে প্রভাবিত করবে। অতি সাম্প্রতিক উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে স্বদেশীয় মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের উত্থান এবং আই এস আই এজেন্টদের সহযোগিতায় তালেবান এবং আল-কায়দার সন্ত্রাসীদের সাহায্যে বাংলাদেশে সর্বত্র ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা ধীরে ধীরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

এই আবেদন ১৯৭১ সালে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সহজে মিলে যায় (উপর যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে)। ভারত বিভক্তির বাস্তবতা এবং দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে আরোপ করা হয় (স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশেও) এবং ২০০১ সালের ১১ সেপ্টম্বর এর ঘটনা একই বৃত্তে আবৃত। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ ভয়ও অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করবে, আশা করা যায় জনসাধারণ ইসলামকে দূরে সরিয়ে দিবে এবং ১৯৪৭ সালের বাস্তবতার দিকে যাবে এবং আওয়ামী-লীগ কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবে, তাদের বিদেশী দোশররা এ অঞ্চলে ভারতের অবশ্যপূরণীয় শর্ত সহজেই মেনে নিয়ে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীকে ধ্বংস করে শক্তিহীন অস্তিত্ব রেখে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে পঙ্গু করতে চায়। আওয়ামী লীগ রাজনীতির সত্যিকার উদ্দেশ্য ও ব্যাকুলতা তাই যা ২০০৬ সালের ৩ এপ্রিল শেখ হাসিনা টাইম ম্যাগাজিনের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে সরাসরি স্বীকার করেছেন। যখন দেশ দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিল- একটি হল জাতীয়তাবাদী শক্তি, অন্যটি পাকিস্তান সমর্থিত মুসলিম শক্তি, তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব থেকে এ দ্বন্দ্ব কতটুকু বাধা গ্রস্ত হলেছিল?

হাসিনাঃ যদি ১৯৭১ সালে ফিরে যাই, অথবা ১৯৪৭ সালে (অধিকারভুক্ত সীমান্ত যা এখন বাংলাদেশ নামে পরিচিত, রক্তাক্ত বিভক্তির দ্বারা পূর্ব পাকিস্তান হয়েছিল) এ বিভক্তি ছিল আদর্শগত। আমরা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। আমরা খুব সহনশীল। আমরা সাধারণ মানুষের জন্য সংগ্রাম করি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন, ক্ষমতায় থাকা এবং সাধারণ মানুষকে শোষণ করা, এছাড়া আর কিছু নয়। তাঁরা কখনও জনগণের জন্য চিন্তা করে না। প্রশ্ন হল এদেশ কি সামরিক একনায়কত্ব দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত, অথবা তাঁদের দ্বারা অথবা জনগণের দ্বারা?

হাসিনার বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকার "র" এর টাকায় কতটুকু প্রভাবিত হয়েছে তা অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন, আমরা ইতোমধ্যে জানতে পেরেছি যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা নিয়মিতভাবে প্রচুর টাকা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে দিচ্ছে, তাছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে উপহার প্রদানে ব্যবহার ও ভারতীয় আদর্শবাদ স্পষ্টভাবে প্রচার করার

www.pathagar.com

কাজে ব্যবহার করা হবে। যদি শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই হয়ে থাকে তবে কর্মকর্তা পর্যায়ে এর প্রতি সংকেত ছিল এবং ভারতীয় সংবাদপত্রে অতি সন্তর্পনে ২০০৬ সালের এপ্রিলে তা প্রকাশিত হয়।

"বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান" দেশ রক্ষায় ঘনিষ্ঠ বিনিময়, পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে আণবিক ও ক্ষেপনাস্ত্র সহযোগিতা এবং বাম দলে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আমুলসংস্কারকামী মতবাদ ভারতের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত।

বাংলাদেশের দেশরক্ষা মন্ত্রনালয়ের ২০০৫-০৬ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, "মৌলবাদের উত্থান, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং তাঁদের সহযোগী ভারত এর নিরাপত্তার জন্য প্রত্যাঘাত যা সতর্কতার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ভারতের বিষয়টি বাংলাদেশের উচ্চপর্যায়ে স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক স্তরে দেখা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক সাফল্য ও ধর্মনিরেপক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা উভয় দেশের জন্য গুরুত্ব বহন করে।

চূড়ান্তভাবে মতাদর্শ ও নীতির প্রসারের পরিকল্পনা ব্যাপক প্রচারের ধাঁধাঁমূলক ব্যবস্থা রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে ভারতের মিডিয়া কাজ করছে।

ভারতের দাবীর বিরুদ্ধে এবং নাট্যমঞ্চের মত বাংলাদেশের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইনিস্টিটিউট অব পিস এর একজন গবেষক প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন বাংলাদেশের নাগরিক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িত।

ডঃ ক্রিশ্চান ফেয়ার, যুক্তরাষ্ট্রের একজন অধ্যাপক, বলেছেন, "ভারতীয়রা তাকে বলেছে যে বাংলাদেশী নাগরিকরা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত, তিনি এর পক্ষে সমর্থনদানের যথেষ্ট প্রমান পান নি। সমগ্র দোষের এই লেখাটি গুয়ানতোনামোতে বন্দি একজন বাংলাদেশীর অঙ্গনে তৈরি করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্তগুলো অনুমানে দেখা যায় সে অনেক বাংলাদেশী সক্রিয়ভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল এবং তাদেরকে আফগানিস্থানে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে, ফেয়ার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সেমিনারে যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই সাইড অব ইন্টারন্যাশনাল ট্যারোরিজম সম্পর্কে একথা বলছিলেন।

শেখ আব্দুর রহমান সেই সঙ্গে বাংলা ভাই এর গ্রেফতার এবং (জামাতুল মুজাহেদীন বাংলাদেশ) জে এম বি সংগঠনকে বিলুপ্ত করার মানে আরও রক্তপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই দলটিকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে সাহায্য করেছে, এ পর্যন্ত যে গুলি পাওয়া গিয়েছে সেগুলি ভারতীয় অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরীর তৈরি। ময়মনসিংহ সিনেমা হলে বোমা মারার ঠিক পরেই অনেক লোক গ্রেফতার হয়েছিল, সেখানকার নিম্নপদস্থ সামরিক বাহিনীর লোক সামরিক বিষয়ের গোপন দলিলাদি সীমান্তের ওপারে ভারতীয় গোয়েন্দাদের নিকট হস্তান্তরের জন্য নিয়ে গিয়েছিল বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। জে এম বির দু'জন নেতা স্পষ্টভাবে ঐ আক্রমণে জড়িত ছিল। নিশ্চতভাবে পূর্বের গ্রেফতার কৃতদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

শেখ আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি সন্দেহ করি যে তাঁদের কার্যকলাপের পিছনে যে সত্য নিহিত আছে তা কয়েক বছর পর পাওয়া যাবে এবং আমি নিশ্চিত যে তাঁরা

www.pathagar.com

প্রাথমিকভাবে তথ্য দেয়ার জন্য যে ইঙ্গিত পেয়েছিল তা ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে এবং জেরাকারীদেরকে ভিন্নপথে পরিচালিত করেছে। ভারত সমর্থক অনেক সংবাদপত্র শেখ আব্দুর রহমানের জিজ্ঞাসাবাদের প্রতিবেদন এর সারমর্ম সমালোচনা না করে বিচার বিষয়ে তাদের ধারণা অনুযায়ী প্রতিকূল অবস্থায় ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং তারপর স্বীকারোক্তির অসঙ্গতার কথা ভুলে গিয়ে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত মৌলবাদী সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক এর অবস্থার তথ্য জানানই হল আসল কথা। অতএব, শেখ আব্দুর রহমান তাঁর জেরাকারির নিকট অখণ্ড ভারতের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে বলে প্রকাশ করে এবং প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের বিদ্রোহের প্রতি খুব কম গুরুত্ব দিয়েছে, এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্যান-ইসলামিকের চেয়ে ভারতের প্রতি বেশী আনুগত্য দেখিয়েছে।

www.pathagar.com

অধ্যায়-২ বি

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর
(The 1971 war of Liberation and after)

এই প্রথম বারের মত বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়ে ভারত সরকার এবং তাদের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর মত ও নীতির প্রচার ও প্রসারের জন্য সঙ্ঘ ক্রিয়াকলাপ, অপরাধ সম্পর্কে এবং ভারতের যুক্তিকে সমর্থন করে লিখিত বইগুলো আমাদের বাজারে প্রচুর আমদানি হয়, কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কি ঘটেছে তা দেখা , কিন্তু শিক্ষা এমনই যে জন্মগতভাবে ত্রুটিমুক্ত, যে কোন বুদ্ধিমান পাঠক দেখতে পাবে আসলে তাঁরা কি? এছাড়া "লিবারেশন এন্ড বিয়ন্ড" বই টি ভারত ও বাংলাদেশ দু'জায়গাতেই প্রকাশিত হয়েছে। এ বইতে মেজর জেনারেল লাখমান সিং , ভারতের একজন অসিযোদ্ধা, তাকে পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ল্যাফটেন্টে জে,কে,আর, জেকব– লিখিত "সারেন্ডার এ্যাট ঢাকা ঃ বার্থ অব এ ন্যাশন" (ঢাকা ১৯৭১),জ্যোতি সেন গুপ্ত– "হিস্টোরি অব ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ, ১৯৪৩-১৯৭৩, মেজর জেনারেল সুখবন্ত সিং "দি লবারেশন অব বাংলাদেশ", ব্রিগেডিয়ার এইচ,এস, সোধি– "অপারেশন উইন্ডফল ঃ ইমারজেন্স অব বাংলাদেশ", "ক্যাপটেন এস,কে, গার্জ-" স্পট লাইটঃ ফ্রিডম ফাইটারস অব বাংলাদেশ", চন্দ্রিকা জে , গুলাটি বাংলাদেশ

"লিবারেশন টু ফান্ডামেন্টালিজম", এস,এ,করিম- শেখ মুজিব ট্রাম্প এন্ড ট্রাজেডি (২০০৫) এবং সম্প্রতি মেজর জেনারেল এ, টি, এম আবদুল ওহাব এর লিখিত মুক্তিবাহিনী উইন্স ভিক্টোরি (ডিসেম্বর ২০০৫), এই সবগুলো পুস্তকে বর্ণিত ঘটনা আংশিকভাবে এবং ভারত কেন্দ্রিক যুদ্ধ সম্পর্কে মতামতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । ১৯৭১ সালের যুদ্ধ সম্পর্কে অত্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত সম্প্রতি প্রকাশিত এনায়েতুর ও জয়সি রহিম এর "বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার এণ্ড দি নিকসন হোয়াইট হাউস ১৯৭১ (ফেব্রুয়ারি ২০০০) যা আরও একটি ইচ্ছাকৃত প্রবণতার অসম্পূর্ণ এবং আংশিক ঐতিহাসিক লেখনির উদাহরণ এতে উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে নি । এটা সম্ভবত ধারাবাহিক যে সমস্ত পুস্তক এবং রাজনৈতিক পত্রাবলী এখন পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো ২০০৭ সালের সংসদ নির্বাচনের পূর্বের তাতে দলগতভাবে এবং সাধারণ মানুষের অনুভূতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালালেও বাংলাদেশ বিষয়ে ভারতের প্রভাব বিস্তারের একটা সীমা ছিল । এছাড়া বাংলাদেশ সম্পর্কে বাংলাদেশী লেখকদের দ্বারা রচিত অনেক পুস্তক আছে যেখানে ভারতকে সমর্থন দেয়া হয়েছে এবং লেখকদেরকে সর্তকতার সঙ্গে ভারতের পক্ষে বুদ্ধিজীবী দালাল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় এ জন্য যে প্রচুর টাকা পেয়ে তাঁরা ফন্দি করে ভাড়াটে লোকদের মত নির্দেশিত হয়ে ইতিহাস লিখেছে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তুরে ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সম্বন্বয় কমিটির মত সংগঠনে অংশগ্রহণ করে মিথ্যা ইতিহাস লেখার জন্য সহায়তা করেছে । আমার কথা সত্য প্রমাণ করার উপমা হল সমসাময়িক সাংবাদিকতার প্রতিবেদনসমূহ বিকৃত করা

www.pathagar.com

হয়েছে, আমি খুব কার্যকরভাবে ২০০৫ সালের দায়গ্রস্ততার রহস্যোদঘাটন প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলছি যে দৈনিক নিউএজ এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে ভারতীয় এবং প্রতিবেশী আরও দুইটি দেশের সাংবাদিককে মোটা অংকের টাকা দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লেখান হয়েছে এবং প্রতিবেদন ধারাবাহিক চলছিল ।

ওয়াশিংটনভিত্তিক অনলাইন পত্রিকা সাউথ এশিয়ান ট্রিবিউন এর নতুন দিল্লী সংবাদ দাতা অরুন রাজনাথ বলেছেন বাংলাদেশ পাকিস্তান অথবা নেপালের বিরুদ্ধে লেখার জন্য মাসিক ১০,০০০ রুপি দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে । রাজনাথ একথা ফাঁস করে দেয় এবং পত্রিকার বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, হেডলাইন ছিল, "ইন্ডিয়ান অফিসিয়ালস হ্যারাশিং সাউথ এশিয়ান ট্রিবিউন এর দিল্লী, জুলাই ২৭" । প্রতিবেদনটিতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়ার কারণে ভারতীয় সাংবাদিককে দোষী করা হয়েছে, যারা নির্দেশনা প্রত্যাখান করেছে তাদেরকে গ্রেফতার এবং সাংবাদিকদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে । গোয়েন্দা সংস্থার মাসিক বেতনের প্রস্তাব প্রত্যাখান, রাজনাথ ভারতীয় সামরিক বাহিনী এবং কাশ্মীর সর্ম্পকে প্রতিবেদন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রত্যাখ্যান করার ফলে তিনি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন এবং গোয়ান্দা লোকদের নিকট থেকে টেলিফোনে হুমকি পেতে থাকেন ।

সংবাদদাতা দাবী করেন যে বহু ভারতীয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাংবাদিক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র ও দেশরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংবাদ পরিবেশন করে, নিরাপত্তা সংস্থা থেকে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতেন, প্রতিবেদন সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে একজন অভিজ্ঞ বাংলাদেশী গোয়েন্দা বলেছেন যে, তাদের কাছে তথ্য আছে, শুধু ভারতীয় সাংবাদিক নয়, বেশ কিছু বাংলাদেশী ভারতীয় উৎস থেকে টাকা পাচ্ছে । বাংলাদেশী গোয়ান্দা সংস্থার পক্ষ থেকে সংস্থান করা ও প্রেরণার অভাব উল্লেখ করে তিনি বলেন যে বর্তমান অবস্থায় খুববেশী করা সম্ভব হচ্ছে না ।

উপরোল্লিখিত এনায়েতুর ও জয়সি রহিম এর "বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার এনদি নিকসন হোয়াইট হাউজ ১৯৭১" একটি ভাল উদাহরণ কিভাবে লেখাগুলো অশালীন ও নির্লজ্জ ভঙ্গি করে মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে? লেখক দাবী করে যে তাদের লেখাগুলোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল আক্ষরিক দলিলাদি নিকসন প্রশাসনের নিকট উপস্থাপন করা এবং বিরোধ জড়িত হওয়া সম্পর্কিত । এটা সত্য থেকে দূরে নয় এবং ভারতের জন্য তাদের প্রশংসা চিরকালের, যা ঘৃণার উদ্রেক করে । তাঁদের পুস্তকের প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে, দি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ এবং ১৯৯৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ মে ১৯৯৯ পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত অন্যান্য লেখা থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ঘটনাগুলো সমকালীন, খুব বেশী দিনের নয় । পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তু খারাপ করার জন্য লেখকরা নিজেরাই ঢাকার 'দি ইন্ডিপেন্ডেট' পত্রিকার কার্যালয়ে গিয়ে লিখেছেন, অতএব যখন তাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা নিষিদ্ধ করা হচ্ছিল তখন নিজেরাই লেখাগুলো প্রকাশ করে, তাদের লেখাগুলো এমনভাবে পরিবেশন করা হয় যেন পক্ষপাতপূর্ণ বলে মনে হয়, মন্তব্যকার উইনিকে প্রতিকূল ধারণাগ্রস্ত করার জন্য এটা করা হয়েছে, তবে কোন মনে অভিমত সন্তোষজনক

www.pathagar.com

পেয়েছে। এ সমস্ত লেখাগুলোর সময়কাল এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা গ্রন্থাকারদের সততা এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে কোন মানুষ মনে মনে সন্দেহ পোষণ করবে। পুস্তকের মুখবন্ধ পড়ে যে কোন মানুষ লেখককে বিকৃত ও ভারসাম্যহীন বলে ভাববে তাদের প্রতিকূল ধারণা এবং কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো লিখা হচ্ছে তা লুকানোর জন্য কোন চেষ্টা করে নি। একজন উপসংহার টানতে পারে যে, এগুলো নীরব সমর্থন পাচ্ছে যদি তা না হয়, তবে এটা পরিস্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে আওয়ামী লীগ অথবা ভারত সরকার সমর্থণ দিচ্ছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই, 'দি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' পত্রিকায় জে এন দীক্ষিতের পুস্তকটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অনেক বাংলাদেশীদের নিকট এ বিষয়গুলি অসন্তোষের কারণ হচ্ছে এবং এ অসন্তোষ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এদেশের তথাকথিত সেরা শিক্ষকরা এ সমস্ত উপহাস দেখতে সমর্থ হয় নি বরং অবিরতভাবে ইতিহাস কে আংশিক ও মিথ্যা দিয়ে উপস্থাপন করেছে। এ অঞ্চলে চমৎকার অভিলাষ ভারতের এবং কৌশল হল আত্মরক্ষামূলক। ইতিহাসের বিষয় হিসেবে আগ্রহের অভাবজনিত কারণে প্রচার হচ্ছে না, এবং খুব কম শিক্ষিত মানুষেরা পড়ে থাকে। ফলে অনেকদিন পর্যন্ত পতন দৃঢ়ভাবে চলতে থাকে, লেখকের নিম্নমানের উপন্যাস এবং কল্পনাপ্রসূত নাটক কোন মেধার পরিচয় নয়। এই সমস্ত মনোবৃত্তির কারণে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখা হয়েছে যার মধ্যে সাধারন ঘটনা ভারতীয় ভাসাবাসাসমূহের বর্ণনাই দেখা যায় এবং নিশ্চিত যে, কোন অন্তর্দর্শী সন্দেহ করতে অথবা লেখকের নিজের ভাবনার ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে, এতে যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাসাবাসা জ্ঞান বহন করবে, ১৯৭১ সালের যুদ্ধের বিষয়ে সুচিন্তিতি অভিমত এবং উত্তম গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণমূলক তথ্য সংবলিত সাম্প্রতিককালের জাতীয় ইতিহাস রচনার জন্য ইতিহাসবিদ এবং গবেষকদের এখনই সময়।

বাংলাদেশীদের দ্বারা লিখিত ইতিহাস বাংলাদেশীদের জন্য, যা রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত, বিদেশী প্রেরণা কাজের প্রচলিত ধারাকে প্রভাবিত করে, ইতিহাস তা থেকে মুক্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিকল্পনা একজন জাতীয়তাবাদী আদর্শের লোকের জন্য, যা মুক্তিযুদ্ধের পর বাতিল করে দিয়ে ভারতের পরিকল্পনা কার্যকরি করার অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশে ভারতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পায়তারা ছাড়া আর কিছু নয়, ভিন্নাধারার পরিচিত বিশ্বাসঘাতক বলে অভিযুক্ত করে ভারতের এবং বাংলাদেশের কিছু শক্তিশালী সেরালোক অতিশয় গোপন বস্তু বলে সংশোধনের পক্ষ নিতে চায়, ঠিক যেমনটি স্টালিনের আমলে কমিউনিষ্ট দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নে এবং মাও সে তুং এর আমলে চীনে হয়েছিল।

বিশ্বাসঘাতককে অভিযুক্ত করার জন্য প্রথম বিষয়টি নিশ্চিত সত্য নয়, তবে শেষ শোধনবাদ সঠিক হতে পারে, কিন্তু তাও বেশীরভাগ বর্ণনা ১৯৭১ সালের যুদ্ধ সম্পর্কে, যা মিথ্যা, যথানুপাতিক পক্ষপাত পূর্ণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, কোন চেষ্টা না নিয়ে নির্লিপ্ত থেকে রচনা করা হয়েছিল, যুদ্ধেশেষে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন সম্ভব ছিল না, তবে এখনই সময় বিশদভাবে পরীক্ষা করে পুনঃসঠিক উপাত্ত দিয়ে ইতিহাস লিখা। এ পর্যায়ে একজন বিখ্যাত দক্ষ ইতিহাসবিদ তাঁর পাঠকদেরকে মোগল রাজত্ব সম্পর্কে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, সময় আমাদেরকে পুনঃকাজ করতে বলেছে, তাই আমাদের পুনঃইতিহাস

www.pathagar.com

লিখতে হবে। আমেরিকান ঐতিহাসিক জন নোবেল উইনফোর্ড বলেছেন ইতিহাসের সকল কাজই অন্তর্বর্ত্তীকালীন প্রতিবেদন। অতীতে মানুষ কি করেছে সেগুলো সবই স্বচ্ছভাবে সংরক্ষিত নয়, যুগের সাথে সব কিছুই পরিবর্তনশীল। প্রত্যেক প্রজন্মকে পেছনের দিকে তাকাতে হবে এবং তা দেখে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে লিখতে হবে, কিভাবে লিখবে তা তাকে চিন্তা করতে হবে এবং সেই ধারায় লিখবে, তা হলে অতীত ও বর্তমান উভয়টি প্রতিফলিত হবে। অতীতের কোন বিশেষ বিবৃতির কার্যকাল নিশ্চিত থাকে না। চলতি ধারা অনুযায়ী চিন্তা করে লিখতে হবে। আর,জি, কলিংউড বলেছেন "ইতিহাসের ধারণা" বাংলাদেশের আণ্ডারগ্রাজুয়েট শিক্ষার পথ নির্দেশনাকে প্রভাবিত করবে এবং নূতন প্রজন্মের লেখকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাধা দিতে হবে, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে সম্পর্কে মনগড়া বিষয় পরিত্যাগ করতে হবে, তাতে উন্নততর বুদ্ধিশালীদের অনুসন্ধানের দুয়ার সকল ক্ষেত্রে খুলে যাবে এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও একাডেমী গুলিতে শিক্ষার সুযোগ করতে সহায়ক হবে যা এখন প্রয়োজন।

অন্য একটি স্বাধীনতাযুদ্ধে
(Another war of Independence)

অখণ্ড ভারত অথবা পুনঃযুক্তকরণ নীতি যার মূলমন্ত্র জওহারলাল নেহেরু কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর কিছু আওয়ামী লীগ নেতা নীরবে এই দুষ্কর্মে সহযোগিতা করেছে, ফলে জাতি শুধু প্রভূত্বের পরিবর্তন করে নিঃসন্দেহে সম্মান হ্রাস করে ক্রীতদাসের শ্রেণীভুক্ত হয়েছে, কিন্তু অবস্থা ও পদমর্যাদা ক্রীতদাসের মত ছিল না। বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য আজও ঐ মর্যাদা রয়েছে। এটা সঠিক যে পূর্ব পাকিস্তানীরা অত্যাচারিত হয়েছে এবং জাতিগতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে, কিন্তু বর্তমানেও বাংলাদেশীরা তাঁদের সঙ্গে বসবাস করছে, এখন আমরা অন্য বিদেশীদের অধীনে যেমন ভারত সরকার, আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা, এবং সংবাদ মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আনুগত্য স্বীকার করে চলছি।

বাংলাদেশীরা শারীরিকভাবে কখনও বাঁধা দিতে পারবে না কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ধারাবাহিক কার্যাবলী এখনও বিজোড়িত অভিজ্ঞতাকে নিম্নগামী করে দিচ্ছে, বাঁধাগ্রস্ত করে দিচ্ছে। বিদেশী শক্তি বাঙালির রুচি, কলহ ও বুদ্ধিকে উৎসাহিত করে, দলাদলি ও অনৈক্যকে তাড়িত করে, এটা হল সাম্প্রতিককালে বিভক্তি এবং শাসন করার নীতির ফল। আমরা ক্রমাগতভাবে আমাদের দুর্বলতাগুলো এবং অভাবগুলো পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী প্রতিবেশীর সম্মুখে উপস্থাপন করছি, ফলে তাঁরা যে কোন ধরনের স্বাধীনতাকে নিরুৎসাহিত করছে, আমাদের শিক্ষার মান প্রতিফলিত করছে, কারণ কোন মূল রচনা আমাদের নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ঘটনাবলীর সমালোচনার তথ্যানুসন্ধানের বিষয়টি এখন নিষিদ্ধ এলাকা এবং উক্ত বিষয়ে নূতন কোন তথ্য নেই বা ভারত থেকে না আসা পর্যন্ত তথ্য সহজে পাওয়া যাচ্ছে না, এসবই ভারতের কারসাজি, তাছাড়া বাংলাদেশে অনেক পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ সে সব পুস্তকের সূচিপত্র তৈরি করা হয়েছে ভারতে তাতে উচ্চমানের স্পর্শকাতর বিষয় দেয়া হয়েছে, তাই অকাট্যভাবে যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের মতামতকে

www.pathagar.com

উপেক্ষা করে রেখেছে। অনেকেই আশ্চর্য হবেন যে মানসিকভাবে যুদ্ধরত হিন্দুইজম এ কাজে লিপ্ত রয়েছে, দুর্ভাগ্যজনক যে তাঁরা মুসলিম নামধারীদের নিকট থেকে সহায়তা পাচ্ছে এবং বাংলাদেশী বলে পরিচয় দিচ্ছে। তাদেরকে জাতীয়বাদী ভাষ্যকাররা বাংলাদেশে পঞ্চমবাহিনী বলে পরিচয় দিচ্ছে, যেমন কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, যিনি সত্যিকারভাবে শেখ মুজিবুর রহমান এর চতুর্দিকের চাটুকারদের বিরুদ্ধে দাড়ানোর জন্য তাঁর "আলোড়ন এন্ড দি রোড টু ফ্রিডম" পুস্তকে আহব্বান জানিয়েছেন। আজকে পঞ্চম বাহিনীনর মৌলিক উপাদান এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব শাহরিয়ার কবির, তাসলিমা নাসরিন, মোনতাসির মামুন, জাফর সোবাহান এবং এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য (কমপক্ষে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে) আবদুল গাফফার চৌধুরী যিনি এখন লণ্ডনের বাহিরে বসবাস করছেন এবং লিখছেন, কিন্তু এখনও তিনি অলৌকিকভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ঘটনা এবং সাধারণ মানুষের অনুভূতি সম্পর্কে জানার জন্য ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন এবং খবর পাচ্ছেন, এবং নিজের ধারণা ও কর্মসূচি অনুযায়ী ঐগুলোকে বিকৃত করার ব্যবস্থা করছেন। অন্যান্য লেখকদের মত তাঁর লেখাও একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আর্বিভাব হচ্ছে।

এ সমস্ত লেখক, সাংবাদিক এবং শিক্ষকগণ অখণ্ড ভারতের ধারণাকে হয় স্পষ্টভাবে, অথবা পূর্ণ নির্ভরশীলতার সঙ্গে উন্নতি সাধনা করছে। সব শেষে, উল্লেখিত সাংবাদিক বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ইউনাইটেড কাউন্সিল এর (ও আই কে এ পরিষদ) ইউ,এস,এ, শাখার অনুগামীদেরকে উপদেশ দিয়ে বলছেন বাংলাদেশে তোমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নাও, কারণ ইউএসএ এবং ভারত তোমাদের কে সাহায্য করবে না। কাউন্সিলের কর্মকাণ্ড প্রশংসা করে বলেছেন পরিষদের নেতাদের বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে বর্তমান তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত। গাফফার চৌধুরী হুমকি দিয়ে বলেছেন ভারত যদি অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করে এবং বাংলাদেশের তিনটি জেলা নিয়ে স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্রগঠনের ঘোষণা দেয় তবে বাধা দেয়ার মত বাংলাদেশে এমন কেউ আছে কি? হিন্দুদের ছাড়া বাংলাদেশ টিকবে না। তিনি আরও বলেছেন, যারা পাকিস্তানের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করেছে তারা এখন বাংলাদেশে 'দেশভক্ত' হয়েছেন। মনের মধ্যে এ ধরনের বক্তব্য ও প্ররোচণামূলক চিন্তা নিয়ে যারা বাংলাদেশের ক্ষমতা গ্রহণ করে বিশ্বাস ঘাতকমূলক আচরণ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করে তাঁরাই সামরিক সংঘর্ষ ঘটানোর পরামর্শ দেয়। ২০০০ সালে ময়মনসিংহ শহরে বোমা বিস্ফোণের ঘটনাকে মনে করলেই বুঝতে পারা যাবে যে অনেক সংবাদপত্রে সংবাদ পরিবেশন করে বলেছে একজন নিম্নপদস্থ সামরিক কর্মকতা, একজন প্রাক্তন লেন্স করপোরেল, এবং একজন বেসামরিক ব্যক্তি ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করার কারণে গ্রেফতার হয়েছে। দোষীদের মধ্যে একজন ছিলো যিনি মানচিত্র, চিত্রাংকন, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়োগদানের নথি, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গঠিত নির্দেশিকা, গোলাবারুদ, ভর্তির ছক, স্থান পরিবর্তন করণের পরিকল্পনা, বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তাদের, স্থায়ী ঠিকানার তালিকা এবং সাংগঠনিক কাঠামো, সামরিক সরঞ্জামাদির এবং জনশক্তির তালিকা, সংক্ষিপ্তকরণের বই এবং গুরুত্বপূর্ণ সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করত। এই বিশেষ দোষী ব্যক্তিটি মোটা অঙ্কের টাকার

www.pathagar.com

বিনিময়ে গোপনীয় নথিপত্র ভারতের নিকট বিক্রি করে দেয়। ইতোপূর্বে উল্লেখিত লোকদের মধ্যে কেউ এ ধরনের কার্যকলাপকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ বলে কিছু লিখে নি। তারা স্পষ্টভাবে ভারত এবং বাংলাদেশকে এক জাতি মনে করে এবং বিভক্তিকে ইতিহাসের একটি অসুবিধাজনক কাহিনী মনে করে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার এই বিশেষ ঘটনা হল সামরিক বাহিনী সম্পর্কে স্পর্শকাতর তথ্য সংগ্রহের একমাত্র প্রধান কৌশল। একইভাবে আমাদের সমাজ ও অর্থনীতির প্রতিটি বিভাগে গোয়ান্দাগিরি করে ভারতের নীতিনির্ধারণের এবং সামরিক পরিকল্পনাকারিগণ বাংলাদেশের হাল সময়ের সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করছে এবং যদি তারা সামরিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন মনে করে তবে তাই করবে, এটাই ভারতের ইচ্ছা। লেখকের নিজের দৃঢ় মনোভাব হচ্ছে, স্বাধীনতার জন্য আবার একটি নূতন যুদ্ধের প্রয়োজন, কিভাবে এ যুদ্ধ হবে এবং কিভাবে বিজয় অর্জন করা যাবে এ বিষয়গুলো আমাদের সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কিভাবে অধিকারে রাখবে সে ব্যাপারে চিন্তাকরতে হবে, কারণ ভারত এখনও নেহেরু দর্শন অনুযায়ী অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ত্যাগ করে নি । আবদুল গাফফার চৌধুরী যদি হিন্দুদেরকে পরামর্শদেন একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে বাংলাদেশর অস্ত্রধারণ করতে, তাহলে তাঁরা নিজেদেরকে রক্ষা করার অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং তা ভারতের বিরুদ্ধেও যেতে পারে। এ বিষয়গুলোর কোনটি অস্বাভাবিক নয় এবং অতিরঞ্জিত নয়। এ পুস্তকের ৩, ৪ ও ৫ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে চরমপন্থীদের লেখা আমরা পুনঃনিরীক্ষণ করব, এর মধ্যে ডঃ কালিদাস বৈদ্য একজন যিনি উপরোল্লিখিত লেখকদের বিশিষ্টতম প্রেরণা দানকারী। বাংলাদেশের জন্য অনুকূল কোন কোন সময় ঐ সমস্ত লেখকদের অতিরিক্ত শপথ করার কারণে সন্দেহবশত নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করছে এবং এই ক্ষতির একটি কৌতূহল পুনঃউদাহরণ হল লেখকেরা নিজেদের স্বার্থেই এসব করছে এবং সম্প্রতি ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের সম্মেলনে তা উদঘাটন করা হয়েছে, সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল ১৯৭১ সালে দক্ষিণ এশিয়া সংকট। ২০০৫ সালের জুন মাসে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শরমিলি বোস এর উপস্থাপনকৃত একটি সংশোধনমূলক প্রবন্ধের বর্ণনা বাংলাদেশও পাকিস্তানে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে তিনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী সম্পর্কে বৈসাদৃশ্য দেখিয়েছেন। এছাড়া সংকটের মৌলিক প্রতিষ্ঠিত গুঢ় অর্থপূর্ণ বিষয়ে সংশোধনমূলক বিশ্লেষণের ঘটনাসমূহের লিখিত বর্ণনায় বৈশাদৃশ্য আছে, সে সমস্ত বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের রাজনৈতিক কৌশলকেই চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহার করেছে, তাদের ভাল এবং মন্দ তিনি পার্থক্য করেছেন, দৈনিক টাইমস পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে মূল্যবান উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়া হলঃ–

"মিসেস বোসের মত অনুযায়ী যখন বাংলাদেশীরা তাঁদের দেশের সৃষ্টি সম্পর্কে কথা বলতে সক্ষম হয়েছে তখন তারা ঐতিহাসিক দলিলপত্র সংরক্ষণের নিয়মানুযায়ী ভালকাজ অনেক কম করেছে। তিনি আরও দেখতে পেয়েছেন যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কিছু সংখ্যক লোক অপসংস্কৃতির চর্চা করে এবং আর্ন্তজাতিক দৃষ্টি আর্কষণ করার জন্য ৬ মিলিয়ন ইহুদির সঙ্গে পৈশাচিক প্রতিযোগতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। এ ধরনের মানসিকতা ১৯৭১ সালের বিরোধ সর্ম্পকে নিয়মানুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকে নষ্ট করে

www.pathagar.com

দিবে এবং দক্ষিণ এশিয়ার আধুনিক ইতিহাস পুনঃগঠনের মহাবিপ্লবে পরস্পরের সঙ্গে সত্যিকার বুঝাপড়ায় বাধা সৃষ্টি করছে। তিনি লিখেছেন যে ১৯৭১ সালের গৃহযুদ্ধ যারা যুক্তপাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন তাদের সাথে হয়েছে এবং তারা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি ন্যায়বিচার ও প্রগতিতে বিশ্বাস করত। উভয়টি বৈধ রাজনৈতিক অবস্থান স্থল, বিরোধে সকল দলই উশৃঙ্খলতাকে আলিঙ্গন করেছে সকলেই নৃশংসতার দায়িত্ব স্বীকার করেছে, সংগ্রামের আর্দশ গ্রহণ করেছে এবং সকলেরই মানবিকতার অংশ আছে। ১৯৭১ সালের বিরোধের পাল্টা অভিযোগ না করে সমন্বয়ের চেষ্টা করার সুযোগ হয়েছে যা উৎকর্ষের নিদর্শন হয়ে থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন ।

বাংলাদেশীদের লেখায় কোন বিশেষ অথবা নির্দিষ্ট বিষয় কেহ খুঁজে বের করতে রাজি হোক বা না হোক এখন পর্যন্ত জাতির অনেক চরম সংকটপূর্ণ এবং বিস্তৃত অতীত সম্পর্কে দেখতে হবে, শুধুমাত্র কথায় নয় কিছু সংখ্যক স্বইচ্ছায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ বাস্তবিক পক্ষে প্রায় তিন দশকের বিরোধিতা ছাড়াই দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের উপর বুদ্ধিগত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এখনও বিদ্যমান আর তা হল অখণ্ড ভারত এবং তাদের সকল কর্মকান্ড যুক্তভারতের দিকে চালিত হচ্ছে যা জওহারলাল নেহেরু কর্তৃক লিখিত বহু পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে আর তাই হল এ অংশের বিষয়বস্তু।

১৯৭১ সম্পর্কে শেষ মন্তব্য এবং তারপর
(Concluding Remarks on 1971 and After)

গত ছয় বছর যাবত এ লেখাটি প্রচারের মধ্যে ছিল বাংলাদেশের উপর ভারতের কর্তৃত্ব সম্পর্কে, আমার যুক্তি প্রদর্শন নিয়ে একজন দৃঢ়ভাবে বিচার বুদ্ধি দিয়ে প্রতিহত বা খণ্ডন করে নি, অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উদাহরণ দিয়ে অখণ্ড ভারতের ধারণা ও দর্শন দেয়া হয়েছে। তৎপরিবর্তে বাংলাদেশ বিদেশী সাংবাদিকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আত্মরক্ষামূলক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে, এর উদ্ভাবক ত্র্যালেক্স প্যারি এবং অববিন্দ অভিগা, তাঁরা টাইম ম্যাগ্যাজিন এর জন্য লিখছে এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ও প্রকাশনা গত পাঁচ বছর যাবত বিদেশী সাময়িকপত্র এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করছে। মৌলবাদী সংগ্রাম আবর্তনশীল সময়ের প্রতিরূপ যা দুর্ভাগ্যজনক এবং বাংলাদেশের দারিদ্রতাকে সবার চোখের সামনে তুলেধরা হচ্ছে এবং পরির্বতে বাংলাদেশ ভীতির মধ্যে আছে, ভারতসহ সুযোগ বুঝে বাংলাদেশকে আন্ত র্জাতিকভাবে তিরস্কার করছে, ভারত ফরিয়াদি, অসাদাচরণ ভোগকারী এবং ব্যর্থ বড় ভাই সুলভ অচরণ। এসবকিছু একসঙ্গে গেঁথেছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে সঠিকভাবে সেকেলে দায়িত্ব গ্রহণ এর বিশ্লেষণধর্মী মূল্যায়ন এবং বর্তমান আলোচনা ব্যর্থ হলে আলোচনায় কথিত কোন উক্তির জন্য উৎকৃষ্ট প্রচেষ্ট গ্রহণ করা হয়েছিল কি?

বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা এবং রাজনৈতিক চর্চা ও জাতীয় শক্তিতে তাদের হস্ত ক্ষেপ অবিচলভাবে ধীরে ধীরে দেখা যাবে যে প্রকোপ হ্রাস পাচ্ছে, কমপক্ষে ভবিষ্যতের ব্যাপারে পূর্ব থেকে অত্যন্ত সঠিকরূপে ২০০৯ সালে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত তথ্য সন্নিবেশন করে এ প্রকাশনা যথোচিত করা হবে। কিন্তু তার অনেক পূর্বেই বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের কাঠামো ইতিহাসকে প্রভাবিত করার জন্য অভ্যস্ত

www.pathagar.com

হবে, কিন্তু ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা (''র'' এর গবেষণা ও বিশ্লেষণ শাখা) এ রচনার পরবর্ত্তী তিনটি অধ্যায়ে পরিচালকের ভ্রমিকার অবতীর্ণ হবে।

শিক্ষাগত গবেষণাধর্মী কাজের অভাব যা এখনও আরম্ভই হয় নি, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে তল্লাশি বাংলাদেশে অদ্বিতীয় নয়, এবং 'র' কে সংযুক্ত করে ঘটনার কাতারে বিতর্ক প্রতিযোগিতাকে পুনঃকেন্দ্রভূত করে সংশোধন করা যেতে পারে, অথবা বর্ণনাসমূহ যেগুলির প্রচুর প্রমাণ আছে এবং প্রভাবিত হয়েছে অথবা রাজনৈতিক, সামরিক এবং জাতীয় পর্যায়ে অন্যান্য কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করেছে অথবা ধ্বংসাত্মক ঘটনা, গোয়েন্দা নিয়োজিতকরণ, সন্ত্রাস এবং এ সমস্ত কাজের পিছনে পরিকল্পনা সবকিছুই জনগণের চোখের আড়ালে করা হচ্ছে। ক্রিস্টোফার এ্যান্ড্রু একজন নেতৃস্থানীয় গোয়েন্দা পণ্ডিত, তাঁর পুস্তকে কে,জি, বি সম্পর্কে লিখেছেন, 'দি মিট্রোখিন আরকাইভ''।

মিট্রোখিন আরকাইভে বহু তথ্য আছে যেগুলো কে,জি,বি এবং এর উত্তরাধিকারীরা বন্ধ করে দিতে অথবা চাপা রাখার চেষ্টা করেছে। তিনি নিঃসন্দেহে এগুলো না করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছেন, তারপর ও জনগণের জন্য এগুলোর রহস্য উদঘাটন করা প্রয়োজন। দেশে এবং বিদেশে কে,জি,বি এর কর্মকাণ্ড জানা ইতিহাসের অংশ, শুধু সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং তাঁদের বৈদেশিক সম্পর্কই নয় বরং যে সমস্ত দেশে তাঁরা হিংসাত্মক ধ্বংস কার্য করেছেন সেগুলোর ব্যাপারেও জানা দরকার। কে,জি,বি এর নথিগুলো না দেখলে তাঁদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা সম্ভব নয় অধিকাংশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসবিদগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসের গোয়েন্দা সমাজের ভূমিকা স্বীকার করার ক্ষেত্রে ধীর গতিতে চলছে। যদিও নেতৃস্থানীয় ইতিহাসবিদগণের দ্বারা এ ধরনের নীতি ভ্রষ্টতার কারণ হল উৎপত্তিস্থানে। গোয়েন্দা আরকাইভ এর অতিরিক্ত বিভাজন যা মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন অনৈক্যের ধারণা করতে সক্ষম। আমাদের সকলের জন্য সমস্যা হল নূতন ধারণা আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে যা কিনা বর্তমান কিন্তু সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর অনেক ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ, গুপ্তগোয়েন্দা বাহিনী একই ধারণা পোষণ করে। নূতন শতাব্দীর প্রারম্ভে গতানুগতিক তত্ত্বমূলক শিক্ষা গোয়েন্দাদের প্রতি উপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, যদিও এখনও পর্যন্ত প্রান্তিক প্রত্যাখ্যান করা হয় নি। নূতন প্রজন্মের পণ্ডিতগণ উদ্ভূত হতে আরম্ভ করেছে। গোয়েন্দাদের কারণে তাদের অধিকাংশ পূর্বসূরীদের থেকে অনেক কম, বুঝতে সক্ষম, এবং এর কারণ হল নীতি নির্ধারকরা গোয়েন্দাদেরকে সঠিক ব্যবহার করছে না, কাজে লাগছে না, সেটাই বিবেচ্য যা গবেষণার এক বিরাট ক্ষেত্র তাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

বাংলাদেশে 'র' এর কর্মকাণ্ড দেখার জন্য আরকাইভ নথির জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, কারণ দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় সংবাদপত্র ও মাধ্যমগুলো প্রচুর পরিমাণে তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছে এবং বাংলাদেশে কি গুপ্ত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র দানা বেধে আছে, বহু দশকের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে আমরা এখনও ভূগছি যা মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা যায় অনৈক্যের মধ্যে জানা, কিন্তু আমাদের ধারণা অনুযায়ী বলা যায় ইচ্ছাকৃতভাবে এ সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। অবসর প্রাপ্ত 'র' এর

www.pathagar.com

পছন্দ কর্মকর্তাদের মধ্যে এখনও অনেকে বিদ্যমান, তাঁদের স্মরণে রাষ্ট্রের গুপ্ততথ্য যা কিছু আছে ফাঁস করে দিতে পারে, যা কিনা দেশের জন্য অত্যাবশ্যক এবং বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ তা সহজেই জানা যাবে। অতএব এটা গোয়েন্দা সংস্থার জন্য সন্তোষজনক কোন বিকল্প ব্যবস্থা নয়, বিশেষ করে বহিঃস্থ বিষয়ের যে স্থাপনা আছে তা দেখা জরুরি প্রয়োজন, আর তা না হলে বিপদ আসতে পারে অথবা জাতির নিরাপত্তা ও স্বার্থ ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হবে।

রেফারেন্সঃ

১. আবুল হাসনাত- দি আগ্রলিয়েস্ট জেনোসাইড ইন হিস্টোরি।
২. জামানাদাস আকতার- দি সাগা অব বাংলাদেশ।
৩. অরুন ভট্টাচার্জ্য- ডেইট লাইন মুজিবনগর।
৪. সুখরঞ্জন দাসগুপ্ত- মিডনাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা।
৫. জি পি ভট্টচার্য্য- রিনাইসেন্স এন্ড ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ
৬. ভাইস এ্যাডমিরাল এন, কৃষ্ণ- নোওয়ে বাট সারেণ্ডার
৭. কল্যাণ চৌধুরী- জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ।
৮. মোহাম্মদ আইয়ূব এন্ড কে, সুব্রামানিয়াম- দি লিবারেশনওয়ার
৯. জ্যোতিসেন গুপ্তা- বাংলাদেশ ইন ব্লাড এন্ড টিয়ারগ।
১০. এ্যাডমিরাল এস এন কোহলী- উই ডেয়ারড ম্যারিটাইম অপারেশন ইন দি ১৯৭১ ইন্দো-পাক ওয়ার
১১. রফিকুল ইসলাম- এ টেইল অব মিলিয়নস (১৯৭১)

www.pathagar.com

অধ্যায়-৩

ইতিহাসের পরিধিরেখা বা পরিকেন্দ্র
(The Circle of History)

কদাচিৎ বলতে শুনা যায় ইতিহাস পূর্ণ বলয় নিয়ে আসে এবং এ রচনাটির জন্য এটা সত্য যা কিনা আমাদের ইতিহাসে কিছু অংশের ঘটনা ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু বর্ণনাগুলো প্রাথমিকভাবে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত যার ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে। তবে এ সময়ের বিবেচনাযোগ্য ঘটনাসমূহের হিসেবে নিতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি, কারণ ভারত সরকার এবং গোয়েন্দা সংস্থা খুব তৎপর ছিল এবং উপমহাদেশকে অখণ্ডভারতে পরিণত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিল।

২০০১ সালে যখন আমি এই প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করি তখন আমার মনে হয়েছিল যে, ১৯৭১ সালে এবং পরবর্তী সময়ে যদি ঘটনার কিছু বাদ পড়ে যায় তবে এ লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এখন পূর্বাপর ১৯৭১ সালকে দেখার উদ্দেশ্য হল তখন আমরা পূর্ব পাকিস্তানী ছিলাম এবং সেই দৃষ্টিকোন দিয়ে দেখতে হবে। আমি ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ের উপাত্তগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি। অখণ্ডভারতের দৃষ্টি দিয়ে যেমনটি মনশ্চাক্ষে দেখেছিলেন জওহারলাল নেহেরু, এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। শেষক্তো জন ছিলেন কার্যকর বাস্তবতার প্রতীক, এবং প্রথম জন তার বিরাট দাবী নিয়ে অপেক্ষা করছেন বিখ্যাত অনুভূতি নিয়ে যদি সুযোগ ও পরিবেশ মেনে নেয় তারই অপেক্ষায়। ইতোমধ্যে ভারত সক্রিয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের পরের অবস্থা নিয়ে বিরাটভাবে প্রচার চালায়, আমার অভিসন্ধবে কি বাধ পড়েছিল আর তা হল ১৯৭১ সালের পূর্ববর্তী অবস্থার কথা, এটা বলা হয়েছিল যে, ভারত তাঁর অখণ্ডভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল।

এটা বিশ্বাস করা যায় না যে, যারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে সেই শহীদদের চেষ্টাকে ধ্বংসাধনের উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং যুক্ত পাকিস্তান দেখার কোন ইচ্ছা বা আকর্ষণ লেখকের নেই। আরও সঠিকভাবে বলতে হয় বিরুদ্ধ আদর্শের তুলনামূলক বিবরণ থেকে জ্ঞান অর্জন করে আমাদের যুবক সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করা, যেন তাঁরা জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে এবং যে প্রেরণার কথা বলা হচ্ছে, তা ভারত ও তার সৈন্য বাহিনীকে দিক নির্দেশনা দিবে যা সম্পূর্ণরূপে আলাদা এবং সুদূরপ্রসারি। আমি মনে করি না যে, কোন বিষয়ে ধারণা দেয়া অতিরঞ্জিত, ভারত বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে যে সাহায্য দিয়েছে তা ছিল চরম ধ্বংসের একটি ধাপ এবং বৃহৎ অখণ্ড ভারতের মধ্যে যুক্তবাংলা গঠনের অভিলাষ।

এ অনুচ্ছেদটিতে তিনটি পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণ নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিশেষভাবে আশা করছি। অন্যান্য দলিলাদি লেখকের হাতে আসার কারণে সেগুলোও

www.pathagar.com

অন্তর্ভূক্ত করে বিস্তৃত করা হবে। যে তিনটি পুস্তক নিয়ে আলোচনা হবে সেগুলো হল– (১) ফয়েজ আহমদের "আগরতলা মামলা, শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ" (১৯৯৭) সংস্করণ, (২) অশোক "রায়না ইনসাইড "র" দি স্টোরি অব ইন্ডিয়ানস সিক্রেট সার্ভিস (১৯৮১)", এবং (৩) মেজর জেনারেল এস, এস, উবান– ফ্যান্টম অব চিটাগাং ঃ দি "ফিফ্‌থ আর্মি" ইন বাংলাদেশ (১৯৮৫)। উল্লেখিত সকল পুস্তক এর মধ্যে যেটি যতটুকু তথ্য পরিবেশন করেছে ততটুকুর যোগ্যতা আছে, কিন্তু বাংলাদেশে সাড়া জাগানোর মত প্রসিদ্ধি দিতে পারে নি, কারণ তাঁদের লিখিত পুস্তকের অভ্যন্তরস্থ বস্তু ও ঐতিহাসিকভাবে উন্মোচিত হওয়ার প্রেক্ষিতে সম্ভব হয় নি। আমি আশা করি মূল বিষয়গুলো পাঠ করলে এবং উদ্দেশ্যসমূহের বিশ্লেষণ করলে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতের ভূমিকা কি ছিল সে সম্পর্কে আলোকিত হওয়া যাবে এবং নূতন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি তার লক্ষ্য, অখণ্ড ভারতের বিরাট কৌশল কিভাবে সকল অবস্থার সঙ্গে মানানসই হবে তা দেখতে হবে।

কোন ক্রিয়া পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্বাস বা প্রত্যয় দিতে হলে অখণ্ড ভারতের ধারণার পিছনে কি আছে তা জানার জন্য অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে একটি যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে সদ্য গঠিত স্বায়ত্বশাসন আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে ভারত কতটুকু জড়িত আছে, কাহারও ধারণায় সম্ভবত পার্থক্য থাকতে পারে, তবে ভারতের সেরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যোগাযোগ করছে। অন্যভাবে বলতে হয়, পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে ধ্বংস করাই ভারতের উদ্দেশ্য, এবিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, সুদূর লক্ষ্য অর্জনের জন্য পাকিস্তানকে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারলে পরিণামস্বরূপ এক অংশকে অর্থাৎ নূতন স্বাধীন জাতিকে ভারতের নিয়ন্ত্রণে এনে প্রভাবিত করবে। অন্তত পক্ষে আংশিক অখণ্ডভারত হয়েছে এটা অনুধাবন করার জন্য যতক্ষণ না সমস্ত অঞ্চলে ১৯৪৭ সালের পূর্বের অবস্থার আধিপত্য বিস্তার না হয় ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
(The Agartala Conspiracy Case)

নেহেরু প্রশাসনের সঙ্গে কোন যোগসূত্রের প্রথম ইঙ্গিত (অথবা ইন্দিরা গান্ধী সরকারের সঙ্গে ১৯৬৬) এবং বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা সরকার বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য (জনপ্রিয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা অথবা আগরতলা কনসপিরেসী কেইস নামে পরিচিত) হওয়ার পর থেকে যোগাযোগ আরম্ভ হয়। আইয়ুব খান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে, অভিযোগে বলা হয় যে, পি, এন ওঝা, ১ম সচিব, ভারতীয় হাই কমিশন এর সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তিনি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য ভারত থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা দিয়ে অস্ত্র সরবরাহের আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ গঠন করা হয় যে, দোষী ব্যক্তি পাকিস্তান ভূখণ্ডের একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করে, সেই অংশ হল পূর্ব পাকিস্তান, সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘাটিয়ে তা করা হবে এবং ভারত আর্থিক সহায়তা দিয়ে একটি স্বাধীন সরকার

www.pathagar.com

গঠন করবে এবং ভারত স্বীকৃতি দিবে। পরবর্তিতে আরও দাবী করা হয় যে মুজিবের স্ত্রী ভারতীয় কূটনীতিক এবং মুজিবের মধ্যে যোগাযোগের বাহন হিসেবে কাজ করছে।

এই আলোচ্য বিষয়টি মুজিবের সমর্থকরা ইচ্ছাকৃত ভাবে অগ্রাহ্য করার (আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিবের স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দেয়া হয় নি সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানীদের মতামতে অস্বীকৃতি পূর্ণ ফল) কারণে অভিযোগ তুরুপের তাস খেলার মত প্রত্যাহার করা হয়। ভারতীয় ভাষ্যকারীরা বিষয়টি প্রকাশ করে যে, শেখ মুজিব ১৯৬৫ সালে ভারতে চলে আসে, নতুন দিল্লী কখনও তার পাকিস্তান ছেড়ে আসার পক্ষে ছিল না। তাঁরা যখন জানতে পারল যে, শেখ মুজিব ভারতে অবস্থান করছে, তাকে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করে। আইন এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে অভিযোগটি করা হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের শেখ মুজিবের সুনামকে নষ্ট করার জন্য এবং ভারতের দালালদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রাদিতে সহযোগিতা করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড জনরোষ সক্রিয় করার চেষ্টা করা হয়। শেখ মুজিবকে কলঙ্কিত করার এ প্রচেষ্টা অন্তহীনভাবে ব্যর্থ হয়েছে, ফলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদ আন্দোলন বৃহত্তর আকার ধারণ করে, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষাণীর নেতৃত্বে গণঅভূথানের অংশ গ্রহণ করে সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় ছাত্র কর্ম শক্তি কমিটি। শেখ মুজিব ট্রাইব্যুনালে বক্তব্য দেয়ার পর ক্রোধের আগুন প্রচণ্ডভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তারপর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানীরা বিশ্বাস করত যে আগরতলা থেকেই এই ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং এতে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা জড়িত আছে, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে যে বৈষম্য তা হল অর্থনৈতিক শোষণ, দেশ রক্ষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা। কেন্দ্রীয় সরকারে প্রার্থক্য এ সমস্ত বিষয় নিয়ে শেখ মুজিবের ছয় দফা দাবীর সুযোগ নিয়ে ভারত অযৌক্তিকভাবে বাড়াবাড়ি শুরু করে। ছয় দফা দাবী নিম্নে দেয়া হলোঃ

(১) পাকিস্তানের সরকার পদ্ধতি হবে ফেডারেল এবং পার্লামেন্টারি, সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

(২) ফেডারেল সরকারের হাতে শুধু প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে।

(৩) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিয়োগযোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। কিংবা সারাদেশে একটি মাত্র মুদ্রাব্যবস্থাই চালু থাকবে, তবে সে ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজি প্রাচারের বিরুদ্ধে কার্যকরী শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাচার হতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে, এবং দুই অঞ্চলে দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

(৪) কর ধার্যকরণ ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ফেডারেশনে অংশ গ্রহণকারী ইউনিটসমূহের উপর ন্যাস্ত থাকবে।

(৫) শাসনতান্ত্রিক বিধানে সুপারিশ থাকবে যে, বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের

www.pathagar.com

এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকবে।

(৬) পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী বাহিনী গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে নৌ-বাহিনীর হেড-কোয়ার্টার স্থাপন করতে এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভরশীল করতে হবে।

পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর জন্য এই অবস্থা বিচ্ছিন্ন বাদীতার প্রথম ধাপের ইঙ্গিত বলেই বিবেচনা করা হয়। সেখানকার জন্য বাস্তব পটভূমি এবং আস্থা আছে কিনা তা আরও তথ্য ও দলিলাদি পাওয়া গেলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে। যা হোক, পাকিস্তান সরকারের নিকট জানা ছিল অনুরূপ একটি ষড়যন্ত্রের কথা যা কিনা কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীকে সতর্কাবস্থায় রেখেছিল। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানকে জড়িত করার মত যথেষ্ট প্রমাণ সম্ভবত ছিল না। তৎসত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের জালের মত ক্রিয়া কলাপ স্পষ্ট ও ব্যাপকভাবে প্রচার চালানো হয় এবং আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের জন্য বিভিন্ন পথ কার্যকরভাবে খোলা ছিল, ফলে তাঁরা ভারত সরকার, এবং ঢাকায় নিযুক্ত গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করতে পারত।

মাসুদুল হক তাঁর লিখিত পুস্তকে "বাংলাদেশ স্বাধীনতাযুদ্ধ" "র" এবং সি, আই, এ (বাংলাদেশ ইন্ডিপেনডেন্স ওয়ার "র" এন্ড সি, আই, এ) বলেছেন, পাকিস্তানের গোয়েন্দা দফতর (ডিআইবি) এর পরিচালক ১৯৬২ সাল থেকে জানতেন যে, একটি বাড়ী (সম্ভবত সানি ভিলা) কলকাতার ভবানীপুরে অবস্থিত ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সক্রিয় কাজের প্রধান দফতর ছিল, তাঁরা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ (ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল রিভ্যুলুশনারি কাউন্সিল) নামে একটি সমিতি গঠন করে, তাদের উদ্দেশ্যই ছিল একটি নূতন দেশ গঠনের জন্য পাকিস্তানের পূর্ব অংশকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা। ডি,আই,বি ও জানত যে, চিত্তরঞ্জন সুতার এব কালীদাস বৈদ্য উভয়ে পাকিস্তানী হওয়া সত্ত্বেও এই অবৈধ গুপ্ত সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ (এসবিবিপি) ১৯৬৪ সালে সিরাজুল আলম খান (ছাত্রলীগ জেনারেল সেক্রেটারী) এর নেতৃত্বে ছাত্র সমাজের মাধ্যমে ক্রমেক্রমে আলক্ষ্যে অনুপ্রবেশ করে। সঙ্গে ছিল আবদুর রাজ্জাক (ছাত্রদলের এ্যাসিসটেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী) এবং কাজী আরেফ, তাঁরা কেন্দ্রীয় ছাত্র দলের দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন। এস,বি,বিপির পক্ষ থেকে আব্দুর রাজ্জাক শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

ছয় দফা দাবী নামা প্রকাশিত হওয়ার পর এস, বি, বি, পি সত্যিকারভাবে বিচ্ছিন্নতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে আরম্ভ করে। এটা ছিল বন্দুক ছাড়ার মত যা পশ্চিম পাকিস্তানে ঘণ্টা বাজাবার সংকেত এর মত। এস,বি,বি,পি চেয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ করবে, কিন্তু তাঁরা অনুধাবন করল যে তিনি অতিরিক্ত কোন কিছুই অনুমোদন করবেন না তাই এস,বি,বি,পি তিন ছাত্র নেতা গুপ্তভাবে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। এতে কাউন্সিলের অস্থিত্ব সম্পর্কে কেউ জানতে আসলো না অথবা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনাও জানল না। ১৯৭১ সালের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, বিচ্ছিন্নবাদিতার ভীতি পশ্চিমাদেরকে (ইউএস এবং বৃটেন) ভাবিয়ে তুলেছে এটা শুধু সে কারণেই নয়, বরং পরিণামে ভারত পাকিস্তান ভূখণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে দখলের

www.pathagar.com

চেষ্টা করছে এবং সামরিক বিরোধে পশ্চিম পাকিস্তানকেও খণ্ডিত করার প্রয়াশ পাচ্ছে। অবশ্যই এটা বহু বছরের পরিকল্পনাও ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত সর্বোচ্চ সীমা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের এ অভিসন্ধি বাধাগ্রস্ত করার জন্য আমেরিকার হস্তক্ষেপ এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করে, এতে ভারত ব্যাপীয়া ভীতি সঞ্চার হয় এবং আমেরিকা সহ চীন ও রাশিয়ার সামরিক শক্তি জড়িত হয়ে যুদ্ধ বিরাট আকারে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সন্দেহাতীতভাবে এই বিপর্যয়কে এড়িয়ে সংক্ষিপ্তভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ভারতীয় বাহিনী সংকটকে সীমার মধ্যে রেখে দ্রুততার সাথে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শক্তিকে দুর্বল করার লক্ষ্য সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। অথবা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা উদ্দেশ্য ছিল না কারণ তা করতে হলে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন হত তাতে বিশ্ব শক্তি অংশগ্রহণে জড়িয়ে পড়বে যাদের মনোভাব ভিন্ন ধরনের এবং সংকটের বিষয়সূচি এবং নীতি একান্ত প্রয়োজন ভারতের "অখণ্ডভারত" দর্শন ক্ষতিগ্রস্থ হত। এস,বি,বি,পি কর্তৃক বিচ্ছিন্নবাদি পরিকল্পনা সম্প্রসারিতকরণ বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করবে, যদি সত্যিকারভাবে ১৯৬৮ সালে অথবা তারও পূর্বে ভারত এবং পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে তবে তা আগরতলা কেন্দ্রীক ছিল এবং শেখ মুজিবকে সংযুক্ত করেছিল। আরগতলা ষড়যন্ত্র মামলার ভাষ্যকারদের মধ্যে একজন সঙ্গে সঙ্গে বিভ্রান্তির ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠে, তাঁরা এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবকে রক্ষা করবে যা কিনা ঢাকা এবং আগরতলায় উভয় স্থানে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে অভিযোগে বর্ণিত হয়েছে। শেখ মুজিবকে জড়িত করে আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হল ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক লিখিত বিবরণ যা ১৯৯১ সালে মিঃ মফিদুল হক পেয়েছেন এবং ফয়েজ আহমেদ এর বইতে শেষ পৃষ্ঠায় বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত পত্রের একটি খসড়া এবং আক্ষরিক অনুবাদ নিম্নে দেয়া হলোঃ

আগরতলায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শেখ মুজিবের সম্পর্ক
(Sheikh Mujib's Relation with Chief Minister of Tripura)

১৯৬৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান এবং আরও ১০ জনসহ আমার ভাই শ্রী উমেশলাল সিংকে নিয়ে ত্রিপুরার পালোম জেলার কোহাই সাব ডিভিশন, আগরতলায় আমার বাংলাতে বেলা ১২.০০ টার সময় পৌঁছেন। প্রাথমিক আলোচনার পর শেখ সাহেব আমার বোন হিমাংগিনি দেবীর বাসায় আসেন, আমার বাংলো থেকে বোনের বাসা দেড় মাইল দূরে, সেখানে তাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে মুজিবুর ভাইয়ের পূর্বের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহার লাল নেহেরুর সঙ্গে দেখা করি, আমার সঙ্গে ছিলেন চীফ সেক্রেটারি শ্রী শ্রী রামন। আমি শ্রী রামনকে বিদেশ সচিব শ্রী ভাণ্ডারিয়ার কক্ষে রেখে চলে আসি। আমি তখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি। তিনি (নেহেরু) মুজিবুর রহমানকে মেনে নেননি এবং জনসম্মুক্ষে ত্রিপুরা থেকে চলে যেতে বলেন, কারণ চীনের সঙ্গে বিরোধের পর তিনি এই ধরনের বড় একটি দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি হন নি। তাই ১৫ দিন পর

www.pathagar.com

শেখ মুজিব ত্রিপুরা ছেড়ে চলে আসেন। সোনামুড়া, কুমিল্লা সংলগ্ন পশ্চিম ত্রিপুরার একটি সাব ডিভিশন, শেখ মুজিবুর রহমানকে কথা দেয়া হয়েছিল যে, তাকে সকল প্রকার সহায়তা করা হবে।

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিনহা
চীফ মিনিস্টার, ত্রিপুরা

মফিদুল হকের মতে প্রাক্তন মূখ্যমন্ত্রী যখন এ বিবৃতি লিখেছেন তখন তিনি রুগ্ন ও ক্ষীণদৃষ্টি রোগে ভুগেছিলেন, তার স্মরণ শক্তির কারণে ভুলগুলো স্পষ্টত ছিল, প্রকাশ ভঙ্গিতে অসংলগ্ন ও চিন্তায় ধারাবাহিকতা ছিল না। ১৯৬৩-১৯৭১ সাল পর্যন্ত শ্রী শচীন্দ্র লাল সিনহা ত্রিপুরার মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠে নি, ২০০০ সালে তিনি পরলোক গমন কারেন। মূখ্যমন্ত্রীর অনুসৃত ঘটনার বিষয়াদি ও আগরতলা মামলা সম্পর্কে ভারতীয় সরকারী কর্মকর্তাদের কোন বিরোধ হয় নি, এমনকি শেখ মুজিবের দেশরক্ষার দলেরও কোন অসুবিধা হয় নি। আশ্চার্যজনক ব্যাপার হলো এই বিবৃতির প্রতিহত করার কোন চেষ্টা করা হয় নি, এমন কি আমরা যদি বিশ্বাসযোগ্য পটভূমিতে অতিরঞ্জন বাবদ বর্ণনাদির সত্যতার মূল্য হ্রাস করি এবং দাপ্তরিক ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তবে বিষয়টি অনুমোদিত হতে পারে অথবা বাতিলও হতে পারে কিন্তু কোনটাই হয় নি। বাকচাতুর্যে মনোহরতা সততার মধ্যে নিহিত নয়, অথবা অন্যভাবে উপরোক্ত বিবৃতিও অনুরূপ হতে পারে। কিন্তু ১৯৭১ এর যুদ্ধে "র" এর সংযুক্ততা ক্ষণস্থায়ী ছিল এবং আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের পূর্বানুমতি ছাড়াই এটা করা হয়েছিল। ঠিক এ সংকটময় সন্ধিক্ষণে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দীর্ঘ সম্পর্ক স্থাপন, সমঝোতা ও সহযোগিতার জন্য ভারত সরকার ও শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য নেতা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত ছিলেন তাদের সঙ্গে খুব বেশী দিন পূর্বে না হলেও ১৯৬৫ সালেই চুক্তি হয়েছিল। প্রধান যোদ্ধা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান এর উপর জোরালোভাবে আগরতলা মামলার বিষয়টি দেখা হয়েছে এবং মামলার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হিসেবে অন্যান্য অভিযুক্তের সংযুক্তি ছিল এবং লুক্কায়িত ভাবে ঢাকায় নিযুক্ত হাই কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে।

প্রথম দোষী যাকে দেখানো হয়েছে তিনি গোপনীয়ভাবে ১ম সচিব, পি,এন ওজার সঙ্গে চুক্তি করেন। সঙ্গে ছিলেন ল্যাফটেনেন্ট কর্ণেল মোয়াজ্জেম হোসেন (দোষী নং-২) এবং মানিক চৌধুরী (দোষী নং-১২) এবং অভিযোগ পত্রে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা ছিল নিছক অনুসৃত পদ্ধতি যে অভিযোগ হতে ইতোপূর্বে ১৯৬৩ অথবা ১৯৬৫ সালে আগরতলা সফরকালে শেখ মুজিব সম্বন্ধে করা হয়েছিল। মামলা প্রতিহত করতে গিয়ে যদি শেখ মুজিব এবং ল্যাফটেনেন্ট কর্ণেল মোয়াজ্জেম হোসেন কোন যোগসূত্র পেয়ে গেলে ভাগ্যহত হতে পারে, কারণ মোয়াজ্জেম পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ১৯৪৭ সাল থেকে সক্রিয়ভাবে কাজ করছিলেন। যদি এই বিচার অবিরত চলতে থাকে, তাহলে হয়তো ভারতের কিছু অভিযুক্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে দেখিয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে। তবে পাকিস্তানকে খণ্ড করাই কি তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিষয়টি বিতর্কিত।

ভারতের বাহিরে যে উদ্দেশ্য দেখা যায় তা ছেড়ে দিয়ে দূরবর্তী উদ্দেশ্য অথবা কার্যসূচি এবং অভিমত বাংলাদেশে সৃষ্টি করার অর্থ হল অখণ্ডভারত প্রতিষ্ঠার সর্বশেষ

www.pathagar.com

ইচ্ছা, আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে অথবা সংগ্রামীদের মধ্যে এ চিন্তা নাও থাকতে পারে, আমরা ও তাঁদের সত্যিকার উদ্দেশ্য কি তা জানি না, অনেক প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অনুত্তরিত রাখা হয়েছে কারণ দৈবক্রমে আগরতলা মামলা বন্ধ হয়ে যায়।

"র" এবং মুক্তিবাহিনী
(Raw and The Muktibahini)

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে "র" সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে সাহায্য করার কথা অনেক লেখালেখি হয়েছে এর কারণস্বরূপ বলা যায় তাঁদের নিজস্ব উদ্দেশ্য ছিল, তা হলো তাদের বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শুধুমাত্র অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহার করেছে। এ সম্বন্ধে এখন গবেষণা ও আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গভীরভাবে মূল বিশ্লেষণের কোন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে "র" এর হস্তক্ষেপের পূর্বে এবং যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে "র" এর কার্যকারিতা সম্পর্কে আমরা কোথা থেকে উপসংহার টানব, কিভাবে তাঁরা পূর্ব থেকে বিদ্যমান কাজকে (এবং যেখানে কল্পিত প্রয়োজন) রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে পরিব্যাপ্ত করেছে এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোকদেরকে কিভাবে বাংলাদেশের ক্ষমতায় বসিয়েছে এবং কিভাবে অখণ্ড ভারতের বিস্তৃত পরিকল্পনার সাথে যথোচিতভাবে বসিয়েছে তাই গবেষণার বিষয়।

আমার যুক্তি হল ভারত ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং ছাত্র নেতাদের বেছে নেয় এবং নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তাদের পরিচালনা করে, একবার যদি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে পাকিস্তানের অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ্য করা যায় তাহলে ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক ভূগোল ভারতের অধিকতর প্রভাবসম্পূর্ণ পুনঃলেখা সম্ভব হবে। এ শাখাটি "র" কে দেখানোর প্রচেষ্টা করে, ভারতের বহিঃস্থ গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে জড়িত হয় এবং গুপ্ত ঘাতক দলের উপদেষ্টা ও সমন্বয়ক হিসেবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। এ ধরনের সহযোগিতা শুধুমাত্র ভারতীয় সামরিক বাহিনী এবং রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ছাত্র ফ্রন্ট সম্ভবত ১৯৬৩ অথবা ১৯৬৫ সালের আগরতলার অভিযোগে সঙ্গে জড়িতদের সম্পর্ক প্রসারিত করার প্রতিফলন দেখা যাবে।

১৯৮১ প্রকাশিত অশোকো রাইনার পুস্তকে আমার অভিসনর্দ্ধ সম্পর্কে অনেক বিষয়ের সমর্থন ও অনুমোদন করেছে এবং এখন বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমের প্রধান ধারায় মিশিয়ে দিবে, বইটি থেকে একটি মাত্র বিষয় বাদ পড়েছে তা হল সরাসরি নিয়মানুযায়ী বিবৃত করা অথবা প্রসারিত করা, উপমহাদেশে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ অর্জন করা। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অশোকা রায়না তাঁর পুস্তকে উপস্থাপন করেছে যে, ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে পরপোকারের ইচ্ছায় সাহায্য করেছে যারা বহুদিন ধরে অযথা গর্বিত সম্পর্কহীন শাসক দ্বারা নীপিড়িত, "র" এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে বাধ্য করেছিল মানবতার কারণ বিবেচনার কথা বলে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা যারা অবহেলা ও উৎপীড়িত সেখানে হস্তক্ষেপ করতে কিন্তু তিনি শুধুমাত্র ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ভারতের সম্প্রসারণশীল নীতি একটি না বলা দুঃখদায়ক কাহিনী। রায়নার বর্ণনার

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিক গঠন প্রশংসনীয়। এটা বলা প্রয়োজন যে, "স্পেশিয়াল অপারেশন বাংলাদেশ" পুস্তকের ৬ষ্ঠ অধ্যায় থেকে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করেছে।

বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ সম্ভবত ১ বছর পূর্ব থেকেই আরম্ভ হয়, সত্যিকার শক্তি প্রয়োগ প্রস্তুতি তখন চলছিল। এমনকি যখন মুক্তিবাহিনীর বিষয়ে সারা বিশ্ব এক ঝলক জানতে পারল, তখন অনেকেই "র" এর জড়িত হওয়ার বিষয়ে সতর্ক ছিল না। এ সময়ের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের শক্তি প্রয়োগের কাজ তাঁরা সম্পূর্ণ করে ফেলে। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা গেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। "র" মুক্তি বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে যখন তাঁরা একটি ভয়ঙ্কর শক্তি গঠন করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট তথ্য পৌঁছাল।

ঘটনাসমূহের একটি পরিষ্কার সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপনের চূড়ান্তভাবে তৈরি করে "র" এর নিকট উপস্থাপন করা হলে বাংলাদেশের ও পি,ত্র,স এর নিকট আনা হয়। ১৯৬৮ সালে গঠনের পর গোয়েন্দাদের কার্যকলাপ একজনকে অবশ্যই সমালোচনার দৃষ্টিতে আগাগোড়া মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু এর মধ্যেই ভারতের শক্তি প্রয়োগকারীদের সঙ্গে "মুজিব পন্থীদের বিরোধীদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হয়। ১৯৬২-১৯৬৩ সালে আগরতলায় এক সভা আহ্বান করা হয়। সভাটি ছিল আই,বি বিদেশ ডেস্ক আপারেটিভস এবং মুজিব বিরোধীদের মধ্যে।

আগরতলা সভার পর (সত্যিকার অর্থে তা ছিল সংকরান নায়ার'স নম ডি গুয়েরি) মুজিব বিরোধী এবং ভারতীয় গোয়েন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান সমন্বয়কারী কর্ণেল মেননকে ইঙ্গিত করেছিল, ঐ দল আন্দোলনকে ক্রমে ক্রমে তীব্রতর করতে উৎকণ্ঠিত কর্ণেল মেনন তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে, তাঁর মতে এ ধরনের বাস্তব কাজ করার সময় এখনও হয় নি। তাদের যে পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছিল তা অর্ধেক হয়েছে, কাজেই কাজ হবেনা। কর্ণেল মেনন সঠিকই বলেছিল তাঁরা "বন্দুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল"। তাঁরা ঢাকায় ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলস এর অস্ত্রাগার আক্রমণ করল, কিন্তু প্রাথমিক আন্দোলন ব্যর্থ হল, আসলে তাদের সম্পূর্ণ বিপর্যয় হল, যা কিনা কর্ণেল মেনন অনুমান করেছিল। কয়েক মাস পর ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি সরকার ষড়যন্ত্র মামলার গ্রেফতারকৃত ২৮জন আসামীর নাম প্রচার করেছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগে বলা হয়েছিল যে, ভারত সরকারের সাহায্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিব ও তার সহযোগিরা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। ১২ দিন পর শেখ মুজিবুর রহমানকে জড়িত করে তাকেই ১নং আসামী বানানো হয়। এই মামলাই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত।

১৯৮১ সালে বইটি সত্যিকারভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর এ মামলার চূড়ান্ত এবং স্থিরকৃত বিষয় ষড়যন্ত্রের কথা প্রমাণিত হয়। তখন কিছু কারণে এই উন্মোচন ভারতের কোন বিশ্বস্ত, অধিকার প্রাপ্ত লোক দ্বারা বাংলাদেশী কোন ইতিহাসবিদ, সাংবাদিক অথবা রাজনৈতিক বিশ্লেষক অথবা মতামত প্রদানকারীর নিকট পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়। কারণগুলো অনুসন্ধান করা প্রয়োজন এ ষড়যন্ত্রের পিছনে সত্য ঘটনা প্রমাণিত, চুপ থাকার অর্থ ষড়যন্ত্রটি ঠিকই হয়েছিল, এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ঐতিহাসিক সমঝোতায় ভুল ছিল। একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুলের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের বিঘ্ন

www.pathagar.com

ঘটে ছিল। ফলে অখন্ড ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ত করার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন, আমাদের নেতারা অত্যন্ত জোড়ালো ভাবে সতর্ক না হলে তাদেরকে অখণ্ড ভারতের দাবীর সঙ্গে জড়িত করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের বাকী পৃষ্ঠাগুলোতে বর্ণিত অজ্ঞাত অবস্থা থেকে উদ্ধার প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা যা এখনও বিতর্কিত এবং আমাদের ১৯৭১ সালের যুদ্ধের আবির্ভাব ঘটিয়েছে তা জানা আজ আশ্চর্য জনক নয়।

"র" এর কর্মকতৎপরতার পদক্ষেপঃ "র" পূর্ব পাকিস্তানে গোপন কার্যকলাপ চালানোর জন্য সাহায্য করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ঐ বছর ১০০ গোয়েন্দা কাজ আরম্ভ করে। "র" সীমান্ত এলাকা দিয়ে গোয়েন্দাদের গুপ্ত দপ্তর চালু করে কর্ণেল মেনন এর সফর স্থানীয় গুপ্তদপ্তরের প্রধানকে নির্বাচন করা সাহায্য করে। অতি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কর্ণেল এম,এ,জি ওসমানি নেতা ছিলেন, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর শফিউল্লাহ এবং আবদুল কাদের সিদ্দীকী, যিনি টাইগার সিদ্দীকি নামে খ্যাত, পরবর্তীতে তিনিই মুক্তিবাহিনী এবং "র" এর সক্রিয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন।

"র" এর মূল নির্ণয়েঃ "র" এর অনুমোদিত প্রতিনিধিরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সর্বত্র ক্রমে ক্রমে অলক্ষিতে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করে (ডিসেম্বর ১৯৭০)। "র" এর পক্ষে যত প্রতিনিধি ছিল তার দ্বিগুণ প্রতিনিধি কাজ শুরু করে এবং কার্যাবলীর প্রায় শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে। একজন জৈষ্ঠ্য পাকিস্তানী কর্মকর্তা যিনি বাংলাদেশের উদ্ভব পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করছিলেন তিনি "র" এর সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছিলেন এবং ঢাকার পতনের একদিন পূর্বে তিনি চলে যান।

(এ) রাজনৈতিক সংলাপ ব্যর্থ হওয়ার কয়েক ঘন্টা পূর্বে কিছু সদস্য ভারত চলে যাওয়র জন্য রাজি হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে তাজউদ্দিন আহমদ সঙ্গে আরও কয়েকজন যারা রাতারাতি "র" লোকদের সঙ্গে মুজিব নগর চলে যায় এবং নির্বাসিত সরকার গঠন করে। অন্যান্যদের মধ্যে তাজউদ্দিনের সঙ্গে যারা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নজরুল ইসলাম, মোশতাক আহম্মদ ও সিলেটের আজাদ এবং চারজন ছাত্র নেতা ফজুলল হক মনি, তোফায়েল আহমদ, আব্দুর রাজ্জাক এবং সিরাজুল আলম খান।

মার্চ মাসে অবস্থার অবনতি ঘটে এবং টিক্কা খান তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ২৫ মার্চ আঘাত করে। ১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল কলকাতায় প্রদেশিক বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়।

ইন্দো-পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত এলাকায় "র" এর আশ্রয়স্থল গুলি ছিল অভয়ারণ্য এবং বিশাল সীমান্ত এলাকা থেকে মুক্তি ফৌজকে তাড়িয়ে দেয়া পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য খুব কঠিন ছিল। মুক্তি ফৌজই মুক্তিবাহিনী হিসেবে পরিচিত। দু' মাস পর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রে খবর আসে- "র" মুক্তিবাহিনীকে কার্যকর যোদ্ধা হিসেবে তৈরি করার ভূমিকা পালন করে।

www.pathagar.com

শেষ বাক্যটি বিশ বছর পরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে এখনও পর্যন্ত মনোযোগের সহিত পুঙ্খানুপঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হয় নি এবং লেখকরা যুদ্ধের কাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলতে যত্নবান হয়েছেন। পুস্তকের এ অংশটি কি ব্যাখ্যা করে তা হল ভারত সরকার, সৈন্যবাহিনী ও গোয়েন্দা প্রতিনিধি যারা পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত ছিল তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগতভাবে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ গোষ্ঠীর ১৯৬০ সালে প্রথম থেকে সংকট আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত সম্পর্ক বজায় ছিল। এ সম্পর্ক স্বাধীনতার পরও অবিরত ছিল। অশোকা রায়না খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে, কারণ "র" এর প্রতিনিধিরা বলেছিল যে, তাঁরা সদ্য নূতন দেশটির উন্নয়নের উপর নজর রেখেছিল, পরবর্তীতে ভারতীয় সামরিক বাহিনী সহজেই চলে গেছে।

মুজিব বাহিনী গঠন
(Formation of the Mujib Bahini))

এটা খুব অন্যায় করা হবে যদি এই অংশে প্রধান স্থপতি ও শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য "র" এর নীলনক্সার এবং বাংলাদেশে যাদের ষড়যন্ত্রে দুটি দেশের মধ্যে তিক্ততাও সন্দেহ বৃদ্ধি পেয়েছে তার কারণ হলো দেশটি জাতীয়তাবাদী ও সাংবিধানিকভাবে ১৯৭৫ সাল থেকে ভাবধারায় মোড়নেয় এবং ভারতের অভিভাবকত্ব ও নির্দেশনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা তুচ্ছ হয়ে যায়। তাঁর নাম ছিল রামেশ্বর নাথ কাত্ত, তিনি "র" এবং নিরাপত্তার মহাপরিচালক উভয়টির প্রধান ছিলেন। বিশেষ করে ইন্দ্রিরা গান্ধী তাঁকে এই পদে নিয়োগ দিয়ে ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি তাঁর পিতা জওহার লাল নেহেরু দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে কাওকে জানতেন। অখণ্ড ভারতের দর্শন তিনি খুব ভালভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবেন বলে অগাধ বিশ্বাস করে। ফলে তাকে দু'জন প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের ক্রিরাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি এবং বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কাত্তই উপযুক্ত, যারা পরিশ্রমী এবং "র" এর উদ্দেশ্যে উৎসাহিত তাদের নিয়োগ দেয়া হয়। আশোকা রায়না এ সম্পর্কে একটি প্রয়োজনীয় মতামত দিয়েছেন, কিন্তু তাদের নিকট লিখিত প্রতিশ্রুতি এবং উৎসাহ জ্ঞাপন করতে ব্যর্থ হয়। যার ফলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতের সামরিক বাহিনী এবং গোয়েন্দাদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। এটি অত্যন্ত পরিচিত সমিতি। কদাচিৎ ভারতের বুদ্ধিজীবী সমাজের বড় ভাই রূপে প্রতিনিধিত্ব করে। কোন সময় খেয়ালী হিসেবে, কোন সময় হঠকারী জাতি অথবা আনুগত্য কুকুরের প্রভূ, অথবা বাংলাদেশে দাসত্ব সতর্কতার সাথে এড়িয়ে গেছে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া দু দেশের অশান্ত সম্পর্কের মধ্যে আজও অনুভব করা যাচ্ছে।

বিবাদ সৃষ্টিকারী নীতির সমর্থকরাও যুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সন্দেহও ষড়যন্ত্র দ্বারা স্বাধীনতা উত্তোরকালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক, ভূ-দৃশ্যের উপর তাৎক্ষণিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তিনিই সেই কাত্ত যিনি আওয়ামী লীগের কিছু যুবককে বিশেষ পদ মর্যাদা দিয়ে ছিলেন যারা নিজেদেরকে দিয়েই মুজিব বাহিনী গঠন করেছিল এবং মনে করেছিল এক মাত্র তাঁরাই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।

www.pathagar.com

এই যুবক নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত এবং প্রিয় ছিল শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমদ, সিরাজুল ইসলাম খান এবং আবদুর রাজ্জাক। শেখ মুজিবের প্রতি এরা ছিল একনিষ্ঠ সমর্থক এবং বাধ্যগত। তাঁরা তাঁদের বাহিনীকে মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত না করে পৃথকভাবে নামকরণ করতে অগ্রাধিকার দেয়া এবং মুক্তিবাহিনী থেকে মুজিব বাহিনীতে যোগ দেয়ার আহ্বান জানায় কারণ অনেকেই তাঁদের রাজনৈতিক শত্রুছিল। মুজিব বাহিনীর সদস্যদের পৃথক সংগঠন করা হয় এবং মেজর জেনারেল এস, এ উবান এর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উবান পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে এই বিশেষ নির্বাচিত গেরিলাদের দুঃসাহসী শোষণের কথা ফাঁস করে দিয়ে একটি বই লিখেছেন। এটার একমাত্র কারণ মুজিবের অনুগত "র" এর বিশেষ হস্তক্ষেপ তাঁদেরকে অসৎও অবৈধ বানানোর পটভূমি তৈরি করেছিল, ঠিক স্বাধীনতার পর পরই তাঁরা তাঁদের বাহিনীকে পরিবর্তন করে অতিশয় ঘৃণীত ও তীব্র সমালোচিত রক্ষী বাহিনী গঠন করে।

তারপর মেজর জেনারেল উবান কোথাও উল্লেখ করেন নি যে তিনি "র" এর চালক হিসেবে কাজ করেছেন। এবং তার উর্ধ্বস্থ কর্মকর্তা মিঃ আর, এন কাওকে তিনি মন্ত্রী পরিষদ সচিবালয়ের একজন সচিব হিসেবে ভুলক্রমে বর্ণনা করেছে। এখন আমরা ভারতীয় গোয়েন্দা প্রক্রিয়াতে তাদের প্রকৃত পদ কি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সতর্ক এবং যুদ্ধে তাঁদের প্রকৃত ভূমিকা কি? ঘটনা হল ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষে মেজর জেনারেল উবান এর উপস্থিতিতে চিত্তরঞ্জন সুতার এর বাসায় বসে মুজিব বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমেদ, সিরাজুল ইসলাম খান, এবং আব্দুর রাজ্জাক।

সন্দেহাতীতভাবে সভায় উপস্থিত সকলের মনকে প্রভাবিত করে এবং এ সভা "র" এর তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ডঃ কালীদাস বৈদ্য এবং অভিজ্ঞ ভারতীয় গোয়েন্দাদের দ্বারা সঠিকভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করা হয়। এ সমস্ত সভাগুলোতে "র" এর প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিঃসন্দেহে চিত্তরঞ্জন সুতার ছিলেন। যিনি শেখ মুজিবের প্রতিনিধিকে ভারতে চাকুরিতে নিয়োগ দিয়ে ছিলেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য জৈষ্ঠ্য সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ ছিল। তিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশকে ভারতের অংশ বানানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদে আধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং মুজিব বাহিনীর চূড়ান্ত ভূমিকা পালনের জন্য এসেছিল কিন্তু ১৯৭৫ সালে অবস্থা বেগতিক হয়ে গেলে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়।

অতএব এটা পরিষ্কার যে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে মুজিব বাহিনীকে অবাধভাবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেয়ার এবং আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে সকল দিক দিয়ে অনৈক্যের ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার হিংসা ছড়িয়ে দিয়ে ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন আহ্বান করার কোন ইচ্ছা কাও এর ছিল না। মেজর জেনারেল উবান এর পুস্তকে এগুলোর কোন কিছুই উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো পাঠকদেরকে এবং নীতিগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান ও ফলাফলের ব্যাপারে ইতিহাসবিদদেরকে বিজড়িত করা প্রয়োজন। এ সময়েই রাজনৈতিক এবং সামরিক আদেশের শৃঙ্খলা ভীষণভাবে ভেঙ্গে

www.pathagar.com

পড়ে কারণ মুজিব বাহিনী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এর আদেশ অগ্রাহ্য করে অথবা কর্ণেল ওসমানি এবং জেনারেল আরোবার নিয়ন্ত্রণে ছিল না।

কাণ্ড ভোজবাজির কৌশল বেছে নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ও দলের সঙ্গে ভারতের অনিশ্চয়তার কথা প্রতিফলিত করে শেখ মুজিব এর খোঁজ খবর নিতে গিয়ে বলেন তিনি কি জীবিত না মৃত। যুদ্ধের পর পাকিস্তান থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ভারত সরকার তাঁকে এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গীদের পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেন এবং তাঁর বদান্যতার প্রস্তাব তৎপরতার সাথে গ্রহণ করে মেজর জেনারেল উবানকে ব্যক্তিগত উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। কতটুকু প্রভাব থাকলে একজন অনুমান করতে পারে যে, মেজর জেনারেল উবান মুজিববাদের আদর্শ রূপদানের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে মানশ্চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাবিত করান এবং বাংলাদেশের রচয়িতার পদ আরোপ করে নৃশংসতা বিদ্যমানের শপথ করে বাকশাল নাম দিয়ে (একক দলের শাসন এবং শেখ মুজিব আজীবন রাষ্ট্রপতি) আবির্ভূত করা হয় যা রক্ষী বাহিনী দ্বারা কার্যকরি এবং উভয়টি উবান এর কপট বাহ্যরূপের উপর করা হয়। তাঁর বই লেখার উদ্দেশ্য সন্দেহ জনক, শেষ ভাষণ যেখানে তিনি উপাখ্যান প্রস্তুত করেছেন এবং শেখ মুজিব বিধি নিয়মের গন্ডি অস্বীকার করে অবচেতন বর্ণনা রূপায়িত করে ভারতের আদর্শকে উন্নীত করায় ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক ধর্মীয় এবং ভৌগোলক ফলাফল বিকৃত করেছে।

ভারতের প্রতি শেখ মুজিব এর অন্ধ অনুভূতি ভীষণভাবে রঞ্জিত করেছে তার সীমাহীন এবং বিচার শক্তিহীন উচ্চাকাঙ্খার পরিণাম ফল এবং বাংলাদেশের প্রতি অবশ্যম্ভাবী বিশ্বাসঘাতকতা শুধুমাত্র অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে সফল করেছে এবং ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে রক্ষার বাসনা বন্ধকরে দেয়া হয় এবং ক্রমান্বয়ে ১৯৭৫ সালের মধ্যে সমর্থন প্রত্যাহার করা হয়। এই আদর্শ নিয়ে মিলিয়নস যোদ্ধা যুদ্ধ করে নি এবং ১৯৭১ সালে জীবন উৎসর্গ করে নি, সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নিজস্ব স্বার্থের দর্শন নিয়ে বাংলাদেশ জাতি হিসেবে বাঁচতে পারত, ভারতের হস্তক্ষেপ এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রভাব বিস্তারই আকাঙ্ক্ষিক বিপত্তির কারণ হয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্য স্বদুঃখে আপরাধ স্বীকারকারী (Apologists for Sheikh Mujibur Rahman)

এ প্রবন্ধের প্রথম অংশে অনেক বই এর আলোচনা করা হয়েছে এবং সেগুলোতে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের বিষয়ে পরস্পর বিরোধী মতামত উপস্থাপিত হয়েছে, এই শাখাতে আমি চষ্টা করব একই সদৃশ শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনী থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপরোল্লিখিত বিশ্লেষণ ও আলোচনা থেকে বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করব। আশা করি যে পাঠক দৃঢ়তা ও আচরণে প্রশংসা করবে। বাংলাদেশের জন্য ভারতের প্রয়োজনীয় সবকিছু সঠিকভাবে প্রয়োগ করে আমাদের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে এবং কিভাবে আমাদের স্থানীয় লেখকগণ উদ্যমী হয়ে তির্যকভাবে প্রচারণা চালিয়েছে এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দলগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা ও জাতীয় কর্তব্যাদি সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা দিয়েছে।

www.pathagar.com

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে, লেখকরা নিজেদেরকে অনুগ্রহ ভাজন ও লোকরঞ্জনবাদী অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রচলনে মেতে উঠেছে এবং লেখকের বই প্রীতি ভারতের স্বার্থের সুবিধা গ্রহণ, যা শেখ মুজিব এর জীবনকে মোহনীয় করে তুলবে এবং, পৌরাণিক কার্যকলাপের মত জীবন্ত বর্ণনাদান করতে ষড়যন্ত্র অথবা ব্যক্তিগত উচ্ছাকাঙ্ক্ষা দ্বারা এ রকম একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যেমন এস, এ, করিম এর শেখ মুজিব ট্রাম্প এন্ড ট্রাজেডি (২০০৫) তে যে ভাবে লিখেছেন যার উদ্দেশ্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো যা শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব এবং পূর্ব বাঙালিদের সামাজিক ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক চাপ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে অবদান রেখেছে। অধিকাংশ লেখকদের জন্য প্রচুর গুরুত্ব এবং অনেকের সীমিত যোগ্যতার বাহিরে ও প্রচেষ্টার থাকবে। মিঃ এস, এ করিম এর প্রচেষ্টা নিরাশ হয়ে চলে গেছেন, যার প্রচুর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কোলকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্, ১৯৫০ সাল থেকে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস এবং বাংলাদেশ সদস্য সত্ত্বেও এখন মাত্র প্রয়োজন বইটির একটি অধ্যায় নির্দিষ্ট করে মিথ্যা উদ্ভাবনের প্রমাণ দেয়া যা স্ববিরোধীতা থেকে শেখ মুজিবকে বাঁচানোর জন্য অবলম্বনকারী হয়েছিল, এবং ফলে সাধারণ জনগণের নিন্দা ও কলঙ্কিত করা হয়েছে যা অনুসরণ যোগ্য। ৩৪ অধ্যায়ে মুক্তি বাহিনী সম্পর্কে লেখক নিম্নে খণ্ডিত করে এমন ব্যাপক ও অখ্যাতিকর বর্ণনা দিয়েছেন।

একটি কারণ হল মুক্তিবাহিনী এবং ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভবনাপূর্ণ যুবকদের দ্বারা সমান্তরাল বাহিনী গঠন মুজিব বাহিনী ফলে গুনগত মান নিম্নমুখী হয়েছে। এটা ছিল শেখ মনির গুপ্তভাবে পরিচালিত সংগঠন। ভারতে পৌঁছার পর থেকে চিত্তরঞ্জন সুতার এর মধ্যস্থতায় ভারতীয় গোয়েন্দাদের সেবার সঙ্গে শেখ মনি কার্যকরভাবে "র" এর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলেন। "র" এর প্রধান কাত্তকে যুক্তি পরামর্শ দিয়ে রাজি করাতে সমর্থ হয়। অস্থায়ী সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে পৃথক একটি শক্তি থাকলে ভাল হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল (অবঃ) উবান তিব্বতের উদ্বাস্তুদের দ্বারা গঠিত গেরিলা বাহিনীকে না দেখার ভান করেন, তাদেরকে মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়। মুজিব বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখে নি। এদেরকে মুক্তিযুদ্ধের পর সম্ভাব্য কাজে লাগানোর জন্য রাখা হয়েছিল।

অশোকা রায়না এবং মেজর জেনারেল এস,এস উবান এর নিকট থেকে জানতে পারি যে, "র" মুক্তিবাহিনী এবং মুজিব বাহিনীকে প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র দিয়ে সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত ছিল। মুজিব বাহিনী যুদ্ধের সময় কোন কর্মশক্তি প্রয়োগ করে নি। একথা সত্য নয়, কারণ চট্টগ্রাম এবং ঢাকা অঞ্চলে সৈন্য বাহিনীর ক্রিয়াকলাপে মুজিব বাহিনী অংশ গ্রহণ করেছিল। তাঁর এই মিথ্যা বলার কারণ হতে পারে ভারত এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালীন ছত্রভঙ্গ ও দুঃখ ময় পরিণতির অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়া এবং শেখ ফজলুল হক মনি এবং তাঁর দলকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহারে দোষী করা।

লেখক সরাসরি উবান এর নাম বলেছেন, তিনি মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনী সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তা তিনি কিভাবে সংগ্রহ করেছেন, এবং 'র' এর সাথে

www.pathagar.com

যোগাযোগ করেছেন, এ সমস্ত বিষয়গুলো উবানের এবং রায়নার পুস্তকে পাওয়া যায়, কিন্তু উৎসের কোন উল্লেখ নেই। এ ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি সার্বজনীনভাবে সারাবিশ্বের লেখকদের, বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে ন্যায়পারায়ণতা এবং সততার অভাব বলে বিবেচিত হয় এবং বিশেষ করে যারা গুরুত্বপূর্ণ ও পন্ডিত্যপূর্ণ শিক্ষায় জড়িত।

আকর্ষণীয় বৈশিষ্ঠ্যসূচক চিত্র লেখা যায় যেমনটি মিঃ এস,এস করিম লিখেছেন, শেখ ফজলুল হক মনিকে লালন পালন এবং যুদ্ধের পূর্বে ও পরে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক তাদেরকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে একজনকে যৌক্তিক এবং ঐতিহাসিক হাস্যকর অবস্থার দিকে প্ররোচিত করে এবং এখন যে উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে তাঁর সঙ্গে কোন মিল নেই। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের পূর্বে ছয় দফা দাবীর বিতর্ক নিয়ে শেখ মুজিবকে মনি সমর্থণ করেছে এবং যারা স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এক দফা দাবী করেছে তাদের বিরুদ্ধে "র" এর পরিকল্পনার সঙ্গে যথাযথ যুক্ত করে পরের ইচ্ছাপূরণে সম্মত বাহিনী গঠন করতে বলা হয় এবং তাদেরকে কমিউনিস্ট, সমাজতান্ত্রি এবং অন্যান্য বামপন্থীদেরকে পরিহার করার জন্য ব্যবহার করা হবে এই বিশ্বাস ভারতের প্রতি হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে তাই ছিল, মুক্তিবাহিনী বিশ্বাস করত সদস্যদের এক বিরাট অংশ তাদের প্রতি বামপন্থীদের কারণে সহানুভূতিশীল এবং তাঁরা হয়তো স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ সরকারের কার্যকলাপে ভারতের হস্তক্ষেপকে সহ্য করবে না। মুজিববাহিনী পাক সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে এ উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় নি, বরং ভারতে শত্রু মিজোদের, কমিউনিস্ট এবং সমাজতান্ত্রিকদেরকে শেষ করে দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হবে।

পরবর্তীতে দু'টি দলের উল্লেখ করে বলা যায় যে, পরিচিত সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা গুপ্ত হত্যা করে সমূলে উৎপাটন করার নীতি অর্জন করা যায় (হত্যাকারীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীতে রাজাকার অথবা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে একযোগে নিঃসঙ্গভাবে নৃশংস কাজ করেছে কিন্তু যতটুকু অনুমান হয় ততটুকু নয়)। ১৯৭১ সালে আগস্ট মাসে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধের মঞ্চে যখন মুজিব বাহিনীর প্রবেশ ঘটে তখন থেকে হত্যাকাণ্ড শুরু হয় এবং বামপন্থী সহানুভূতি সম্পন্ন সমব্যাথি যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে তাদেরকে কার্যক্রমে জড়িত করা হয় এবং স্বপন চৌধুরীই প্রথম বাংলাদেশকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র করার প্রস্তাব করেছিল। "র" এর নির্দেশনা অনুযায়ী মনি গ্রুপ মুক্তি যোদ্ধাদেরকে ও রেহাই দেয় নি এমনকি মুজিব বাহিনীর কোন সদস্যকে বামপন্থী মনে হলে তাকেও তিনি ছেড়ে দেন নি।

স্বাধীনতার পর কমিউনিষ্ট সমাজতান্ত্রিক এবং বামপন্থী চিন্তাকীরা মনির ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার নিজের বাসনা চরিতার্থ করার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং আওয়ামী যুব লীগ নামে বেসরকারী সামরিক বাহিনী গঠন করে এবং অবিরতভাবে নির্বাচিত লোকদের হত্যার কাজ চলতে থাকে এবং এক সময় এলোপাথাড়ি তারতম্যহীনভাবে চলে। বামপন্থীদের বিরুদ্ধে এ অনুভূতি ও অবিশ্বাসের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমান অংশ নেয় এবং গর্বের সঙ্গে দাবী করে অভিমত ব্যক্ত করে যে, শীঘ্রই পূর্ব পাকিস্তান থেকে বামপন্থীদের উৎক্ষাত করা হবে। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বলে মনশ্চক্ষুর সামনে আসবে তাদেরকে তিনি গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর অবর্তমানে বাংলাদেশ স্বাধীনতা

www.pathagar.com

অর্জন করেছে এটা তিনি বিশ্বাস করতেন না, এবং তিনি কখনও সত্যিকার ভাবে যারা যুদ্ধ করেছে তাদের কষ্টের কথা বা অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চান নি। তুলনামূলকভাবে এস,এস করিম এই সময়কালে শেখ মুজিব কে উপস্থাপন করতে চেয়েছে, পাকিস্তান থেকে (লন্ডন হয়ে) ফিরে আসার পর দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ থাকার কারণে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ও স্বাভাবিকভাবে কোনকিছু চিন্তা করতে না পারার কারণে সহজেই তিনি শেখ মনির দ্বারা এবং কিছু পরিমাণে ভারত সরকারের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু সাধারণত এই কাহিনীর সঙ্গে বিজড়িত ঘটনা গভীরভাবে ভেদ করাকে ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রাহ্য করেছেন। বিশেষ করে মুজিব এর ব্যক্তিত্বে খারাপ দিকটি যা তিনি কৈফিয়ত দ্বারা দোষ প্রশমিত করে অপ্রিয় উক্তির পরিবর্তে কমল কমল উক্তি প্রয়োগ করতেন।

একই রকম পরিবর্তনশীল, স্ববিরোধীতা এবং প্রতারণা মূলক বর্ণনা এস,এ করিম এর পুস্তকে অধ্যায় ৩৪, ৩৯ এবং ৪০ এ দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। ভারত সম্পর্কে তথ্য প্রদান জ্ঞাপন অত্যন্ত মর্মান্তিক, অধ্যায় ৪২ এ অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্ক, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে রক্ষী বাহিনীর প্রতি লক্ষ্য, অধ্যায় ৫০, ভারতের সাথে আত্মরক্ষার কৌশল সংশোধন করা যা শুধুমাত্র সীমান্ত এলাকার বিতর্কের দোষ থেকে ভারতকে মুক্তিদান, পরিবেষ্টিত বিষয়, এবং ফারাক্কা বাঁধ, অধ্যায় ৫৪, মুজিব এর দ্বিতীয় বিপ্লব বাকশাল কর্তৃক গণতন্ত্রের অপমাণ, অধ্যায় ৫৫ সিরাজ সিকদার এর ঘটনা যা দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করে না এমন বিষয়ে অনুসন্ধান, ক্ষমা এবং অপরাধের অনুষ্ঠান কালে অন্যত্র থাকার অজুহাতে রেহাই পাওয়ার দাবি বামপন্থী নেতার হত্যাকাণ্ডে শেখ মুজিবের জড়িত থাকা, এবং অধ্যায় ৫৭ মুজিব এর শাসনকালের সমাপ্তি, যেখানে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখের গুপ্ত হত্যা চক্রান্তের পূর্ণ বিবরণ, অপর পক্ষে পূর্ববর্তী ৩ বছরের সকল ভুলের জন্য মনিকে দোষী করা। "র" তাদের সকল দুষ্কার্যের জন্য মনিকে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং ভারত সরকারের এই সত্যিকার ঘটনা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে এবং তাদের কথার প্রতিনিধিত্ব করেছে মনির চেতনার বহিরাংশ।

শেখ মুজিব পরবর্তীতে রক্ষীবাহিনীকে ব্যবহার করে এবং শেখ মনি ছিল উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে একজন, যাদেরকে বামপন্থী হত্যা চক্রান্তের পূর্ণ বিবরণ, অপর পক্ষে পূর্ববর্তী ৩ বছরের সকল ভুল, ভুলের জন্য মনিকে দোষী করা। "র" তাদের সকল দুষ্কার্যের জন্য মনিকে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে, এবং ভারত সরকারের এই সত্যিকার ঘটনা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে এবং তাদের কথার প্রতিনিধিত্ব করেছে মনির চেতনার বহিরাংশ।

www.pathagar.com

অধ্যায়- ৪

শত্রুহস্তে সমর্পণ-বাংলাদেশ
(The Betrayal of Bangladesh)

শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাস করেছিলেন যে ভারত বাস্তবিকপক্ষেই প্রায় দু'দশক প্রতি পালন ও সহযোগিতা এবং ১৯৭১ সালে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করে তাঁকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। ভারত বলতে পারে যে তাঁর জন্য প্রচুর বিনিয়োগ করেছে এবং প্রধান মন্ত্রীর পদ ও বাংলাদেশের নেতৃত্ব রাখার জন্য দখলকারীর কাজ করেছে। এই ঔদ্বত্য ও নিজকে শক্তিশালী মনে করার কারণে সম্ভবত, তাকে খাড়া গিরিচূড়ার ন্যায় ক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া আরম্ভ করে এবং স্বেচ্ছাচারি ও রাজনৈতিক ভীতিপ্রদর্শন কারীতে পরিণত করে। এই পর্যায়ে দেশের ইতিহাসে ব্যাপকভাবে প্রমানিত দলিল, বহু লেখক দ্বারা গুণগত মান যাচাই করে এর গভীরতা, এবং প্রভাবিত না হয়ে সাধারণভাবে বর্ণনার মধ্যে কি কি বাদ পড়েছে, ভারত কি ভূমিকা পালন করেছে, স্ববিরোধী দলিলের প্রারম্ভিক অংশ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক চরিত্রের উচ্চাঙ্ক্ষা এবং নূতন জাতির প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিত্বকে কিভাবে বসানো হয়েছে তা অনুধাবন করা।

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে 'র' এর আগ্রহে অপরিহার্য ভাবে মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়েছে। অন্যান্য উপদলগুলোকে ভারতীয় গোয়েন্দা ও সামরিক কর্মকর্তারা ডেকে এনে আভাস দিয়েছে তাঁরা সব কিছুই একই সঙ্গে করার জন্য প্রস্তুত নয়, প্রাথমিকভাবে তারা নিশ্চিত হবে যে প্রতিদ্বন্দ্বি রাজনৈতিক উপদলগুলোর অভ্যন্তরীণ বিতর্কিত বিষয় বিচার করে নিরপেক্ষভাবে বাছাই করে ভারতীয় সহযোগিতা দেয়া হবে। উদ্দেশ্য সাধনার্থে সকল দলগুলো কখনও যুক্ত হতে পারবে না এটাই হলো প্রধান পরিণতি, এমন একদিন আসবে যখন তাদের দাতাদের বিরুদ্ধে যাবে, এবং নতুন দিল্লী থেকে স্বনির্ভর ব্যবস্থা পত্র দেয়া হবে। ঘটনা থেকে বর্ণনা করা যায় যে শেখ মুজিবের প্রতি তাদের কোন ভালবাসা অথবা আসক্তি নেই, (১) তাঁকে শুধুমাত্র তাঁদের বৃহৎ রাজনৈতিক দাবা খেলার নগন্য সহকারী মনে করেছে অখণ্ডভারত সৃষ্টি করার বাসনায়। ডঃ কালীদাস বৈদ্যর লিখিত পুস্তক "মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব" ২০০৫ সালে প্রকাশিত, তাকে খুব অপরিণত ও রুক্ষ বলে অভিহিত করেছেন। এটা এরকমও হতে পারে যে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ সতর্ক ছিল যে ভারত এত কিছু সহ্য করছে কারণ, এ দেশের জন্য যে সেবা ভারত দিয়েছে, যদি বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। পরিবর্তে ভারতীয় সৈন্যদের মাধ্যমে ক্ষমতা তাদের হাতে দেয়া হবে ।

সম্ভবতঃ এটা ও হতে পারে যে শেখ মুজিব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বাধীনতা ঘোষণার বিরোধিতা করছিল (ডঃ কালীদাস বৈদ্য) যুক্তি দেখিয়েছে যে শেখ বাস্তবিকপক্ষে কখনও স্বাধীনতা ঘোষণা করে নি। তিনি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে শয়তানদের সঙ্গে যুক্তি না করে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে দরকষাকষি করা অনেক

www.pathagar.com

ভাল। যাই হোক একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তা প্রত্যাহার করা অসাধ্য, কারণ তিনি পাকিস্তানে বন্দি থাকায় তা হয়েছে, বিরোধী পন্থার মধ্যে একটি অবলম্বন– সম্পূর্ণ ভারতের দিকে চলে আসেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ডঃ কালীদাস বৈদ্য, সম্ভবত শেখ মুজিবের বিশ্বস্থতার মূল্যহ্রাস করে দেখেছেন, ক্ষমতা গ্রহণের পরবর্তীতে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাতে বাংলাদেশের উপর ভারতের কঠোর হস্তে দমন নীতি বৃদ্ধি পেতে থাকে যেগুলো তাঁর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রত্যাহার করেন। অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য যে ডঃ বৈদ্য এখনও দু:খিত যে শেখ মুজিব ভারতের স্বার্থের জন্য কোন কিছু করে নি বরং বাংলাদেশে মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা তিনি উপেক্ষা করেছেন, এবং সাধারণ মানুষের অনুভূতি অধিকন্ত সীমা লঙ্ঘন করাকে সহ্য করবে না যা কিনা পাল্টা বিদ্রোহকে উৎসাতি করতে পারে।

কারও এটা চিন্তা করে ভুল করা উচিত নয় যে ড: বৈদ্য নিরপেক্ষ ও বাস্তব দর্শক যার ভেঙ্গে দেয়ার শক্তি নেই অথবা রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য সত্য তথ্য ও মতামতকে মিথ্যা বলে প্রমান করা এবং উদ্দেশ্য সাধনে সুবিধা জনক করা। একইভাবে বলা যায় কেউ বলতে পারবে না যে শেখ মুজিব এর মধ্যে দৃঢ়তা এবং আদর্শগতভাবে দায়িত্ব স্বীকার করার কোন কিছু ছিল না কারণ সত্যিকারভাবে ঘটনাসমূহ তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল না এবং কৌশলে সত্যকে এড়িয়ে দরকষাকষি করে তার মনপুত ও অহংভাবপূর্ণতার জন্য প্রস্তুত থাকতেন।

বাংলাদেশ অথবা পূর্ব বঙ্গ
(Bangladesh or East Bengal)

"বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব" সম্পর্কে বিসদ সমালোচনা ভিতরের রহস্য ভেদ করতে সাহায্য করবে, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ভারতের উদ্দেশ্য অখণ্ডভারত সম্পর্কে পাঠকদের মনের সন্দেহ পরিষ্কার করে দিবে যা পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করেছে এমন একজন ভারতীয়র নিকট অভিপ্রেত ও যুক্তি সংগত ঘটনা। পরবর্তীতে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক চরম দুর্দসাগ্রস্ত সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি দৃষ্টি পড়লে লক্ষ্য করা যাবে যে সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবতার ক্ষেত্রে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রের এলাকার নিরাপত্তার ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তথাপি "বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব" পুস্তকে অখণ্ডভারতের উক্তি দেখা যায় নি, এটা না বলা উচ্ছাকাঙ্ক্ষা ভিতরে লুকায়িত, (২) স্বাধীন পূর্ববঙ্গ কম হুমকিপূর্ণ কর্মসূচি নয়, যদি কৃতকার্য হয়। তবে ভারতের জন্য অপ্রতিরোধীয় চূড়ান্ত পুরস্কার-যুক্তকরণ "বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব" এই আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ডঃ কালীদাস বৈদ্য 'বাংলা সেনা নামে একটি সংস্থার প্রধান, বাংলাদেশ কর্তৃক বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে এবং কোলকাতা থেকে এর কার্যক্রম চলে। বাংলাদেশ সরকার (৩) ভারত সরকারকে অনুরোধ করেছে এ উপাদলটির কার্যক্রম বন্ধ করতে, কিন্তু করা হয় নি, ফলে ডঃ কালীদাস বৈদ্যর পরিচিতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের অভিসন্ধির মুখপত্র হিসেবে কাজ করছে, পবিত্রা কুমার ঘোষ, সাংবাদিক এবং দৈনিক বর্তমান এর উপদেষ্টা তার পুস্তকের মুখবন্ধে লিখতে তাঁর শক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, লেখক আমাদেরকে নিশ্চিত করেছে যে ডঃ বৈদ্য ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের একজন কাছের সহযোগী, ও গুরুভার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যার ফলে তাঁকে এই ঐতিহাসিক সময়ে পরিবর্তনের স্বাক্ষী থাকার জন্য অনুমোদন করেন। একজন অভ্যন্তরীণ লোক হিসেবে সুবিধাজনক অবস্থান থেকে অবলোকন করেছেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে তিনি শেখ মুজিবুর রহমান এর সঙ্গে পরিচিত হন। বইতে যে তথ্য দেয়া হয়েছে, কুমার ঘোষের মতানুযায়ী ডঃ বৈদ্য এর নিকট থেকেই তথ্য এসছে, তিনি বিষয়গুলো প্রচার করেছেন, ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্বে প্রচার হয় নি। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এটা পাঠকদের জন্য, তাঁরা সিদ্ধান্ত নিবে, কি বিষয়, কতটুকু পুস্তকে লেখা হয়েছে, সেগুলো বাস্তবতামূলক সত্য, অধিকার সম্পন্ন, বিশ্বাসযোগ্য, কোন অংশটি ইচ্চাকৃতভাবে প্রভাবিত হয়েছে, বিভ্রান্তিকর, প্রতারণামূলক, না কি উদ্দেশ্য সাধনের মতামত।

মূল বিষয় সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক আবেদন "রাইটারস ওয়ার্ড" শাখাতে উত্থাপন করা প্রয়োজন, লেখক তাঁর উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে লিখেছেন এবং পুস্তকের অবশিষ্টাংশে এখনকার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যথানুপাতিক বিকৃত করা হবে। ডঃ বৈদ্যের মতামত অনুযয়ী এটা হওয়ার কারণ হল পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের কারণে যা তাঁকে শত্রু বানিয়েছে এবং তাতে তিনি পাকিস্তান এর ভাঙ্গন চেয়েছেন। একবার পাকিস্তান থেকে পূবাংশের অর্ধেক ভেঙ্গে গেলে, এই পৃথক অংশটি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের দ্বারা উৎসাহিত হবে, তাতে স্বাধীন পূর্ব বঙ্গ' অর্জিত হবে। এই ভূমিকা থেকে তিনি বাস্তবাদী পূর্ববঙ্গ পরিকল্পনা করেন, কিন্তু ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে 'পূর্ববঙ্গ' হল না, তাই তিনি নিরাশ হয়ে পড়েন। এই দোষ তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের উপর চাপিয়ে দেন এবং দাবী করেন যে মুজিবুর রহমান ইসলামী জাতীয়তাবাদকে প্রণোদিত করেন, এটা তার জন্য যন্ত্রনাপূর্ণ চিহ্ন হিসেবে থেকে যায়, কিন্তু লেখক উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে 'পূর্ববঙ্গ' এর নিজস্ব চিন্তাধারা হিন্দু জাতীয়বাদকে অগ্রসরমান করবে, যা হবে বাংলাদেশের সংখ্যাঘরিষ্ঠ মুসলমানদের বিনিময়ে।

এ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে "আওয়ার ওয়ার্ক বিগিন ইন ঢাকা", আমরা বলেছিলাম যে লেখক চিত্ররঞ্জন সুতার এবং নিরোদ মজুমদার ১৯৫১ সালের শেষে ঢাকায় প্রবেশ করেছে। আমরা জেনেছি যে "শেখ মুজিব ট্রাম্প এন্ড ট্রাজেডি" (২০০৫) চিত্ররঞ্জন সুতার 'র' এর কর্মী এবং লেখক অনিচ্ছাকৃত ভাবে 'র' এর প্রতিনিধি হিসেবে তার পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছেন। তখন কালীদাস (ডঃ বৈদ্য) ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন, ছাত্র সমাজের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে এবং অন্য দু'জন সোসিয়েল ওয়েল ফেয়ার ভর্তি হয়ে জনসংযোগের কাজ করতে আরম্ভ করেন। আমরা জানতে পারি যে এই তিন জনের কাজের আবরণের পিছনে গুপ্ত কাজ হচ্ছে। "শেখ মুজিবুর রহমান" সম্পর্কে লিখিত অধ্যায়ে এখবর উল্লেখ করা হয়েছে, লেখক "শেখ মুজিবের প্রতি তার বিদ্ধেষ প্রকাশ করেছেন, যিনি এইচ, এস সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সখ্যতা লাভ করেন এবং ১৯৪৬ সালের কুখ্যাত কোলকাতার দাঙ্গায় সক্রিয় অংশ গ্রহণকরে সন্দেহ পূর্ণ সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত হন যা মুছে ফেলা অসাধ্য। ১৯৬৪ সালে কোলকাতা দাঙ্গার বহু পূর্বে চিত্তরঞ্জন সুতার (চিত্তবাবু) এবং কালীদাস শেখ

www.pathagar.com

মুজিবকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে পূর্ব বঙ্গের সকল হিন্দু তাঁকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণে "পূর্ব বঙ্গের স্বশাসন আন্দোলনে সমর্থন দিবে। ফয়েজ আহমেদ এবং অশোকা রায়নার পুস্তকে এই কঠোর তথ্যের বর্ণনা পাওয়া যাবে যা উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে একটি তৃতীয় পন্থায় শেখ মুজিবকে জড়িয়ে ষড়যন্ত্র করা হয়।

এই যোগাযোগ শেখ মুজিবের সঙ্গে সমঝোতা এবং ছয় দফাভিত্তিক স্বশাসনের দাবীকে আরও শক্তিশালী করবে যা পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে লেখ হয়েছে. বিশেষভাবে "আগরতলা ষড়যন্ত্র" সম্পর্কে লিখিত অধ্যায়ে আরও বেশী শক্তিশালী সমর্থন এর সম্পর্কে বলা হয়েছে। শেখ মুজিব এবং চিত্তবাবু উভয়েই বন্দি হিসেবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলেন, সেখানে কালীদাসের শ্বশুর ঢাকা আই, জি (প্রিজন) এর অফিসে হেড এ্যাসিসটেন্ট ছিলেন, তিনি এই দু'জনের সভা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। যা কিছু আলোচনা হত তা চিত্রবাবুর মাধ্যমে কালীদাসকে জানানো হত, কালীদাস চিকিৎসক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। শেখ মুজিব কোন জরুরি খবর বাহিরে পাঠালে কালীদাসকে জানানো হত, তখন কালীদাস মনোনীত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দিত। এভাবে গোপন খবরাদি কালীদাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হত। এ অধ্যায়টি শুধু 'র' এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগেরই বিষয় লিখে নি বরং ১৯৬৩-৬৭ সালে ষড়যন্ত্র করার কাজ যখন চলছিল সেই সময়ের কার্যপ্রণালী এবং বিচারের সময়ে অনিশ্চিত অবস্থা যখন সন্দেহজনক ব্যক্তিদের উপর সর্বোচ্চ কড়া নজর তখনকার কার্য প্রণালীর বিবরণ পাওয়া যাবে।

"পিপল্‌স ফ্রিডম পার্টি" সম্পর্কে যে অধ্যায়টি আছে সেখানে পরোক্ষভাবে অখণ্ড ভারতের কথা এবং ১৯৭০ সালে একাজের জন্য রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়েছিল যার গোপন কর্মসূচি ছিল স্বাধীন পূর্ববঙ্গ। পূর্ব পাকিস্তান এর পুনঃনামকরণ বাংলাদেশ হয়েছে, কালীদাস অযৌক্তিক ভাবে বর্ণনা করেছেন যে তাঁর দল পশ্চিম বাংলা দখল করে নিয়েছে। এটা এমন এক সময়ে যখন কালীদাস আবিষ্কার করলেন যে হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব রয়েছে। বাংলাদেশ নামকরণ হওয়ার ফলে এর ভাষা বাংলা ভাষার দাবী যৌক্তিক অতএব, অসংযত এবং বাধাহীন অধিকার আছে, পশ্চিম বাংলা বা ভারত এর বিরুদ্ধে কিছু বলে নি। এত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এ বিপদকে উপলব্ধি করতে সক্ষম নই তা নয়, ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় একটি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে গ্রহণ করে, ঠিক যেমনটি বিবেচিত ছিল, একটি অংশ সম্পূর্ণ হতে পারে না, কালীদাসের মতে ভারতে রাজনৈতিক নেতাদের নিকট সেই সময়ে উপলব্ধির ক্ষমতা অথবা সমঝোতার বিষয় ছিল না। সব কিছু একত্র করে এ অধ্যায়ে একটি রাজনৈতিক পরিকল্পনার সমর্থনের কথা বলা হয়েছে আর তা হল 'পূর্ব বঙ্গের সৃষ্টি করে অখণ্ড ভারতের সঙ্গে একত্র করে ফেলবে অথবা আত্মভূত করে ফেলা। এটার কারণ হল কালীদাস এবং চিত্তবাবুর প্রাথমিক উদ্দেশ্যই ছিল শেখ মুজিব "পূর্ব বঙ্গের" স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। চিত্তবাবু রাজি হয়েছিল যে শেখ মুজিবের প্রতিনিধি হয়ে কোলকাতায় আসবে এবং গোপনে পূর্ব বঙ্গ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে, খুব সর্তকতার সাথে সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রচারণা এমনভাবে চালাবে যে শেখ মুজিব বিশ্বাসঘাতকতা করলে যেন সংগ্রাম থেমে না যায় এবং নিজস্ব গতিতে চলতে থাকবে।

www.pathagar.com

পাকিস্তানী সেনা অপরাধ দমনের জন্য মাঠে নামে এবং শেখ মুজিব স্বইচ্ছায় সেনাদের নিকট ধরা দেন, তখনই সন্দেহের উদ্রেক হয় কারণ তিনি সহজেই আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে নিয়ে ভারতে পালিয়ে চলে আসতে পারতেন।

কালীদাস প্রশ্ন উত্থাপনা করেছেন যে 'র' এর সহযোগিতায় আওয়ামী লীগের যে সমস্ত সদস্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে এসেছিল তাঁদের নিকট শেখ মুজিব কেন স্বাধীনতা ঘোষণা পত্র দেন নি, শেখ মুজিবের ক্ষেত্রে এটা একটি ত্রুটি, শেখ মুজিবের পরিবর্তে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন– এ বিষয়টি এখনও বিতর্কিত এবং কালীদাসই সম্ভবত প্রথম ভারতীয় এ বিষয়টি প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করছেন। শেখ মুজিবের ব্যবহারের কারণে তিনি বন্দি থাকার সময় পাকিস্তানীদের সঙ্গে মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বহিঃবিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া এ কাজ করা সঙ্কট জনক ও অসুবিধা ছিল। অপাতত দৃষ্টিতে অতি ন্যায় সঙ্গত উত্তর হল কি তার চরিত্রের উপযুক্ত ও উত্তম দিক তিনি যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট কোন কিছুর দায়িত্ব নিতে আগ্রহী ছিলেন না। কারণ তিনি ব্যক্তিগত জয় অর্জনের কাছাকাছি ছিলেন। তিনি স্বাধীনতার ব্যপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না, যে পর্যন্ত না তিনি ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলে তিনি আস্বস্ত হতে পারেন নি যে স্বাধীন বাংলাদেশের হিন্দু 'র' এর সমর্থকরা বিরোধিতা করতে পারে অথবা পূর্ববঙ্গ যা হলে সমগ্র জাতি তাঁর বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। সবচেয়ে ভাল নীতি হলে চুপ থাকা যতক্ষণ না পাকিস্তানের সাথে ক্ষমতা নিয়ে আপোষ মীমাংসা হয় এবং ক্ষমতা হস্তান্তর না করে অথবা ভারতীয় সেনাবাহিনী স্বাধীন বাংলাদেশ অথবা পূর্ব বঙ্গ হিসেবে বিজয় অর্জন না করে এবং তাঁকে ছাড়াই সহজেই মীমাংসা হয় ততক্ষণ এড়িয়ে থাকাই ভাল।

আলোচ্য এ বিষয় থেকে অগ্রসররত কালীদাস অন্য লেখকদের বেলায় ও একই পথ অনুরবণ করেছেন যা এবিষয়ে ভারতের 'র' স্থিতিস্থান থেকে বিচ্যুতি হয় নি। সিরাজুল হিসলাম খান, আবদুর রজ্জাক, শেখ মনি এবং তোফায়েল আহমেদ মুজিবের উত্থানের জন্য অনেক বেশী অবদান রেখেছেন। কোলকাতায় এই চার ছাত্র নেতা এবং চিত্তবাবু নিয়মিতভাবে আবদুর রব সেরনিয়াবাত এবং পরে শেখ কামাল ও জামাল এর সঙ্গে সভা করতেন। এ অধ্যায়ে কালীদাস কোলকাতায় সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার কথা বলে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ফিরে তাঁর প্রিয় জুজুবুড়ি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের অবশিষ্টাংশ এর দিকে ফিরে যান, কিন্তু তিনি তাঁর যুক্তির সঙ্গে জোড়া অশুভ লক্ষণ যুক্ত করেন। তিনি বিবরণ দেন যে হিন্দু উদ্ধাস্তু যারা এখন ভারতে আছেন তাঁরা একটি মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠা করবে এবং সেখানে বসবাস করবে। একবার বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেলে মাতৃভূমির দাবী উঠবে এবং খুব সংযত এবং অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে প্রচার চলবে। কালীদাসের ভাষ্য অনুযায়ী ভারত সরকার এ বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে এবং এ কাজে গোপনভাবে হিন্দু মাতৃভূমির জন্য প্রচার চলবে। এটার অর্থ হলে বাংলাদেশকে খণ্ড করে অন্য রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হবে অথবা ভারতের সন্নিহিত এলাকাগুলো দিয়ে হিন্দুদের তথাকথিত মাতৃভূমি সৃষ্টি করা হবে যার ভিত্তি হবে ইসরায়েলর সাদৃশ্য যাকে কালীদাস সরাসরি স্বীকার করে নি কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ঐরকম। বহুদিক নিয়ে একই ধরনের কলহ, বিবাদ যুক্তি যেমনটি জইনিষ্টরা

www.pathagar.com

প্যালেস্টানিয়ানদের জন্য তৈরি করেছে, কিন্তু হিন্দুদের মাতৃভূমির জন্য ভারত বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূমি না পেলে বসতি করবে না, তা হবে প্রাকৃতিকভাবে সাদৃশ্য, যদি অল্প পরিমাণ পাওয়া যায় তা দেশের অর্থনৈতিক তাড়িত। অখণ্ড ভারত সরাসরি অর্জন করা যাবে না, অর্জন করতে হবে ঘোরানো পথে পূর্ববঙ্গ অথবা একটি হিন্দু মাতৃভূমির দাবী দিয়ে।

পোল্যান্ড, চেকোস্লাভাকিয়া এবং অট্রিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করে তাদের জার্মান জাতিগত জনগণের উপর অত্যাচারের কথা বলে হিটলার আক্রমণ করেছিল, ঠিক অন্যরূপভাবে একই কায়দায় কালীদাস পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে। হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার কথা উঠাচ্ছে। হিন্দু মাতৃভূমির ধারণাকে অগ্রসর করাচ্ছে এবং তাদেরকে রক্ষার জন্য দেশ রক্ষা বাহিনী তৈরি করছে। কারণ দেখিয়ে হিন্দু যুবকদের গুপ্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছিল এবং মুক্তিবাহিনী থেকে পৃথক একটি বাঁছাই করা বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। এই নূতন বাহিনী হবে অসাম্প্রদায়িক এবং স্বাধীনতার পর তাঁরা নিয়মিত সামরিক বাহিনীর মত দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এই বাহিনীর সদস্যরা রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্বাহী ক্ষমতা নিয়ন্ত্রনে জড়িত থাকবে এবং সাম্প্রদায়িক মুক্তিবাহিনীর ক্ষমতা ও শক্তি খর্ব করে দিবে চিত্তবাবু মুজিব বাহিনীর নাম প্রস্তাব করে এবং উপরোল্লিখিত ছাত্র নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হবে। ছাত্র নেতারা নিজেরা বিশ্বাস করে যে যদি ভারত সরকার মুজিব বাহিনীকে সক্রিয় করার অনুমতি প্রদান করে এবং যদি তারা আলোচনা অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম হয় তবে রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতা তাদের হাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসবে। ফলে নতুন সরকার কখনও নূতন দিল্লীর ইচ্ছা থেকে পৃথক হতে পারবে না। চিত্তবাবু এবং কালীদাস একমত হয়ে দুই বাহিনীকে খারাপ ধারণা ও হিংসার মধ্যে চালাতে চায় যাতে বিতর্কিত ও তিক্ত হয়ে উঠলে পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার নিজেই একত্র করে দিবে। যদি পৃথক হিন্দু বাহিনী গঠন করতে সক্ষম হওয়া যায় তবে প্রতিযোগী দলের সঙ্গে সমতা রক্ষা করা যাবে এবং পরবর্তীতে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অগ্রগমন করা যাবে। হিন্দু বাহিনীর প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে গোপন থাকবে যা শুধু ভারতে প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনী প্রধান জানতে পারবে। 'র' এর প্রত্যক্ষ উৎসাহে স্পষ্টভাবে বাংলাদেশ সরকার এবং তাদের সামরিক প্রধানকে বিশ্বাস করা যাবে না, হিন্দু বাহিনীর প্রস্তার তাৎক্ষণিকভাবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং মেজর জেনারেল এস.এস. উবান এর তত্ত্বাবধানে মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ আরম্ভ হয়।

"পাকিস্তান ভারত যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং যুদ্ধ" শিরোনামে লিখিত এই পুস্তকে শেষ অধ্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের এবং ছাত্র নেতাদের যারা কোলকাতায় ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নিন্দা ও অবিযোগ করা হয়েছে। সংকটের চূড়ান্ত পর্যায়ে অথবা ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পরপরই (কালীদাস সঠিকভাবে তারিখ উল্লেখ করেন নাই। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম (তখন পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্তি পান নি) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে নিম্নেবর্ণিত সাত দফা অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ

www.pathagar.com

(১) যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে এবং স্বীকার করা হয়েছে তাঁরা যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনা করতে এবং অন্যান্যদেরকে চাকরি থেকে বাদ দিতে হবে।

(২) ভারত এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যুক্তভাবে গঠন করা হবে অথবা যৌথ বাহিনী থাকবে যার প্রধান হবে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান। একমাত্র তাঁরই নির্দেশে যুদ্ধ চলবে।

(৩) বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সামরিক বাহিনী থাকবে না।

(৪) তৎপরিবর্তে আধা সামরিক বাহিনী গঠন করে অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করবে।

(৫) দু'দেশের মধ্যে একটি খোলাবাজার থাকবে এবং সময়ে সময়ে পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে বাণিজ্যের নীতিগুলো ঠিক করতে হবে।

(৬) ভারতীয় সেনাবাহিনী অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বাংলাদেশে থাকবে।

(৭) দু' দেশের মধ্যে আলোচনার উপর ভিত্তি করে ভারত এবং বাংলাদেশের একই বৈদেশিক নীতি থাকবে।

এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর কালীদাস ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশ দখল করতে বলে। আত্মসমর্পণ এবং সার্বভৌমত্বের ক্ষমতার দলিল যেটি পরাজিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে জেনারের নিয়াজী স্বাক্ষর করেন এবং জেনারেল অরোর নিকট হস্তান্তর করেন সেখানে কোথাও উল্লেখ করা হয় নি যে পরবর্তীতে এই দলিল বাংলাদেশে সরকাররের নিকট দিতে হবে। কালীদাস সম্ভবত পরোক্ষভাবে প্রকাশ করতে চাচ্ছেন যে উক্ত দলিল এখনও ভারতের হাতে এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের আইনগত অধিকার এখন ও ভারতের কাছেই রয়েছে। কালীদাস আরোও বলেছেন আজও পর্যন্ত সরকার পৃথকভাবে অথবা যৌথভাবে সাত দফা চুক্তির দলিল বাতিল করে নি।

এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ৭ দফা চুক্তির দলিল স্বাক্ষর করার সময় আন্ত র্জাতিক স্বীকৃত প্রাপ্ত বাংলাদেশের সরকারের নিজস্ব ভৌগোলিক সীমারেখা, সেনাবাহিনী অথবা স্বীকৃত কোন রাষ্ট্রীয় চিহ্ন নিয়ে কেহ উপস্থিত ছিল না। বাংলাদেশের জনগণের আইনসম্মত কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলনা, তখন বাংলাদেশ বলে কোন রাষ্ট্র ছিল না যে নাগরিক হওয়া যায়, অথবা প্রতিনিধিত্ব করা যায়, এ দলিল স্বাক্ষরের সময় কোলকাতাভিক্তিক মুজিব নগর সরকার ছিল এবং সাধারণত বুঝা যায় তা ছিল পরিবর্তন কালের অধিকার প্রাপ্ত সরকার, দ্বিভাগ বিশিষ্ট চুক্তি ক্ষতিকর মমার্থ হল এর সকল আরোপিত শর্ত যথাযথভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে অথবা সরকার বিদ্যমান না থাকার কারণে বাস্তবায়ন হয় নি, তাঁরা পুতুলের মত শুধু কেন্দ্রীয় সরকার নতুন দিল্লীর নির্দেশনা পালন করত যা রাষ্ট্রসুলভ ভিত্তিকে অস্বীকার করার সামিল। চুক্তির দলিল না থাকায় অনেক সুচিন্তিত কার্য কালীদাস কর্তৃক এ সমস্ত অসস্থিপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে চলা এবং মিথ্যা প্রচার করে ভারতের জনগণের মনের মধ্যে পরীক্ষা দ্বারা সুরক্ষিত করতে চায় যে আইনগত পদমর্যাদা এবং চুক্তির কার্যকারিতা কাগজে কলমে পূর্ববঙ্গ অখণ্ডভারতের অন্য একটি প্রদেশ হিসেবে লিখা।

www.pathagar.com

অনুমানসিদ্ধভাবে চুক্তির (আমাদর নিকট কোন প্রমাণ নেই।) আইনগত ভিত্তি নেই কারণ কেবল চুক্তি শর্ত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রশাসনকে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মানতে কোন বাধ্য বাধকতা নেই। শেখ মুজিবুর রহমান যখন তাজউদ্দিন আহমেদ এর নিকট থেকে বিষয়টি জানতে পেরে আরোপিত শর্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জনের কথা বলেন। এগুলো সাধারণ মানুষের জ্ঞাত হওয়ার জন্য হতে পারে কারণ একদিক বিবেচনা করে (৪ দফা) তিনি দেখেছেন যে রক্ষী বাহিনী গঠনের জন্য অকথিত অনুমোদন দিয়েছেন। কিন্তু চুক্তিটি দুঃখজনকভাবে শেষ হয়েছে। চুক্তি অনুসরণযোগ্য শর্তসমূহ আইনগত সিদ্ধ ও কার্যকর করা হয় যখন শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের সাথে ২৫ বছরের বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশে ভারতের সেনাবাহিনীর উপস্থিতি মুক্ত করার শক্তি হিসেবে নয় বরং দখলদার শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলে আর্ন্তজাতিকভাবে উদ্বেগ প্রকাশের ফলে এই চুক্তি করা হয়। তাদের অবস্থানের সময় বৃদ্ধি পেতে থাকলে বাংলাদেশীদের মধ্যে শত্রুতা জন্মলাভ করতে পারে, কারণ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র, যুদ্ধ সরঞ্জাম, যন্ত্রাংশ, যন্ত্রপাতি এমনকি আসবাবপত্র এবং গৃহ সামগ্রী ট্রাক বহরে ভর্তি করে সীমান্তের ওপারে নিয়ে গেছে। শেখ মুজিবের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাংলাদেশে ভারতের সেনাবাহিনীর উপস্থিতির ফলে বহু দেশ বাংলাদেশের স্বীকৃতিকে স্থগিত করে রেখেছিল। এই কারণে শেখ মুজিব বাধ্য হয়েছিলেন অসৎ দরকষাকষির চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা বিবেচনা জন্য পেশ করে ছিলেন

ধারা-৪ ঃ উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ স্থাপনকারী দল নিয়মিতভাবে প্রধান আন্ত র্জাতিক সমস্যা যা উভয় দেশের স্বার্থকে প্রভাবিত করে সেগুলোর বিষয়ে সকল পর্যায়ে সভা, মতামতের আদানপ্রদান করার জন্য যোগাযোগ করে সমাধান করতে হবে।

ধারা-৫ ঃ উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ স্থাপনকারী দল পারস্পারিক সুবিধাদি অবিরতভাবে শক্তিশালী করণের উদ্দেশ্যে সকল দিকের সহযোগিতা দ্বারা অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কৌশলগত ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হবে। দু'টি দেশই পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাণিজ্য, পরিবহন এবং যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত সাহস, শক্তি পারস্পারিক স্বার্থ উপরন্তু জাতীয় নীতির উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন করতে হবে।

ধারা-৮ ঃ বিদ্যামান দু'দেশের বন্ধুত্বের বন্ধন অনুযায়ী উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগকারী দল শপথ ঘোষণা করবে যে উভয় দেশ কোন সামরিক মিত্রতায় যোগ দিবে না যা অন্যের বিরুদ্ধে যাবে।

প্রত্যেক উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ স্থাপনকারী দল সকল প্রকার আগ্রাসন থেকে বিরত থাকবে যাতে অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে না হয় এবং কাহারও ভৌগোলিক সীমারেখা ব্যবহার করবে না যাতে সামরিক বা নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে।

ধারা-৯ ঃ প্রত্যেক যোগাযোগ দল কোন তৃতীয় পক্ষকে কোন প্রকার সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবে, কোন সামরিক সঙ্কট অন্যের বিরুদ্ধে না যায়, যদি কোন দল আক্রান্ত হয় অথবা আক্রমণের হুমকি পায় তবে তৎক্ষণিক ভাবে উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগ দল পারস্পারিক আলোচনায় বসবে এবং প্রয়োজনীয় কার্যকরি পদক্ষেপ নিয়ে হুমকি ধ্বংস করে দিয়ে উভয় দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

www.pathagar.com

ধারা-১০ ঃ প্রত্যেক উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ দল শপথ নিয়ে ঘোষণা করবে যে বর্তমান চুক্তির শর্তানুযায়ী বেমানান এক বা একাধিক দেশের সঙ্গে গোপন তথ্য প্রকাশ্য কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দিবে না।

ধারা-১১ ঃ বর্তমান চুক্তি ২৫ বছরের জন্য করা হয়েছে এবং পারস্পারিক চুক্তির মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ দল কর্তৃক পুনঃনবায়নযোগ্য।

চুক্তিটি স্বাক্ষরের তারিখের দিন থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে। দু'সরকারের মধ্যে পূর্ব স্থিরকৃত চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় সৈন্য ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ প্রত্যাহার করা হয়, পরিবর্তে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে সংক্ষিপ্ত সফরে আসেন এবং ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ বন্ধুত্বের চুক্তির ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন।

দেখা গেছে সাত দফা দাবী যথার্থভাবে সকল দিক বিবেচনা করে চারটি ধারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে উপরে অবিকল প্রতিরূপ করা হয়েছে, ছয় দফা ছাড়া যা সংশোধন করে নূতনভাবে আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় আনা হয়েছে। কিন্তু বিধি সম্মতভাবে ধারা ৮-১০ যা উল্লেখ করা হয়েছে তা দেশের সার্বভৌমত্বের জাতীয় অখণ্ডতার জন্য অতীব ক্ষতিকর কারণ বাংলাদেশ যখন কঠোর নিয়মানুবর্তীভাবে সাফল্যের সঙ্গে চুক্তির শর্ত রক্ষা করছিল, ভারত তখন লঙ্ঘন করতে বেশী তৎপর হয়। ভারত কখনও মনে করে নি যে চুক্তির শর্ত তাকেও মানতে হবে। অতএব যে কোন ধরনের প্রচার অবজ্ঞা করে খুঁটিনাটি বিষয়ে অতি সতর্ক অথবা বিশ্বস্ততার সঙ্গে মূলনীতি পরীক্ষা করে থাকে। ভারত চুক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছে বন্ধুত্ব এবং সোহার্দ্য একটি অভিনব পৃথক অর্থ যে কোন অভিধানে পাওয়া যায়। তাদের স্বচ্ছতার অভাবের কারণে এ শব্দগুলোর পিছনে সত্যিকার অনুভূতি উপেক্ষিত হচ্ছে– যেমনটি দেখা গেছে এ পুস্তকের ৫ম অংশে। ফলে চুক্তি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ক্রমান্বয়ে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের মান সম্মান কমে যাচ্ছে এবং ১৯৯৭ সালে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ও পুনঃ নবায়ন করা হয় নি।

এটা জেনে রাখা ভাল যে ইউ,এস,এসআর এর সঙ্গে যে চুক্তি (ইন্দো-সোভিয়েট শান্তি, বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা চুক্তি, ৯ আগস্ট ১৯৭১) হয়েছে সেই চুক্তির বর্ণনা প্রায় একই, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল, বলা হয়েছে যে চুক্তিটি ২০ বছরের জন্য করা হয়েছে, মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর নবায়ন হতে থাকবে এবং কোন পক্ষ চুক্তি বাতিল করতে ইচ্ছা করলে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার বার মাস পূর্বে নোটিশ প্রদান করবে। চুক্তির শর্ত প্রতিপালিত হলে বলবৎ হবে এবং এই চুক্তি বলবৎ করার জন্য দলিল হস্তান্তরের তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং তা স্বাক্ষরের এক মাসের মধ্যে হবে। চুক্তির শর্তগলো উভয় দেশের সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা দিবে এবং অভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীর প্রতি প্রত্যেক দেশেরই সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। ইন্দো বাংলাদেশ বন্ধুত্ব চুক্তিতে এ ধরনের কোন শর্তই অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি যা কার্যকরি হলে শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতা প্রয়োগ করে এক তরফাভাবে ২০ বছরের জন্য চুক্তি করতে পারতেন তা হলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিকার রক্ষা করতে পারতেন এবং তাতে চুক্তি বাতিলের কোন সম্ভাবনা থাকত না। ১৯৭৩ সালের সংবিধানের সংশোধিত ধারা ৬৩ জাতির জন্য কল্যাণজনক এবং বিসদৃশ দেখে শেখ মুজিবুর রহমান চুক্তির শর্ত দেশের সংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে

www.pathagar.com

সমন্বয় করতে চেয়ে ছিলেন এবং এই সংশোধনি এখন অবৈধ সাত দফ চুক্তির এবং বিলুপ্ত ২৫ বছরের বন্ধুত্বের চুক্তির। যৎকিঞ্চিত অবশিষ্টাংশ মূলগত ধারা নিম্নরূপঃ

(১) যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না এবং গণপ্রজাতন্ত্র পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া কোন যুদ্ধে জড়াতে পারবে না।

(২) যদি সত্যিকারভাবে বাংলাদেশকে স্থল, নৌ ও আকাশ পথে আক্রমণ অত্যাসন্ন হয়, তবে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রপতি যে পদক্ষেপকে প্রয়োজনীয় বিবেচনা করবে তাই গ্রহণ করতে পারবেন এবং সংসদ তখন চলতে না থাকলে তিনি তাৎক্ষনিকভাবে সংসদ বর্জন করতে পারবেন।

(৩) সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন এই সংবিধান দ্বারা কিছুই বাতিল করা যাবে না, কারণ আইনে বলা হয়েছে দেশের জনগণের নিরাপত্তা, যুদ্ধের সময় দেশকে সংরক্ষণ এবং আক্রমণ ও সেনা বিদ্রোহ থেকে রক্ষা করতে হবে।

১৯৭৩ সালে সংবিধান (২য় সংশোধন) সংশোধন করে ধারা (২) এবং (৩) বিলুপ্ত করা হয়েছে যেখানে প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে এবং নির্বাহীদের জরুরি অবস্থায় সংসদের উপর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ যদি কোন বিদেশী সামরিক শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে সংসদের অনুমোদন ছাড়া যুদ্ধাদি চালাতে এমন কি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারবে না। তাহলে এর অর্থ হল ভারতীয় সেনাবাহিনী যদি শত্রুতা করে আগ্রসী উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করে তবে দেশকে অপেক্ষা করতে হবে, সংসদ আহবান করে হুমকি সম্পর্কে বাকবিতন্ডা করবে, তারপর সমুচিত প্রতিশোধ গ্রহন অথবা যুদ্ধের প্রস্ত াব অনুমোদন করতেও পারেন অথবা প্রত্যাখান করতে পারবেন। বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির কারণে প্রস্তাব সম্পাদন করতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে, এ সময়ে ভারতের কর্মকর্তারা সংসদের ভিতরে এসে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পূর্বে ভারতীয় সৈন্যরা পদব্রজে অতিক্রম করে অতি সহজে জয়লাভ করতে পারত কারণ তাঁরা অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল, পঞ্চম বাহিনীর নির্দেশের জন্য দেশের অভ্যন্তরেই অপেক্ষা করছিল, সেই অলক্ষুণে নাম রক্ষীবাহিনী।

রক্ষীবাহিনীর পতন এবং একনায়কতন্ত্র
(The Rakkhi Bahini and the Decline out Dictatorship)

পুস্তকের তৃতীয় অংশে আমরা দেখেছি এবং উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝতে পারি যে ভারত বাংলাদেশকে তাঁর খপ্পর থেকে যাতে বের হতে না পারে সেজন্য বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং ১৯৭২ সালে ক্ষমতায় আসার পর একাজে শেখ মুজিবুরেরই নিকটস্থ ব্যক্তিগণ সহযোগিতা করেছে। ১৯৭১ সালের ঘটনার পর পুলিশ বাহিনী বহুল পরিমাণে হ্রাস পায় এবং অপ্রতুল বাংলাদেশ রাইফেলস থাকার কারণে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে এ অজুহাতে অতি ব্যাপক ও ধ্বংসকর রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়।

বাহ্যতঃ প্রতীয়মান হয় মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটাছুটি করছে কারণ তাদের হাতে অস্ত্র রেখে বিদেশীরা চলে

www.pathagar.com

গেছে, ফলে চিন্তা করা হল এ ব্যাপারে কিছু করা দরকার, বাংলাদেশ সেবানাহিনীর হস্তক্ষেপকে তারা মিথ্যা অজুহাতে বাতিল করে দিল, কারণ দেখাল যে এরা অসংগঠিত এবং রাজনৈতিক অবিচুক্ষণ, ফলে জনগণের বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করতে পারবে না। আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করল 'যে প্রতিষ্ঠানগত সেনাবাহিনী ছাড়াই দেশ ভাল চলবে, মওদুদ আহমেদ এর মতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা উপযুক্ত, এমন বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে কাজেই স্থায়ী সৈন্য দল গঠনের প্রয়োজন নাই বাংলাদেশ বাহিরের কাহারও দ্বারা আক্রান্ত হলে ভারত তার পাশে থাকবে বলে ভরসা করা যায়, কিন্তু ভারত যদি আক্রমণ করে তাহলে কি ঘটবে সে বিষয়ে কখনও পরিষ্কারভাবে চিন্তা করা হয় নি।

রক্ষীবাহিনী অতি শীঘ্রই আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব থেকে সরে যায় এবং শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশে ভারতের ইচ্ছাকৃত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে নির্যাতন চালিয়ে রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়। রক্ষীবাহিনী অপরিহার্য রূপে 'র' এর উৎসাহিত বাহ্যমূর্তি, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বিশেষজ্ঞ ইকরাম সেহগল এর লেখনিতে একথা বলা হয়েছে এবং তিনি দাবী করেছেন যে আওয়ামী লীগ এবং ভারতের আনুগত্যের জন্য তাদের গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক অনুরূপ সেনাবাহিনী গঠন করে। রক্ষী বাহিনীর প্রধান ছিলেন ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান। যিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপটেন ছিলেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য বিখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন যা তাকে বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল, তিনি ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন যে বিষয়টি ইতোপূর্বে তৃতীয় অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কলহের প্রতি বাংলাদেশে খুব সীমিত সমর্থন ছিল, কিন্তু আমরা জানি মুজিব বাহিনীর একচেটিয়া ও বাছাই করা সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ ও সংগঠিত করার তদারকির জন্য 'র' বিশেষ ভূমিকা রেখেছে, বিভিন্ন কারণে ইকরাম সেহ্‌গলের মত একই সিদ্ধান্ত আমরাও গ্রহণ করতে পারি, বিশেষ করে যখন মেজর জেনারেল এস এস উবান রক্ষী বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সমস্ত অস্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করতে সহযোগিতা করছিলেন। আমরা এও জানি যে মুজিব বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যারা নিযুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে মেজর মালহোত্রা কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং তিনি রক্ষী বাহিনীতে প্রশিক্ষণের কাজ করেছেন। ভারতের একজন বিশ্লেষক সত্য স্বীকার করেছেন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার উদ্দেশ্যে বলেছেন কেন রক্ষী বাহিনীকে বাংলাদেশে ভারতের কর্তৃত্বের সংযোজিত অংশ হিসেবে গ্রাহ্য করছে। (এমন কি আমরা গুপ্ত সংস্থা 'র' সম্পর্কে পূর্ব থেকে সর্তক ছিলাম)। প্রকৃত ঘটনার রহস্য হল বাংলাদেশে সরকারের অনুরোধে ভারত এই আধা সামরিক বাহিনীকে সামরিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করেছে এবং তাঁরা অভিন্ন ধরনের পোশাক ব্যবহার করে যা সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীও একই পোশাক পরিধান করে, সকল অভিযোগ মৌলিকভাবে মওদুদ আহমেদ লিখিত পুস্তক "এরা অব শেখ মুজিবর রহমান (১৯৮৩) এ উপস্থাপন করেছেন। ভারতের লেখকগণ কোথাও চরম অসত্য বলে বাস্তব তথ্যমূলক দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করার পরিবর্তে অতি দুর্বল মত পোষণ করেছেন, বাংলাদেশে সরকারের অনুরোধে ভারতীয় ক্ষমতাশালী আমলারা যে সেবা প্রদান করেছেন সেই সেবাকে

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ, লুটতরাজ যুদ্ধকে ধ্বংস ইত্যাদি অতিরঞ্জিত ঘটনা বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

বেআইনিভাবে স্বয়ং নিযুক্ত বিশেষ জ্ঞানীর নিকট থেকে রক্ষী বাহিনীর জন্মতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ কথা একজন ভারতীয় লেখকের স্বীকারোক্তি এবং বিশেষ অধিকারের কথা সাধারণভাবেই আরও অধিক সন্দেহের উদ্রেক করে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই লোকেরা অপরিণতভাবে অভিমত ব্যক্ত করেছে যে বাহিরের কোন অবদান ছাড়া অভ্যন্তরীণভাবে শেখ মুজিবের প্রয়োজনে এই দল গঠন করা হয়েছিল। এই প্রতারণার দাবীর বিরদ্ধাচারণ করা হয়েছিল কারণ স্বাধীনতার পর পরই বৃহত্তর দলের অংশ কিছু বেসরকারি কর্মকর্তা ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত ভারতীয় উপদেষ্টা দল ঢাকায় আসে এবং বেসরকারি প্রশাসন পুনঃ চালাতে থাকে এবং আমরা পূর্বে জেনেছি যে মেজর জেনারেল এস এস উবান শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়ছিল, তাই রক্ষী বাহিনীর জন্য কোন অস্ত্রসস্ত্রের অনুরোধ করা হলে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রাদেশিক সরকারের মত এক জাতীয় অস্ত্র একত্রে কেন্দ্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দপ্তর থেকে এনে গণবিক্ষোভ ও জনরোষ দমণ করা হবে।

শেখ মুজিব সরকারের পতনের পর রক্ষীবাহিনী ভারতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল এবং বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানোর অভিপ্রায় গ্রহণ করেছিল এবং একটি সংসদীয় বাহিনী গঠনের জন্য 'র' এর সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি সমর্থন ও অনুমোদন লাভের চেষ্টা করা হয়েছিল। মওদুদ আহমেদ এর মতে প্রবাসী সরকারের কোলকাতায় অবস্থান কালেই রক্ষীবাহিনীর সূত্রপাত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং নূতন বানিহীর ভিত্তি নির্মাণ পরিকল্পনা রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল, বিশেষ করে সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে কাজ করার জন্য যা মুজিব ও ভারত সরকারের উভয়ের পৈশাচিক স্বার্থ রক্ষা করবে। স্বার্থের এই পারস্পারিক সম্পর্ক শৃঙ্খলাও রক্ষীবাহনীর শৃঙ্খলা এবং মনোবলের পরিণতি হবে, একবার এ বাহিনী কার্যক্ষেত্রে আসলে অসত্য বলা স্বাভাবিকভাবেই অঘোষিত কার্যাবলির কারণে বিরোধী দলের লোককে অতিরিক্ত বিচারগত হত্যা করা হলে আওমী লীগের বিরুদ্ধে যাবে। মনে মনে উপলব্ধির বিষয়টি দলগতভাবে ভারতের নিকট ক্রীতদাস তুল্য গোলামের মত আজ্ঞাবই আচরণ দেখিয়েছে, এ অবস্থা বাংলাদেশীরা অপমানজনক মনে করেছে এবং স্বাধীনতার অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে বলে মনে করে।

রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং নিয়োগ সম্পূর্ণ করার পর ভূতাপেক্ষ তারিখ থেকে বলবৎ হবে বলে আইনগত কাঠাম গঠন ঘোষণা করা হয় এবং কার্যাবলী আরম্ভ করা হয়। রক্ষীবাহিনীর আদেশটিতে যে ভাষ্য এবং শর্ত উত্থাপন করা হয়েছে তাতে গঠন প্রণালীর কথা খুব কম বলা হয়েছে অথবা রক্ষীবাহিনীর কার্যাবলী সংযমিত করা, কারণ তাদের নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য নেই আর শর্তে কোন কর্মসূচি নেই, শুধুমাত্র এতটুকু বলা হয়েছে, এরা রক্ষী বাহিনী শুধু মাত্র প্রয়োজন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য বেসরকারি প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করবে এবং সে ধরনের কাজই করবে যেভাবে সরকার তাদেরকে নির্দেশ দিবে। আইনগতভাবে যৎ সামান্য সংকীর্ণ স্থানে রক্ষীবাহিনী দেশের চতুর্দিকে প্রচণ্ড উত্তেজনাপূর্ণ আচরণ অর্জন করা হলে হত্যা, লুটতরাজ ও ধর্ষণে

www.pathagar.com

জড়িয়ে পড়বে। একজন লেখক ১৭ বছরের বালকের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন চারদিন অমানুষিক অত্যাচারের পর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। যখন সুপ্রিম কোর্ট এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং রক্ষীবাহিনীকে আইন বিরুদ্ধে কাজের মত তীব্র নিন্দা করে। আদলাত দেখতে পায় যে রক্ষী বাহিনীর কোন আচরণ বিধি নেই, আইনগত কার্য পরিচালনার নিয়ম নেই, গ্রেপ্তার বা জিজ্ঞাসাবাদের কোন এখতেযার নেই। পূর্ণ সাজসজ্জা লাগাম টানিয়া ধরার পরিবর্তে শেখ মুজিব তাঁর ঔদ্ধত্যপূর্ণ চারিত্রিক আচরণ অনুযায়ী এ সমস্ত ব্যাপারে আদালতের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে ছিড়ে খুলে ফেলে দেন।

শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ এবং রক্ষীবাহিনী অতিরিক্ত যা কিছু করছিল ভারত সরকারের পরোক্ষ সমর্থনে করা হতো কারণ এই ব্যক্তি, এই দল এবং এই দুর্বৃত্তরা যে কোন উপায়ে ক্ষমতায় থাকার জন্য কঠোর কৌশল অবলম্বন করে। এই অনুভূতিগুলো দু'জন লেখকের লেখায় প্রচারিত হয়, যারা তাদের বর্ণাঢ্য জীবনে বহুকাজ করেছেন তাঁরা কিছু সময় ভারতে গোয়েন্দা সংস্থায় ও কাজ করেছেন। জে এন দীক্ষিত গভীর দুঃখ করে বলেছেন রক্ষীবাহিনীরর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান আধাসরকারি বাহিনীকে ট্যাংক এবং ধর্ম আচ্ছাদিত কর্মচারীদের গাড়িসহ প্রেরণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু শেখ মুজিব তাঁর কথায় কান দেন নি। রক্ষীবাহিনী কত দ্রুতগতিতে দক্ষতার সঙ্গে তাদের অধিকারে রক্ষিত সামরিক গাড়ি ব্যবহার করে হত্যাও লুটতরাজের কাজ করে তা শুধু একজন ধারণা করতে পারে। মি. দীক্ষিত কখনও রক্ষী বাহিনীর বর্বর দুস্কার্যের কথা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেন নি এবং অন্যান্য লেখক যারা পুনবিবেচিত হয়েছেন একজন হলেন মেজর জেনারেল এস এস উবান যিনি তাদের দেশপ্রেমে চমৎকারিত্ব হন স্বাধীনতা এবং ভয়শূন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সময়ের প্রেক্ষিতে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে এখন আমরা যা কিছু জানতে পেরেছি তা বিশেষভাবে প্রতারণা পূর্ণ এবং ছলনা, প্রশিক্ষণ এবং সজ্জিতকরণ এবং কর্তব্য কাজে আইন প্রয়োগকারী বাহিনী হিসেবে সাহায্য করা হয়েছে।

উপরোল্লিখিত আলোচনা এবং বিশ্লেষণ থেকে ইঙ্গিত প্রদান করা অতিরঞ্জিত করা হবে না যে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী হিসেবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য একই সময়ে পূর্বাংশের প্রতিবেশী হয়ে বশ্যতা স্বীকার এবং অনুচ্চারিতভাবে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ভারতীয়দের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছিল। বাংলাদেশের মানুষ একবার এ অবস্থা অনুধাবন করতে পারলে এবং প্রকাশ পেলে জন বিক্ষোভ এবং বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ধ্বংসাত্মক অর্থনৈতিক নীতি সংকট করছে। এ ধরনের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেলে বৈপ্লবিক আবিষ্কারের অবস্থা অতি চূড়ান্ত এবং অতিশয় কঠোর ও নির্মম অবস্থা সূত্রপাত হলে রক্ষীবাহিনীর বর্বরতার অসম্পূণতা পূরণ হবে।

ক্ষমতার গ্রহণের পর বহু নূতন আইন এবং সংবিধান সংশোধন অনুমোদন হয়েছিল যার মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত ছিল রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ৫০, সংবিধান দ্বিতীয় সংশোধন আইন, ১৯৭৩, প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস্ (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্ট্রেশন) অধ্যাদেশ। স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট ১৯৭৪, জরুরি অবস্থা ঘোষণা

www.pathagar.com

আদেশ ১৯৭৪ এবং নিউজপেপার (অ্যানালমেন্ট অব ডিকলারেশন) অর্ডিন্যান্স। এগুলো করার অভিপ্রেত ছিল ভিন্নমত পোষণ কারীদেরকে পদলিত করে নির্মম বলিষ্টভাবে ধ্বংস করে দেয়া, এর মধ্যে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হল সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনী যা গণতন্ত্রের নীতিকে স্তব্ধ করে দিয়ে বাকশালী শাসনের আগমন ঘটিয়ে ছিল। চতুর্থ সংশোধনীতে কি জটিলতা আছে, তা সংবিধান বিশেষজ্ঞ জেষ্ঠ্য আইনজীবী মাহমুদুল ইসলাম ব্যাখ্যা করেছেন।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে সংবিধানের (চতুর্থ সংশোধনী) আইন, ১৯৭৫ অনুমোদিত হয়, সংবিধানকে মূলের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে অপেক্ষাকৃত অধিকতর অগ্রবর্তীর রূপান্তর করা হয়। রাষ্ট্রের মধ্যে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে বর্ণনা করে পার্ট ৬/এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটা ছিল গণতন্ত্রের কপালে পদাঘাত, সংবিধানের আর্টিকেল ১০২ (১) এ হাই কোর্টকে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল যা বাতিল করা হয়। সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে এমন একটি সরকারের রূপান্তর হয়, যা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারও নয় বরং সরকারকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বলা হবে কারণ রাষ্ট্রপতি শাসন সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। রাষ্ট্রপতি গনপ্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার সংরক্ষক, যা তিনি মনোনীত মন্ত্রীদের সহায়তায় রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করবেন। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেয়া হয়। অসৎ ব্যবহার এবং অযোগ্য বিবেচিত হলে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদেরকে চাকুরীচ্যুত করতে পারবেন। এ ব্যবস্থা সংসদীয় গনতন্ত্র এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে চালিত এবং পরিণতি হল রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী।

তারপর যা ঘটেছে তা বাংলাদেশের জন্য আকস্মিক কিছু নয়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সকালে দিনের প্রারম্ভে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবার বর্গ (দু'কন্যা তখন ইউরোপে ছিলেন তাদের ব্যতীত) সেই সঙ্গে শেখ ফজুল হক মনি এবং আব্দুর রব সেরনিয়াবাত এবং পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য নিহত হন।

অভিসম্বন্ধ:

১. আবু রুশদ- 'র' ইন বাংলাদেশ (২০০৫)
২. এস এ করিম- শেক মুজিব ট্রাম্প এন্ড ট্রাজেডি (২০০৫)
৩. মেজর জেনারেল এস এস উবান- ফ্যান্টম অব চিটাগাংঃ দি ফিফথ আর্মি ইন বাংলাদেশ (১৯৮৫)।
৪. উইলিয়াম এল সিরার- দি রাইজ এন্ড ফল অব দি থার্ড রিক (১৯৬০)।
৫. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন- দি চিটাগাং হিল ট্রাকসঃ এ ভিকটিম অব ইন্ডিয়ান রেফারেন্স (২০০৩)।
৬. মাসুদুল হক- 'র' এন্ড সি আই এ ইন দি লিবারেশন ওয়ার অব বাংলাদেশ (১৯৯১)
৭. মওদুদ আহমেদ- এরা অব শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৮৩)
৮. ইকরাম সেহগল- ইন্ডিয়া এন্ড স্টেট ট্যারোরিজম (১৯৯৯)
৯. ডঃ কালীদাস বৈদ্য- বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে অন্তরালে শেখ মুজিব (২০০৫)
১০. আব্দুল আউয়াল ঠাকুর- প্রতিরোধ দুর্বার (১৯৯৩)
১১. হাসনাত করিম- সোসাইটি ফর ন্যাশনাল স্টাডিজ (১৯৭৯)

www.pathagar.com

১২. ল্যাফটেন্ট কর্ণেল শরিফুল হক ডালিম- যা দেখেছি যা বুজেছি যা করেছি (২০০১)
১৩. এস্থনি মাসকারেন হাস- বাংলাদেশ এলেগেসি অব ব্লাড (১৯৮৬)
১৪. জে এন দীক্ষিত- লিবারেশন এন্ড বিয়ন্ড ঃ ইন্দোবাংলাদেশ রিলেশান্স (১৯৯৯)
১৫. মাহমুদুল ইসলাম- কনিস্টিটিউশনাল লে অব বাংলাদেশে (২০০২)

www.pathagar.com

পার্ট-৫/এ

পরবর্তীকালীন পরিণাম

(The Aftermath)

শেখ মুজিবের মৃত্যুতে ভারত গভীর জটিল অবস্থায় উপনীত হয়, অন্যদিকে একজন ঘৃণিত, কুৎসা রটনাকারী স্বৈরশাসকের পতন, রক্ষীবাহীনি নিষিদ্ধ, আইন ও সংবিধান সংশোধন আদেশ বাতিল হওয়াতে বাংলাদেশের মানুষ আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছে। ভারতের অভীষ্ঠ লক্ষ্য অখণ্ড ভরতের আদর্শ বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সকালবেলা সর্বনাশা বাঁধা দেয়া হয়েছে, কিন্তু এতে তাঁদের লক্ষ্য থেকে নিবৃত হয়নি বরং সমর্থকদের ঐকান্তিক সমর্থন ও উৎসাহ পায়, বাংলাদেশ এখন ভারতের গন্ডি থেকে পৃথক হয়ে নিজের পথ খুঁজে পেয়েছে। বাংলাদেশের অনেক মানুষ এ ধৃষ্টতা দেখানোর জন্য জীবন হারাবে, কিন্তু জাতি একটি আপরিবর্তনীয় প্রক্রিয়ায় ছিল যা ধ্বংসাত্মক কার্য, সন্ত্রাস দ্বারা এবং প্রচারের দ্বারা বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু প্রভাব মুক্তির উৎসাহ এবং জনগণের দৃঢ়তার কারণে নূতনভাবে স্বাধীনতা দেখার জন্য কোন সমঝোতা করা হয় নি। পাকিস্তানকে খণ্ডিত করার জন্য ভারতের পরিকল্পনা, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস সাধন করা সম্পর্কে ভারতের একজন বিশিষ্ট, অত্যন্ত সম্মানিত এবং পক্ষসমর্থক ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষক রবি রাখাই নিদারুন মর্মপীড়ানিয়ে উপমহাদেশকে পুনঃযুক্তকরণের আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন।

"আমার বিশ্বাস ভারত যথাসময়ের পূর্বে সুযোগ গ্রহণ করে পাকিস্তানকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে একত্র করে ফেলবে এবং স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের সীমারেখা যা ছিল তাই করে ফেলতে সক্ষম হবে"। আমার যুক্তি হল, ভারত যদি তার স্বাভাবিক সীমান্তরেখা সম্প্রসারণ না করতে পারে তবে কেন্দ্র হতে অপসারণ হয়ে জন্মগত প্রবণতা কর্তৃত্ব হারাবে এবং অভ্যন্তরীণভাবে দেশ খণ্ডখণ্ড হয়ে যাবে

গোলাযোগ আজ আমাদের কে সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, এটা কোন দুর্ঘটনা নয়, ভারত একবার ভাগ হয়ে গেলে খণ্ড খণ্ড হওয়ার প্রক্রিয়া আরম্ভ হবে এবং বিপরীত ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে।

ভারতের বর্তমান রাজ্যসমূহ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের স্বাভাবিক সীমারেখা। আমাদের ভূ-সুকৌশল একান্ত প্রয়োজন, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, নেপাল এবং ভুটান এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তিব্বত ও আফগানিস্তানকে শাসনাধীনে আনা। এটার জন্য ভারত মহাসাগরে তাদের দাবী থাকবে এবং ভারত মহাসাগর তাদেরই। এ কাজের জন্য সবকিছু করতে হবে, আমাদেরকে অব্যশই পুনঃঅঙ্গীভূতকরণের প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। শেষ পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া ছেড়ে দিলে পরিণাম আরও খারাপ হবে।

সম্পদ এবং শক্তির দিক দিয়ে ভারতের নিকট পাকিস্তান দ্বিতীয় স্তরে, ঐ দেশের সঙ্গে পুনঃঅঙ্গীভূতকরণের প্রক্রিয়া অবশ্য চালুকরা উচিত। একবার পাকিস্তন সংযুক্ত হয়ে গেলে এবং দু'দেশের সংযুক্তিতে অন্য রাষ্ট্রগুলোকেও চেষ্টা করে যে কোন মূল্যে

www.pathagar.com

তাদের দিকে ফেরাতে হবে এবং ফিরে আসবে । পুনঃঅঙ্গীভূত করণের কাজটি শান্তি পূর্ণভাবে করতে হবে অথবা যুদ্ধারম্ভ করতে হবে ।

শান্তিপূর্ণভাবে অথবা আগ্রাসী পথ ছেড়ে পুনঃঅঙ্গীভূতকরণের তৃতীয় আর একটি প্রক্রিয়া আছে যেটি রবি রাখাই উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তা হতে পারে পুনঃঅঙ্গীভূতকরনের জন্য দেশের মধ্যে ধ্বংসের আকার বৃদ্ধি করা। এ নিয়মের ব্যবহারাদি দ্বারা ক্রমান্বয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রকে ক্ষয় করতে হবে, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামোকে পঙ্গু করে দেয়া হলে দেশগুলিকে ভারতের সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা যাবে। বাংলাদেশ, নেপাল, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ এবং ভুটানের ক্ষেত্রে এ নিয়ম অগ্রাধিকার দেয়া। ভারতীয় গোয়েন্দারা ক্রমে ক্রমে অলক্ষিতে প্রশাসনের সকল শাখায় প্রবেশ করে বিরোধী রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র এবং স্যাটেলাইট মিডিয়া, সংস্কৃতিক অঙ্গন, আমলাতান্ত্রিক, রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। কাজেই ভারত মুক্তভাবে প্রচারের কাজ চালাতে পারে, ধ্বংসাত্মক ও সন্ত্রাসী কাজের ব্যাপারে নিজের উপর কোন বিপদসম্ভাবনার ঝুঁকি নানিয়ে অভীষ্ঠদেশগুলোর অভ্যন্তরে খুব সহজেই চালাতে পারে ।

রাখাই এর কল্পনা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি অখণ্ডভারতের সঙ্গে বহুদেশ অঙ্গীভূত করতে চেয়েছেন, যে দেশগুলো বৃটিশ রাজত্বকালে এবং মোগল সাম্রাজ্য থাকাকালীন সময়ে, যখন বৌদ্ধ, হিন্দু , তামিল এবং উপজাতিরাজত্ব স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষুদ্র নৃপতি শাসক ছিল সেগুলোর কথা বলা হয়েছে। সম্ভবত রাখাই পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে নজর দিয়েছে। একজন সুবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ অভিসন্দর্ভ করতে পারেন, সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে, যিনি মৌর্য বংশের তৃতীয় সম্রাট ছিলেন এবং তার রাজত্বকাল ছিল ২৭৩ বি,সি-২৩২ বি,সি পর্যন্ত । রাজত্বের সীমা ছিল বর্তমান দক্ষিণ এশিয়া এবং আরও বৃদ্ধি পেয়ে আফগানিস্তান থেকে বাংলা তারপর মহিশূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। একজন মৌর্য বিশ্বাস করেন যে সম্প্রসারণ এর মূলে আপরাধমূলক আচরণ, আত্মরক্ষামূলক সাড়া দেয়া, এবং সাম্রাজ্য টিকে থাকা নির্ভর করত শোষণ এবং প্রতিবেশী দেশগুলো অধিকার করে তাদের বিভক্তিকরণ।

যে সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল, অধিকন্তু রাষ্ট্র শাসন কার্যের উত্থান আশোকের সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রভাব রেখেছিল, বিংশ শতাব্দী এবং একবিংশ শতাব্দীতে ভারত সরকার ব্যাপক ও বাছবিচারহীনভাবে সামরিক সুকৌশল, কূটনৈতিক ও গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণ করেছে । অর্থশাস্ত্রের লেখক এবং চন্দ্রগুপ্তের মূখ্য মন্ত্রী (আনুমানিক ৩২১/বি,সি,ই), কৌটিল্য (অথবা চাণক্য)এর লেখার মাধ্যমে করা হয়েছিল, মৌর্য শাসকরা ধর্মীয় বিধান পালনের প্রক্রিয়ার অনুমতি, গোয়েন্দা গিরি, গুপ্ত হত্যা, বিরুদ্ধানেতাদের মতভেদের বীজবপন, ভুল তথ্যের প্রচার, জাতীয় স্বার্থে তাঁরা চুক্তি করে আবার ইচ্ছা করে ভঙ্গ করে। এছাড়া সুবিধা লাভের কৌশল প্রয়োগ করে অত্যাধিক বাস্তববাদী অন্যের নিয়ন্ত্রণকর্তাকে নিচে থেকে শত্রু দিয়ে শাসনাধীনে আনাই তাদের উদ্দেশ্য। তাঁর মতে, শত্রুকে প্রভাবিত করতে হবে, মানিয়ে নিতে হবে অথবা সুবিধা লভের কৌশলে তাকে পরাজিত করতে হবে, যাই

www.pathagar.com

হোক, কৌটিল্য অত্যন্ত সর্তকছিল, সুবিধালাভের কৌশল তখনই কার্যকরি হবে যখন পিছনে বিশ্বাসযোগ্য সামারিক শক্তি থাকবে।

এসমস্ত নিয়মগুলো চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা এবং অশোক সহ সফলতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছে। পরর্বতী সময়ে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা "র" পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে অস্থিরতা সৃষ্টি করে অভাবণীয় ভাবে সাফল্য হয়েছে এবং চানক্যের নীতি অনুসরণ করে প্রবঞ্চনা ও ছলনা দ্বারা স্বাধীন দেশগুলোকে নানা অংশে বিভক্ত করার প্রচেষ্টা চালায়। ঐ সমস্ত ছলনামূলক কাজের স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারত সরকার সারনাথ লায়ন ক্যাপিটাল ও অশোকের চাক্কাকে জাতীয় প্রতীক হিসেবে রাখার প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সরকারের সকল দাপ্তরিক কাজের সরকারি দলিলাদিতে এমনকি তাদের জাতীয় পতাকায় এই প্রতীক দেখা যায়। অশোকের সম্রাজ্য আবার কিভাবে পুনরুদ্ধার করা যায় এটাই হল রাখাই এর চিন্তার অংশ এবং বাংলাদেশর বিষয়টি পুনঃবার তাঁর লেখায় উল্লেখ হয়েছে।

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। যদিও মিসেসগান্ধী প্রথমেই হস্তক্ষেপের বিবেচনা করেছিলেন এবং তিন ডিভিশন সৈন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল, শেষে ভারত সরকার ইতস্থতঃ করছিল। ইতোমধ্যে সময় পার হয়ে যায়। ফলাফল বাংলাদেশকে আমাদের কব্জা করে রাখার সুযোগ দূরিভূত হয়ে যায়। একই মতাদর্শে ভরতের হস্তক্ষেপ যুক্তিসঙ্গত ছিল, শুধু অপেক্ষা করছিল যে সোভিয়েট ইউনিয়ন, পোল্যান্ড এবং আফগানিস্তানে এবং আমেরিকা নিকারাগুয়া ও গ্রানাডায় হস্ত ক্ষেপ করে কিনা এ মুহূর্তে ইতস্তত করার কোন যুক্তি পাওয়া যায়নি যা ভারতকে বাংলাদেশে সরাসরি হস্তক্ষেপে বাধা সৃষ্টি করেছে, ১৯৭৫ সালের ২৬ জানুয়ারি দেশের অভ্যন্তরে আক্রমনাত্মক ঘটনার করণে ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। রাখাই এর প্রস্তাব অনুযায়ী বাস্তবায়ন চূড়ান্তভাবে সময়োপযোগী ছিল না এবং তা করা হলে বিপদজ্জনক পরিস্থিতি হত। কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর ভারতে বিক্ষোভ শান্ত হয়ে যায়, নূতন সরকার অব্যাহতভাবে চেষ্টা করে সহসা বাংলাদেশকে প্রবল বেগে আক্রমণ করার জন্য মনোযোগ দেয়, কিন্ত এটা করা হলে আন্তজাতিকভাবে জনসাধারণের আপত্তির কারণ হবে এবং বিপুলভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। অস্ত্রধারী বিদ্রোহীদল ভারত থেকে বাংলদেশে আঘাত করতে পারে এমন সম্ভাবনা এখনও আছে. তবে অনুমান করা হচ্ছে, এটা করা হলে সম্পদের প্রচুর ক্ষতি হবে, প্ররোচণা দিয়ে জীবনকে বিদ্রোহী করে তুলবে অথবা বিদ্রোহকে সক্রিয় করে তুলবে। বিশ্বাসঘাতকতার মত ঘৃণ্য কাজ করে টাইগার (কাদের) সিদ্দিকী ভারতের সেবা করার প্রস্তাব করে এবং বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধ অথবা বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। তাঁর এ অবিশ্বাসী প্রস্তাব মিথ্যা ওজর দেখিয়ে বলেছিল তিনি শেখ মুজিবের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এ উদ্দেশ্যে ২০০০ হাজার অনুগামী নিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশকে জবর দখল করার জন্য বেসরকারিভাবে সমর্থন এবং তাদের উপদল করে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার আর্থিক সহযোগিতা পায়। অশোক রায়নার মতানুসারে সরকার এ দাবীতে রাজি হয়, কিন্তু শর্ত হল যুদ্ধ বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় করতে হবে এবং সীমিত উদ্দেশ্যে অর্থ্যাৎ মুজিবের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাঁচানোর জন্য কাজ করতে হবে। যদি বাংলাদেশের শাসকরা ধরতে

www.pathagar.com

পারে যে কাদের সিদ্দিকী একাজে ভারতের সমর্থন পাচ্ছে, তাহলে ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলবে এই বলে যে, বাংলাদেশ মিজো বিদ্রোহকে আশ্রয় দিচ্ছে এবং তাদেরকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যাপারে চীনকে অনুমতি দিয়েছে। অশোকা রায়নার শব্দ ব্যবহারের প্রণালী থেকে যুক্তিসংগত ভাবেই বুঝা যায় যে সততার সঙ্গে নিন্দার ব্যাখ্যা করতে পারে। কাদের সিদ্দিকী সম্পূর্ণভাবে নিজের স্বার্থে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য শেখ মুজিবের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হতে চেয়েছিল, কারণ মুজিবের উভয় পুত্রকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যা করা হয়েছিল।

সৌভাগ্য যে ভারতের দেশাই সরকার "র" এর কার্যকলাপকে সন্তোষজনক দেখেনি এবং তাঁদের লোকবল ও অর্থবরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছিল, শুধুতাই নয়, সন্দেহজনক সন্ত্রাসীদেরকে বংলাদেশের হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল। ভারত সরকার এবং গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে কাদের সিদ্দিকীর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। তবে বেশী দিনের কথা নয়, নতুন দিল্লীতে অনুকূল পরিবেশ ফিরে এসেছে এবং "র" এর বিদেশনীতির গুপ্ত চক্রান্ত সক্রিয় করে পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহ
(Insurgency in the chittagonj hill tracts)

শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা এবং রক্ষীবাহিনীকে নিষিদ্ধ করার পর "র" এর প্রধান নাটক শুরু হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে, সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদের কৌশল প্রয়োগ করে গুপ্ত চক্রান্তের ক্ষেত্র তৈরির প্রচুর সুযোগ পায় এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দেশের অখণ্ডতা এবং একতা ধ্বংস করে রবী রাখাই যেভাবে বর্ণালী রেখাচিত্র এঁকেছেন সেভাবে দক্ষিণ এশিয়াতে অখণ্ডভারত তৈরিতে আশবাদী। এ অংশে দেখানো হবে যে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দাবী সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক এবং "র" সহযোগিতাও দুষ্কর্মে সাহায্য করছে গুপ্তউদ্দেশ্য নিয়ে, আর তা হল স্বাধীনতা নয় বরং ভারতের সাথে একত্রীকরণ করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট ইতিহাসের ভ্রমাত্মক গভীর এক সমস্যা চাপিয়ে দেয়া, বিশেষভাবে বিবেচনা করে, মিথ্যা বর্ণনা দিয়ে আবেগ জাগায় এমন বোকামী করা হয়েছে যাকে উপলব্দি করার ক্ষমতা সম্পন্ন মানসিকতা দিয়ে জরিপ করা একটি জরুরি বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে, যে একাধিক অংশদ্ধারা গঠিত বাংলাদেশে একটি সক্রিয় শক্তি কাজ করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়টির সম্পর্কে ভিন্নমত ও যুক্তির গঠন সম্পর্কে বিবেচনার জন্য প্রচীন কাল থেকে ঐতিহাসিক সকল কিছু এ রচনায় আলোচনা করা হয়েছে, শুধু তাই এ সংক্রান্ত বিষয়গুলো অতিক্রান্ত স্মৃতিকথার বাইরে কিন্তু মূল বিষয়ে বিশ্লেষণ এবং বৈশ্লেষিক গবেষণা থেকে এটা সম্ভব যে মিথ্যা দাবীকে চুল তুলে ফেলে দেয়ার মত করে পার্বত্য লোকদের (বিশেষ করে চকমা) দাবী যারা করে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং উদ্দেশ্য সাধনে কাজে লাগাচ্ছে। সেই "র" পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ থেকে সামরিক শক্তি দিয়ে বিচ্ছিন্ন করার পায়তারা

www.pathagar.com

করছে। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান; এইচ, এম এরশাদ এবং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া যুক্তিসঙ্গত ভাবে দৃঢ় আবস্থান নিয়ে দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করে পার্বত্য দুস্কৃতকারী ও সন্ত্রাসীদের দাবী সরাসরি প্রত্যাখান করে দিয়েছেন

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী
(Inhabitants of CHT)

এ শাখাটির ভিত্তি হবে এলিনর ডিক্টন বাং-ওয়া (ডিক্টান) লিখিত প্রতিবেদন "ইন সার্চ ফর পিস ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাক অব বাংলাদেশ", ইউ,এন,ডি,পি, কর্তৃক ২০০৪ সালে প্রকাশিত ডিক্টান সঠিকভবেই নির্ণয় করেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন আনুমানিক ৫.০৯৩ বর্গমাইল, কিন্তু অন্য কিছু সংখ্যক লেখকের মতে ঐ জেলাটির মূল আয়তন ছিল ৬,৭৯৬ বর্গমাইল যা গত শতাব্দীতে ১৯০১ সালে একবার এবং ১৯৪৭ সালে পুনরায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন কর্তৃক কমিয়ে বর্তমান আয়তন করা হয় যা এখন বাংলাদেশের দশ ভাগের-একভাগ সমান ভূ-ভাগ নিয়ে গঠিত জেলাটি বাংলাদেশের আর্ন্তভুক্ত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন হ্রাস করা অর্থাৎ বাংলাদেশের মোট ভৌগোলিক আয়তনের উপর প্রভাব ফেলেছে, কারণ প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের অখন্ড এবং অবিভাজনীয় অংশ, তাই আয়তনের দিক দিয়ে কোন হ্রাসকৃত কার্য বাংলাদেশের আয়তন কে ছোট করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে খণ্ডিত করার যে কোন উদ্দেশ্য অখণ্ড বাংলাদেশের প্রতি অসহনীয় হুমকি যা এ দেশকে রক্ষার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে যুদ্ধের দিকে ধাবিত করবে। আংশিকভাবে সঠিক, সূচনাতে ডিক্টান একটি গতানুগতিক ভুলের সম্মুখীন হন তাহল সমালোচনা হীন ধারণা গ্রহণ করেছেন– পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক দেশীয় আধিবাসী প্রায় শতবছরকাল যাবত বসবাস করেছে এবং তাঁরা নিজেদের আইন ও সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক অবস্থা ভোগ করছে, এসমস্ত বর্ণনাগুলো অত্যন্ত সন্দেহজনক এবং ঐতিহাসিক দলিলপত্র এবং নৃবিদ্যা গবেষণায় ঘটনার কোন সত্যভিত্তি পাওয়া যায়নি। অনেক দেশীয় অধিবাসী অথবা উপজাতি ডিক্টান যাদেরকে অভিস্বদ্ধ করেছেন; তারা হল বাওয়াম, চক, চাকমা, খুমী, খাইআং, লুসাই, মরমা, মরো(মরু), পাংখুয়া, টানচাংজিয়া এবং ত্রিপুরা এদের মধ্যে কেহ বিশদভাবে পার্বত্য চট্টগামের দেশীয় অধিবাসী বলে বর্ণনা করতে পরে নি, যেমন বুশরা হাসিনা চৌধুরী বলেছেন, সিনো-তিব্বতীদের বংশধর, কিন্তু চূড়ান্ত প্রমাণ এর বিপরীত, এলাকায় তাঁরা আদিবাসী হিসেবে যে কথা বলেছে তা মিথ্যা।

অনেক ভারতীয় লেখক উপজাতিদের মূল উৎপত্তির উল্লেখ করে তথ্য পরিবেশন করেছেন। মোহাম্মদ জাইনুল আবেদীনের পুস্তক 'দি চিটাগাং হিলট্র্যাকস– এ ভিকটিম অব ইণ্ডিয়ান ইন্টারভেনশন (২০০৩) এবং বি,জি ভারগেস এর মতে যে সমস্ত "হিউম্যান রাইটস ভায়ওলেশন্স ইন চিটাগং হিলট্র্যাকসঃ মিথ্ এন্ড রিয়েলিটি (২০০৫) দু'টিতে পক্ষপাতহীন এবং উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

সম্পর্কে মূল্যায়ন করে। উপজাতিদের মূল উৎপত্তির উল্লেখ করে তথ্য পরিবেশন করেছেন। বি,জি, ভারগোসের মতে যে সমস্ত উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে তাঁরা তিব্বত বার্মা/মনখমার স্টক থেকে এসেছে, অনুরূপ অধিবাসী উত্তর-পূর্ব ভারতে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা ১৬ শতকে এবং ১৯ শতকের মধ্যে তাঁদের দেশ ছেড়ে চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী সমতল ভূমিতে বাঙালিদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছিল। মজার ব্যাপার হল বুশরা হাসিনা (চৌধুরী বুশরা) বি,জি, ভারগেস এর পুস্তকের কোন উল্লেখ করেন নি, কিন্তু তিনি তার আবিষ্কারকে অসমর্থিত এবং নির্দেশহীন প্রস্তাব বলে পরোক্ষভাবে আপত্তি করেছেন। বুশরা হাসিনার মতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম বাংলাদেশীরা বসবাস আরম্ভ করেছে ১৭ শতক, ১৮ শতক, ১৯ শতকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ছয় মাসে নানা কারণে এসেছে, বিজি ভারগেস বলেছেন বাঙালি বসবাস কমপক্ষে এক শতব্দী আগে হয়েছে যা প্ররোক্ষভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপজাতিদের আগমণের পূর্বেই স্থানীয় বাঙালি অধিবাসীদের বসবাস আরম্ভ হয়েছে ।

বিস্তারিত নির্দেশনা থেকে বিরোজ মোহন দেওয়ান এর ভাষ্য অনুযায়ী স্পষ্টভাবে বলা যায় অনেক চাকমা অভিবাসী পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্তান নয়, এটা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, চাকমারা এ জেলার মূল বসতি স্থাপনকারী নয় এবং চতুর্থ শতাব্দীতে সুলতানের অনুগ্রহে তাঁরা বঙ্গদেশে প্রবেশ করে এবং তাঁদের অভিবাসী হওয়ার কারণ হল বার্মিজ রাজশক্তি তাদের উপর আক্রমণ চালাত, এতে চাকমারা দুর্বল হয়ে পড়ে, মানবিক কারণে বাংলার সুবেদার এর অনুমোদন ও সাহায্যে প্রথমবার তাদের অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য টোয়েন ছরি নদীর তীরে বসতি স্থাপন করে। তখন থেকে অথাৎ চতুর্দশ শতাব্দীতে চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে বলে জানা যায় এবং তাদের সংখ্যা এত কমছিল যে ৭০০ বছর পর ১৯৯১ সালের আদমশুমারী আনুযায়ী তাদের সংখ্যা ২,৮০,০০০ দেখান হলেও আরও কম হতে পারে । বিরোজ মোহন দেওয়ান কর্তৃক যে উপাত্ত দেয়া হয়েছে তা গুরুত্বপূর্ণ, চর্তুদশ শতাব্দীতে মোগল প্রশাসন পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন করত, সম্ভবত, বাঙালি আমলা এবং বসতি স্থাপনকারীদের সহায়তায় অভিবাসীরা বসবাস আরম্ভ করে।

কিছু বুদ্ধিজীবী সনাক্ত করে যে জয়নুল আবেদীনের পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে যে, ভারতের হস্তক্ষেপের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন নিপীড়িত মানুষ অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, কারণ চাকমা সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং ভাষার অস্থিত্ব বাঙালিদের থেকে পৃথক, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা মিথ্যা এবং ফন্দি মাত্র। তাই বিরোজ মোহন দেওয়ান এবং আশোক কুমার দেওয়ান চূড়ান্তভাবে তাদের দাবী বাতিল করে করে দেয়, আরও অনেক লেখকের মধ্যে বুশরা হাসিনা চেবধুরী চাকমাদের স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবীর একজন সক্রিয় প্রস্তাবক, তিনিও স্বীকার করেছেন যে চাকমারা যে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে তা চট্টগ্রাম বাসিদের ভাষার সমকক্ষ, চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীরা যে ভাষায় কথা বলে তা বাংলা ভাষারই রূপান্তর মাত্র। তাদের হস্তলিপি বার্মিজ ভাষার সাথে

www.pathagar.com

মিল আছে, কিন্তু তারা ঐ হস্তলিপি কদাচিৎ ব্যবহার করে। গুরুত্বপূর্ণ হল বাংলা এখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা, বহু ভাষাভাষী অঞ্চলেল যে ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেব ব্যবহৃত হয় তাই বাংলা ভাষা আন্ত-উপজাতির যোগাযোগের মাধ্যম এবং অধিকাংশ উপজাতি এ ভাষা জানে। উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে উপজাতিরা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বদেশী নয়, সঠিকভাবে বলা যেতে পারে যাযাবর, উদ্বাস্ত এবং আশ্রয় প্রার্থী, যাদের কোন স্বতন্ত্র সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্য (বিশেষ করে নিঃসন্দেহে কিছু প্রথাগত অনুষ্ঠান, রান্নাবান্না সম্পর্কিত পার্থক্য ছাড়া) নাই যা তাদেরকে স্থানীয় বাংলাদেশীদের থেকে আলাদা করা যাবে, শতাব্দী কাল যাবত অঙ্গীভূত করা এদেরকে স্থানীয় লোকদের থেকে কিভাবে বের করা যাবে (অর্থাৎ বাঙালি) ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম প্রভাব
(Muslim influence in the CHT region)

ডিক্টান এবং বুশরা এবং অনেক বাংলাদেশী লেখক যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন তা অবশ্যই সঙ্গত নয় বরং তাঁরা মুসলিম নেতারা যারা মোগল সম্রাটদের অধিনস্ত সুলতান ছিলেন তাদের অত্যাচার, রুচি বিগহিত কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রতি মনকে কেন্দ্রীভূত করেছেন। তাঁদের দাবী সুলতানগণ চাকমা রাজাদের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে বাধাপ্রাপ্ত হত এবং শাসকরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত তাদেরকে শান্ত করার জন্য মুসলমানদের নাম বলা হত। ধারণা করা হচ্ছে যে একক এবং অদ্ভূত অভিব্যক্তি এবং প্রকাশ্যে অধিকার সম্পন্নব্যক্তি বিরোধিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আগ বেড়ে ধ্বংস করে দিত। যাহোক ডিক্টান দৃঢ় প্রত্যয় লাভ না করে বলেছেন যে মোগলরা কখনো উপজাতি অধিবাসীদের কে আয়ত্বে আনতে পারেনি এবং তাদের আধিকার পার্বত্য চট্টগ্রামে চাপিয়ে দিতে পারেনি। একমাত্র সুযোগ পেয়েছিল যে পার্বত্য নেতারা মোগল সম্রাটকে বার্ষিক কর হিসেবে দেশের শাসকের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী (১৭১৩ সালের চুক্তি) তুলার গাট দেয়া হত, কিন্তু ডিক্টান জোর দিয়ে বলেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রাম তাদের আওতার বাইরে ছিল। ইতোপূর্বে আমরা দেখছি যে বিরোজ মোহন দেওয়ান ঐ মন্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁর গবেষণায় তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন চতুর্দশ শতাব্দীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বুশরা হাসিনা চৌধুরী বিশদ বর্ণনা দিয়ে বলেছেন চাকমা প্রধান জালাল খান চট্টগ্রামে মোগল প্রশাসনের নিকট বশ্যতা স্বীকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফলস্বরূপ মোগল দেওয়ান অথবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কিষন চাঁদ কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং আরাকানে পালিয়ে যান এবং পরবর্তীতে তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। ১৭৩৭ সালে প্রধান সেনাপতি শেরমাস্ত খান মোগল প্রশাসনের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। মোগলদের প্রভাবধীনে একটি নূতন প্রশাসনিক পদ 'দেওয়ান' এর সৃষ্টি হয় এবং চাকমা উপজাতি প্রশাসন চালু করা হয় যা ১৯০০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। মোগল শাসনামলে বিদ্রোহ করাটা স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আনুগত্যের সত্যিকার পরীক্ষা

www.pathagar.com

এবং জমিদারের প্রতি প্রজার আনুগত্য চাকমা রাজা কর্তৃক মুদ্রার উপর নাম খচিত করা। মুদ্রা ও পদক সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করে আবিষ্কার করা হয়েছে যে, মুদ্রাগুলোতে সুলতান ও সম্রাটের নামাঙ্কিত থাকত, এমনকি 'আল্লাহু রাব্বি' খোদিত আকারে লেখা হত যার মধ্যে আনুগত্য প্রকাশ পেত। এ সমস্ত কার্যাবলীকে যদি কেহ মোঘল সম্রাটদের অত্যাচার বলে, তবে বিষয়টি অবশ্যই বিতর্কিত, যদি আমরা বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা, অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলিম সমাজের উপর বাস্তবায়িত হয়, তবে ঐ ধারণাগুলো বুঝা সম্ভব নয়। তাঁদের ব্যবহারও ঐরূপই হবে যেভাবে তাঁরা করেছে এবং এটাই অপরিহার্য। তাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য প্রজাদের মধ্যে আইন বজায় রাখার জন্য চিন্তা ও বিবেচনা সকল সময়েই ইউরোপিয়ান নৃপৃতিদের মনে রেখাপাত করত, তাদের ক্ষমতাধর উপদেষ্টাগণ এবং মন্ত্রীগণ যারা প্রশাসন পরিচালনা করত এবং রাজকীয় মর্যাদাও ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলো নিয়ন্ত্রণ করত তাদেরও সেভাবে কাজ করতে হত। ইউরোপিয়ান সাম্রজ্য শাসকদের ও নিশ্চিত হতে হত যে তাদের ঔপনিবেশিক বাণিজ্য স্থানীয় বিদ্রোহীদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কিনা, কারণ অনেক দূর দেশ থেকে শক্তি প্রয়োগ করে শাসনাধীনে আনা কঠিন ছিল এবং ঔপনিবেশিক স্বতন্ত্র ভবিষ্যৎ বাংলাও পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলিম শাসনের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব নয় কারণ মুসলিম সাধু পুরুষ, আরব্য ব্যসায়ীরা এবং মার্চেন্টদের দ্বারা শিক্ষা পেয়ে তাঁরা লাভবান হচ্ছিল এবং স্বাভাবিক ভাবে তরবারির দ্বারা নয়, অথবা ক্ষুদ্র বক্র ধারালো তরবারি দ্বারাও এটা হয়নি। তরবাবির বিষয়টি অনেক পরে মানুষের মনে উদয় হয়।

এ বিষয়ে অনেক পত্রপত্রিকায়, প্রবন্ধে এবং পুস্তকে খুব কম এবং গভীর এলাকা ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে অধ্যয়নে মানোনিবেশ করা হয়েছে যা অকাট্যভাবে বলা যায় মুসলমানরা (আরব বাণিজ্যিকরা মোগল জেনারেলস অথবা বাংলায় বসতি স্থাপনকারী) প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের অঞ্চলের অধিবাসী এবং বসতি স্থাপনকারী এবং বাংলাদেশ এই ইতিহাসের ন্যায়সঙ্গত দাবিদার এবং এ অঞ্চলের ভূভাগ অত্যন্ত কাছাকাছি লেগে আছে। অতএব, পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলিম বসতি স্থাপন সম্পর্কে সমস্ত কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা অতি প্রয়োজন, এ অঞ্চলের শাসকদের শক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং অধিকার সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে আসতে হবে। ডঃ মোহাম্মদ এনামুল হকের মতে আরব মুসলিমরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসতিস্থাপন করে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে পারস্পারিক মৈত্রী স্থাপন করে ৯৫১- ৯৫৭ এ.সি.ই. সময়কালে প্রভাবশালী সমাজ গড়ে তুলে এবং সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁরা চট্টগ্রামের তীরবর্তী অঞ্চল এবং নোয়াখালী জেলাকে অন্তর্ভূক্ত করে মুসলিম স্বাধীন ক্ষুদ্র নৃপতি শাসিত অঞ্চল গঠন করে এবং শাসককে বলা হত সুলতান। সুলতান খেতাবটি অনুমোদনের জন্য অবশ্যই কোন মোগল সম্রাটের নিকট প্রস্তাব অথবা দিল্লী কেন্দ্রিক কোন অধিকার প্রাপ্ত কেন্দ্রে পাঠানো হয় নি, মুসলমান সৈন্যদের আগমনের বহুপূর্ব থেকে চট্টগ্রামে সুসঙ্গতিপূর্ণ গঠিত সমাজের সিদ্ধান্ত বিরাজমান ছিল। মোহাম্মদ মোহর আলী তাঁর চমৎকার এবং নির্ভরযোগ্য পুস্তক "হিস্টেরি অব দি মুসলিমস

www.pathagar.com

অব বেঙ্গল" চট্টগ্রামে প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম বসতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে মুসলমানরা তাঁদের প্রথম আইনসম্মত রাজনৈতিকভাবে সরকারি কর্তৃত্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর এ,সি,র প্রথম বছর উত্তর-পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করে, তখন পর্যন্ত আরবীয় প্রভাব এ এলাকার সাধারণত খুব ক্ষীণ ছিল, অথচ এগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যাপক ছিল, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার এ সমস্ত এলাকাগুলো শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে। এই অদ্ভূত উন্নতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যাচ্ছে যে উত্তর ভারত থেকে আগত মুসলিম জেনারেলদের দ্বারা বিজয়ের বহু পূর্ব থেকেই এ এলাকা ইসলামিক আরবদের দ্ধারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে প্রকাশ। মোহাম্মদ তোগলোক আসার পর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার (মার্চ ১৩২৫ এ,সি,ই) করে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম রাজত্বের সালতানাতি সোনারগাও থেকে পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্ব চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। সুলতানের অধীনে ফখর আল-দীন সমগ্র পূর্ববাংলা চট্টগ্রাম পর্যন্ত যা তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সময়ে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিল্লীর শাসন থেকে পৃথক হয়ে পড়েন এবং ১৩৪৯ সাল মৃত্যু পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন, এর পর তাঁর ছেলে শাসনভার গ্রহণ করলে তিনি হাজী ইলিয়াস কর্তৃক উৎখাত হন, যিনি ইলিয়াস শাহী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা এরপর শুনেছি সুলতান জালাল আল-দীন এর কথা যিনি ১৪১৫ সালে ক্ষমতা লাভ করেন, তিনি একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান ছিলেন, তাঁর পিতা ছিলেন প্রতিপত্তিশালী ও শক্তিশালী হিন্দুরাজা নাম ছিল রাজা গনেশ। সুলতান জালাল আল-দীন ১৪২০ সালে চট্টগ্রাম থেকে মূদ্রার প্রচলন করেন, সম্ভবত এটাকে নাটকীভাবে পুনঃস্বাধীকারের জন্য সমগ্র ব-দ্বীপে সুলতানের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন টিকতে পারে নি, আরাকানিজ অথবা টিপ্‌পারা সৈন্যবাহিনী টিপ্‌পারা রাজা ধন্যমানিক্য চট্টগ্রাম এলাকা দখল করে শতাব্দীর ও কম সময় ১৫০৯-১৫১৬ পর্যন্ত তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৫১৬ সালে রাজকুমার নুসরাত শাহ অথবা পারস্য ইতিহাসে দেখা যায় যে, রাজা অথবা বাংলার রাজকুমার চট্টগ্রাম পর্যন্ত এলকা বিজয় করেন এবং দারুল ইসলাম নামকরণ করেন। এ সময়ে মোগলদের আত্মপ্রকাশ হয় এবং জহির আল-দীন মোহাম্মদ বাবর এবং তাঁর ছেলে হুমায়ুন এদেশে আগমন করেন, কিন্তু তাঁরা নুসরাত শাহ এর নিয়ন্ত্রনাধীণে বাংলার সালতানীতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নি, নুসরাত শাহ পুনঃনাম ধারণ করে ফিরোজ শাহ কর্তৃক হত্যার পূর্ব পর্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফিরোজ শাহ নিজেই মাহমুদ শাহ এর দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হন এবং মাহ্‌মুদ শাহ ১৫৩৩-১৫৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলার সুলতান হিসেবে রাজত্ব করেন। মাহমুদ শাহ এর মৃত্যুর পর আফগান নেতা শের খান ১৫৩৮ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং আফগান রাজবংশ হিসেবে রাজ্য পরিচালনা আরম্ভ করেন এবং এ বংশের শেষ রাজা দাউদ শাহ এর মৃত্যু পর্যন্ত ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত এই রাজবংশ রাজত্ব করে। তখন পর্যন্ত বঙ্গদেশ মোগলদের নিয়ান্ত্রণে আসেনি, কারণ আফগান যুদ্ধবাজরা বিরোধিতা করার জন্য ইন্ধন যোগাত, এ সময়ে অত্র এলাকা গোলযোগপূর্ণ

www.pathagar.com

ছিল, সুযোগ বুঝে আরাকান শাসক মেংগ খামউং চট্টগ্রাম পর্যন্ত তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করে শক্তিশালী নৌ-গ্যারিসন গড়ে তুলে অবস্থান করেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মামা শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং ১৬৬৬ সালের ২৬ জানুয়ারি আরাকানের নৌ-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে শত্রু নৌ-সেনাদেরকে পরাজিত করে সম্পূর্ণ উত্তর-চট্টগ্রাম কার্যকারিভাবে মোগলদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। সমগ্র চট্টগাম অঞ্চল মোগলদের শাসন ক্ষমতা আগামী দশক পর্যন্ত চলতে থাকে, তবে তাঁদের শাসনাধিকারের প্রতি একমাত্র ব্রিটিশদের নিকট থেকে হুমকী আসে, রাজা জেমস-২ এর পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পনির চর্টার যখন নবায়ন করে তখন কোম্পানিকে যুদ্ধ করার, আবার শান্তি স্থাপনের জন্য ক্ষমতা দেয়া হয় এবং ভারতীয় শাসকদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের অধিকার দেয়া হয়। অতএব মোহাম্মদ তোগলকের সময় থেকে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ১৭৫৭ পর্যন্ত একমাত্র আরাকান শক্তিই মোগল শাসনের বিরোধিতা করেছে (মিত্র শক্তি ছিল পর্তুগীজ) এবং তারপর ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করেছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতিরা কখনও তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বলে উল্লেখ নেই। বাস্তবিক পক্ষে এ অঞ্চলে যাদেরকে দেশীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে তাদের সঙ্গে দৈহিক এবং সংস্কৃতির কোন মিল উপজাতিদের মধ্যে নেই বলে ডিকটান মন্তব্য করেছেন এবং রিচার্ডাইটন এর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় তাদের সামাজিক আচরণসমূহ হয় বন্ধ হয়ে গেছে অথবা ইসলামে পরিবর্তিত হয়েছে।

চট্টগ্রামের মধ্যাংশে ১৬৬৬ সালে দেশীয় লোকদের বসবাস ছিল, তাঁরা দেখতে কালো এবং খাটো ছিল, কোন দাড়ি ছিল না। আবুল ফজল লিখেছেন তাদের ধর্ম ছিল হিন্দু এবং মুসলমানদের থেকে আলাদা। বোনরা তাদের নিজের দু'ভাইকে বিয়ে করতে পারত। তারা শুধু ছেলে এবং মা এর সঙ্গে বিয়ে থেকে বিরত থাকত। তাদের বস্তুগত আচরণ ছিল ঝুমচাষ অথবা পরিবর্তন করে কৃষি কাজ করা হত।

ডিক্‌টান দাবী করেন যে তিনি যে উপজাতিদের কথা বর্ণনা করেছেন তাঁরা হল জুম্মা, এ শব্দটি ঝুম থেকে এসেছে এটা স্পষ্ট একটি ভুল, দেশীয় আধিবাসী যাদের কথা কোটেশন করা হয়েছে তাঁরা কখন সমরূপ হওয়ার কল্পনা করতে পারেন। এমনও হতে পারে যে মূল অধিবাসীরা সাধারণভাবে অধুনালুপ্ত আপত্তিকর সামাজিক আচরণ বাদ দিয়ে এসেছে অথবা ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করে। কারণ– ১৬৬৬ সালে মোগলদের বিজয়ের ঠিক পর থেকেই মসজিদ, তীর্থ স্থান সমগ্র চট্টগ্রামে কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত প্রচুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, এর ফলে আর্থিক অনুদান প্রদানের রীতি ধর্মীয় উত্থাণের জন্য মঞ্জুর করা হয়, এতে আমির ওমরাহ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশের অব্যহিত নিম্ন বংশীয় ব্যক্তিবর্গ শত শত মসজিদ পবিত্র স্থান, (মন্দির, দরগাহ) ইসলামে নিবেদিত ধর্মীয় ব্যক্তিগণ একাজে নিয়োজিত হয়। তাঁরা বন জঙ্গলকে ধান উৎপাদনের জমিতে পরিণত করে এবং দেশীয় বসতি স্থাপনকারীরা ধান

www.pathagar.com

উৎপাদন কৃষকের কাজ করে এবং তাৎক্ষণিক ভাবে অর্থনৈতিক এবং ধর্ম প্রচারক হিসেবে নূতন বংশের উৎপত্তি হয়।

ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনের রীতি এবং প্রাথমিক ভাবে চট্টগ্রামে আরব বণিক এবং মার্চেন্টদের স্থায়ী বসবার করার যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদাণের ফলাফল ১৮৭২ সালের প্রথম সরকারি জরিপ হিসেবে ৭০% মুসলমান এবং চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পাবনা, রাজশাহী জেলাতে আরও বেশী মুসলমান অধিবাসী ছিল। এ সংবাদ থেকে জানা যায় একমাত্র চট্টগ্রামেই ২,৩২৩,০০৮ জন মুসলমান বাসকরত, (এর মধ্যে ৫,০২৫ জন বিদেশী পূর্ব পুরুষগণ) বলে দাবী করে এটা থেকে সহজেই উপজাতিদের সংখ্যা বের করা যায়। ডিক্‌টান বহুবার তাদেরকে সনাক্ত করেছেন। আমার ধারণা যে এই উপজাতিদের সংখ্যা ১৯০০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত জনসংখ্যার মধ্যে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয় এবং এখন এ অঞ্চলে বসবাসরত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় অন্যস্থান থেকে অষ্টাদশ, নবম দশ ও বিংশ শতাব্দীর সু-সময়ে এদেশে এসেছে, তখন এদের সংখ্যা খুব কম ছিল বলে সামান্য প্রামাণিক সাক্ষ্য যার মূল চতুর্দশ শতাব্দীতে পাওয়া যায় যখন মুসলিম সুবাদার মানবিক কারণে বার্মিজ রাজা কর্তৃক বিতারিত কিছু চাকমাকে বসবাসের অনুমতি প্রদান করেছিল।

রেফারেন্সঃ-

১. জয়নুল আবেদীন- 'র' এন্ড বাংলাদেশ
২. রবি রাখাই- দি ওয়ার দ্যাট নেভার ওয়াজ (১৯৮৮)
৩. ক্রিস্টোফার এ্যান্ড্রু এন্ড ভ্যাসিলি মেট্রোখিন- দি মেট্রোখিন আরকাইভ (২০০০)
৪. ভিনসেন্ট এ স্মিথ- দি আরলি হিস্টোরী অব ইণ্ডিয়া (১৯৬২)
৫. মানজিৎ সিং প্রাদেশ- ডিভিউসিং ইণ্ডিয়াস গ্রাণ্ড স্ট্র্যাটেজি অব রিজিওনাল হেজিমোনি ফ্রম হিস্টোরিক্যাল এন্ড কনসেটপচ্যুয়েল (২০০৫)
৬. মজুমদার রায় চৌধুরী- এন্ড-এন্ এ্যডভান্স হিস্টোরী অব ইণ্ডিয়া (২য় সংস্করণ ১৯৫০)
৭. অশোকা রায়না দত্ত- ইনসাইড 'র' দি স্টোরি অব ইণ্ডিয়াস সিক্রেট সার্ভিস (১৯৮১)
৮. ডঃ কালীদাস বৈদ্য- বাংগালীর মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব (২০০৫)
৯. জয়নুল আবেদিন- দি চিটাগাং হিল ট্র্যাক ঃ এ ভিকটিম অব ইণ্ডিয়ান ইন্টারভেনশন (২০০৩)
১০. মাহ্‌মুদ আলী- দি ফিয়ারফুল স্টেট ঃ পাওয়ার, পিপল এন্ড ইন্টারনাল ওয়ার ইন সাউথ এশিয়া (১৯৯৩)
১১. বি, জি ভারগেস- নর্থ ইস্ট রির্সাজেন্ট এথনিসিটি, ইনসারজেন্সি, গভর্নেন্স ভেভেলাপমেন্ট (১৯৯৬)
১২. বিরোজ মোহন দেওয়ান- দি ক্রোনিকেল অব দি চাকমা নেশান (১৯৬৯)
১৩. অশোক কুমার দেওয়ান- এন্ ইনভেস্টিগেশন ইনটু হিস্টোরি অব দি চাকমা নেশান (১৯৯১)
১৪. ডঃ মিজানুর রহমার শেলী- দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকস অব বাংলাদেশ দি আনটোল্ড স্টোরি (১৯৯২)
১৫. রিচার্ড এম, ইটন- দি রাইজ অব ইসলাম এন্ড দি বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার ১২০৪- ১৭৬০(১৯৯৭)
১৬. মোহাম্মদ মোহর আলী- হিস্টোরি অব দি মুসলিমস অববেঙ্গল (১৯৮৫)

www.pathagar.com

অংশ-৫/বি

পার্বত চট্টগ্রামে বিদ্রোহের কারণ
(Causes of the CHT insurgency)

১৬৬৬ সালে আরাকান বাহিনীকে পরাজিত করে শায়েস্তাখান বিজয় লাভ করেন এবং সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক তাকে বঙ্গদেশে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়, ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে অতি শীঘ্রই মতভেদ দেখা দেয় এবং বাংলার দেওয়ান ও নায়েব সুবাদার মুরশিদ কুলি খানকে আরও উত্যক্ত করতে ছিল, তিনি ১৭১৩-১৭২৭ সাল পর্যন্ত এ পদে অতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৭ সালে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় হওয়া পর্যন্ত রাজকার্য যথাযথভাবে চলছিল, ব্রিটিশ এবং সিরাজদ্দৌলার সভাসদগণের মিলিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর পতন ঘটানো হয়, সিরাজদ্দৌলার সভাসদদের মধ্যে ছিলেন মীর জাফর, আমির বেগ, ইয়ার লাতিফ খান, খাদিম হোসেন খান, জগৎ শেট, নন্দকুমার, মীর মদন এবং শ্রীবাবু, এছাড়া শক্তিশালি হিন্দু স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিনিধি গবিন্দরাম মিত্র, মানিক চাঁদ, রায় দূর্লব রাম এবং উর্মিচাঁদ।

এ পরাজয়ের পরিণতিতে বাংলার ডেপুটি গর্ভণর কাশেম আলী খান বশ্যতা স্বীকারপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে ১৭৬০ সালে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট ছেড়ে দেন এবং ১৮৬০ সালে বঙ্গদেশের সঙ্গে এ অঞ্চলকে যুক্ত করা হয় (এ্যাক্টর নং ২২ অব ১৮৬০), সমুচিত প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মিজোরামে বসবাসরত মানুষ বৃটিশদের উপর অতিকির্তে হামলা চালায় এবং বহুদূর পূর্বদিক পর্যন্ত অগ্রসর হয়, যতদূর জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা উপজাতি অথবা অন্যান্য অধিবাসীরা এ হামলা চালায়নি যাহোক, ডিকটান দাবী করে যে ১৭৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ব্রিটিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ চালায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৮৬০ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বায়ত্তশাসিত ছিল। এই প্রথমবারের মত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতির লোকজনের গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় যে ইতহাসে লিপিবদ্ধ করার মত বিষয়ের আর্বিভাব ঘটে, এটা মোগল এবং ব্রিটিশদের সময়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা ডিকটান এবং বুশরা কর্তৃক উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁরা আর কোন সমর্থিত সাক্ষ্য দেননি যে আমরা এ ঘটনার নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করব। বুশরার মত অনুযায়ী চীফ শেরদৌলাত খান (চাকমা উপজাতি) ১৭৭৭ সালে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে কর প্রদান বন্ধ করে দেন এবং তাৎক্ষণিক কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন, এর ফলে দু'দলের মধ্যে থেমে থেমে যুদ্ধ চলতে থাকে এবং এ যুদ্ধ ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত চলে। শেরদ্দৌলাত খানের ছেলে জানবক্র খান শেষ পর্যন্ত ওয়ারেন হেস্টিংশ এর নিকট অধীনতা স্বীকার করেন।

ডিকটান এবং বুশরার মধ্যে বিরাট অসামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও একজন প্রশ্ন করতে পারে এই মনোরম কাহিনী এ পুস্তকে কেন এসেছে অন্যকোন বিখ্যাত এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রকাশনায় নয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার ব্যাখ্যা আপাত দৃষ্টিতে ন্যায়

www.pathagar.com

সঙ্গত মনে হলেও আসলে ভারতের বর্তমান মিজোরামের মিজোরাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্রিটিশদেরকে বিরাট হুমকি দিয়েছেন, এ হুমকিতে চাকমারা ছিল না, হতে পারে ১৭৭৭ সালে মুখোমুখি যুদ্ধের পর তারা সহজেই বশ মেনে নেয়। আধুনিক লেখকরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে, তাঁদের মতে বিদেশী অথবা বহিস্থ কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের দু'টি উপজাতি অবিরতভাবে সংগ্রাম করত এ দাবীর সমর্থনে প্রামাণ্য কিছু দেখাতে বলছেন। ডঃ নন্দিতা চৌধুরী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্তে ব্রিটিশ সৈন্যদের ঘাটি ছিল তাই মিজোরা পূর্ব দিকেই প্রতিরোধ করেছে। বর্ণিত বিষয়টি খুব নগন্য যে চাকমাদের জড়িয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ব্রিটিশদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে এ অজুহাতে ক্রমাগত ধাপেধাপে পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে এবং ঐ এলাকাতে অতিমাত্রায় মুসলিম আগমন ও বসতি স্থাপনকে প্রতিরোধ করে।

চাকমাদের বিরোধিতা একটি অবস্তাব ঘটনা যা পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ কর্তার মুসলমান বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায় এবং জানবক্স খানকে ভবিষ্যৎ নীতি বাস্তবায়নের ভূমিকা গ্রহণের মুখপত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তিনি বলেছেন ব্রিটিশদের সাথে ত্বরান্বিতভাবে সংকট সৃষ্টি করেছেন কারণ সাধারণ মানুষ (বাঙালি মুসলমান) কে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশে নিষিদ্ধ কারার সিদ্বান্তে এটা করা হয়। এই নিষেধমূলক আদেশ পরবর্তীতে একত্র করে ১৯০০ সালের প্রবিধান নং ১ (প্রচলিতভাবে ১৯০০ সালের প্রবিধান অথবা বিধিপূর্ণগ্রন্থ নামে পরিচিত) করা হয় যা ব্রিটিশ অধিকারী বাঙ্গালীদের বসতি স্থাপন ও ভূমির অধিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে সহায়ক হয় এবং উদ্দেশ্য পূরনার্থে বিধিহির্ভূতভাবে প্রবিধান সংশোধন করে ঘোষণা দেয়া হয়।

চাকমা, মগ অথবা যেকোন পাহাড়ী উপজাতির সদস্য, স্বদেশীয় পার্বত্য চট্টগ্রাম, লুশাই পাহাড়, আরাকান পার্বত্য এলাকা অথবা ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়া কোন লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে বা বসবাস করতে পরবে না যদি না তিনি ডেপুটি কমিশনারের কোন অনুমিত পত্র পেয়ে থাকেন।

প্রবিধানের নং ৫১ এর নিয়ম অনুযায়ী জেলা কমিশনারকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপজাতি নয় এ ধরণের লোককে এলাকা থেকে বিতারিত করতে পারেন এবং ১৮৮১ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্ত এলাকার পুলিশ প্রবিধান অনুযায়ী পুলিশের মাধ্যমে বলপ্রয়োগ করতে পারেন বলে সিদ্ধান্ত নেবে, তবে উপজাতির পুলিশ দৈহিক নির্যাতিত হতে পারে, পরিণতিতে মুসলমান বসতি স্থাপনকারিদেরকে ভীতি প্রদর্শন এবং হুমকি দিতে পারে, কারণ তাঁরা এখন শক্তিহীন এবং ব্রিটিশের পালিত বিরোধী অনুচরদের দয়ার উপর নির্ভর করে বাস করতে হত।

পক্ষপাতমূলক শর্ত আরোপের উদ্দেশ্যের পিছনে কি উদ্দেশ্য আছে সে বিষয়ের প্রাথমিক পরিচয় দিতে গিয়ে ১৮৭২ সালে জরিপের উল্টো ফলাফলের কথা বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা অত্যধিক বলে জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে, ইচ্ছা করলে তারা ব্রিটিশদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে হুমকি প্রদান করতে পারে এবং বন্দর ব্যবহারের সুবিধা বিশেষ করে সংকটকালে অথবা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের মত ও হতে পারে। ১৯০০ সালের প্রবিধান ও উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

প্রণোদিতভাবে নিশ্চিত অন্যদের উপর উপজাতিদের সুবিধা দেয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি কর অঞ্চলে ভাগ করে দেয়া হয়, প্রত্যেক অঞ্চলের প্রধানকে রাজা বলা হত। অঞ্চল তিনটি চাকমা, মং এবং বোসাং নামে পারচিত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য আরও দশটি উপজাতির উপর তাদের আইনগত অধিকার ছিল। এই সুবিধাজনক অবস্থানকে উন্নত করা হয় যখন পার্বত্য চট্টগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে ভূ-ভাগ ১৯৩৫ সালে আইনের মাধ্যমে করা হয়, এর অর্থ হল পার্বত্য চট্টগ্রামকে সদৃশ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয় এবং গতানুগতি গোত্র প্রধান এর অধীনে শাসন কার্য পরিচালনার অধিকার প্রদান করা হয় এবং সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। সকল পরিবর্তন একত্র করা হয়, এগুলো হল পরোক্ষ শাসন এবং বিভক্তি এবং ব্রিটিশ রাজের কৌশল জয় করা, এই একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের ন্যায়বিচার সম্পন্ন মালিক এবং অধিবাসীদের (মুসলিম) দেয়া হয়েছে মুসলমানরা নিজের দেশেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, এদিকে ভন্ডামি করে সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের কথা বলা হচ্ছে।

এই বির্তকিত নীতি আরও নিশ্চিত হয় ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় আলাপ আলোচনার দ্বারা বিরোধ মিমাংসার সময়, আলোচনা হয়েছিল কোলকাতা এবং চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বিজড়িত হবে, না ভারতের সঙ্গে, সবচেয়ে উপযুক্ত কারণ উভয় অঞ্চল মুসলমানদের চরিত্র, ইতিহাস এবং অধিবাসী নিয়ে গঠিত ছিল। বঙ্গদেশের নূতন সীমান্ত বেড়া দেয়ার দায়িত্ব স্যার সইরীল রেডক্লিফ এর উপর বর্তায়। তিনি অবাক হওয়ার মত কিছু বিবেচনা করছিলেন, তিনি ভারত সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, কখনও কিছু লিখেন নি, অথচ তিনি এর সঙ্গে যেকোন একটিতে বিজড়িত হওয়াতে আইনগত সমস্যা দেখা দিয়েছে। সত্যি যে তিনি কখনও এ উপমহাদেশে আসেন নি। যাই হোক, অভিজ্ঞ বাউন্ডারী কমিশন তাকে একাজে সহযোগিতা করেছে, তা ছিল নিশ্চিত হয়ে সংখ্যাগুরু মুসলিম এলাকা এবং অমুসলিম এলাকা সীমারেখা চিহ্নিত করা, এটা করতে গিয়ে তিনি অন্যান্য দিকও দেখেছেন, তবে কখন, স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেনি। গভীরভাবে দেখে বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে ভাগ করা হয় এবং বিভাজন উপদেষ্টা পরিষদের বক্তব্য জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়, বাউন্ডারি কমিশনের কাজকে গ্রহণ করার জন্য সদস্যদের বলা হয় এবং তাঁরা যা কিছু করুক না কেন পক্ষপাতহীনভাবে প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়।

বাউণ্ডারি কমিশন সীমান্ত নির্ধারণে অসততার পরিচয় দিয়েছে বিশেষ করে কোলকাতার সীমানা নির্ধারণে, প্রকৃতপক্ষে কোলকাতা ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত, এটা ১৯০০ সালে প্রবিধানের পরিণতি, অসংখ্য মুসলমান জনসংখ্যার যারা চট্টগ্রামে বসবাস করত তাদের বিরুদ্ধে কিছু নূতন অধিকৃত উপজাতি দলের উন্নয়ন করা হয়। তাদের এই অস্বচ্ছ কাজের প্রতিফল ঘটেছে স্যার সাইরিলের ভাষণে অস্বাভাবিক মূল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে বঙ্গদেশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা তিনি বিবেচনা করেছেন।

(১) দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে (পাকিস্তান অথবা ভারত) কোলকাতা শহরকে কি বণ্টন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দেয়া যায় অথবা তাদের মধ্যে কোলকাতাকে কি ভাগ করে দেয়া সম্ভব?

www.pathagar.com

(২) যদি কোলকাতাকে একটি দেশের ব্যবহারের জন্য দেয়া হয় তাহলে এলাকার জন্য অন্যদের অপরিহার্য দাবী যেমন সংলগ্ন নদী ব্যবস্থা যার উপর শহরজীবন ও বন্দরের কার্যাবলী নির্ভর করে সেটার কি হবে?

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রামে অল্প সংখ্যক মুসলমান নিয়ে যারা বাস করত তাদের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে অন্তরঙ্গ ভাব আছে পূর্ব বাংলার সঙ্গে।

সকল উপজাতির দলকে এক জায়গার জড়ো করার বিষটি একটি কুটিলতার প্রমাণ এবং এখানে শুধু মাত্র চাকমারা ছিল এবং স্বাধীকার প্রাপ্ত ছিল এবং মুসলমানরা সংখ্যালঘু ছিল এর কারণ ১৯০০ সালের প্রবিধানের ফল পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমানদের বসতি স্থাপনে বিধিনিষেধ ছিল। যদি সত্যিকারভাবে জনসংখ্যা তাত্ত্বিক গণনা করা হয় এবং চাকমাদের বাদ দিয়ে মুসলমান এবং অন্য আরও যে দশটি উপজাতি দল আছে তাদেরকে নিয়ে হিসাব করলে দেখা যাবে তারা সংখ্যাগুরু, কিন্তু প্রশ্নটি এমনভাবে করা হয়েছে যে কোলকাতাকে বাদ দিয়ে কথা বলা হোক (যেখানে প্রচুর মুসলমানের বাস) এবং কোলকাতাকে ভারতের ভাগে দেয়া হয়, পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া অন্যায় হবে। ভারতের পক্ষে এত সুবর্ণ সুযোগ আসার পরেও বৃহত্তর দলের অংশ কিছু ব্যক্তির দল সীমানা মেনে নেয় নি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে/কোলকাতা সম্পর্কে তাদের পদ্ধতি স্যার সাইরিল কর্তৃক উদ্ভাবন একটি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যবস্থা যা পরবর্তী দেশগুলোতে ঘটবে সে বিষয়ে সর্তক হওয়ার নিদের্শ রয়েছে।

সরদার বল্লভভাই প্যাটেল (একজন কংগ্রেস নেতা) মাউন্টব্যটনের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধি নিয়োগের বিষয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন (সম্ভবত একমাত্র চাকমাদের ব্যাপারে কারণ অন্যান্য উপজাতিরা ১৯৪৭ সাল থেকে ভারতের সাথে সহযোগিতা করছিল না) মাউন্ট ব্যাটেনের নিকট তিনি অভিমত দিয়েছিলে যে তাঁরা ভীষণ ভয়ে আছে এই ভেবে যে তাদের এলাকাও পাকিস্তানে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যেতে (তিনি নিম্নবর্ণিত মন্তব্যগুলো কারেছন যা) পারে, এইচ ভি হড্‌শন এর "দি গ্রেট ডিভাইড" এ লিখিত বিষয়ের সঙ্গে মিল আছে। সরদার প্যাটেল লিখেছেন যে আমি তাদেরকে বলেছি যে প্রস্তাব ভয়ঙ্কর যদি কিছু ঘটে আর তাঁরা যদি সর্বাধিক শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করে তবে তাদের প্রতিরোধ যুক্তিসঙ্গত হবে এবং আমাদের পক্ষ থেকে সর্বাপেক্ষা বেশি সমর্থন পাবে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবেই দেয়া হয়। স্যার সাইরিল রেডক্লিফ এর কোন কারণ দর্শান নাই। কিন্তু বাংলার গভর্ণর এর মতে, পার্বত্য এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণরূপে পূর্ব বাংলার উপর নির্ভরশীল।

১৯০০ সালে প্রবিধান অনুমোদনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিটিশ সরকার যে ভুল করেছে সে দায়িত্ব স্বীকার করে পুনরায় সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা অতিশয় বিলম্বিত হয়েছে অথবা কোলকাতাকে হারানোর ব্যাথাকে বাঙলার মুসলমানদের মন থেকে মুছে দেয়ার জন্য সামান্য চেষ্টা করে স্বাদবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। যেকোন উপায়ে চাকমাদের পক্ষে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব শুধু ছলনামাত্র, যেকোন উপায়ে বাংলাকে যুক্ত রেখে হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণেও প্রভাভাধীনে রাখাই আসল উদ্দেশ্য। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সমর্থনে চাকমাদের কিছু দল ঝোঁপ বুঝে কোপ মারার মত ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের পতাকা উত্তোলন করেছিল। ভারত

www.pathagar.com

সমর্থক চাকমারা যুদ্ধের অবস্থান জানিয়েছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বেলুচরেজিমেন্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করার সাথে সাথে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ বাতিল করা হয়েছে, কোলকাতায় কংগ্রেস দল এবং ক্ষমতাশালী হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য বঙ্গ দেশের ভাগকে ঈর্ষাভরে গ্রহণ করা হয়েছিল, আশা করেছিল ভবিষ্যতে হারান অংশ উদ্ধার করা যাবে। মুসলমানদের অনুকূলে যে ভূভাগ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বচ্ছ বলে বিবেচনা করে এর বিরুদ্ধে অনবরত অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল এবং তারা শিক্ষা, অর্থ, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক অচরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাই যথাযথভাবে স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করে অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব বিরোধীতা করে কারণ বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ লোক ছিল কৃষিজীবী এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁদের কোন লাভ হবে না।

কংগ্রেস দল ইতোমধ্যে এ ধরণের অনেক উদ্বিগ্নতা এবং ভাব প্রবনতা বিরোধীতার কারণে প্রকাশ করেছে এবং ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন কর্তৃক ১৯০৫ সালে প্রস্তাবিত বাঙ্গালার প্রশাসন ব্যবস্থাকে বিভক্ত করে। ১৯০২ সালের মূলপ্রস্তাব এ্যান্ড্রু গ্রাম ফ্রাজের দ্বারা প্রেরণ করা হয় পরবর্তীতে বাংলার ল্যাফট্যানেন্ট গর্ভণর আসাম প্রদেশের সীমানা বর্ধিত করেন বাংলার পূর্বাদিকের জেলাগুলোকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করেন (পশ্চিম বাংলার বিহার এবং উড়িষ্যার প্রশাসনিক অবকাঠামো থেকে পৃথক করা হয়)। জানা যায় চট্টগ্রামের স্থানীয় লোকদের সমর্থ পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু কংগ্রেস দল এবং পশ্চিম বাংলার ক্ষমতাধর হিন্দু ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চিৎকার করে বিরোধীতা করতে লাগল। ডেভিড্ গিলমোর তাঁর আত্মজীবনীতে লর্ড কার্জন এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছেন যে যখন এখানে কেহই ছিল না তখন আসামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে চেয়েছে, মুসলমান অধিবাসীর জনসংখ্যার ৭০% ছিলেন, তাঁরা খুশি হবেন জেনে যে ঢাকাভিত্তিক আরও একটি প্রদেশ তাদের সঙ্গে যুক্ত হলে যুক্ত আসাম হবে। এই সংশোধন প্রস্তাব পশ্চিম বাংলার হিন্দুদের নিকট দৈব অভিশাপ বলে মনে করল এবং তাদের আপত্তির কারণে পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের নিকট দরখাস্ত করার ভিত্তি তৈরি করে এবং সীমানা নির্ধারণ কমিশনের প্রতিবেদন থেকে যা পাওয়া গিয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনার সময় পার্টিশন কাউন্সিলের মধ্যে উত্তেজিতভাব থাকায় সমন্বিয় হয় নি।

১৯০৫ সালে হিন্দুদের যুক্ত বাংলার (অর্থাৎ একটি অখণ্ড বাংলা) দাবীতে তাঁরা অদম্য ও অটল ছিল এবং এই দাবী তাদেরকে উদ্দীপিত করত এবং ভারতের ও পশ্চিম বাংলার অনেক মানুষকে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল ফলে মুসলমান প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের তিক্ততা সৃষ্টি হয় যা বহু দশক ধরে চলতে থাকে। একই ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় দলের ইচ্ছা অখণ্ড ভারতের মত সমস্ত অঞ্চল ১৯৪৭ সালের পূর্বের সীমানার পুনরায় একটি হয়ে যাক। পণ্ডিত জওহার লাল নেহেরু, মাধব সদাশিব গোলওয়ার এবং ডঃ কালীদাস বৈদ্যের লেখা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় যে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর পূর্ব পাকিস্তানের অধিকারের ব্যাপারে তাঁরা আপত্তি করেছিল এবং শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল এ অঞ্চল মুসলমানদের বসতি বৃদ্ধি পেতে থাকলে তাঁরা প্রতিবাদ করে। চট্টগ্রামকে পূর্ব

www.pathagar.com

পাকিস্তানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করায় একটি যন্ত্রনাপূর্ণ সংকট এবং ১৯০৫ সালের মূল বক্তব্যে এর বর্ণনার অনুভূতি গভীরভাবে চিন্তান্বিত করে এ বিষয়ে আবু আল সয়ীদ এর লিখিত পুস্তকের (১) শিরোনাম "সাতচল্লিশের অখন্ডবাংলা আন্দোলন" ঃ পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (৪৭ ইউনাইটেড বেঙ্গল মুভমেট ঃ ইস্ট পাকিস্তান টু বাংলাদেশে)। সৈয়দ যুক্তি দেখিয়েছেন যে ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ হয়ে গেলে ঢাকা পূর্ব বাংলার রাজধানী হয়, কোলকাতা দুঃখজনকভাবে অপমাণিত হয় এবং কোলকাতা বন্দরের ক্ষতি হয়। কোলকাতা বন্দরের গুরুত্ব আরও কমে যাবে বলে ভয় আছে, কারণ চট্টগ্রাম বন্দরের দ্রুত উন্নতি পশ্চিম বাংলার হিন্দু সমাজ বিশেষে করে ব্যবসায়ী মার্চেন্টদের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া হবে।

১৯১১ সালে পঞ্চম জর্জ কর্তৃক বঙ্গ বিভাগ রদ করে দিলে বাঙালি হিন্দু সমাজের জন্য অসুবিধা অমঙ্গল লাখব হয় বলে তাঁদের ধারণা। যা হোক ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর ভারতের বাঙালি হিন্দুরা পুনরায় ১৯০৫ সালের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে উদ্ধার করতে চায় এবং বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলনের দ্বারা চট্টগ্রামে বন্দরের সুবিধা ভোগ করার প্রয়াস পায় অথবা ১৯৯৮ সালে সেন্টার ফর ডায়ালগ কর্তৃক আয়োজিত ঢাকায় এক সেমিনার প্রাক্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী আই,কে গুজরাল প্রস্তাব করেছিলেন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মিমংসা করে উৎসাহ জাগিয়ে চট্টগ্রাম ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রামসহ ভারতে ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্য নিয়ে একটি উন্মুক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করা, ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম বন্দর এবং চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কার্যকর ক্ষমতাসম্পন্ন না হলেও ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে, তাতে দেশকে কলহে লিপ্ত করবে এবং চতুর্দিকের বিদ্রোহ ভারতের উত্তর পূর্ব দিককে দুর্দশাগ্রস্ত করে ফেলবে।

ভারতে জাতিগত ও সাম্প্রদায়িত্ব যে বিভেদ বিরাজমান তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৪৭ সালের মত সুযোগে অবস্থা পরিবর্তিত হতে পারে, তুলনামূলকভাবে বলা যায় একদা স্বাধীনতা প্রাপ্তরাজ্য অরুনাচলপ্রদেশ, আসাম, মেঘালয়া, মনিপুর, মিজোরাম নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরা ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়ে ১৯৪৭ সালের পরে ভারতের বশ্যতা স্বীকার করায়। তাঁরা ইতোপূর্বে কখনও নতুন দিল্লীর উপর নির্ভরশীল ছিল না এবং স্মরণাতীতকাল থেকে সার্বভৌম কর্তৃত্ব থেকে মুক্তা ছিল এবং তাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস সবকিছুই ভারতীয়দের থেকে পৃথক। ত্রিপুরা, মেঘালয়া, এবং মনিপুর ১৯৭২ সালে ভারতের রাজ্যে পরিণত হয়, নাগাল্যাণ্ড ১৯৬৩ সালে, মিজোরাম এবং অরুনাচল প্রদেশ ১৯৮৭ সালে রাজ্যের পদমর্যাদালাভ করে, এ সবগুলি বিষয় বিদ্রোহ, নিয়মিতভাবে হিংসাত্মক ঘটনা ও বিক্ষোভের ফলে হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি পার্বত্য চট্টগ্রাম সরাসরি বৈষম্য প্রদর্শন করছে, অথচ বাংলাদেশের অচ্ছেদ্য, নির্ভরশীল এবং অখণ্ডনীয় অংশ, এবং ৮০০ বছর পূর্বে যখন প্রথম মুসলমানরা এদেশে এনে চট্টগ্রামের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং বাংলার সুলতানদের শাসনামল থেকে বাঙ্গালিরা বসতি আরম্ভ করে। বর্তমানে চাকমাদের বিদ্রোহ ভারতের সহায়তার জন্য সাহস পাচ্ছে এবং ভারত চাচ্ছে ১৯৪৭

www.pathagar.com

সালের বিভক্তিকে পুনরায় সমন্বয় সাধন করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পাকিস্তান শাসনকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে (The CHT from 1947-1971, The Pakistan Period)

১৯০০ সালের প্রবিধান দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামের পদমর্যাদা এবং অভিবাসন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পাকিস্তান শাসনামলে উক্ত প্রবিধান বিলুপ্তকরা হয় এবং ১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে দেশের একটি বহিস্থ অঞ্চল হিসেবে সাংবিধানিকভাবে পদমর্যাদা বাতিল করে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমানদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। আইনগত, রাজনৈতিক এবং সংবিধানে পরিবর্তন আনার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের পদমর্যাদা উলট-পালট করা সম্ভব হয়েছে কারণ ১৯০০ সালে প্রবিধান এর পরিনতি ছিল পক্ষপাতমূলক প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট থেকে জানা গেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিম্নাঞ্চলের জনসংখ্যা পাঁচগুণ অর্থাৎ ২৬,০০০ থেকে ১,১৯,০০০ হয়েছে ১৯৫১-১৯৬১ সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি প্রাকৃতিক নিয়মে জনসংখ্যা ক্রম বৃদ্ধি পেত এবং জনসংখ্যা বিষয়ক ক্রমান্বনয়িক উত্থান অব্যাহত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হত তাহলে একজন অনুধাবন করতে পারত যে, ১৯০০ সাল থেকে হস্তক্ষেপের পর ৫০ বছরে যখন থেকে ব্রিটিশরা তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্য জমির ব্যবহার নিশ্চল, প্রতিযোগিতাহীন এবং এক চেটিয়াভাবে সুবিধা ভোগ করত, ১৯০০ সাল থেকে ৫০ বছরে জমির ব্যবহার এবং অবাধে বসতি স্থাপন করে কতটুকু উন্নতি লাভ হয়েছে তা তুলনাকরা যেত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প (১৯৫৯-৬৩) অনুমোদন করে এই প্রকল্পে অর্থায়ন করে ইউনাইটেড স্টেট এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশল ডেভেল্পমেন্ট। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগের মধ্যে কর্ণফুলী কাগজেরকল স্থাপন করে উক্ত এলাকার জঙ্গলকে কাজে লাগানো হয় এবং বিভিন্ন ধরনের কাঠ পরিচয় লাভ করে প্রচুর পরিমাণে টিক কাঠ, বাঁশ কাগজের মণ্ড তৈরির কাজে লাগানো হয়। অতএব কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প (যা কাপ্তাই ড্যাম নামে পরিচিত) নির্মাণ করলে প্রায় ৫৪০০০ হাজার কৃষিজমি অর্থাৎ মোট ৪০% পানিতে ডুবে যাওয়ার ফলে প্রায় ১০০,০০০ লক্ষ উপজাতি (অধিকাংশ চাকমা উপজাতি) গৃহহীন হয়ে পড়ে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করে অর্থাৎ পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও পুনঃস্থায়ীকরণ এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হলে যে কেউ অকাট্য যুক্তিতে বলবে এ ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য।

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং ক্ষতি পূরণ দেয়ার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে সম্পর্কে দেশের লেখক, মন্তব্য করে ও বিশেষজ্ঞদের মতামত দ্রুত প্রকাশ পায়, সাহায্যের প্রকৃত অঙ্কের সঙ্গে অনেক পার্থক্য দেখা যায়, সর্বঙ্গীনভাবে সাহায্য মোটের উপর অপ্রতুল ছিল। এ কারণে বিশেষ করে চাকমাদের মধ্যে অসন্তষ্ট বিরাজ করে, প্রকল্পের জন্যতারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, পাকিস্তান আমলে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে যুদ্ধদেহী মনোভাব দূর করা হয়েছিল ফলে আর কোন বিদ্রোহ হয় নি। রাজা ত্রিদের রায়, চাকমা উপাজাতি প্রধান এবং রাজনৈতিক দর্শনে পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতীক প্রকৃত ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারেন। ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশ বাস্তবরূপ লাভ করে তখন

www.pathagar.com

তিনি চুপ থাকেন এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের আনুগত্য স্বীকার করে চাকমাদের কোন নেতা না রেখে চলে যান এবং ১৯৭৮ পর্যন্ত এঅবস্থাই ছিল। চাকমাদের মধ্যেই মনোভাব প্রকাশ করে যে অনেকেই স্বাগতিকভাবেই মুসলমান শাসকদের প্রতি অনুরাগী ছিল, কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় বাস্তুহারাদেরকে নিয়ে যাদেরকে ভারত প্রশ্রয় দেয়াতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ খুঁজতে থাকে, কারণ ১৯৪৭ সালে বিভক্তির পর থেকে তাঁরা শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে।

প্রাক্কলন করে দেখা গিয়েছে প্রায় ৪০,০০০ হাজার বাস্তুহারা (প্রভাবশালী চাকমা) উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ভারতে চলে যায়, কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে তাঁদের স্থানচ্যুতি এবং ক্ষতিপূরণের জন্য সরকার যা দিয়েছে তা অপ্রতুল। আরও একটি সমস্যা ছিল তা হল সকল বাংগালী মুসলমানরা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি কর্মকাণ্ডে সকল শাখাতে তাঁরা প্রয়োজনীয় বিনিযোগে জোগান দেয়, অথচ জানা যায় যে রাজধানী শহর নির্মাণ কাজের খরচের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরণ করা হয়। বাস্তুহারাদের মধ্যে অনেকেই বিরল বসতিস্থাপন এলাকা ভারতের মিজোরাম, ত্রিপুরা, আসাম এবং অরুনাচল প্রদেশের চলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত এ সমস্ত রাজ্যে নাগিরকত্ব লাভের প্রচেষ্টায় তাঁরা ব্যর্থ হয়। যখন এ খবর প্রকাশ হয় যে সরকার বাস্তুহারাদের তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে, তখন ভারতের সুপ্রিমকোর্টে নির্দেশ জারি করে অরুনাচল প্রদেশে যে সমস্ত চাকমা বাস করে তাঁরা ভারতের নাগরিক, কিন্তু সরকার আদালতে নির্দেশ অমান্য করে উচ্ছেদ কার্য চালিয়ে যায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ভারত তাঁর দেশের নদী সংযোগ কৃষি এবং বাঁধ প্রকল্পের দ্বারা বাস্তুহারা মানুষের প্রতি একই লক্ষণমূলক আচরণ করেছে, তাৎক্ষণিকভাবে বলা যায় সর্দার সরোবর জলধারের কথা, এছাড়া ৩৬০০ অন্যান্য বাঁধ যা স্বাধীনতার পর ভারত তৈরি করেছে, অরুন্ধতী রায় মোটামুটিভাবে হিসেব করে দেখেছেন যে প্রায় ৩,৩০০০,০০০ - ৫০,০০০,০০০ মানুষ বাস্তুহারা হয়েছে যাদেরকে কোনরূপ সাহায্য সহযোগিতা কখনও দেয়া হয় নি।

এ পটভূমি দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বহু সংখ্যক নালিশের কারণ ভুল বোঝাবুঝির এবং সরাসরি শত্রুতা যা ভারত নিজের স্বার্থের জন্য তৈরি করে শোষণ করছে এবং এলাকাভুক্ত করাকে অন্যায় বলে মনেমনে উপলব্ধি করছে কিভাবে পুনরায় সমন্বয় সাধন করা যায় তাছাড়া নূতন করে ভারত বিভক্তির পরিকল্পনাকে অখণ্ড ভারতের আওতায় নিয়ে আসবে কথা পুনঃলিখতে হবে। এ ধারণার একজন দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন মেজর জেনারেল এস, এস, উবান যার কথা আমরা ৩য় ও ৪র্থ অংশে লিখেছি, যিনি ১৯৭১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে শক্তি প্রয়োগ করে ছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিন দর্শক ধরে ঐ অঞ্চলের সংগ্রামরত বিদ্রোহী আন্দোলনের ঘটনাবলির পূর্বাভাষ পেয়েছেন।

তিনি তাঁর লিখিত পুস্তক "ফ্যান্টম অব চিটাগাং" এর একটি অধ্যায় মিজোরামে স্থানীয় বসবাসকারী মিজো উপজাতির প্রতি উৎসর্গ করেছেন। একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় একটি উপজাতির সম্পর্কে লেখা বিষয় ১৯৭১ সালের এবং চট্টগ্রামে সামরিক শক্তি প্রয়োগের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, যদি না কেহ পার্বত্য চট্টগ্রামের মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং মিয়ানমার এর উপজাতিরদের সঙ্গে সম্পর্ক কি তা না জানে তবে এ পুস্তকে অধ্যায়টি সংযোজন সম্পূর্ণ রূপে বেমানান। ১৯০০ সালের প্রবিধান আমরা দেখেছি, তাতে উল্লেখ আছে যে চাকমা, মগ, পার্বত্য স্থানীয় উপজাতির যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে লুসাই পাহাড়, আরাকান

www.pathagar.com

পার্বত্য এলাকা ত্রিপুরা রাজ্যের লোক ছাড়া অন্য কোন লোক প্রবেশ করতে অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি করতে পারবে না যদি ডেপুটি কমিশনারের নিকট থেকে অনুমতি পত্র আদায় করতে না পারেন।

আরাকান পার্বত্য এলাকা বর্তমানে মিয়ানমারে অবস্থিত এবং লুসাই পার্বত্য এলাকা নিয়ে এখন ভারতে পৃথক মিজোরাম রাজ্য গঠিত হয়েছে যা পরোক্ষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় ১৯০০ সালের প্রবিধানের ক্ষমতা এবং বল প্রয়োগ করে উক্ত এলাকায় বসবাসরত অলস উপজাতি দলের সঙ্গে মিত্রতা করে এবং ভৌগোলিকভাবে সন্নিহিত অঞ্চলগুলো পরিবেষ্টন করে একটি স্বায়ত্বশাসিত রাজ্য গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছে যার পরিধি পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। ব্রিটিশরা শীঘ্রই অনুধাবন করল যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মিজোরাম অথবা ত্রিপুরার সঙ্গে একত্র করা সম্ভব নয়। কারণ পরবর্তী অঞ্চলগুলোর স্বাধীনতা এবং নিজস্ব সরকার গঠনের লম্বা ইতিহাস আছে এবং যার অধিবাসীরা উৎকৃষ্টতর উপজাতি কিন্তু দৃষ্টি ভঙ্গি বিদেশী প্রভাবাধীন করে কলঙ্কিত করেনি এবং নবমদশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপিয়ানদের আগমনের পূর্বে তারা চিন্তা ও করেনি। ত্রিপুরার উপজাতি রাজা কোন প্রকার বাধা বিপত্তি ছাড়াই প্রায় শত বৎসর তার এলাকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং মিজোরামে মিজোউপজাতি যারা তাদের মূলউৎপত্তি চীন থেকে পঞ্চম শতাব্দীতে এ সি ই এদেশে এসেছে এবং তাঁরা মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। মিজোরাম ১৯৩৫ সালে যথোচিতভাবে কার্যাদির জন্য মনোনীত হয়েছে। "সম্পূর্ণভাবে পৃথক অঞ্চল" হিসেবে আসাম তাদের ভাবপ্রবণতাকে এবং ধৈর্যকে উত্তপ্ত করার জন্য সাহায্য করছে। স্বাধীনতা ও মুক্তির ব্যাপারটি ব্রিটিশ হৃদয়ে প্রথিত করে দেয় যা তাদেরকে ভারতের সাথে সম্পৃক্ত করার পরই স্বাধীনতার দাবীকে চাঙ্গা করে তুলে। ভবিষ্যতের বীজ বপন করার সঙ্গে ব্রিটিশ জড়িত ফলে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় মিজোদের হুমকি কে উচ্ছেদ করার জন্য মেজর জেনারেল এস এস উবানকে ক্ষমতা দেয়া হয়।

ব্রিটিশ সরকার এসময় প্রতিক্রিয়াশীল সীমান্ত এলাকায় সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ব্রিটিশ মিশনারীদেরকে সকল প্রকার সুযোগ দিয়ে বলা হয় এ সমস্ত সাধারণ উপজাতির লোকদেরকে খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করে পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দেয়ার তাগিদ দেয়া হয়। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, ব্রিটিশ রাজনৈতিক কর্মকর্তা, কুখ্যাত খলনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পুস্তিকার পর পুস্তিকা লিখে লোকদের শিক্ষা দিয়েছে রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারণে জাতির স্বাধীনতার অধিকারের। তিনি চার্চের নেতা এবং মিশনারীদেরকে ব্যবহার করেছেন মিজোদেরকে উত্তেজিত করতে। এই বলে যে ভারত তাদের সংস্কৃতি ও ধর্মের ক্ষতি করে স্বীয়স্বার্থ সাধন করছে এবং তাদের আসন্ন বিপদ হল ভরত সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় করে তুলবে এবং সম্প্রতি যে পশ্চিমা শিক্ষা পেয়েছে তা ধ্বংস করে দিবে। তিনি মিজোইউনিয়ন নেতাদের নিকট যেয়ে ভয়াবহ পরিণতির কথা বলেছেন। যদি তাঁরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের বৃহৎ স্বাধীনতা দলের লাগাম টেনে না ধরে তবে তাদের সবকিছু হারিয়ে যাবে। তিনি তাদেরকে বলেছেন, তোমাদের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে ব্যবহার করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তোমাদেরকে নোংরা ময়লা ফেলার মত গর্ত করে ফেলে দিবে। এটা ইঙ্গিত পূর্ণ যে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের বিষয়ে ব্রিটিশরা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে এবং তারা ধর্মান্তরিত

www.pathagar.com

করার কোন চেষ্টা করেনি, উপজাতিদের চিন্তাধারকে এবং ভারতের সঙ্গে কনফেডারেশনের ধরণকে ব্রিটিশরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে যা হিলম্যান এসোসিয়েশন কংগ্রেস নেতাদের নিকট উপস্থাপন করেছিল, এসমিতি ১৯৪৬ সালে এ অঞ্চলের কয়েকজন উপজাতি প্রধান গঠন করেছিল। অন্যদিকে ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে মিজো উপজাতির ছিল সত্যিকারভাবে পৃথক, অতএব স্বাধীনতা ও মুক্তি বিষয়ে সহজভাবে বৃটিশ মিশনারি ও কূটনৈতিকদের শিক্ষায় আরোপ করা হয় নি। ১৯৬১ সালের ২২ অক্টোবর মিজোরামে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়, নাম দেয়া হয়েছিল 'মিজোন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএস)' এর সভাপতি ছিলেন মিঃ লালডেনগা, যিনি স্বাধীন মিজোরাম রাজ্যের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তিনি বলেছেন, যদি প্রয়োজন হয় তবে বিদ্রোহের অবস্থা সৃষ্টি করে হিংসাত্মক পন্থায় শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা হবে।

মেজর জেনারেল উবান এর দায়িত্ব ছিল ক্রমেক্রমে ও অলক্ষিতে অনুপ্রবেশ করা এবং ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের মিজো উপজাতিকে তাঁর গেরিলা আক্রমণের দ্বারা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া এবং কার্যকলাপের সমর্থনে একটি মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে অপরের দুষ্কর্মের ভার পাকিস্তান ও চীন সামরিক বাহিনীর উপর ফেলে দিয়ে দৃষ্টি অন্য দিকে পরিবর্তন করে স্পেসিয়াল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স কে ঐ অঞ্চলে মিজোদের শক্তিশালী অবস্থানে যে স্থানে বেশী বাস্তহারা আছে সেখানে আক্রমণ পরিচালনা করা। উবান একটি বিষয় উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তা হল পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে পাকিস্তানী সৈন্যদের সুযোগ হয়ে গেল মিজোদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সাহায্য করা এবং মিজোউপজাতি বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে যুক্তভাবে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সম্ভবতঃ পাকিস্তানী এবং মিজোরা আত্মরক্ষমূলকভাবে কাজ করছে এবং এসএসএফ ছিল আগ্রাসী দল উবান এর পুন নির্দেশের মধ্যে সন্দেহ করে, তার অপারেশন ঈগলকে সুযোগ প্রদান করা।

উবান এর কার্যাদি সাধনার্থের আরও একটি উদ্দেশ্য তাঁর পুস্তকে নবম অধ্যায় থেকে উদ্ধার করা সম্ভব যেখানে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিখেছেন তা সমারিক জরিপের বৈশিষ্ট্যমূলক প্রতিনিধিত্বকারী কাজ যা ভবিষ্যতে এ অঞ্চলের সামরিক অভিযোনর্থে ব্যবহারের জন্য এ তথ্য সম্ভবত 'র' এর জন্য অমূল্য সহযোগিতা যা চাকমা বিচ্ছিন্নতা বাদী বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ১৯৭০ সাল থেকে সমন্বয় করছে।

উবান চালাকি করে ইঙ্গিত দিয়েছে যে এ সহযোগিতা ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় থেকে আরম্ভ হয়েছে এসএফকে কাপ্তাই বাধ ধ্বংস করার উদ্দীপিত করেছেন, (এটি একটি পরিকল্পনা ছিল যা পরিবর্তীতে বাতিল করা হয়েছে কারণ তাদের ধারণা ছিল ভারত যদি পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ থেকে পৃথক করে নিতে পারে তবে এটা তাদের কাজে লাগবে) কিন্তু তাদের নির্দেশনার সীমা পরিণামে আরও বেশী নিয়ন্ত্রণ করে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণের গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়।

মিঃ উবান খোলাখুলিভাবে মিঃ রমেশ নাথ কাও এর নিকট স্বীকার করেছেন যে এস এফ এফ এর বৈধ কার্যাবলীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেয়া হবে, কারণ 'র' এর ইতিহাসবিদ অশোকা রায়নার নিকট যাওয়ার জন্য তা প্রতিরোধ্যভাবে আমাদেরকে পরিচালিত করবে।

www.pathagar.com

তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে ভারতীয় গোয়েদা এজেন্সির সঙ্গে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্তে বাংলাদেশের সর্বাদিক দূরবর্তী অংশে চাকমা গেরিলারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল, তারা মুক্তিবাহিনীরকে পছন্দ করত এবং উভয় দল একত্র হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় 'র' এর কার্যকলাপ এবং ভারতীয় সৈন্য বাহিনীকে সাহায্য করত। চাকমা উপজাতি লোকদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিজো বিদ্রোহীদের কোন পার্থক্য নেই, তারাও অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে সজ্জিত হয়ে ভারতে উত্তর পূর্বাংশে বিদ্রোহকে দীর্ঘ করতে ইচ্ছুক। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমারা তাদের অধিকার হারাচ্ছিল, ক্রমেক্রমে তারা অলক্ষিতে মিজো বিদ্রোহীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করছিল, তাদের পরিবারদের আশ্রয়ের পরিবর্তে ভারত সরকারের নিকট তথ্য প্রেরণ করত। তাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

'র' এবং শান্তিবানিহীর সঙ্গে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার এবং গভীরতর করার এটাই ছিল ভূমিকা স্বরূপ, ১৯৭৫ সালে শেষ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার পর তাদের এ সম্পর্ক নবায়ণ করা হয়েছিল। উপরোক্ত আলোচনা আরও বেশী সমসাময়িক সময়ে হলে ট্রানজিট অধিকার নিয়ে ভারতের অতি আগ্রহের কারণ ব্যাখ্যা করতে সাহায্য হত উত্তরপূর্ব গোলযোগপূর্ণ রাজ্যগুলোর সঙ্গে সরাসারি ট্রানজিট দানের প্রস্তাবের অর্থ বাংলাদেশকে খণ্ড খণ্ড করা, পরোক্ষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের দীর্ঘ দিন যুদ্ধ করার জন্য সাহায্য করা, যার ফলে অখণ্ডভারতের বিস্তৃত পরিকল্পনাকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হত। এ ঘটনাটির বাকী অংশ পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যাবে।

রেফারেন্স ঃ

১. মোহাম্মদ মোহর আলী– হিস্টোরি অব দি মুসলিমুস ইন বেঙ্গল (১৯৮৫)
২. রবার্ট হারভে– ক্লাইভ দি লাইফ এন্ড ডেস অব এ ব্রিটিশ এনপয়ার (১৯৯৮)
৩. ডঃ নন্দিতা চৌধুরী– এ্যাথনেসিটি, হিউম্যান রাইটস ভায়গুলেসন এন্ড কলোনিয়াল লিগেগিস ইন বাংলাদেশ দি পোস্ট বাংলানিয়াল ট্রাজেক্টরি অব দি ঝুমল্যান্ড মুভমেন্ট (২০০৩)
৪. এলিনর ডিকটান বাং ওয়া– ইন সার্চ ফর স্পিস ইন দি চিটাগং হিল ট্র্যাকস অব বাংলাদেশ (২০০৪)
৫. কলিনস এন্ড লেপিয়ার– ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট (১৯৮২)
৬. এইচ ভি হডসন– দি গ্রেট ডিভাইড (১৯৬৯)
৭. ডেভিড গিলমোর– কার্জন (১৯৯৪)
৮. রফিউদ্দিন আহমেদ– দি বেঙ্গল মুসলিমস (১৮৭১-১৯০৬ (১৯৮৮)
৯. আবু আল সাইয়েদ– সাতচল্লিশের অখণ্ডবাংলা আন্দোলনঃ পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৯৯)
১০. মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন– দি চিটাগং হিল ট্রাকস।
১১. গণেশ থাপা– রুরাল পোভারটি রিডাকসন ষ্ট্রাটেজি ফর সাউথএশিয়া (২০০৪)
১২. সৈয়দ আনওয়ার হোসেন– ওয়ার এন্ড পিস ইন দি চিটাগং হিল ট্রাকসঃ রিটোস পেষ্ট এন্ড প্রোসপেক্ট (১৯৯৯)

www.pathagar.com

অধ্যায়-৫সি

শেখ মুজিবুর রহমান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম

Sheikh Mujibur Rahman and The CHT

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়, শেখ মুজিবুর রহমান নূতন এ দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আসীন হন, দেশটির আদর্শ হয় জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জোর দেয়া হয় জাতীয় চরিত্রের স্বতন্ত্র মর্যাদা বাঙালি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সমস্ত বাঙালি প্রাণ উৎসর্গ করেছে, খসড়া সংবিধান সম্পর্কে বিতর্ক কালে প্রধানমন্ত্রী আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে তা প্রকাশ করেন। এছাড়া পশ্চিম বাংলার সংখ্যা গুরুর সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে কিছু সন্দেহ জনক কথাও যথাযথ বর্ণিত হয়নি, এমন কিছু বিষয় মূল সংবিধানের ধারা-৩ এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্র ভাষা হবে "বাংলা" এবং সংশ্লিষ্ট ধারা-৬ এ বলা হয়েছে বাংলাদেশের নাগরিকরা এখন থেকে বাঙালি বলে পরিচিত হবে যা বিভ্রান্তিকর।

সংস্কৃতি, ভাষা, ইতিহাস, জাতিগত ধারণার সাথে নাগরিকত্ব এবং জন্মগত বা স্বাভাবিকভাবে আইনগত অধিকার, পদমর্যাদা, সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি অধিকারীদের অধিকার দান বিষয়ে বাংলাদেশের নেতৃত্বের মধ্যে পরস্পর বোঝাপড়ার অভাব প্রকট হয়ে উঠে। ফলে ক্ষমা চেয়ে চাকমা নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান গণপরিষদের একজন সদস্য এবং পার্বত্য চট্রগ্রামের একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সংবিধানে অন্যান্য জাতির সমাজের অস্থিত্বের পরিচয় না থাকাতে তাঁরা সমর্থন প্রত্যাখ্যান করে। সংবিধান লেখার সময় এবং দেশ গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে মং রাজা মং প্রু সাইন এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল, ঐ প্রতিনিধি দলে এম, এন লারমাও ছিলেন, ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহামনের সঙ্গে স্বাক্ষাৎ করেন এবং চার দফা প্রস্তাব পেশ করেন যা ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, তা ছিল বিচ্ছন্নতাবাদের সূত্রপাতের অভিসন্ধিঃ-

(১) নিজস্ব আইন প্রণয়ন কারী পরিষদসহ পার্বত্য চট্রগ্রামের স্বায়ত্বশাসন।
(২) বাংলাদেশ সংবিধানে ১৯০০ সালের প্রবিধান সংরক্ষণ
(৩) উপজাতি প্রধানদের দপ্তর চালু রাখা এবং
(৪) সংবিধানে এমন একটি শর্ত রাখতে হবে যেন ১৯০০ সালের প্রবিধান সংশোধন নিষিদ্ধ থাকে এবং উপজাতি ব্যতীত বাহিরের মানুষ অনুপ্রবেশ না করতে পারে।

শেখ মুজিব ক্রোধোম্মত ক্ষীপ্তাবস্থায় তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী দেশীয় লোকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে এবং সংখ্যাগুরু সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়ার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। ঘটনার পরে বুদ্ধির উন্মেষ এর সুযোগ এবং আসন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এবং চাকমা নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে সম্ভবত সবচেয়ে খারাপভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বিকল্প সনির্বন্ধ আবেদনের ভিত্তিতে নাগরিকত্বের আইনগত এবং কর্তব্য বিষয়ে

www.pathagar.com

প্রতিনিধিদের নিকট প্রস্তাব রাখা হয়, উদাহরণস্বরূপ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব (অস্থায়ী শর্ত) আদেশ এবং নাগরিকত্ব আইন ১৯৫১ যা শেখ মুজিবের আইন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সংশোধন করা হয়।

নাগরিকত্বের সঙ্গে অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রতিনিধিদের নিকট ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের আইনগত অভিব্যক্তির অর্থ কি সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা প্রয়োজন ছিল এবং নাগরিকত্ব পরিবর্তন করা যায় দেশ ছেড়ে চলে গেলে, এ উদ্দেশ্য নিয়ে যে, সে আর কখনও ফিরে আসবে না এবং তাঁর পছন্দমত স্থায়ীভাবে নির্বাসিত হবে; যেমনটি অষ্টাদশ, উনিশ শতক এবং বিশ শতকে চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি করেছিল, পুনরায় কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পর ৪০,০০০ হাজার উপজাতি স্থায়ী ভাবে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যায়। এটা নিশ্চিত জলন্ত উদাহরণ বিষয়টি হলো ১, ২ এবং ৪এর প্রতিনিধিদের দাবী ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে বিতর্কিত বাংলাদেশের অখণ্ডতা এবং নূতন জাতি হিসেবে নাগরিকত্ব অর্জন সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বিপরীতমুখী, কারণ তাদের অন্য কোন অধিকার ছিল না যা তাঁরা প্রয়োগ করতে পারে, (১) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তারা কেউ স্থানীয় ছিল না। এটা বলা প্রয়োজনাতিরিক্ত হবে না যে, ১৯৭২ সালের সংবিধানে পার্বত্য চট্টাগ্রাম অঞ্চলের জন্য বিশেষ পদমর্যাদা সংক্রান্ত কোন শর্ত ছিল না; এবং তাদের দাবী গ্রহণ করা যেত, কিন্তু চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে; কারণ দাবীর মধ্যে স্বায়ত্ত্বশাসন, ১৯০০ সালের প্রবিধানের কোন পরিবর্তন করা চলবেনা, করলে সংবিধানে শর্ত আরোপের দাবী তাদের কর্মসূচিতে প্রকাশ্য লিখিত ঘোষণা ছিল বলে গ্রহণযোগ্য হয় নি।

শেখ মুজিবুরের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হয়, ফলে ১৯৭২ সালের ১৬ মে এম, এন লারমার নেতৃত্বে গোপনে রাংগামাটি কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়। দি চিটাগাং হিল ট্রাকস পিপলস সলিডারিটি এসোসিয়েশন (পি,সি,জে,এস,এস), দি পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি গঠিত হয়। এবং উপরোক্ত সমিতির পক্ষে জনসংযোগের কাজ করে উভয় দল একই বছর গঠিত হয়। যদিও কয়েক মাস পূর্বে রাংগামাটি কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়। পি,সি,জে,এস,এস এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্ত্বশাসনের জন্য ব্যাপক প্রচার করা এবং এর ভিত্তি ছিল পাঞ্চায়েত ব্যবস্থা, পাঞ্চায়েতের সদস্যরা গ্রামের জনগণের ভোটে নির্বাচিত হত; বাস্তবে এ ব্যবস্থা একনায়কত্ব সুলভ এবং উচ্চ পর্যায়ের চাকমা উপজাতিদের মধ্য থেকে মনোণীত করা হত, আসলে এরা ছিল প্রাধান্য পূর্ণ শক্তি, যারা কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করত। শান্তিবাহীনির একটি সসস্ত্র দল তৈরি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে লেলিয়ে দেওয়া হয়; এ দলটি পি,সি,জে,এস,এস এর অংগ সংগঠন হিসেবে কাজ করে এবং এই দলটি উক্ত অঞ্চলে মানবতা বিরোধী কাজের জন্য দায়ী। ১৯৭৩ সালে ৭ জানুয়ারির দৃশ্য থেকে তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। ৮ মাসের কম সময়ের মধ্যে পি,সি,জে,এস,এস এর দখল থেকে তারা পৃথক হয়ে সঠিক এবং সন্তোষজনকভাবে পরিকল্পনা প্রস্তত এবং কার্যকারী করার কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সংবিধানের দুটি নীতি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে এবং স্বায়ত্ত্বশাসন অথবা বিচ্ছিন্নতাবাদী আদর্শ এর যুক্তিকে প্রকৃত প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমান নিশ্চিহ্ন করে

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন; তাঁর আরও একটি অশোভন ধারণা ছিল ক্রীতদাস সুলভ সিদ্ধান্ত যা পি,সি,জে,এস,এস কে অতিরিক্ত উৎসাহ যোগায় এবং শান্তি বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচন্ডভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে। ধারা ১ এ একক রাষ্ট্রের শর্ত এবং বাংলাদেশ এলাকার অখণ্ডতা ধারা ২এ বর্ণিত শর্ত দুটিই ১৯৭৪ সালের মে মাসে ইন্দিরা গান্ধী যখন শেখ মুজিবুর রহমান সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হয় তখন ভীষণভাবে ধ্বংসাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। চুক্তির ধারা ১.১৪ তে বর্ণিত হয়েছে যে,

দক্ষিণ বেরুবাড়ি ইউনিয়ন নং ১২ এর দক্ষিণের অর্ধেক এবং সংলগ্ন পরিবেষ্টিত প্রায় ২.৬৪ বর্গ মাইল এলাকা ভারতের অধিকারে থাকবে; এর বিনিময়ে দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা পরিবেষ্টিত এলাকা বাংলাদেশের অধিকারে থাকবে। ভারত তিন বিঘা করিডোরের ১৭৮ মিটার×৮৫ মিটার জায়গা বাংলাদেশের পানবাড়ি মৌজা (থানা-পাটগ্রাম)সহ দহগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বাংলাদেশ চিরস্থায়ী ইজারা পাবে।

চুক্তির শর্তানুযায়ী বাংলাদেশের বেরুবাড়ি ছেড়ে দেয়, ১৯৭৪ সালে সংবিধান সংশোধন আইন অনুমোদন করে; কিন্তু ভারত পারস্পরিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা না দিয়ে তিন বিঘা করিডোর দিয়ে দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতায় যাওয়ার অনুমতি দেয় নি; চুক্তি অনুযায়ী বিনিময়ের জন্য ১৯৮২ সালের ৭ অক্টোবর বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মি, এ, আর, সামসুদ্দৌলা ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী নরসিংহ রাও এর নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। কোলকাতা হাইকোর্ট এবং ভারতের সুপ্রিমকোর্ট উভয় আদালত রায় প্রদান করে যে তিন বিঘা ইজারা সম্পূর্ণরূপে আইনত বৈধ, কিন্তু ভারত সরকার ১৯৭৪ সালে চুক্তি সই করার ৩২ বছর পরও গড়িমসি করছে। নিশ্চিন্তভাবে বলা যাচ্ছে যে, এটি অন্য আরও একটি সর্বব্যাপী অখণ্ড ভারতের উদাহরণের চেহারা, ভারতের রাষ্ট্রশাসন কার্য এবং রাজনীতির সঙ্গে চাকমা বিদ্রোহীদের যোগাযোগ আছে বলে দেখা যায় এবং দেশের কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা এ সমস্ত বিদ্রোহীদের উৎসাহিত করবে বিশেষ করে এ ব্যাপারে অমনোযোগী হলে সব কিছু পন্ড হবে।

শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর ভারতের প্রতি অনমনীয় মনোভাব এবং পি,সি,জে,এস,এস এর প্রতি সরকারের আচরণ এবং শান্তি বাহিনীর কার্যকলাপের প্রতি কম সহনশীল অথবা কমলতা দেখান নি। সাধারণ নাগরিকদের দৃষ্টি ভঙ্গি দেশের স্বার্থের প্রতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দেশের অখণ্ডতা রক্ষা কারী অথবা যে কোন ধরনের অঞ্চলে যে কোন ধরনের সীমা লঙ্ঘন করা হলে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী অথবা বি,ডি,আর-দের সহায়তায় প্রচন্ডভাবে প্রতিহত করে, এমনকি যখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা ভয়াবহ অবস্থায় ছিল, এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সরকারের আমলে রাজনৈতিক অবস্থা বিশৃঙ্খল ছিল (অর্থাৎ বড়ইবাড়ি, রৌমারী উপজেলা, সিলেট ১৮ এপ্রিল ২০০১ দেশের অভ্যন্তরে জোর করে প্রবেশ করে) ফলে ২০০১ সালের নির্বাচনে তাঁর দল বহু ভোটের ব্যবধানে পরাজয় বরণ করে।

www.pathagar.com

১৯৭৫-১৯৮১ পর্যন্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা
(The Situation from 1975-1981)

শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর ভারত সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়ে বিবেচনা করছিল, কিন্তু অবশেষে সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং জরুরি অবস্থার কারণে কোন প্রকার সামরিক হস্তাক্ষেপ নিষিদ্ধ থাকায় বিপদ সম্ভবনাপূর্ণ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে (১৯৭৫ সালের ২৬ জুন ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন) অবস্থা বেগতিক হয়ে যেতে পারে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আন্তর্জাতিক সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে তাই বিরত হয়ে যায়। ভারত হস্তক্ষেপের ব্যাপারে বিকল্প পথ অবলম্বন করে এবং "র"কে কার্যকরী পদক্ষেপের নির্দেশ দেয়া হয় এবং শান্তি বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করে চাকমাদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করার তাগিদ দেয়া হয়ে যেমন ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় তাঁরা করেছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে অস্থিতিশীল করার জন্য ধ্বংসাত্মক কার্য পরিচালনার সকল প্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা "র" গ্রহণ করে এবং শান্তি বাহিনীর সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া আরম্ভ করে এবং ইন্দো-বাংলাদেশ শান্তি চুক্তির আদর্শ সরাসরি লঙ্ঘন করে একযোগে কাজ করার জন্য শক্তি বৃদ্ধি কল্পে ভারত সীমান্তে সন্ত্রাসবাদী ছাউনি বসায়।

১৯৭৫ সালে "র" কে নির্দেশ দেয়া হয় বিদ্রোহী চাকমাদেরকে অস্ত্রসস্ত্র সরবরাহ করে এবং প্রশিক্ষণ এর ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য। ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রশিক্ষন চলছিল; কিন্তু দেরাদূনের কাছে চাকমাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সন্তু লারমার শান্তি বাহিনীর সদস্যরা চকরাতাতে পালিয়ে গিয়ে ত্রিপুরায় ফিরে আসে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে অলক্ষিতে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। আগরতলাতে "র" এর দপ্তর এবং এর কর্মরত ব্যক্তিরা প্রশিক্ষিতদের অগ্রগতির প্রতি সদা দৃষ্টি রাখত। ১৯৭৬ সালে শান্তি বাহিনী প্রথম বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায় একটি নূতন বিদ্রোহী দল জন্মলাভ করে এবং ভারত গুপ্তভাবে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ আরম্ভ করে।

১৯৭৭ সাল থেকে শান্তি বাহিনীপার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনী এবং তাঁদের অবস্থান স্থল গুলিতে আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করে; প্রকৃতপক্ষে এ আক্রমণ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধের রূপধারণ করে যা ভীষণভাবে বহু মানুষের ক্ষতি করে, শুধু তাই নয়, বসতি স্থাপনকারী অউপজাতিদের উপর আক্রমণ চালায়, ফলে শত শত লোককে হত্যা করে এবং বিদ্রোহীদেরকে অপহরণ করে, এবং মুক্তি পণ দাবী করা আরম্ভ করে। অপহরণের ঘটনা, বহু জাতিক কোম্পানীগুলোকে বল প্রয়োগের ফলে "শেল" এর মত কোম্পানি তাদের বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে তাঁদের তৈল উত্তোলনের প্রকল্প বাতিল করে চলে যায়, ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে, এতে উদ্‌জান ও অঙ্গারজানের যৌগিক জাত পদার্থ উক্ত অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জমা হতে দেখা যাবে।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান অনেক নিস্পত্তিমূলক এবং স্বক্রিয় প্রস্তাবের সমর্থনে পদক্ষেপ নিয়ে বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ করার উপায় এবং ভুল বোঝাবুঝির সংশোধন করে যা ১৯০০ সালের প্রবিধান দ্বারা জনসংখ্যা বিষয়ক চিত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সৃষ্টি করা হয়েছে তা মূলগতভাবে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষই শুরু করেছিল এবং শেখ মুজিবর রহমানও তাই করেছে, কিন্তু উভয়ে খুব সীমিত এবং নেতিবাচক কায়দায় সাধারণভাবে উশৃঙ্খল আন্দোলনকে চলমান রেখে সংবিধানের ধারা ৩৬ এ বর্ণিত আছে যে সমগ্র বাংলাদেশে প্রত্যেক নাগরিকের অবাধে চলাফেলার নিশ্চয়তা আছে এবং যেখানে ইচছা যে কোন জায়গায় বসতি স্থাপন করতে পারবে।

সংবিধানে ধারা ৪২ এর পাশাপাশি বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের নিজের জন্য অর্জন, সংরক্ষণ, হস্তান্তর অথবা যে কোনভাবে সম্পত্তির যে কেন ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার আছে, শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে যাওয়ার ব্যাপারে বিধি নিষেধ আছে, কারণ সেখানের নিরাপত্তা এবং আর্থসামাজিক অগ্রগতি সম্পর্কে নিজেদের বিবেচনা করতে হবে। নূতন বসতি স্থাপনকারীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে শেখ মুজিবুর তাঁর নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে খুব বেশী অনুপ্রাণিত ও বিশ্বাসী ছিলেন না। শেখ মুজিব তাঁর মোসাহেবী মার্কা প্রশাসনের কারণে প্রেরণার অভাব থাকায় একজন বিশিষ্ট নেতা হিসেবে বেশ নূতন নীতি এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি। এ সমস্ত ত্রুটিগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের অল্পসংখ্যক অভ্যন্তরীণ (বাংলাদেশের অন্য অংশ থেকে আসা) ৫০,০০০ এর মত হবে স্বতন্ত্র (এ সংখ্যা অতিরঞ্জিত ও হতে পারে) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ হতে ১৫ আগস্ট ১৯৭৭ এর সময়ের মধ্যে অভিবাসীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই অল্পসংখ্যক অভিবাসীদেরকে কালীদাস বৈদ্য ভীষণ হুমকি বলে বিবেচনা করে এবং শেখ মুজিবুর রহমান প্রশাসনকে পার্বত্য চট্টগামে কৃত্রিমভাবে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী করেছে এবং চাকমাদের বিরোধিতা করায় তাঁরা অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। কালীদাসের মতে মুসলমানরা পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্রমেক্রমে এবং অলক্ষিতে অনুপ্রবেশ করছে এবং দার আল-হার্ব অঞ্চলকে দার আল-ইসলামে রূপান্তর করার চেষ্টা করে। সম্ভবত তাঁর অখণ্ড ভারত করার বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তাবায়নে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় এবং "র" এর পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন কারার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। যা হোক তিনি হয়ত উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন যে ১৫১৬ এ,সি,ই তে যুবরাজ নুশরাত শাহ বহু পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে ইসলামের আওতাভুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। চাকমাদের অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ এটাই হতে পারে না, এটা সংকটের ভিত্তি নয়, বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা যা শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে অনুমান করা হয়।

অতএব, যদি সত্যিকারভাবে চাকমাদের নৈরাজ্যের বীজ শেখ মুজিবুর রহমান রোপণ করে থাকে, তবে তা দূরিভূত করা হবে। সংঘর্ষ শান্ত করার জন্য প্রয়োজনবোধে সক্ষম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমঝোতা এবং আলোচনা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঙালিদের অভিবাসী হওয়ার নিশ্চয়তা লাভ করতে হবে। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে আদেশ নং ১ দ্বারা সংবিধানের ধারা ৬ বিজ্ঞতার সঙ্গে সংশোধন করে ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে বাংলাদেশের সকল নাগরিক

www.pathagar.com

বাংলাদেশী বলে পরিচিত হয়ে এক শ্রেণীভুক্ত হবেন বাংলাদেশের আওতাভুক্ত সকল জাতিগত সংস্কৃতি ও ধর্মীয় দলের পক্ষপাতবিহীন সকলের প্রতিনিধিত্বের অধিকার নিশ্চিত করেন। এতেও চাকমা বিদ্রোহী দল শান্ত হল না, তাঁরা অযৌক্তিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯০০ সালের প্রবিধান প্রয়োগ করে সরকারকে বাধ্য করে সমতল ভূমি থেকে বাঙালিদের বসতি স্থাপনকে বন্ধ করে দিতে চায়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান অযৌক্তিক দাবীকে উপেক্ষা করে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং বসতি স্থাপনকারীদের উৎসাহিত করার জন্য ইউ,এস, এইড, সুইডেন সরকার, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় অভিবাসীদেরকে পরিবহন আর্থিক সাহায্য, ছয় মাসের খাদ্যের সংস্থানসহ প্রতি পরিবারকে ২.৫ থেকে ৫ একর পর্যন্ত জমি বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

ফলস্বরূপ এ ব্যবস্থায় কলহমূলক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সুকৌশলে "র" আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিকর সম্মেলনের প্রতিবেদন ও পুস্তক প্রকাশ করে অসঙ্গত সংখ্যা বৃদ্ধির গঠন বাঙালি বসতি স্থাপন কারীদের উক্ত অঞ্চলে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ২৪ মার্চ ১৯৮২ পর্যন্ত সময়ে ৪,৪১,০০০ মুসলমানদের স্বতন্ত্র সংখ্যা প্রসারিত করে অথবা ১৯৮৫ পর্যন্ত ৪,০০,০০০ বাঙালি অন্য একটি প্রাক্কলনে একই সংখ্যা অতি অল্প সময়ে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৪ বলে প্রচার করা হয়, তবে তা অগ্রাহ্য করে সরকার আনুমানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনকারীদের সংখ্যা ১৯৯১ সালের শুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ী ৪,৭৩,৩০১ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

"র" এর প্রতিশ্রুত উদাহরণ এবং অনুরূপ মোট পরিমাণ মিথ্যা উদ্ভাবন করা হয়েছে, যৌক্তিকভাবে পরীক্ষিত ও অসঙ্গত, প্রকাশ্য স্পষ্টত প্রতীয়মান যদি কেহ বিবেচনা করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৫১-১৯৬১ সাল পর্যন্ত সময়ে নিম্নভূমির জনসংখ্যা ২৯০০০-১,১৯,০০০ উপনীত হয়েছে। একই সংখ্যক লোক যদি ঐ অঞ্চলে ১৯৬১-১৯৭১ সালের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে তাহলে বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের সংখ্যা ২,০০,০০০ লক্ষে ছাড়াবে, যা কিনা ১৯৭১-১৯৯১ সময়ে আরও ২,০০,০০০ লক্ষ বসতি স্থাপনে অনুমতি পাবে। এই পরিসংখ্যান চাকমাদের হিংস্রতাকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য কৃত্রিমভাবে নূতন করে অস্থিরতা তৈরির কারণ খুঁজে বের করা হয়েছে যাকে ইসরাইলীদের পশ্চিমে তীর ও গাজা উপত্যকায় বসতি স্থাপনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু এর বাস্তব তথ্যমূলক বা ঐতিহাসিক কোন ধরনের ভিত্তি নেই, পার্বত্য চট্টগ্রাম ৮০০ বৎসর পূর্ব থেকে মুসলমান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত ছিল।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে পার্বত্য চট্টগ্রাম বোর্ড এবং রপ্তানি প্রক্রিয়া জাত অঞ্চল তৈরি করে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে অভিবাসীদের বসতি স্থাপনে উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উক্ত অঞ্চলে সামাজিক মর্যাদার প্রয়োজনীয় অবস্থা তৈরির জন্য দীর্ঘ মেয়াদী বহু বিভাগীয় উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন, কিন্তু এটা প্রধানত পি, সি, জে, এস, এস এর সম্পূর্ণ আপোস বিরোধী মনোভাব এবং "র" এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শান্তি বাহিনী ঐ এলাকায় অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকার জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

১৯৭৭ সালে শান্তিবাহিনী কর্তৃক একটি সামরিক বহরের উপর গোপনে অতর্কিত আক্রমণ করায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর চব্বিশতম বিভাগের জি,ও,সি এর নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ আরম্ভ করা হয় এবং শান্তিবাহিনীর বিদ্রোহী সসস্ত্র সদস্যদেরকে নিঃসঙ্গ করার উদ্দেশ্যে কিছু উপজাতিকে গুচ্ছ গ্রামে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয় এবং গ্রামরক্ষা পুলিশ বাহিনী সৃষ্টি করে বাঙালি বসতি স্থাপন কারীরা যাতে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে সে ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৭ সালে শান্তিবাহিনী কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে আবেগের হিংস্রতায় কয়েক হাজার উপজাতি চাকমা দেশ ছেড়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে চলে যায়। বাস্তবিকপক্ষে চাকমাদের চলে যাওয়ায় দায়িত্ব তাঁদের উপর বর্তায়, যদি তাঁরা বাংলাদেশী হিসেবে নিরাপদে বাস করতে না পারে অথবা আনুগত্যের অভাবে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। পরবর্তীতে তাঁরা পরিস্কারভাবে বুঝতে পেরেছে যে, তাঁদেরকে দেশ ছেড়ে যাওয়ার উদ্ধাস্ত ভাবছে এবং জঘন্য আবর্জনা বহুল অবস্থানে আছে এবং ভারতে তাঁরা প্রতারিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর শাসনামলের মাঝামাঝি সময়ে রাজ মাতা (চাকমা রাজার মাতা) বিনিতা রায়কে তাঁর উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে এ,এস,প্রু চৌধুরীকে নিয়োগ করা হয় এবং চাকমা উপজাতি লোকদের প্রতি তাঁর সততার বিষয়ে পুনঃনিশ্চয়তা প্রকাশ করেন এবং যে সমস্ত বিষয়গুলো উথাপন করা হয়েছে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছে, তা পূরণে সদ্বিচ্ছার অভাব নেই, কিন্তু অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক অবস্থার কারণে ফলাফল ভাল হয় নি; যদিও দুজন উপদেষ্টা তাঁদেরই রাজ পরিবারের সদস্য ছিল তথাপি বিদ্রোহীরা তাঁদেরকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আরও অধিকতর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রপতি সরকার এবং পি, সি, জে, এস, এস এর মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য ১৯৭৭ সালের ২ জুলাই উপজাতিদের সম্মেলন আহ্বান করেন; কিন্তু পরিণতিতে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করে কারণ তাঁদের দলের মধ্যে বিরোধ বেঁধে যায় এবং তীব্র আকার ধারণ, বহু চাকমা বুঝতে পারে যে, "র" তাঁদের প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়ে তামাশা করছে। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের হত্যার পর গুজব ছড়ায় যে, "র" এর ষড়যন্ত্রে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে তাই পি,সি,জে,এস,এস এর সঙ্গে সমঝোতার বিষয়টি অস্থায়ীভাবে থেমে যায়।

পি, সি, জে, এস, এস এর সঙ্গে আলাপ আলোচনা দ্বারা মিমাংশা এবং চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা পুর্বক পরিত্যাগ
(Negotiations with the PCJSSTT & The Final Betrayal)

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ লেফট্যানেন্ট জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ এক অভূত্থানের মাধ্যমে অক্ষম বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে উৎখাত করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন, তখন উপজাতিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার দ্বার পুনঃ খুলে যায়। পি,সি,জে,এস,এস এবং তাঁদের বিদ্রোহী শাখার সদস্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্ধের কারণে শান্তিবাহিনীর ৩০ জন সদস্যকে হত্যা করা এবং ২২ জনকে আহত করা হয়। শান্তিবাহিনীর নেতা মানকেন্দ্র নারায়ণ লারমাকেও ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর হত্যা করা হয়। এই গৃহযুদ্ধ পি,সি,জে,এস,এসকে দু'ভাগে

www.pathagar.com

বিভক্ত করে ফেলে। একটি দলের নেতৃত্বে আসলে নিহত নেতার ভাই, জ্যোতিন্দ্র নরায়ণ লারমা (যিনি শন্তু লারমা নামে বিশেষভাবে খ্যাত) অন্যটির নেতা হন প্রিতী কুমার চাকমা। ১৯৮৫ সালে প্রিতীর দল জেনারেল এরশাদের সঙ্গে এক চুক্তিতে পৌঁছেন এবং এই বিরোধী দলের ৩০০ যোদ্ধা সরকারের পুনর্বাসানের প্রস্তাব গ্রহণ করে কিন্তু পি, সি, জে, এস, এস এর মূল অংশ যার নেতৃত্বে সন্তু লার্মা ছিলেন তাঁরা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নীতি অনুসরণ করে এরশাদ শত্রু ব্যুহ ভেদ করে সাফল্য অর্জন করে, এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন; আর্থ সামাজিক অর্থনীতির ধরন উন্নয়ন এবং উদ্দেশ্য সাধনে উদ্যোগী হয়ে সমন্বিত রাজনৈতিক স্থায়ী চুক্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তৎসত্ত্বেও ১৯৮৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থার অবনতি ঘটে; শান্তিবাহিনী ৩৮ জন বাঙালিকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে এবং ২৪ জনকে আহত করে, এ ঘটনাটি পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরের গ্রাম টেইনটিং, তানাক্কোপাড়া, সেনতিলা এবং আসালং ঘটে, এর প্রতিউত্তরে বাঙালি সমাজ তড়িৎগতিতে স্থানীয় উপজাতিদের সমাজে প্রচণ্ডভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, যার ফলে ৫০,০০০ চাকমা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কাঠালছড়ি, কারবুক, পঞ্চরামপাড়া, শীলাছড়ি এবং তাকুমবারি তে অবস্থিত উদ্ধাস্তু শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় সরকার এবং পি,সি,জে,এস,এস এর মধ্যে আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হয় এবং দ্বিতীয় বার আলোচনা হয় ১৭-১৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৭ সালে। চাকমা প্রতিনিধি দল পাঁচ দফা দাবী পেশ করে যা দ্ব্যর্থহীন স্বায়ত্ত্বশাসনের প্রস্তাব। যদি তা বাস্তবায়ন করা হয় অথবা আংশিকও হয় তাহলে পরিণামে তা হবে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্য। পাঁচ দফা দাবীকে পুনঃভাগ করে ৪৭টি উপ দাবীতে পরিণত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক কাউন্সিলের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং সীমিত নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং তাঁদের বার্ষিক খরচের বাজেট স্বাধীনভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঢাকা থেকে অনুমোদন করাতে হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

ডিকটান তাঁদের প্রধান দাবীগুলো প্রকাশ করেছেন, সেগুলো (১) ১৯৪৭ সালের পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সমস্ত অস্থানীয় লোক বসতি স্থাপন করেছে তাদেরকে চলে যেতে হবে; (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল বাংলাদেশী সেনাবাহিনী ও অস্থায়ী পুলিশ বাহিনীসহ সকলকে প্রত্যাহার করতে হবে; (৩) ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রবিধানকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সংবিধানে এর সংশোধন নিষিদ্ধ করতে হবে। (৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসনসহ এর আইন প্রণয়ন পরিষদ এবং ঝুম জাতিকে রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণে জাতির স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং (৫) জাতিসংঘের শান্তি রক্ষীবাহিনী নিয়োগ করে ঐ সমস্ত বিষয়গুলো জাতি সংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় বাস্তবায়ন করতে হবে। এ সমস্ত দাবীগুলো সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে কারণ সবগুলো প্রস্তাব সংবিধান বিরোধী, এবং জাতিয় কমিটির সঙ্গে পি,সি,জে,এস,এস এর সঙ্গে ছয় বার আলোচনায় বসা হয়েছে কিন্তু সব কিছু ব্যর্থতার পর্যবসতি হয়।

আলোচনায় বাস্তব কোন অগ্রগতি না হওয়াতে সরকার একক ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়ে প্রশাসনিক পরিবর্তন করে নূতন ভাবে গঠিত আঞ্চলিক কাউন্সিল এর

www.pathagar.com

উপর কিছু দায়িত্ব অর্পন করা হয়। ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ সংসদে কয়েকটি আইন পাশ হয়। আইনগুলো হলোঃ- (১) দি রাংগামাটি হিল ট্রাক্টট লোকাল গর্ভমেন্ট কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৮৯ (২) দি খাগড়াছড়ি হিল ট্রাক্টট লোকাল গভর্ণমেন্ট কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৮৯ (৩) দি বান্দরবান হিল ট্রাক্টট লোকাল গর্ভমেন্ট কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৮৯ এবং (৪) দি হিল ডিস্ট্রিকট্ (রিপিল এন্ড এন্‌ফোর্সমেন্ট অব ল এন্ড স্পেশিয়াল প্রোভিশন) এ্যাক্ট ১৯৮৯।

১৯৯০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম এর বিষয়গুলো তদারকের জন্য দি স্পেশিয়াল এফেয়াস মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। এই আইনগুলোর দ্বারা তিনটি জেলা কাউন্সিল যথা– রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান গঠন করা হয়। এই কাউন্সিল দুই-তৃতীয়াংশ উপজাতি নিয়ে গঠিত হয় যার চেয়ারম্যান হন একজন উপজাতি। এ ব্যবস্থার ফলে ছোট উপজাতিগুলোকে রাজনৈতিক চর্চায় সম্পৃক্ত করা হয় এবং চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরীদের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার হয়। কাউন্সিলকে সীমিত পরিমাণে প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে সরকারী বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয় তম্মধ্যে মৎস্য, কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, জনস্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত।

পি,সি,জে,এস,এস এবং শান্তিবাহিনী এ সমস্ত পরিবর্তন প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ খুঁজতে থাকে, মুখ্যত "র" এর প্ররোচনায়ই এগুলো চলতে থাকে, কিন্তু ভারতের দাবী মিটানোর জন্য তাঁরা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারছিলনা। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যে কাঠামো গঠন করা প্রয়োজন তা হয় নি। তাঁদের এ দুষ্কর্মের সিদ্ধান্ত অনেক চাকমাদের মধ্যে অপ্রিয় ছিল; যে কারণে তারা যুদ্ধ করছিল তা আর বিশ্বাস করতে পারছিল না। এছাড়া যখন ২,২৯৪ জন বিদ্রোহী এবং ৩০,৩৯০ জন উপজাতি ভারতের ছাউনি থেকে ফেরত আসে তখন অবাধে ও স্পষ্টভাবে তাদের দুরভিসন্ধি প্রকাশ পায়।

পি,সি,জে,এস,এস ১৯৮৯ সালের নির্বাচন বর্জন করার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এর বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের কমিউনিটি থেকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের এবং আলাপ আলোচনার অবস্থা আগেই বুঝে নিয়ে প্রতিবাদ ভোট দেয়ার মনোভাব প্রকাশ করে।

১৯৯৫-১৯৯৬ সালে নির্বাচনী প্রচারের সময় ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুনাচল প্রদেশে যে সমস্ত চাকমা অবস্থান করছিল তাদের প্রত্যাবসন এর বিষয়ে খালেদা জিয়া সরকার এবং ভারতের তাঁর অনুরূপ অংশ পারস্পারিক অবিশ্বাস এর মধ্যে নাছোড়বান্দার মত পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করে। তখন বিরোধীদল আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ শুরু করে এবং সারা দেশে হরতাল আহ্বান করে এবং প্রচুর ক্ষতি সাধান করে যা দেশের অর্থনীতিতে আঘাত হানে। পরবর্তীতে আবিষ্কার করা হয়েছে যে, "র" আওয়ামী লীগের নেতাদেরকে এ সময়ে প্রচুর পরিমাণে টাকা দিয়েছে এবং বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে যে সাংবাদিক, সংস্কৃতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ কারী এবং বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করছে এ ধরনের রাজনীতিবীদদের জন্য তহবিল গঠন করা হয়েছে।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ভারত সরকারের সমর্থনে গোয়েন্দা সংস্থা এবং অন্যান্য সম্মুখ কাতারের সংস্থা গুলির সহায়তা আওয়ামী লীগ অস্বাভাবিক রকম বিশালকায়

www.pathagar.com

ব্যবধানে নির্বাচনে জয় লাভ করে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ভারত সরকার গুপ্তভাবে বাংলাদেশে যে বিনিয়োগ করেছে তার পরিবর্তে জোর করে বেশ সুবিধা আদায় করে নেয়, যে পদ্ধতিতে এ কাজ করেছে তা উদ্ঘাটন করে মতিউর রহমান রিন্টু তাঁর লিখিত "আমার ফাঁসি চাই" পুস্তকে তা উল্লেখ করেছেন। ১৯৯৬ সালে পশ্চিম বাংলার মূখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বাংলাদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে এক বিরাট বর্ণনা দিয়েছেন যে, গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাক্ষাৎকারের সময় উপদেশ প্রদান করে বলেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে যার মধ্যে উপজাতিরা তাঁদের নিজেদের কর নিজেরা আদায় করবে এবং রাজস্ব আদায়ের হিসেব তাঁরা নিজেরাই করবে, সেখানে তাঁদের অনুমতি ছাড়া সরকারের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।

জ্যোতি বসু তাঁকে (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) নির্দেশ প্রদান করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতাদের সঙ্গে একমত হয়ে শান্তি চুক্তি করে তা বাস্তবায়ন করবেন, এ বিষয়ে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং দেশরক্ষা মন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহু বছরের সংকট ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর শান্তি চুক্তি হয়েছে এটা প্রচার করা উচিত এবং তিনি উদ্যোগী হয়েছেন এতে নোবেল পুরস্কারও পেতে পারেন। তিনি আরও বলেছেন ভারতকে ট্রানজিটের সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করতে, সেই সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরের নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতে তুলে দিতে। শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করা হবে।

এ সুবিধাগুলো প্রদান করা হয়েছে ১৯৪৭ সালের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য যখন পূর্ববাংলা ভাগ হয়ে যায়, তখন পূর্ববাংলাকে নিয়ে অখণ্ডভারত গঠনের কল্পনা করা হচ্ছে এবং বিষয়টি অনুধাবনের জন্য বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্ভবত শেখ হাসিনা পরিণতি সম্পর্কে খুব বেশী সতর্ক ছিলেন না, তিনি জ্যোতি বসুর পত্রের নির্দেশ অনুযায়ী আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ (আবদুর রব সেরনিয়াবত এর ছেলে) চীফ হুইপকে প্রধান করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি কমিটি (এন, সিসি, এইচ, টি) গঠন করেন। ঢাকায় এন,সিসি,এইচ,টি এবং পি,সি,জে,এস,এস এর মধ্যে বহু সভা অনুষ্ঠিত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি শান্তিচুক্তি হয়। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং সন্তু লারমা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু চুক্তি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, বিচার্য বিষয় পরোক্ষভাবে ঘৃণা করে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের গঠনের মধ্যে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।

কৌশল গত দিক দিয়ে মতৈক্য কে চুক্তি বলা যায় না কারণ স্বাক্ষরকারীরা দুটি পৃথক দেশের ছিল না, স্বাক্ষরকারী হল বাংলাদেশ সরকার এবং নিজের দেশের একটি ক্ষুদ্র অংশের অধিবাসীদের প্রতিনিধি। এ কারণে মতৈক্য জন্মগতভাবেই ত্রুটিপূর্ণ যা একটি স্বাধীন দল দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে।

ভারত সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তির শর্ত এবং আইনগত বাধ্যবাদকতা না মানবে ততক্ষণ বিদ্রোহীদের নিকট হতে হুমকি আসবে এবং "র" এর আদেশে ভারতভিত্তিক এ বিদ্রোহীরা বাংলাদেশকে আক্রমণ করতে পারে। সত্যিকারভাবে এ কারণেই ধারা ৮

www.pathagar.com

এবং ৯ পঁচিশ বছর মেয়াদী চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও ভারত সরকার সংযত না হয়ে বিদ্রোহীদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, সংগঠনিক কাজ শিক্ষা দিচ্ছে এবং অস্ত্রসস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করছে যেন তাঁরা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালাতে পারে। অকারণে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রতিনিধিত্বহীন দল এবং আমলারা নিজেদের কাছেই জবাবদীহি থাকবে। এ ধরনের মতৈক্য সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে হস্তক্ষেপ করতে ভারতের জন্য অত্যন্ত বড় ধরনের সুযোগ হবে, তবে যদি বাংলাদেশী করদাতারা এবং ব্যবসায়ীরা বড় আকারে আর্থিক সাহায্য করে তাহলে ফলপ্রসূ হবে। এ সমস্ত কারণে ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তিতে অত্যন্ত আপত্তিকর শর্ত থাকায় বুশরার প্রবন্ধের ৪র্থ আংশ থেকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সার্বজনীনঃ

(১) উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রামকে "উপজাতিদের অঞ্চল" হিসেবে বিবেচনা করেছে। সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে অঞ্চলের স্বকীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজন আছে বলে অনুবাদন করা হয়।

পাহাড়ী জেলা স্থানীয় সরকার কাউন্সিল/ পাহাড়ী জেলা কাউন্সিলস
(Hill District Local Government Council/ Hill District Councils)

উভয় পক্ষ ১৯৮৯ সালের হিল ডিষ্ট্রিক লোকাল গভর্ণমেন্ট কাউন্সিল আইনটি পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন এবং বাতিল করার ব্যাপারে একমত হন এবং ঐক্যমতে বর্ণিত বিভিন্ন শাখাগুলো নিম্নরূপঃ-

(২) হিল ডিস্ট্রিক্ট লোকাল গভর্ণমেন্ট কাউন্সিল নামটি সংশোধন করে শুধুমাত্র হিল ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল পুনঃনামকরণ করার প্রস্তাব করা হয়।

(৩) অউপজাতি স্থায়ী বাসিন্দা বলতে বুঝাবে যারা উপজাতি নয়, যাদের আইনগতভাবে পাহাড়ী জেলাতে জমি আছে এবং যারা পাহাড়ী অঞ্চলে নির্দিষ্ট ঠিকানায় বাস করত;

(৪) ৬ষ্ঠ ধারাতে নিম্নবর্ণিত উপধারাগুলো সংযোজন হবেঃ– কোন ব্যক্তি উপজাতি হোক অথবা না হোক তাহলে সে কোন্ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবে, এটা সাব্যস্ত করতে হবে, তাহলে তাঁকে সংশ্লিষ্ট মৌজার প্রধান/ ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান/ সংশ্লিষ্ট সার্কেল প্রধান এর নিকট থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে, সার্টিফিকেট ছাড়া কোন ব্যক্তি অউপজাতি হিসেবে গণ্য হবে না এবং অউপজাতিদের পক্ষে নির্বাচনে সদস্য হতে পারবে না।

২৪(এ) ৬২ ধারায় উপধারা (১) এ নিম্নরূপ সংশোধন হবে। অন্য কোন আইনে অন্য কিছু না থাকলে যা এখন কার্যকরী আছে, তম্মধ্যে ছোট দারোগা এবং একই পদ মর্যাদার অন্যান্য সকল সদস্য এবং পাহাড়ী জেলার পুলিশদের অধীনস্ত সকল পদে লোক নিয়োগ নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী কাউন্সিল করবে এবং কাউন্সিল তাঁদের বদলিও করতে পারবে এবং নিয়মানুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে, তবে উপজাতিদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

www.pathagar.com

২৬। ধারা ৬৪ নিম্নরূপভাবে সংশোধনও বিধি হবে। (এ) কার্যকরি বিধিতে অন্য কোন কিছু না থাকলে কোন জমি এবং চতুর্পার্শ্বস্থ ভূমি, ইজারা দেয়ার মত খাস জমি যা পাহাড়ী জেলার এলাকার মধ্যে আছে ইজারা দিয়ে হস্তান্তর করা যাবে না। বসতিস্থাপন, ক্রয় অথবা বিক্রয় কাউন্সিলের পূর্বানুমতি ছাড়া করা যাবে না; তবে এ শর্ত সংরক্ষিত বন এলাকা, কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প, বেতবুনিয়া উপগ্রহ কেন্দ্র, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এবং সরকারের নামে রেকর্ডকৃত জমির ব্যাপারে এ বিধি প্রযোজ্য হবে না।

(বি) যদি আইনে অন্য কোন কিছু বর্ণিত না থাকে তাহলে কোন জমি, পাহাড়ীবন এলাকা যেগুলো কাউন্সিলের আওতায় ও তাদের কর্তৃত্বাধীনে আছে সেগুলো কাউন্সিলের সঙ্গে আলোচনা ও অনুমতি ছাড়া সরকার অর্জন ও হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

২৭। ধারা ৬৫ নিম্নরূপভাবে সংশোধন এবং বিধিসম্মত করা হবে; কার্যকরি আইনে অন্য কিছু বর্ণিত না থাকলে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করার দায়িত্ব কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং আদায়কৃত অর্থ কাউন্সিলের তহবিলে জমা থাকবে।

চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্টট আঞ্চলিক কাউন্সিল
(Chittagong Hill Tracts Regional Counicl)

১। সংশোধন সাপেক্ষে এবং বিভিন্ন ধারার অন্তর্ভুক্তকরণ বিষয়ে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (হিল ডিস্ট্রিক্ট লোকাল গভর্ণমেন্ট কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৮৯ এর ১৯ও ২০ এবং ২১ ধারা) হিল ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল কে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তিনটি পাহাড়ী জেলার স্থানীয় সরকার কাউন্সিলকে নিয়ে একটি আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠন করতে হবে।

৯(এ) তিনটি পাহাড়ী কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কাউন্সিল সমন্বয় করবে, নিয়ন্ত্রণ করবে এবং যে সমস্ত বিষয় তিনটি জেলা কাউন্সিণকে দেয়া হবে সেগুলো সমশ্রেণীভুক্ত করবে। সমন্বয়ের অভাব দেখতে পেলে দায়িত্ব পালনে তিনটি পাহাড়ী কাউন্সিলে কোন প্রকার অসলগ্নতা পাওয়া যায় তাহলে আঞ্চলিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(সি) কাউন্সিল তিনটি পাহাড়ী জেলা কাউন্সিলের সাধারণ প্রশাসন, আইন এবং আদেশাদি এবং উন্নয়ন সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করবে না।

১০। চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টট উন্নয়ন বোর্ড এর উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব কাউন্সিলের সামগ্রীক তত্ত্বাবধানে পালন করবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যাপারে সরকারকে উপযুক্ত উপজাতি প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

www.pathagar.com

পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা এবং অন্যান্য বিষয়
(Rehabilitaion, General Amnesty and other Matters)

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থা স্বাভাবিক রাখার জন্য, সেই সাথে অন্যান্য কাজ ও পুনর্বাসন, সাধারন ক্ষমা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সমাধানের ব্যাপারে উভয় পক্ষ নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে ঐক্যমত ও সম্মত হয়েছে।

৪। বিতর্কিত ভূমিও সংশ্লিষ্ট জায়গার বিষয়ে নিষ্পত্তি করার জন্য একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ল্যান্ড কমিশন গঠন করতে সম্মত হয়। এই কমিশন উদ্ধাস্তদের পুনর্বাসনের বিতর্কিত বিষয়টি সমাধানের অগ্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যারা বেআইনী ভাবে পাহাড় এবং ভূমি দখলকরে বসতি করেছে, যারা অবৈধভাবে বসতি করছে এবং অবৈধভাবে অধিকারচ্যুত করেছে তাদের অধিকার বাতিল করার জন্য কমিশনকে পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে। বিচারের রায়ে বিকল্প কোন প্রকার পূর্ণ বিচারের প্রার্থনা পোষণ করা যাবে না, কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এ সমস্ত শর্তগুলো সীমান্তবর্তী এলাকার ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৮। রাবার চাষ এবং অন্যান্য চাষাবাদ করার জন্য জমি বন্টনঃ যে সমস্ত জমি ছিল সেগুলোর মধ্য থেকে উপজাতি নয় এবং স্থানীয় নয় এ ধরনের লোকদেরকে রাবার চাষ ও অন্যান্য চাষাবাদ করার জন্য জমি বন্টন করা হয়। জমি লিজ নিয়ে গত দশ বছরে যারা কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেনি অথবা সঠিকভাবে জমি ব্যবহার করে নি তাঁদের বন্টননামা বাতিল করে দেয়া হবে।

১৭ (এ) বাংলাদেশ সরকার এবং জনসংহতি সমিতির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার ঠিক পর পরই জন সংহতি সমিতির সদস্যরা স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে আসে, অস্থায়ী সেনা ছাউনি, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (ভি,ডি,পি) সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বি.ডি. আর) ব্যতীত এবং স্থায়ী সেনাবাহিনী স্থাপনা (তিন বাহিনী নিয়ে গঠিত জেলা হেড কোয়ার্টার আলী কদম রুমা ও দীঘিনালায় অবস্থিত) অন্য সবই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাহার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসা হয় এবং প্রত্যাহারের সময় নির্দিষ্ট করা হয়।

এতদঅঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে, চরম দুর্দশা ঘটলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনীকে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে দেয়া হবে এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য দেশের সকল স্থানে কার্যকরি হবে। এ পর্যায়ে আঞ্চলিক কাউন্সিল সময় মত প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়ার জন্য যথোচিত ভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট চাইবে।

(বি) সামরিক বাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনীর পরিত্যাক্ত জমিগুলো মূল মালিকদের অথবা পাহাড়ী জেলা কাউন্সিলের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

১৮। সরকারি, আধাসরকারি, কাউন্সিলের দপ্তরসমূহ স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থাগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা স্থায়ী বাসিন্দা এবং উপজাতি তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদে সরকারি, আধাসরকারি, কাউন্সিলের দপ্তরসমূহ স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থাগুলোতে নিয়োগ দিতে হবে। স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে যদি যোগ্যতাসম্পন্ন কোন লোক বিশেষ পদের জন্য না পাওয়া যায় তবে সাময়িক ভাবে সরকার কোন প্রতিনিধি নিয়োগ দিতে পারবেন।

www.pathagar.com

যদি এ সমস্ত শর্তগুলো মেনে নেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় তবে উক্ত আঞ্চলে ৮০০ বছরের মুসলিম ইতিহাস উল্টিয়ে ফেলা হবে, বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামে নূতন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়বে অথবা ভারতীয় সেনাবাহিনী এ অঞ্চলে জোরপূর্বক প্রবেশ করবে। ঐক্যমত হওয়ার কারণে তাঁরা ১৯০০ সালের বিধান পক্ষপাতমূলক ও অন্যায়ভাবে পুন প্রয়োগ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। চুক্তি হওয়ার ফলে যে সমস্ত নীতি নির্ধারণী ও প্রশাসনিক সংস্থা গঠন হয়েছে, সে সমস্ত সংস্থা উপজাতিদের মধ্য থেকে চাকমা এবং মারমাদের নিয়ে গঠন করার ফলে সংখ্যাধিক্যে অদম্য হয়ে উঠে, এবং অন্যায়ভাবে তাঁরা ১৮৮১ সালের চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্স ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশান পুনঃ কার্যকরিভাবে প্রবর্তন করতে চায়।

প্রবিধানের কিছু অসুবিধা লাঘব করার পরও ১৯০০ সালের সেই আইন বর্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন, এ আইনের জন্ম হওয়ার ১৫০ বছর পর এবং শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের এক দশক পর একজন বেসরকারি লোক একক ভাবে সুপ্রিম কোর্টের আওতায় হাইকোর্ট রিট পিটিশনের অধীনে বাংলাদেশ হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলে কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা তীব্র বিরোধীতার সম্মুখীন হয়। অতএব সন্দেহ হচ্ছে যে, এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা উত্তেজনাকর যা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, ২০০৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে উপজাতি দল তাঁদের দাবী সকলের চোখের সম্মুখে তুলে ধরে উত্তেজনা ছড়াতে চায়, এবং নূতনভাবে হিংস্রতা ও অস্থিরতার সৃষ্টি করে নির্বাচনী কার্য ব্যাহত করতে চায়, এটা কোন প্রধান রাজনৈতিক দলের কর্মও হতে পারে। তৎসত্ত্বেও এ সমস্ত ব্যাখ্যা গুলো স্বাভাবিক বিচার্য বিষয়কে ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করে প্রবিধানকে অবৈধ ও সম্পূর্ণ অকার্যকর করার পায়তারা। অপরদিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের জনগণের অধিকারের পরিপন্থী যদি এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শুভ ফলাফল হয় তাহলে ঐক্য মতে অনেক সংশোধন করতে হবে এবং সংবিধানের প্রয়োজন হবে, তাতে চুক্তির হয়তো পুনঃলেখার প্রয়োজন হবে। পরিণামে যদি মামলা বাতিল হয়ে যায় তবে আইনগত ও চূড়ান্ত ভাবে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ খুলে যাবে এবং কোন মতেই বন্ধ করা যাবে না।

ভারত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি
(India and the CHT Peace Accord)

অতঃপর এ লেখাটির প্রাথমিকভাবে ভারতের সম্প্রসারণ বাদী বিতর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ঐক্য মতের বিষয় বাস্তবায়ন না করায় এবং বর্তমানে যে সমস্ত উপজাতি ভারতে বাস করছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না হওয়াতে সমালোচনার ভার স্পষ্টভাবে বি,এন,পি সরকারের উপর বর্তান হয়েছে; যা জাতীয় অখণ্ডতাও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি প্রদর্শন সম্পূর্ণ অসংলগ্ন। যতদিন পর্যন্ত ভারতের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসীদের ছাউনি থাকবে ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীর পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাহার করার প্রশ্নই উঠে না এবং এ বিষয়ে কোন সমঝোতা করা হবে না। সম্ভবত "র" এর উৎসাহে নূতন করে উক্ত অঞ্চলে হিংস্রতা দেখা দেয়ার সুযোগ গ্রহণ করতে পাবে, সে ক্ষেত্রে ধারা ১৭ এর (এ) অনুযায়ী অত্র অঞ্চল থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার বাংলাদেশের কোন বিষয় নয়

www.pathagar.com

এবং চুক্তি প্রত্যাহারের কোন সঠিক সময় নির্ধারণ করা হয় নি। কারণ পি,সি,জে,এস,এস হিংস্রতার পথ ত্যাগ করেনি এবং "র" এর জন্য এখনও এ শক্তি প্রয়োগের ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে যা ডিক্‌টানের লেখায় বাংলাদেশ সরকারের এবং পি,সি,জে,এস,এস এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ হংসরাজ চাকমার স্বাক্ষাৎকারে উল্লেখ করা হয়েছে। "যদি সরকার শান্তি চুক্তির প্রতি সততা না দেখায় তবে, জনগণ অন্য কোন সুযোগ না দিয়ে অন্য একটি আন্দোলন আরম্ভ করবে এবং তা সসস্ত্র হতে পারে অথবা অস্ত্রবিহীন"। কিছুসংখ্যক চাকমা নেতার অসততার অভাবে সত্যিকারভাবেই সন্দেহ হয় যে, তাঁদের সঙ্গে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ততা আছে এবং ভারতের কর্মসূচি "অখণ্ড ভারত" গঠনের সমর্থন করছে যা পাহাড়ী গণপরিষদ (পি,জি,পি অথবা হিল পিপলস কাউন্সিল) পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পি,সি,পি অথবা হিল স্টুডেন্ট কাউন্সিল) এবং হিল ওম্যান ফেডারেশন (এইচ,ডাব্লিউ,এফ) কর্তৃক চুক্তি প্রত্যাখান করা থেকে বোধশক্তি দ্বারা নির্ণয় করা যায়, এবং তাঁরা আরও যুক্তি দেখায় যে, পাহাড়ী জনগণের বাসনা স্বায়ত্তশাসন (স্বাধীনতা বেশী দূরে নয়) চুক্তির এ অস্বীকৃতির পিছনে ইউনাইটেড পিপলস ডেমক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউ,পি,ডি,এফ) এবং ঝুম লিবারেশন আর্মির (জে,এল,এ) বিদ্রোহী দল কাজ করছে।

কিছু পশ্চিমা মানবাধিকার সংস্থা এ সমস্ত দলগুলোর প্রতি তাঁদের নৈতিক সমর্থন যোগাচ্ছে, এরা স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাগুলো থেকে সময় সময় বিকৃত ও অনিষ্টকর তথ্য সংগ্রহ করে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী কর্তৃক অতিরিক্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ করছে এবং অপব্যবহারের ধূয়া তুলে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙালিদের স্থানান্তর করার ইচ্ছা প্রকাশ করছে। সকল মানবাধিকার সংস্থা শান্তিচুক্তিকে সমর্থন করছে, শান্তি চুক্তি যদি এতই প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে ভারত কেন আসামের ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং অন্যান্য সেভন সিষ্টারের রাজ্যগুলোর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে অনুরূপ চুক্তি করছেনা, এ ব্যাপারে তাঁরা কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। তাঁরা এটা স্বীকার করছেনা যে, বিধি সম্মত কাঠামো অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ হচ্ছে এবং কোথাও কোন পীড়ন করা হচ্ছে না; অথচ ভারত পীড়ন চালানোর জন্য অতিশয় কঠোর ও নির্মম আইন যেমন- প্রিভেনটিভ ডিটেনশন এ্যাক্ট, ১৯৫০, ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়ান রুলস, ১৯৬২, ম্যানটিনেন্স অব ইন্টারনাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট, ১৯৭১, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট, ১৯৮০, টেরোরিস্ট এন্ড ডিজরাপটিভ এ্যাকটিভিটিস এ্যাক্ট, ১৯৮৫ এ্যাসোসিয়াল সার্ভিসেস ম্যানটিনেন্স এ্যাক্ট, ১৯৮০ আর্মড ফোর্সেস (স্পেশিয়াল পাওয়ার) এ্যাক্ট, ১৯৮৫ এবং ডিসটার্ব (এরিয়া এ্যাক্ট (আসাম) ১৯৮০ প্রয়োগ করছে।

মানবাধিকারের প্রধান বলেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামে যে অব্যবহার হয়েছে তা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী করে নি, আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিখুঁতভাবে কাজ করে যাচ্ছে, বরং বিদ্রোহী দল যেমন শান্তিবাহিনী, ইউ,পি,ডি,এফ এবং জে,এল,এ যারা ডাকাতি, অত্যাচার, বলপ্রয়োগ, অপহরণ, হত্যা, ধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ করছে এবং অন্যান্য ছোটখাটো দুষ্কর্ম করছে তাঁরাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনার জন্য দায়ী। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মানবাধিকারের, অপব্যবহার করছে এটা জোরালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য সংগঠিত ও ব্যাপক প্রচার কার্য চালায়,

www.pathagar.com

শান্তিবাহিনী এবং চাকমা সন্ত্রাসী দলের কার্যকলাপকে বৈধ করার প্রয়াশ চালায় এবং পার্বত্য চট্রগ্রাম থেকে সামরিক বাহিনীর প্রত্যাহার চায়। এতে দেশ নিরাপত্তাহীন হয়ে শত্রু হস্তে অর্পণ হবে। ভারতের আগ্রাসনকে কিছু উপজাতি সাহায্য করবে। তাতে আরও সুযোগ সন্ধানী হবে, আদর্শ গত প্রতিশ্রুতি এবং অখণ্ড ভারতের যুক্তি তারা উপলব্ধি করতে পারবে না, পরিণতিতে ভারতের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে একজনও বাঁচতে পারবে না।

সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ষড়যন্ত্র
(Communation Secessionist Conspiracies)

পার্বত্য চট্রগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্র এবং ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা একত্র হয়ে কালীদাস বৈদ্যের ধারণা অনুযায়ী কৌশল করে বাংলাদেশে নূতন করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উস্কে দেয়ার চেষ্টা করে, এ বিষয়ে ৪র্থ অধ্যায়ে পূর্ববঙ্গের সৃষ্টি এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এ সমস্ত দলগুলো সম্ভবত মাধব সদাশিব গোলওয়ালকার এর মত অতিশয় গোড়া হিন্দুদের নিকট হতে উৎসাহ পাচ্ছে। মাধব সদাশিব আর,এস,এস এর জনক এবং পণ্ডিত জওহার লাল নেহেরু পরে তিনিই হলেন অখণ্ডভারতের সবচেয়ে বেশী সক্রিয় প্রস্তাবক। কালীদাসের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ ভেঙ্গে একটি বৃহৎ অংশ নিয়ে হিন্দু মাতৃভূমি গঠন করতে, এ বৃহত্তর অংশের মধ্যে বৃহৎ খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, জেলা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কালীদাস দেখাতে চেয়েছেন যে ১৯৪৭ সালে এবং ১৯৭১ সালে যে সমস্ত হিন্দু দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়ে ছিল তাঁরা হিন্দু মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছে, হিন্দুদের এই মাতৃভূমিকে বলা হবে বঙ্গভূমি অথবা স্বাধীন বঙ্গভূমি এবং অনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এ ঘোষণা দেয়া হয়।

নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ (অল বেঙ্গল সিটিজেন্স অর্গানাইজেশন) নামে দলটি ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গভূমি আন্দোলন আরম্ভ করে। এর জেনারেল সেক্রেটারী হন কালীদাস বৈদ্য। এ দলটির অন্য একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন চিত্তরঞ্জন সুতার, তিনি "র" এর কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতেন, ১৯৫০ সালে তিনি বাংলাদেশে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে পি,সি,জে,এস,এস এর মত নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ (এন,বি,এস,এস) ও "বঙ্গ সেনা" নামে তাঁদের নিজস্ব সামরিক শাখার কার্যক্রম আরম্ভ করে, যার সেনাপতি হলেন কালীদাস বৈদ্য। কয়েক বৎসরের মধ্যে বঙ্গভূমি আন্দোলন কারিরা বিভিন্ন উপায়ে ক্রমে ক্রমে অলক্ষিতে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করে, সম্মুখ সারির সংগঠনের সঙ্গে বিভিন্ন রুপে প্রচার করে এবং সহযোগীতার মাধ্যমে বিভিন্ন দলকে অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ রিফিউজি ওয়েল ফেয়ার অর্গানাইজেশন, দি মহাজির সংঘ এবং হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টিয়ান ঐক্য পরিষদ ছিল এছাড়া আরও অনেক দলছিল, কিন্তু দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপে তাঁদের সফলতা কম ছিল বলে উল্লেখ করা হল না। এ সমস্ত প্রচেষ্টার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল অখণ্ডভারত সৃষ্টির প্রয়াশ যা কালীদাস বৈদ্য অকপটেও সত্যিকার ভাবে স্বীকার করেছেন, ১৯৮৯ সালের মে মাসে ঢাকা কুরিয়ায় এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন, সাক্ষাৎকারে তাকে প্রশ্ন

www.pathagar.com

করা হয়েছিল, আচ্ছা বলুনতো দেখি বঙ্গভূমি আন্দোলনের বিকল্প কি? কালিদাস তাৎক্ষণিকভাবে উত্তরে বলেছিলেন, "বিকল্প হল একটাই আর তা হলো বাংলাদেশ আত্মসমর্পণ করে ভারতের একটি অংশ স্বীকার করুক, তাহলে বঙ্গভূমি আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে, যদি বাংলাদেশ সম্পুর্ণভাবে আত্মসমর্পণ স্বীকার করে।

বঙ্গভূমি আন্দোলনের সর্বশেষে গুপ্ত বিষয়াদি প্রকাশিত হয়েছিল হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস অন বাংলাদেশী মাইনরিটিস (এইচ,আর,সি,বি,এম) আকারে যা বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে বলে মিথ্যা দোষারূপ করা হচ্ছিল এবং জনসম্মুখে উন্মোচন করার চেষ্টা করে আন্তর্জাতিক সহানুভূতি লাভ করেছিল। এইচ,আর,সি,বি,এম এবং এর সম্পূরক যোগাযোগকারী দল, ইউনাইটেড মাইনরিটি বিশেষ একটি হিন্দু সংস্থা যাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে অভ্যন্তরীণভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে সম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টি করা এবং হিন্দুদেরকে জোরপূর্বক দেশের সীমান্ত এলাকার জেলাগুলিতে আশ্রয় নিয়ে ভারতকে শক্তি প্রয়োগ করে সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলোকে বৃহৎ ভারতের রাজ্যাংশ করতে (অর্থাৎ অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন) বাংলাদেশকে ছোট করে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে দেয়ার এই জঘন্য চক্রান্ত দুজন স্বদেশভক্ত বাংলাদেশী ফাঁস করে দেয়, তাঁরা এইচ,আর,সি,বি,এম এর কাজে যোগদান করেছিল।

এ কাজটি গোয়েন্দা এবং তথ্যানুসন্ধানী সংবাদিকতার একটি অত্যুৎকৃষ্ট এবং অসাধারণ উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত এবং "আলোচনা ফোর্স" কর্তৃক প্রতিবেদনটি করা হয়েছিল। এইচ,আর,সি,বি এর (ইন্টারনেট ভিত্তিকদল) রাষ্ট্রের শত্রু। তাঁদের আবিষ্কারের ভিত্তি ছিল নেতাদের সঙ্গে এইচ,আর,সি,বি,এম এর সমর্থকদের মধ্যে ই-মেইল আদান প্রদান এবং যারা দলের অভ্যন্তরে কাজ করতেন এবং বাংলাদেশে প্রণোদিত করতঃ তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে যত্নশীলদের নথি থেকে এ রচনার লেখক একজন নেতৃস্থানীয় যিনি এইচ,আর,সি,বি,এম এর পশ্চাতে আছেন তাঁর সাথে পরিচিতি। তিনি হলেন এ্যাডভোকেট রবিন্দ্র ঘোষ, প্রতিবেদনটির সত্যপরায়ণতা যাচাই করা যেতে পারে। প্রতিবেদনের মুখবন্ধে দলের পরিকল্পনা ও সুকৌশল সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে যেখানে অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ– (১) বাংলাদেশকে একটি তালেবান রাষ্ট্র হিসেবে বর্ণনা করা (২) বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য বর্জন করার জন্য উৎসাহিত করা (৩) ইসলাম সকল নষ্টের মূল ব্যাখ্যা করতে হবে (৪) বিশ্বব্যাপী সকল চরমপন্থী হিন্দুদের সমর্থন আদায় করতে হবে (৫) বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে দিতে হবে। (৬) ভারতকে বাংলাদেশে প্রবেশ করে হিংসাত্মক কাজ চালাতে হবে (৭) বাংলাদেশে সামাজিক ভাবে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে হবে। অতএব এখানে প্রতিবেদন যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে অখণ্ড ভারতের প্রতিচ্ছবিই দেখাযায়। এতে কোন সন্দেহ নেই। নির্দেশনা অনুযায়ী নেহেরুর দর্শন পূরণের চেষ্টা করা একটি অসম্ভব ব্যাপার। প্রতিবেদনের উপসংহারে এইচ,আর,সি,বি,এম এর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগের কথা লেখা হয়েছে।

www.pathagar.com

এইচ,আর,সি,বি,এম জাতীর শত্রু
(H,R,C,B,M is an Enemy of Nation states)

এইচ,আর,সি,বি,এম বাংলাদেশে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা কাম্য করেছে যা দিয়ে একটি সামাজিক দলকে সহজেই সনাক্ত করা যাবে এবং এমন একটি ফাঁদ পাতে হবে যা ১১ সেপ্টেম্বরের পরে বিশ্বে যেমন অর্থনৈতিক মন্দা দেখাদিয়েছিল, ঠিক অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাই করতে হবে।

এইচ,আর,সি,বি,এম এর কার্যাবলী এবং উদ্দেশ্য যেভাবে প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে তাতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং সুদূর প্রসারি আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রতি অকাট্যভাবে হুমকির ইঙ্গিত রয়েছে।

এইচ,আর,সি,বি,এম এর কার্মসূচির মধ্যে ধর্মীয় চরম পন্থা ছদ্মবেশে মানবাধিকার এবং ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে যেখানে উল্লেখযোগ্য হিন্দু সমাজ আছে, সে সমস্ত দেশের নিরাপত্তা সার্বভৌমত্ব এবং সামাজিক স্থিরতার প্রতি হুমকি দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

যদি এইচ,আর,সি,বি,এম সংস্থার কার্যাবলী অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে তবে বাংলাদেশ কঠিন দুর্যোগে অবশ্যই পতিত হবে। দুজন বাংলাদেশীর সাহসিকতা এবং দূরদৃষ্টির কালে এইচ,আর,সি, বি,এম এর ষড়যন্ত্রের কারণে বাংলাদেশের দূর্ভাগ্যপূর্ণ কোন ঘটনা ঘটবে না। এটা পরিষ্কার যে এখনও অনেক মানুষ বিশ্বাস করে ভারত সরকারের কৌশলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে যোগ্যতার সঙ্গে রক্ষা করা হয়েছে। তাঁদের গোয়েন্দা সংস্থা শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পূর্বে অত্যন্ত বড় ধরনের হুমকি দিতে প্রস্তুত ছিল এবং তারপর পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহের সময়ও একই অবস্থা বিরাজ করছিল।

এ রচনাটি লেখা হয়েছে শুধুমাত্র মনে করিয়ে দেয়ার জন্য যে, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং এলাকার অখণ্ডতার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্র চলছে এবং আক্রমণ থেকে বিরত হবে না। আমাদের সমাজের প্রত্যেকটি শাখাতে ভারতের অনুমোদিত প্রতিনিধি অবস্থান করছে। এদের মধ্যে সুবিন্যস্ত ব্যক্তিত্ব আমলা, প্রশাসন, সংবাদ জন সংযোগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কৃতিক সংস্থা, বিচারালয়, এবং আইন পেশাজীবি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং মানবাধিকার সংস্থা (যেমন এইচ,আর,সি,বি,এম অথবা ধর্মীয় মতবাদ অথবা নারীবাদীরা বাম প্রচারিত অস্তিত্ব নিয়ে একাজে বিজড়িত) এরা সবাই এককভাবে অথবা একত্রে রাষ্ট্রের কার্যাবলী বিচ্ছিন্ন এবং দেশের প্রশাসনে অযোগ্যতা এবং মানুষের মধ্যে অনৈতিকতা সৃষ্টি করে কাজ পরিচালনায় বাধা দিচ্ছে। এ সমস্ত কাজের সত্যিকার রহস্য নিহিত আছে পণ্ডিত জওয়ার লাল নেহেরুর স্বপ্নময় একটি অখণ্ড ভারত।

রেফারেন্স ঃ

১. ডাঃ এস খারাত– ফ্রম ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট টু রিফিউজিঃ দি ট্রাউমা অব চাকমা'স ইন বাংলাদেশ (২০০৩)
২. চিন্ময় মুৎসদ্দি– আনরেস্ট ইন সি,এইচ,টি এন্ড রিলিভেন্ট মেটারস (১৯৯২)

www.pathagar.com

৩. মোহাম্মদ জয়নূল আবেদীন, দি চিটাগাং হিল ট্রাকস এ ভিমটিম অব ইন্ডিয়ান ইন্টারভেন্সন (২০০৩)।
৪. সৈয়দ আজিজ আল আহসান এন্ড চাকমা ভূমিত্রা প্রোবলেম অব ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি ইন বাংলাদেশঃ দি চিটাগাং হিল ট্রাকস, এশিয়ান সার্ভে।
৫. আমেনা মহসিন– দি পলিটিক্স অব ন্যাশনালিজমঃ দি কেইস অব দি চিটাগাং হিল ট্রাকস, বাংলাদেশ (১৯৯৭)।
৬. ডঃ মিজানুর রহমান শেলী- দি চিটাগাং হিল ট্রাকস অব বাংলাদেশ দি আন্ টোল্ড ষ্টোরি (১৯৯২)
৭. ইলিনর ডিকটান বাং-ওয়া-ইন-সার্চ ফরপিস ইন দি চিটাগাং হিল ট্রাকস অব বাংলাদেশ (২০০৪)
৮. ডঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী এন্ড ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রব– পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূরাজনীতি ও বিপন্ন সার্বভৌমত্ব (১৯৯৭)।
৯. বীণালক্ষী নিপ্রাম– সাউথ এশিয়াস ফ্রাকচার্ড ফ্রন্টিয়ার (২০০২)
১০. নন্দিতা চৌধুরী এ্যাথনিসিটি, হিউম্যান রাইটস ভায়ওলেশন এন্ড কোলোনিয়াল লিগেসিস ইন বাংলাদেশ, দি পোষ্ট কালোনিয়াল ট্রাজেক্টরি অব দি ঝুমল্যান্ড মুভমেন্ট (২০০৩)।
১২. ডঃ কালীদাস বৈদ্য– বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব (২০০০)
১৩. মতিউর রহমান রিন্টু- আমার ফাঁসি চাই (১৯৯৯)।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যুক্তবাংলার মাধ্যমে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার ভারতীয় আন্দোলন

(India move to establish United India through United Bengal)

– খোদেজা বেগম

কিছু কার্যকলাপ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অনিষ্টকর এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাহিরে সকল সচেতন নাগরিকদেরকে দেশের অখণ্ডতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অবিভক্ত উপমহাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৯১ সালের ২৯ ডিসেম্বর, ঢাকায় এক হোটেলে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে জোর করে দৃঢ় রূপে দাবী উত্থাপন করা হয়। এ ঘটনার পেছনে সংস্থাটির নাম দেয়া হয় উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন (মুভমেন্ট ফর রিভাইবাল অব দি সাব-কন্টিনেন্ট)। পরবর্তীতে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯১ সালে দলের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং অতিথি সেবক ছিল ঐ একই দল, এবং কংগ্রেস দলের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাকে আনা হয়েছিল ভারত থেকে, তিনি ক্রমাত্মকভাবে উল্লেখ করেন যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির জন্য দায়ী। তাঁর এ বক্তব্য দ্বি-জাতি তত্ত্বকে প্রত্যাখান করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে এবং উদ্দেশ্য হল, বাংলাদেশও দক্ষিণ এশিয়াতে নূতন চিন্তাধারা দিয়ে দেশগুলোকে গিলে ফেলবে।

পরবর্তী সময়ে বিচিন্তা সাময়িকীর প্রচ্ছদে একটি কাহিনী প্রকাশিত হয়। কাহিনীটি ছিল অবিভক্ত উপমহাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে আন্দোলন করা। ইউ.পি.এ নেতা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন তাঁরা ১৯৪৭ সালের পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে ইচ্ছুক যা যুক্ত ভারতের কথাই ইঙ্গিত করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তাঁরা ক্ষুদ্র পুস্তিকা আকারে "অসাম্প্রদায়িক উপমহাদেশের ইশতেহার" (কমিউনিক অব নন-কমিউনাল সাবকন্টিন্টে) শিরোনামে প্রচারপত্র প্রকাশ করে এবং তাতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে দেশ রক্ষা, মুদ্রা এবং আরও কিছু রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সমন্বয় করার দায়িত্ব কেন্দ্রের হাতে অর্পণ করার জন্য বলা হয় (সম্ভবত নতুন দিল্লীর কথা বলা হয়েছে)। পুস্তিকার প্রচ্ছদে ভারতের একটি মানচিত্র ছাপান হয়েছে যার মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে স্পষ্টভাবে দেখান হয়নি, অতএব সত্যিকারভাবে প্রভেদ করা যায় না।

বিশ্বশান্তি কাউন্সিল কর্তৃক অনুরূপ একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল, সেমিনারে বাংলাদেশ অংশটির সম্পর্কে পরবর্তীতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় যার আদর্শ নীতি বাণী ছিল "দক্ষিণ এশিয়ান আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নূতন প্রেরণা"। দেশের সেরা ব্যক্তিরা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আলোচনার কার্যসূচি পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিল যা শুধু "দক্ষিণ এশিয়ান আঞ্চলিক সহযোগিতার" মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও কংগ্রেস দলের নেতা মায়ারাম সার্জন এবং অন্যান্যরা তাদের বক্তৃতায় যুক্তভারতের প্রস্তাব বিস্তারিত আলোচনা করে। আমরা কেন বাহ্যিকভাবে ১৯৪৭ সালের পূর্বের যুক্ত ভারত প্রতিষ্ঠা করি না। আমরা বিভক্তি চাই না। ধর্ম ভিত্তিতে আমরা ব্রিটিশের নকশা অনুযায়ী বিভক্ত হয়ে গিয়েছি। এখন প্রমাণ হয়ে গেছে যে ধর্মভিত্তিতে বিভক্তি টিকে থাকে না। আমরা অবিভক্ত ভারতে ফিরে

www.pathagar.com

যেতে চাই। নূতন উপদেশের নামে 'যুক্ত ভারত' গঠনের প্রস্তাব নিয়ে স্পষ্টভাবে এ ধরনের সেমিনার করা খুব কঠিন, বাস্তবিক পক্ষে এটাই ছিল সেমিনারের মূল চিন্তাধারা। এ ধরনের কর্মসূচি নিয়ে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে ও প্রকাশ্যভাবে সেমিনারে দেশের রাজনীতিবিদদের যোগদানের নিশ্চয়তা পাওয়া অসম্ভব ছিল। অতএব, আলোচনা আঞ্চলিক সহযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়েনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বশান্তি কাউন্সিল (ওয়ার্লড পিস কাউন্সিল) গঠন করা হয়েছিল, মূলত সোভিয়েত গোয়েন্দাদের আগ্রহেই হয় (দি ডেইলি টেলিগ্রাফ, ২রা মার্চ, ১৯৯২)

ভারতের শিল্পী, সাহিত্যিক সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাদেশে আগমন করে বিভিন্ন সভা সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে স্বভাবতঃ পক্ষপাতিত্ব ও ব্যাপকভাবে নৈতিক বক্তৃতা প্রচার করতে থাকে এবং অবাঞ্ছিতভাবে পুনঃযুক্তভারত এবং একটি যুক্তবাংলার ইচ্ছাপ্রকাশ করে, বিশ্লেষণে একই নীতির কথা প্রচার করে। কিছুদিন পূর্বে ভারতের বুদ্ধিজীবী শিব নারায়ণ রায় আগ্রহান্বিত হয়ে যুক্ত বাংলার কথা বলে ছিলেন। একটি সাপ্তাহিকরে সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বলেছিলেন বাংলার উভয় অংশের যুক্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবীয় কিন্তু তিনি উভয় বাংলার যুক্ত হওয়া সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি, তাছাড়া ভারত শাসিত বাংলা স্বাধীন হয়ে যাবে, নাকি বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হবে, নাকি বাংলাদেশ ভারত শাসিত বাংলার সঙ্গে একত্র হয়ে পশ্চিম বাংলা শাসন করবে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের যুক্তকরণ, যুক্তবাংলা অথবা উপমহাদেশের পুনঃপ্রবর্তন অথবা যুক্ত ভারত যাই হোক না কথাগুলো সব একই।

আসুন আমরা এ সমস্ত ঘটনাদির সর্বশেষ অবস্থা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে দেখি। যুক্তবাংলা, অবিভক্ত বাংলা অথবা অবিভক্ত ভারতের দাবীদারা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগকে ভারত বিভক্তির জন্য দায়ী করে, ইতিহাসের গবেষণায় নেহেরু এবং কংগ্রেস দল ১৯৪৭ সালের বিভক্তির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বর্ণনা করেছেন যে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদীর মূলনীতি নেতা নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বিবেচনাকে অস্বীকার করতে পারবে না, কিন্তু তা হওয়ার ছিল মেধা অনুসারে। তৎপরিবর্তে তাঁরা সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু মানুষের অনুভূতিকে পুঁজি করে সরদার প্যাটেল বলেছেন বিভক্তিকে মেনে নেয়া হবে কারণ এটাই অবশ্যম্ভাবী বিধেয় সমাধান। প্রত্যেক দিন ঝগড়া করার চেয়ে বিভক্ত হয়ে যাওয়াই সর্বোত্তম। (ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, ওরিয়েন্টাল লংম্যান, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা ১৯-২০, ১৮৫ এণ্ড ১৯৭)

বিক্রমাদিত্যের লেখায় এসমস্ত অনেক বিবেচ্য বিষয় পাওয়া যাচ্ছে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার প্রস্তাব অনুযায়ী নেহেরু ভারতের বিভক্তিকে বিবেচনা করে গ্রহণ করেছিলেন বলে ফাঁস করে দেয়। নেহেরু এবং কংগ্রেস দলে গভীরভাবে প্রত্যয়ী ছিলেন যে পাকিস্তান বেশী দিন স্থায়ী হবে না। তাঁরা চিন্তা করেছিল যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দুর্বলতার কারণে পাকিস্তান বেশী দিন টিকতে পারবে না। (স্বাধীনতার অজানা কথা, মুখবন্ধঃ পৃষ্ঠা ১০)

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দী-হালিম-শরৎ বোস এর পরিকল্পনা অনুযায়ী যে দাবী করা হয়েছিল সে অনুযায়ী গান্ধী, নেহেরু এবং কংগ্রেস দল অবিভক্ত এবং সার্বভৌম বাংলা তাঁরা মেনে নেয়নি। বাংলার বিভক্তিকে তাঁরা ইতিহাসের সত্য ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করেছে। আশরাফ চৌধুরীর নিকট এক পত্রে নেহেরু লিখেছিলেন যদি ভারত বিভক্ত করণ অকাট্য হয় তবে বাংলাও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কারণ, বিভক্ত হলেও খুব অল্পসময়ে আমরা পুনরায় অবিভক্ত ভারত প্রতিষ্ঠা করতে পারব। (জিন্নাহ এণ্ড গান্ধী- শ্রী আর মজুমদার)। ব্রিটিশের ভণ্ড মিছিল এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাউন্টব্যাটেন যখন অনুধাবন করতে পারলেন যে ভারতকে কোন মতেই অবিভক্ত রাখা যাবে না, তখন তিনি পরিকল্পনা করলেন যে বিতর্কিত অংশগুলো পরে যুক্ত করা হবে। (মাউন্টব্যাটেন এণ্ড দি পার্টিশান অব ইন্ডিয়া– ল্যারিকলিন্স এন্ড ডোমিনিক ল্যাপিয়ার, পৃষ্ঠা ৯২-৯৩)

একারণেই সিকিম অধিকার হয়ে যায় এবং ভারতীয় সৈন্যদেরকে নেপাল, ভুটানসহ শ্রীলঙ্কায় অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সাহায্য করেছে এটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু আমরা ভারতের নেতাদের উদ্দেশ্য সম্পর্ক বিবেচনা করতে চাই। ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল ইন্ডিয়ান ইনিস্টিটিউট অব ডিফেন্স স্ট্রাটেজিক এনালাইসিস এর চেয়ারম্যান শ্রী সুব্রামানিয়াম, নেহেরু পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, ডেইলি হেরাল্ডে লিখেছে, পূর্ব বাংলার সঙ্কট ভারতকে এমন একটি সুযোগ এনে দিয়েছে যে হাজার বছরের মধ্যে এরকম সুযোগ আর আসবে না, ভারতের উচিত ভারতের বিবাদপূর্ণ এলাকা উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বার্থে বাংলাকে নিরপেক্ষ করে ফেলা (ওয়ার এণ্ড সিসেশন রিচার্ড সিশন এন্ড লিও রোজ, পৃষ্ঠা ২০৭)। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত সরকার ও বাংলাদেশের মধ্যে ৭ দফা গোপন চুক্তি স্বাক্ষর হয় যার মধ্যে বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে ভারতের উপর নির্ভরশীল থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ('র' এন্ড সি.আই.এ. ইন দি লিবারেশন ওয়ার অব বাংলাদেশ, মাসুদুল হক, পৃষ্ঠা ৯২-৩৯)

চুক্তির এ ধারাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সামরিক বাহিনী থাকবে না। দুঃসাহসী মুক্তি যোদ্ধারা যখন লুণ্ঠনকারী পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে জীবনের বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিল, 'র' তখন কোলকাতায় নির্বাসিত বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি না নিয়ে জেনারেল সুজন সিং উবানের অধীনে দেরাদুনে একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করে, নাম দেয়া হয় 'মুজিব বাহিনী'।

তাঁর লিখিত পুস্তক "ফ্যান্টম অব চিটাগাং" এ জেনারেল উবানে পরিষ্কারভাবে মুজিব বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য কি তা বর্ণনা করেছেন। অনেক জনমত প্রকাশ করেছেন যে ২৫ বছরের বন্ধুত্ব চুক্তি (বর্তমানে বিলুপ্ত)টি আর কিছু নয় বরং ৭ দফা চুক্তিরই সংশোধিত সংস্করণ। চুক্তির ৮, ৯ ও ১০ ধারায় সঙ্কলিত ধারণায় বাংলাদেশও ভারতের দেশরক্ষা ব্যবস্থা একই সূত্রে গাঁথার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। এটার অর্থ হল ভারত এবং বাংলাদেশের দেশরক্ষানীতি পারস্পরিক ও পূরক। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর লেখায় অনুরূপ মনোভাব প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেছেন সংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারত এবং বাংলাদেশ একে অন্যের পরিপূরক। (এ্যাসপেক্ট অব আওয়ার ফরেন পলিসি, পৃষ্ঠা ১০০)

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সম্পর্কে স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য আছে। সেগুলো হলঃ

১। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উত্থানকে ক্রমান্বয়ে ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করতে হবে এবং অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে ভারত কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

২। মার্কসবাদী শাসন এবং বাংলা ভাষাভাষি পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রক্ষার জন্য বাংলাদেশের দেশরক্ষার সামর্থ্যকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

৩। যুদ্ধ বিধ্বস্ত উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা করতে হবে এবং কোলকাতা ও হালদিয়া বন্দরের চাপ কমিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪। বাংলাদেশে একটি পুতুল সরকার বসাতে হবে, অবশেষে হামলা চালিয়ে বাংলাদেশকে ভারতের সাথে অঙ্গীভূত করতে হবে। ভারতের সম্প্রসারণবাদী দেবদূত নেহেরুর লেখার মধ্যে এ সমস্ত আগ্রাসী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। "ভারত সন্ধানে নেহেরু" পুস্তকে তিনি লিখেছেন "ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব অনুশীলন করবে যা অবশ্যম্ভাবী ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ভারতমহাসাগর এলাকা পর্যন্ত চলাচলের কেন্দ্র হিসেবে গঠন করা হবে। ছোট রাষ্ট্রগুলোকে নরকে পরিণত করা হবে। এরা হয়ত সংস্কৃতিক স্বায়ত্বশাসন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে কিন্তু স্বাধীন রাজনৈতিক একক হিসেবে নয়।

ভারতের বিখ্যাত দেশরক্ষা বিশ্লেষক রবি রাখাই এর লেখনিতেও অনুরূপ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি তার পুস্তক "দি ওয়ার দ্যাট নেভার ওয়াজ" এ লিখেছেন, পাকিস্তানকে প্রথম সুযোগেই ভারত প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে সমস্ত এলাকা দখল করে স্বাধীনতা পূর্বকালের ভারত গঠন করতে। ভারতের স্বাভাবিক সীমান্ত এলাকার সঙ্গে বর্তমান ভারতের রাজ্যগুলো পাকিস্তান এবং বাংলাদেশকে ঘেরাও করে ফেলতে হবে। আমাদের ভূ-কৌশল অনুযায়ী শ্রীলঙ্কা, বার্মা, ভুটান এবং একাধিক বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তিব্বত এবং আফগানিস্তানকে শাসনাধীনে আনা একান্ত প্রয়োজন। যে কোন মূল্যে আমাদেরকে পুনঃঅঙ্গীভূতকরণের প্রক্রিয়া চালান উচিত। যত দেরী হবে ততবেশী শক্তির প্রয়োজন হবে। একবার পাকিস্তানকে পূর্বেকার আশ্রয়ের মধ্যে নিয়ে আসতে পারলে অন্যান্য ছোট টুকরা টুকরা ভগ্নাংশ রূপে আসবে। পুনঃঅঙ্গীভূতকরণ– হয় শান্তিপূর্ণভাবে করতে হবে, নয়ত যুদ্ধের মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান গুপ্তঘাতকের দ্বারা নিহত হয়। ইন্দিরা গান্ধী প্রথম সামরিক হস্তক্ষেপের চিন্তা ভাবনা করেছিলেন এবং তিন ডিভিশন সৈন্য প্রস্তুত ছিল, শেষে তিনি ইতঃস্থত করছিলেন, এদিকে সময় অতিক্রম হয়ে যায়। ফলাফলঃ বাংলাদেশকে করতলগত করার আশা বিলোপ হয়ে যায়। ভারত সম্পূর্ণভাবেই সামরিক হস্তক্ষেপের মতাদর্শ অনুযায়ী করতে চেয়েছিল, কিন্তু একই মতাদর্শে সোভিয়েত ইউনিয় পোল্যান্ড এবং আফগানিস্তানে এবং আমেরিকা নিকারাগুয়া ও গ্রানডাতে হস্তক্ষেপ করে কিনা সে অপেক্ষায়ই ছিল।" পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের পর, ২ মার্চ, ১৯৯১ আনন্দ বাজার পত্রিকা মন্তব্য করেছিল যে বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গীভূত করার জন্য বাংলাদেশের জনগণের দাবী করা উচিত।

www.pathagar.com

ভারত তাদের গন্তব্যে পৌঁছার জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশলগুলো গ্রহণ করেছেঃ-

১। বাংলাদেশে 'র' এর কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে দুর্বল বানিয়ে স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বকে মুছে ফেলতে হবে। বাংলাদেশে 'র' এর কার্যকলাপ এখন একটি ভয়ঙ্কর অবস্থায় পৌঁছেছে। ভারতের জনতাদল এর নেতা সুভ্রামানিয়াম স্বামী কর্তৃক অভিযোগে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যা কাণ্ডের সঙ্গে 'র' জড়িত (সানডে, ১৮-২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮)। পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারেও 'র' ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

২। 'র' এর কার্যকারিতাকে চাকমা গেরিলারা গুপ্তভাবে সহায়তা করেছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং পরে তাদেরকে সাহায্য করা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে সরকার পরিবর্তন হলে চাকমারা 'র' এর সঙ্গে যোগাযোগ করে। আশ্রয়ের পরিবর্তে চাকমারা মিজো বিদ্রোহীদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে অলক্ষিতে অনুপ্রবেশ করে ভারত সরকারকে তথ্য প্রেরণ করতে থাকে। তাঁদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। (ইনসাইড্ 'র'ঃ দি স্টোরি অব ইন্ডিয়াস্ সিক্রেট সার্ভিস, আশোকা রায়না, বিকাশ পাবলিশার্স, নিউ দিল্লী, ১৯৮১, পৃঃ ৮৬-৮৭)

৩। ১৯৭৫ সালে চাকমা বিদ্রোহীদেরকে অস্ত্র, গোলাবারুদ, উপাদান এবং প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। ত্রিপুরার সীমান্ত ছাউনিগুলোতে প্রশিক্ষণ আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল দেরাদূন এর নিকট ছাক্‌রাটায়। শান্তুলারমার শান্তিবাহিনীর সদস্যরা ছাকরাটায় গিয়ে প্রশিক্ষণ শেষে ত্রিপুরায় ফিরে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে অলক্ষিতে অনুপ্রবেশ করে। আগরতলায় 'র' এর একটি দপ্তর এবং তাঁদের পরিচালকরা প্রশিক্ষণের অগ্রগতি তদারক করত। ১৯৭৬ সালে শান্তিবাহিনী প্রথম বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। একটি নূতন বিদ্রোহের আর্বিভাব ঘটে এবং বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় ভারতের অঘোষিত যুদ্ধ আরম্ভ হয় (সাউথ এশিয়া'স ফ্রাকাচার্ড ফ্রন্টিয়ার, বীনালক্ষ্মী নিপ্রাম, মিত্তাল পাবলিশার্স, নিউ দিল্লী, ২০০২, পৃঃ ১৫৩)

৪। চাকমা বিদ্রোহীদের এবং শান্তি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যাপারে 'র' জড়িত ছিল এবং বাংলাদেশে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালানার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল ('র'স রোল ইন ফারদারিং ইন্ডিয়া'স ফরেন পলিসি, দি নিউ ন্যাশন, ঢাকা, ৩১ আগস্ট, ১৯৯৪)

৫। ভারতীয় গোয়েন্দারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ঐ অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করতে চেষ্টা করে। (ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেশন, মতিউর রহমান, এডিটর, দৈনিক প্রথম আলো, ১০ ডিসেম্বর, ২০০২)।

ভারত চায় বাংলাদেশে ভারত সমর্থক সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করতে। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সংস্কৃতিক অঙ্গন, সাংবাদিক, ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবী মহলে ভারতীয়রা চতুরতার সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতের একটি দৈনিক (দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৮ এপ্রিল, ১৯৯২) এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, "নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর কোলকতা অফিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দলকে পাঁচ কোটি রুপি দিয়েছে।

www.pathagar.com

একজন প্রাক্তন ছাত্রনেতা যিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুপ্ত রহস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত একটি সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন, সেমিনারের বিষয় ছিল, "পলিটিক্যাল ট্রেনড্ অব সাউথ এশিয়া" যেখানে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা, আসাম এবং ত্রিপুরা সকল বাংলাভাষাভাষি লোকদের একত্র করবেন (সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ২৩ মে ১৯৯১)। ভারত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে উদীয়মান রাজনৈতিক সচেতনাকে দ্বিধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে। ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গণমাধ্যম, স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে সংস্কৃতিক আগ্রাসন ভিডিও এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার চালাচ্ছে।

পূর্ববর্তী বিষয় বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যুক্তবাংলা বা বৃহৎবাংলা যাই হোক না কেন কখনও স্বাধীন সার্বভৌমত্বের অস্থিত্ব নিয়ে থাকতে পারবে না, এটা ভারতের একটি প্রদেশ হিসেবেই গণ্য হবে। যুক্ত বাংলা অথবা বৃহৎ বাংলা হল উপমহাদেশের পূর্ণস্বাধীন অথবা অবিভক্ত ভারত গঠনের স্বপ্নের অন্য একটি রূপমাত্র। এখন প্রশ্ন হতে পারে, যদি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কোন সীমান্ত না থাকে অথবা ১৯৪৭ সালের পূর্বের অবিভক্ত ভারত হয়, তাহলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কি প্রয়োজন ছিল? কাজেই সকল দেশ প্রেমিক বাংলাদেশীদেরকে যে কোন অনিষ্টকর দুষ্ট চক্রের হাত থেকে আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য অনেক সর্তক প্রহরারত থাকতে হবে।

www.pathagar.com

চীন-ভারত-ইউ.এস কৌশলগত জটিলতা- বাংলাদেশের জন্য সঙ্কেত ধ্বনি

(China-India-US Strategic Tangle Challenge for Bangladesh)

— ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) এম. সাখাওয়াত হোসেন

প্রস্তাবনা

বিগত তিন দশক যাবত দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চলে পরিবেশগত ভূ-কৌশল অনবরতভাবে পরিবর্তন হচ্ছে। এ সমস্ত পরিবর্তন এ অঞ্চলের ছোট দেশগুলোকে দুর্বল করে ফেলছে এবং তাঁদের উন্নয়ন ও দেশরক্ষা এ দু'টির মধ্যে একটি বেছে নিতে অনেক কঠিন অবস্থার মধ্যে পতিত হচ্ছে। এ পরিবর্তনগুলো পূর্বেও ছিল এবং এখনও চলছে বলে প্রমাণিত । তাই অভ্যন্তরীণ ও বহিঃআঞ্চলিক সম্পর্ক স্থাপনে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ সমস্ত কারণগুলোই অভ্যন্তরীণ বিবাদের কারণ বলে প্রমাণিত, এক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা একটি উদাহরণ, এখন নেপাল এ সময়ের আর একটি উদাহরণ হওয়ার প্রমাণ দিতে পারে। সর্বশেষ নেপালের ঘটনা থেকে এখন নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না কিভাবে সমগ্র অঞ্চলকে প্রভাবিত করবে। চলতি ভূ-কৌশল স্থাপনের দ্বারা নেপালের ভবিষ্যৎ এ অঞ্চলে মহাবিপ্লব ঘটাতে পারে, নেপালের দু'টি মহাশক্তিশালী-প্রতিবেশী দেশ উত্তরে চীন এবং দক্ষিণে ভারতকে সংঘর্ষে লিপ্ত করতে পারে, হিমালয়নে রাজ্যটিতে রাজতন্ত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাংশে মাওবাদী আন্দোলনের আধিপত্য বিস্তার লাভ করবে। নেপালে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইন্দো-চায়নিজ সম্পর্কে নূতন মাত্রা আরম্ভ হতে পারে যা এখনও অপছন্দ নয় তা হল সাময়িক অভিযানের শর্ত। যদিও এ দু'টি মহাশক্তিধর এশিয়ান প্রতিবেশীদেশের সম্পর্ক পূর্বের চেয়ে এখন উত্তম, তবুও তাদের সীমান্ত এলাকা নিয়ে বির্তক আছে যা এখনও সমাধান হয়নি, এটা উদ্বিগ্নতার কারণ হতে পারে। চীন ভারত ভূখণ্ডের একটি বড় অংশ অক্শয় চীন দখল করে রেখেছে এবং ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার সমগ্র উত্তর অংশ তাদের বলে দাবী করছে এবং দীর্ঘকালের এ বির্তকের ফলাফল অর্থনৈতিক সম্পর্কে উদ্ভূত হতে পারে। আসল কারণ চীন-ভারত কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরসহ এর জলস্রোত আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর বিশেষ করে অনেক উপকূলবর্তী স্থলভাগ পর্যন্ত তাদের দাবীর প্রসারণ ঘটাচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার এ জটিলতা অভ্যন্তরীণ প্রগতিশীল রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট হেতু প্রমাণ করে এবং আরও প্রমাণ করে ভৌগোলিক সংস্থান দ্বারা প্রভাবিত দেশ বিদেশের আঞ্চলিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বহির্ভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

যা হোক, আসল ঘটনা হল দক্ষিণ এশিয়ান ভূ-রাজনীতি এবং ভৌগোলিক কৌশলগত কারণে পরিবর্তন হওয়ার ফলে আমাদেরকে ১৯৭১ সালের বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের দিকে ফিরে যেতে হয়, কৌশলগতভাবে এ অংশটি পাকিস্তানের পূর্বাংশে অবস্থিত প্রদেশ ছিল, বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারত এ অংশকে অপবিত্র করে দিয়ে যুদ্ধে

www.pathagar.com

চিরশত্রু পাকিস্তানকে পরাজিত করে এ অঞ্চলে একক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তখন থেকে ভারত আর পিছনে ফিরে তাকায়নি, অথবা নেহেরুর স্বপ্ন নিরপেক্ষ নীতি নিয়ে কল্পনা প্রবণ হয় নি। ১৯৭৪ সালে ভারত তাঁর স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করে গান্ধীর দর্শন অহিংসানীতি পরিহার করে দক্ষিণ এশিয়ার আনবিক প্রতিযোগিতার অগ্রদূত হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তান ও অভীষ্টলাভের জন্য চেষ্টা করে। ১৯৯৮ সালের মধ্যে ভারত পাকিস্তান উভয় প্রতিবেশী দ্রুতগতিতে আণবিক শক্তির অধিকারী হয়ে কৃতকার্যতার সঙ্গে বিষ্ফোরণ ঘটালে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-কৌশলের পরিবেশ দৃঢ় শক্তির উপর অবস্থান নেয়। দক্ষিণ এশিয়ার এই বিপজ্জনক অবস্থা যথাযথ নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অতঃপর ঐ সমস্ত ঘটনা এবং ৯/১১ এবং পিছনের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করলে এ অঞ্চলের সামরিক প্রতিযোগিতা দেখে যে কেউ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে এবং এখন পর্যন্ত তা চলছে। ভারত বৃহৎ শক্তির কাতারে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলে চীনের কর্তৃত্ব ব্যর্থ করে দিবে– ভারতের নতুনভাবে জন্মলাভ করা যুদ্ধকৌশল সাম্প্রতিক ঘটনাদির প্রভাব মুক্তির বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে- যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে ক্রমশঃ অগ্রসর করিয়ে নেয়ার জন্য নিরপেক্ষ আন্দোলনের দেশের সঙ্গে ভারত সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলবে।

অনেকদিন থেকেই ভারত এ অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে, এটা প্রশংসনীয় যে এখনও তা অর্জন করতে পারে নি, নিকট ভবিষ্যতেও তা পারবে না। দিল্লী যুক্তরাষ্ট্রের নিকট থেকে দৃঢ় সহযোগিতা চায়। এখন ভারত দেখতে পেয়েছে যে, বিশ্বে একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সু-কৌশল উপলব্ধি করে অংশীদার হতে চাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে ভারত মহাসাগরে চীনের অনুপ্রবেশ ঠেকাবার জন্য পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মিয়ানমার এর মধ্যে দিয়ে দিল্লীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে রাজি হয় এবং বর্তমানে সম্ভবতঃ নেপালের মধ্যদিয়ে, যদি রাজতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় অথবা রাজা চাপে শর্তাধীনে রাজি হলে করা হবে। এ সমস্ত দেশ গুলির সঙ্গে দু'টি কৌশলগত বিষয়ে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিছুটা কম হলেও পকিস্তান ও মিয়ানমার সঙ্গে সামরিক অভিযান জোরদার করার কৌশলের দৃঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান। চারটি দেশের মধ্যে তিনটি দেশই আলোচনার মধ্যে, যেমন– মিয়ানমার নেপাল পাকিস্তান এশিয়ার এ দু'টি অতিশক্তিশালী দেশ ভারত ও চীনের সঙ্গে সীমানা সমভাবে ভাগিদার। উল্লেখ্য যে সম্প্রতি নেপাল চীনের সঙ্গে পুরাতন রাস্তার যোগাযোগ পুনস্থাপন করেছে প্রায় ৫০ এন.এম দূরত্ব (নটিকেল মাইল) কাঠমুন্ডু থেকে তিব্বত (চীন) সীমান্ত পর্যন্ত।

ভারত মহাসাগরে চীনের উপস্থিতি সহায়ক ঘটনাঃ

ভারত মহাসাগরের পশ্চিম এবং পূর্ব উভয় দিক দিয়ে চীনের অনুপ্রবেশ সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান, ভারত উপলব্ধি করছে যে চীন ভারতকে গ্রাস করার চেষ্টা করছে এবং উত্তর দিকে অনুপ্রবেশ করে খুলে রাখা হয়েছে কারণ নেপালের অবস্থা পরিবর্তনীয়। এ বিপজ্জনক অবস্থা দেখে ভারত তার সীমান্ত এলাকার কৌশল নির্ণয় করছে। ভারত মনে করে এবং বাস্তবিক পক্ষে দাবী করে যে, ঐতিহাসিকভাবে ভারত মহাসাগর ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সঞ্চালনের জন্য বঙ্গোপসাগরে অনুপ্রবেশকারীদের

www.pathagar.com

বাধা দেয় হত। ভারত এখনও চীনের উপস্থিতিকে শক্তভাবে বন্ধ করে নি, কারণ এটা চীনের তৈল সরবরাহের পথ, যে পথ দিয়ে উপসাগর থেকে মালাক্কা হয়ে সুদূর চীনের পূর্ব পর্যন্ত তৈল নিয়ে যায় যা চীনের জীবন, তাই ভরত বিবেচনা করে। চীনের এনার্জির চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়াতে চীন আফ্রো-এশিয়ান দেশসমূহে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে, এ দেশগুলোর মধ্যে কিছু দেশ অভ্যন্তরীণ সংকটে আছে অথবা কোন ধরনের ঔপনিবেশিক অবস্থায় চলছে। উল্লেখ্য যে ৮০% তৈল উপসাগরীয় অঞ্চলথেকে আমদানি হয় এবং বাকিগুলো ভারত মহাসাগরের পথ দিয়ে আফ্রিকা থেকে জাহাজ আসে। অতএব, হরমুজ এবং মালাক্কা প্রণালী উভয়টি চীনের সমুদ্রপথের যোগাযোগের চরম সংকটপূর্ণ পথ (এস,এল,ও,সি)। অনেক দিন থেকে চীন এ দূরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে এবং চীনের মূল ভূ-খণ্ডের সঙ্গে উপসাগর থেকে একটি নিরাপদ পথ তৈরির জন্য চেষ্টা করছে।

চীন উপলব্ধি করছে যে সমুদ্রপথের যোগাযোগে সম্ভবত তীব্র বাঁধার সৃষ্টি করছে চীন বিরোধী ইন্দো-ইউ.এস এর বাগ্নিতা। সম্প্রতি ৯/১১ ঘটনায় বিশ্বের মোড় ঘুরে গিয়েছে। ইউ.এস.এ উদ্দেশ্য সাধনার্থে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ ভারতে পেয়েছে। অতঃপর ক্রমাগত ভাবে দু'এর মধ্যে কৌশলগত যৌথক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছে, চায়নীজ বিশ্লেষক অভিমত দিয়েছে যে বদলির ক্ষমতার উদ্ভব হয়েছে এ অঞ্চলে চীনের সামরিক সু-কৌশল ও প্রবেশাধিকার অবলোকন করতে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে মিঃ জ্যাং লিজুন, চায়না ইনিস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশলাল স্টাজিড এর সদস্য, ইউ.এস প্রেসিডেন্ট বুশ এর মার্চ মাসে দক্ষিণ এশিয়া সফরের পিছনে কি কারণ সে সম্পর্কে সম্প্রতি মতামত ব্যক্ত করে লিখেছেন, "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এশিয়াতে ইউ.এস এর আঞ্চলিক কৌশল অনুযায়ী ভারত ভবিষ্যৎ শক্তিশালী চীনকে সীমাবদ্ধ করে রাখার সর্বোত্তম বাজিকর। আমেরিকান গণ মাধ্যম বলেছে বুশের ভারত সফর এমনই গুরুত্ব যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৯৭২ সালে রিচার্ড নিক্রসনের চীন সফর। নিক্রশন চেষ্টা করেছিল চীনকে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘায়েল করতে। আজ বুশ চাচ্ছে একই কৌশল অবলম্বন করে চীনকে ঘায়েল করতে"। (বেইজিং রিভিউ, ডি-৪৯, নং-১১, ১৬ই মার্চ ২০০৬)

চীন-পাক-কৌশলগত সহযোগিতা- এনার্জি সংযোগ
(Sino-Pak Strategic Cooperation – Energy corridor)

উপরে বর্ণিত অংশের অনুবৃত্তিক্রমে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি যে, চীন-পাকিস্তান কৌশলগত সম্পর্ক উভয় দেশের প্রেক্ষাপটে হয়েছে যাকে "সময়ে প্রতিরোধ করার পরীক্ষা বলা যেতে পারে। কারাকোরাম রাজপথ দ্বারা কে.কে.এইচ. চীনের দক্ষিন পশ্চিম প্রদেশ জিংজিয়াং, উইঘুর স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ এবং করাচি বন্দর দিয়ে আরব সাগর পর্যন্ত যোগাযোগ হওয়ার ফলে ইতোপূর্বের চীন পাকিস্তান সম্পর্ক গভীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং এখন একচেটিয়াভাবে গোয়াদ্দার বেলুচিস্তানের বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। সত্য কথা হল প্রায় পাঁচ দশকের পুরাতন সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে কারণ কৌশল একত্র করে গোয়াদ্দার বন্দর দ্বারা প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পথ বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক জলপথ হরমুজ প্রণালীও পারস্য উপসাগর

www.pathagar.com

(পুরাতন নাম তবে সহজে সনাক্ত করা যায়) কে যুক্ত করে কর্মসম্পাদন করেছে। কে কে এর দৃঢ় ভিত্তি গোয়াদ্দারকে সংযুক্ত করায় অত্যান্ত নিরাপদ ও সহজ বেইজিং এনার্জি রুটে পরিণত হয়েছে। সত্যিকারভাবে এ কৌশল কার্যকরি হওয়াতে চাইনিজরা এটাকে "চাইনিজ এনার্জি করিডোর" বলে। গোয়াদ্দারকে পরিশোধন এবং তৈল ও গ্যাস এর প্রান্তিক সংযোগ স্থলে পরিণত করেছে। কে কে এইচ অধিকন্ত যথাযথভাবে গোয়াদ্দার থেকে পাইপ লাইন রুট বাস্তবিকপক্ষে সাম্ভাব্য গ্যাস পাইপ লাইন ইরান থেকে পাকিস্তান হয়ে চীন পর্যন্ত বসানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। বাস্তবিকপক্ষে প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দিয়েছে যে চীনের জন্য মধ্য এশিয়ার ক্রুড্ওয়েল পরিশোধনাগার স্থাপন করা হবে এবং ট্যাংকার এবং পাইপলাইন দিয়ে পাঠান হবে। চীন ইরাকে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে যার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। উল্লেখ্য যে চীন ইরানে বিনিয়োগের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। আলোচ্য এনার্জি করিডোর অর্থাৎ কে কে এইচ যে কোন উপায়ে হোক শুধুমাত্র মধ্য এশিয়ার তৈলই পরিবহন করবে না, বরং আফ্রিকা থেকেও তৈল সরবরাহের সুযোগ দিবে। চীন পশ্চিম ও উত্তর আফ্রিকার এর্নাজির ক্ষেত্রে বৃহত্তম বিনিয়োগকারী। একটি প্রাক্কলনে বলা হয়েছে এ রুটটি উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে আসা রুট থেকে ২০,০০০ কি.মি কম। সত্যিকার কারণ হল আফ্রিকার তৈল সরবরাহের জন্য এ রুটটি ব্যবহার হলে ২৫% পরিবহন খরচ কম হবে এবং সময়ের দিক দিয়ে একমাস কম লাগবে।

চায়নীজ বিশ্লেষকের মতে একবার গোয়াদ্দার পরিপূর্ণভাবে চালু হয়ে গেলে চায়নীজ অর্থনীতিতে নতুন শক্তি সঞ্চার হবে, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সমস্যাপূর্ণ এই এনার্জি রুট নিরাপদ করতে হবে কারণ কোন এক সময় এটা হবে এই চীনের জীবন শক্তি। অতএব বেইজিং এর জন্য এটা হবে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ যে জাতীয় স্বার্থকে সংরক্ষণ করবে তাঁর প্রভাব দিয়ে এবং এ অঞ্চলের দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন করবে। চীন-পাকিস্তান কৌশলগত যৌথক্রিয়ার উন্নয়নের গুরুত্ব আরোপ করে মি.নি. ইয়ানসুও লিখেছেন, "মালাক্কা প্রণালীর ভঙ্গুর নিরাপত্তা পরিবেশ চীনের দীর্ঘ দিনের মধ্যে এনার্জি নিরাপত্তার বিষয়টি রিবাট মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে"। এটা এখন প্রমাণিত যে চীন-পাকিস্তানের কৌশলগত সম্পর্ক বেইজিংএর নিকট বেশী গুরুত্বপূর্ণই কারণ ইসলামাবাদের চেয়ে চায়নিজ এনার্জি রাস্তা সংযুক্তকরণ নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তান বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মি. নি চীন-পাকিস্তান কৌশলগত সম্পর্কের গুরুত্বের বিষয়ে আরও বলেছেন, এনার্জি করিডোর এর ব্যাপারে চীনের প্রতি পাকিস্তানের ভূমিকা অগ্রসর মান নয়। চীন এবং ভারত মহাসাগরের সঙ্গে জল যোগযোগ এবং চীন ও ইরানের মধ্যে স্থল যোগাযোগের ব্যাপারেও একই কথা বলা যাচ্ছে। চীনের ভৌগলিক অবস্থান অদ্বিতীয়, পূর্ব-এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়াকে সংযুক্ত করে ভারত মহাসাগরের বন্দর হতে এশিয়ার দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত মিলিত করতে পারে যা আরও একটি নতুন জলপথে চায়নিজ ব্যবসায়ীদের বিশ্বব্যাপী সরবরাহের সুযোগ হতে পারে। (বেইজিং রিভিউঃ মার্চ ৩০,২০০৬, ভি-৪৯ নং-১৩)

সত্য ঘটনা হল চীনের জাতীয় স্বার্থে এ পথকে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করে চীন তাঁর "করিডোরকে" যে কোন প্রকার ঐক্যনাশ থেকে প্রতিরক্ষা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই, এর মধ্যে সমুদ্র পথ ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং

www.pathagar.com

গোয়াদ্দার থেকে আরম্ভ হবে, এতে চীনের নৌবাহিনীও এ অঞ্চলে মোতায়েন থাকবে। ইউ.এস কৌশল বিশ্লেষক উপলব্দি করতে পেরেছে যে চীন এতদঅঞ্চলে একটি দাঁড়াবার স্থান পেয়েছে এবং গোয়াদ্দার একটি চমৎকার অবলোকন চৌকির ব্যবস্থা করতে পারে। অতএব হরমুজ প্রণালীতে চীনের উপস্থিতি আঘাত করার মত দূরত্বে আছে, মধ্যপ্রাচ্যে যে কোন সংকটকালে চীনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রকে সন্দেহ প্রবণ করে তুলেছে। পারমাণবিক বিষয়ে ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অচল অবস্থায় চীনের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। চীন ইরানের উপর কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়, কারণ তা হলে ইরান থেকে চীনে তৈল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটবে।

আরব সাগর এবং উপসাগরে পাকিস্তানের নৌবহর গড়ে তোলাঃ (Pakistan's Naval buildup in the Arabian Sea and in the Gulf)

পাকিস্তান কৌশলগতভাবেই বিশ্বের সবচেয়ে প্রধান তৈল রপ্তানি পথ হরমুজ অঞ্চলের সন্নিকটে অবস্থিত এবং মধ্যপ্রাচ্যের দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত যাতায়াতের সমুদ্র শাখা সংযোগ করেছে। পাকিস্তানের কৌশলগত স্বার্থ পূর্ব দিক সুদূর বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমের দিকে বেশী নিহিত। অতএব বাংলাদেশের পূর্বে এবং আরও দূর পর্যন্ত ইসলামাবাদের প্রতিশ্রুতি অতি সামান্য, জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক পৃথক রেখে যদিও মোশাররফ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যে উৎসাহ শূন্য পূর্বাঞ্চল নীতির জন্য সবচেয়ে ভাল কি শর্তাবলী দিয়ে ভারতের প্রচেষ্টার সমকক্ষ হওয়া যায় তাই বিবেচ্য। অতএব এটা স্বাভাবিক যে পাকিস্তানের কৌশল মালাক্কাকে অর্ন্তভুক্ত করে নি এবং তাঁর ই.ই.জেড অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব নয়। বিগত দশক পাকিস্তান চেষ্টা করেছে মধ্য এশিয়ার অংশ বিশেষে প্রভাব বিস্তার করতে, কিন্তু কাবুলে তালেবান শাসনের পতনের কারণে ব্যর্থ হয় এবং অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ইসলামাবাদের সম্পর্কের একটি ভাল মাত্রা ছিল যা ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন, কাবুল এবং ইসলামাবাদের মধ্যে নিরাপত্তার ব্যাপারে কঠিন কাজ বলে স্পষ্ট প্রতীয়মান। ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো ব্যতিরেকে আফগান পূণর্গঠনে ভারতের সাহায্য উল্লেখযোগ্য। দিল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের নিয়োজিত রয়েছে। এবং প্রায় ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান দিয়েছে, আফগানিস্তানের প্রয়োজনের তুলনায় অর্থের পরিমাণ কম হলেও এ থেকে বুঝা যায় দিল্লী মধ্য এশিয়াতে আফনাগানিস্তানের মাধ্যমে কর্মে নিযুক্ত থাকার জন্য দৃঢ় সংকল্প। অন্য দিকে, ইন্দো-ইরান সম্পর্ক মধ্য এশিয়াতে ভারতের অবস্থনের সহজ থাকার প্রধান উপায়। ইরানের এর্নাজি শাখাতে ভারত প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের এর্নাজির যে প্রয়োজন সে জন্য ভারতকে উপসাগরীয় অঞ্চল এবং কিছুটা ইরানের এর্নাজির উপর নির্ভরশীল। সত্যিকার অর্থে প্রস্তাবিত ইরান-পাকিস্তান-ভারত পাইপ লাইন প্রকল্প ভারতের অর্থনীতিতে উন্নতি সাধনের স্বপ্ন মাত্র। বিপরীতে ইরানের সঙ্গে ইসলামাবাদের সম্পর্ক ঐকান্তিকতাহীন তদস্তর ইরানের বিপ্লব আফগান জেহাদকে অনুগমন করেছে। ইরান আফগান মুজহেদিনদের আটটি দলকে অতিথেয়তা দেয়ার পর আফগান জেহাদের সময় ইরান নিঃসঙ্গ করে রেখেছিল, দলগুলো তেহরানে আট নামে পরিচিত, যারা যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই সোভিয়েত দখল দারিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। অতঃপর তখন থেকে স্থলপথে সুয়েজে অথবা

www.pathagar.com

লোহিত সাগরে অথবা ভূ-মধ্যসাগরে প্রবেশের পথ খুব কমই উন্নয়ন করা হয়েছে, যদিও এ ধরণের সহযোগিতা অল্প সময়ের জন্য হলেও প্রথম সামরিক শাসক আইয়ুব খানের সময় বিদ্যমান ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নকে এ অঞ্চল থেকে বাহিরে রাখার জন্য স্নায়ুযুদ্ধের চরম সময়ে আইয়ুব খান উদ্যমী হয়ে আর.সি.ডি (পাকিস্তান, ইরান এবং তুরস্ক) গঠন করে ছিলেন। যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল ততটা কাজে আসে নি, ১৯৬৫ সালে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হলে ইরানের শাহ কাশ্মীর বিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন। তৎসত্ত্বেও, পাকিস্তান সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বিকল্প পথ খুজে, তখন অবধি কাবুলে সোভিয়েতের পতন পর্যন্ত। ৯/১১ এর ঘটনা কৌশলের সমীকরণ বদলিয়ে দেয় কাবুল থেকে সোভিয়েতের চলে যাওয়ার পর পাকিস্তান মধ্য এশিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে আফগানীস্তানের অস্থিতিশীলতার জন্য বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছিল। অতএব, পাকিস্তানের জন্য সমুদ্র পথ চালু ও নিরাপদ রাখা অত্যাবশ্যকীয় বাধ্যবাধকতা ছিল, বিশেষ করে উপকেন্দ্রের সমতল ভূমির বাহিরে– অর্থাৎ উপসাগরীয় অঞ্চলের জন্য। ঐ উদ্দেশ্যে পাকিস্তান তাঁর চিরশত্রু ভারতের হুমকি মোকাবেলা করার জন্য নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রবৃত্ত হয়। এটা হতে হবে, কারণ বর্তমান বিশ্ব দৃশ্যাবলীতে পাকিস্তানের কার্যবলী বিশ্ব সন্ত্রাস দমন যুদ্ধে প্রথম কাতারের রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত হয়েছে এবং আণবিক প্রযুক্তি বিস্তারে পাকিস্তানের সম্পৃক্ততার উপর নজরদারি করাসহ এ অঞ্চলে এবং বিশ্বের অন্য কোথাও ইসালাম ধর্মাবলম্বীদের মুখোমুখি হওয়ার পাকিস্তানের প্রয়োজনীয়তা এখনও আছে বলে যুক্তরাষ্ট্র মনে করে। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন বৈদেশিক নীতির প্রয়োজনীয় উপলব্দি করে ইসলামবাদ তার কৌশলগত সুযোগ গ্রহণ করেছে– এখন ইরাক বিভক্ত হওয়ার পথে। জানা গেছে যে পাকিস্তান নৌবাহিনী উপসাগরে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে এবং সম্মিলিত নৌবাহিনী ও সামুদ্রিক বাণিজ্য বাহিনী নিরাপত্তা প্রচারে অংশ নিয়েছে (সি.এম.এস.সি) পাকিস্তান নৌ-বাহিনী এ.এইচ.এস কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। "নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের (এন.এ.টিও) বাহিরে পাকিস্তানই প্রথম দেশ যে কিনা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সমন্বিত প্রচেষ্টার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এশিয়ান টাইমস অন লাইন (২৮ এপ্রিল, ২০০৬) এর ফেড্রোরিকো বোর ডোনারো লিখেছেন "উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দায়িত্ব প্রাপ্তির কথা বিবেচনা করেই পাকিস্তান নৌ-বাহিনী আর্ন্তজাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে, পাকিস্তান নৌ-বাহিনী চীনের সহযোগিতায় আরও যে উন্নতি করেছে লেখক তা তুলে ধরেছেন।

"পাকিস্তান তার নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে" এ শিরোনামে তিনি লিখেছেন যে চীন এবং ফ্রান্সের সহযোগিতায় ইসলামাবাদ নৌবাহিনীকে শক্তিশালীকরণে ডুবজাহাজ যুক্ত করেছে। সেই সাথে নিজ দেশে তৈরি করার প্রযুক্তি স্থানান্তর করেছে, এখন পর্যন্ত এ সেক্টরে চীনের সহযোগিতাই প্রাধাণ্য বিস্তার করেছে। মি. ফেড্রোরিতো ডোনারো আরও ব্যাখ্যা করেছেন, "চীন পাকিস্তান মৈত্রী রাজনৈতিক ও কৌশলগত উভয় দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দিক দিয়ে কৌশলগত অংশীদারিত্বের দীর্ঘকালের জন্য এটা নতুন পদক্ষেপ, যাদ্বারা এ দু'এশিয়ান শক্তি সম্প্রতি" বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও ভাল প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য চুক্তি করেছে।" এ চুক্তি অনুযায়ী যৌথভাবে তাঁরা "মাল্টিরোল জেএফ-১৭ থান্ডার

www.pathagar.com

ফাইটার এয়রাক্রাফট" তৈরি করবে বিমানবাহিনীর জন্য এবং চাইনিজ নকসা অনুযায়ী "গাইডেড্ মিসাইল এ্যাটাক" সংগ্রহ করবে। এছাড়া, আগে থেকে আণবিক শক্তি উৎপাদন সহযোগিতাসহ কৌশল অব কাঠামো প্রকল্প যেমন কারাকোরাম হাইওয় প্রশস্তকরণ ইত্যাদি কার্যকর করা।

মি. ফেড্রিকো বোরডোনারো ইতোপূর্বে আলোচনা করেছেন, বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে পাকিস্তানের অবস্থা বিপজ্জনক, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে তাঁর নিজের দেশে আল-কায়েদা ও তালেবানদের খুঁজে বের করতে হবে। তিনি অবশেষে বলেছেন, "ইসালামাবাদ কৌশলগত পরিবেশে খুব কঠিন অবস্থায় দেখেছে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দীর্ঘস্থায়ীত্ব, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আমূল সংস্কারকামীদের মতবাদ এবং আফগান সীমান্ত দিয়ে আল-কায়েদার উপস্থিতি ওয়াশিংটনকে ভাবিয়ে তুলেছে এবং প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ প্রশাসনকে তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলকে পুনঃবিবেচনার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছে। একই সময়ে বৃহৎ শক্তি হিসেবে ভারতের উত্থান, অর্থাৎ পাকিস্তান তাঁর উত্তম নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করতে পারে, এর অর্থ হচ্ছে দিল্লীর সঙ্গে মিলে আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। অতএব, চীন ও ফ্রান্সের সঙ্গে কৌশলগত সহযোগিতায় নৌশক্তিকে ইসলামাবাদের সর্ব্বোচ্চ স্বার্থে উন্নতি সাধন করতে হবে (ফেড্রিকো বোর ডোনারো, এশিয়া টাইম, ২৮ এপ্রিল ২০০৬)

পাকিস্তানের সঙ্গে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের সঙ্গে সহাযোগিতা থাকা অত্যাবশ্যক, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ দু'এর মধ্যে পাকিস্তান পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশ হিসেবে চীনের সঙ্গে বেশী মুক্তাবস্থায় থাকতে পারবে, কিছুটা হলেও ভারতের শক্তি উদয়ে অবিশ্বাস আছে। ইরাকে অবস্থা অবনতিশীল, আফগান পরিস্থিতি অস্থিতিশীল এবং ইরানের ব্যাপারটি জটিলতা পূর্ণ, কাজেই পাকিস্তান চীনের সঙ্গে শক্তভাবে কৌশল গ্রহণে অগ্রসর হতে চায়, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ততটা নয়। সবকিছু মিলিয়ে আগামী বছরগুলোতে এবং তারপর আরব সাগর কৌশলগত পরিবেশের পরিবর্তনের বিক্ষুব্ধ সাক্ষী হয়ে থাকবে।

ভারত মহাসাগর- ভারতের নৌবাহিনী গঠনঃ
(Indian Ocean – Indian Naval buildup.)

আমরা ইতোপূর্বেই আলোচানা করেছি যে, ভারত দক্ষিণ এশিয়াতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে উদ্ভব হয়েছে, পেছন দিকে তাকালে দেখা যায় ১৯৭১ সালে তাঁর চিরশত্রু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সামরিক বিজয় এবং তখন থেকে ভারত আর পিছনে ফিরে তাকায়নি। ভারতের রাজনৈতিক নের্তৃত্ব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে তাঁদের উদ্দেশ্য বজায় রেখে বৃহৎ শক্তির জাতির কাতারে সামিল হয়েছে। আসল কথা হল, এটা জাতীয় আবেগের বিষয় হয়েছে। যখন রাজীব মতাদর্শ উদীয়মান, তখন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীবগান্ধী বলেছিলেন ভারত একটি শক্তি যে স্বাভাবিক ভাবেই ভারত মহাসাগরকে প্রভাবিত করবে যা ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাঁর মতাদর্শকে বলা হয় "ব্লু ওয়াটরার নেভী", যা পূর্বে মালাক্কা থেকে হরমুজ এবং তারপর পর্যন্ত

www.pathagar.com

কর্তৃত্বে থাকবে। রাজীব মতাদর্শ ভারতে শক্তি প্রদর্শনের অন্যতম ভিত্তিস্বরূপ, অর্থাৎ নৌবাহিনীকে প্রধান কৌশল শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

এটা হতে পারে, আরও অগ্রসর হওয়ার পূর্বে, চলতি কৌশলের দিকে দেখে চিন্তা করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মি. অটল বিহারী বাজপায়ী স্থির করে ২০০৩ সালের ১ নভেম্বর অধিনায়কদের যৌথ সম্মেলনে ভাষণ দানকালে বলেছেন, "আমরা আন্তর্জাতিক নৈতিকগুণ নিয়ে বড় হয়েছি, আমাদের দেশরক্ষা কৌশল স্বাভাবিকভাবে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয় প্রতিফলিত করবে, দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে প্রসারিত হবে"। তিনি আরও বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে এ অঞ্চলে কাজ করার ভারতের ইচ্ছার সংকেত দিয়েছে। যার মধ্যে উভয় জাতির স্বার্থ জড়িত। "আমাদের নিরাপত্তা পরিবেশের সীমা পারস্য উপসাগর থেকে মালাক্কা প্রণালী হয়ে ভারত মহাসাগর, মধ্য এশিয়া, উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান, উত্তর-পূর্বে চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত। আমাদের কৌশলগত চিন্তা এ সমস্ত দিক বলয় পর্যন্ত বিস্তৃত করা।

পরিবর্তিত কৌশলের পরিবেশ সঙ্গতিপূর্ণ রেখে এবং ভূ-কৌশলগত সীমান্ত কৌশলের ধারণা দেয়া হয়েছে, ভারতীয় সামরিক শক্তি পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলছে, তাদেরকে সামরিক অভিযান থেকে কৌশলগত শক্তিতে শিক্ষা দেয়া হবে। ঐ নৌ-বাহিনী হবে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বাহিনী– কমপক্ষে তিনটি বিমানবাহী জাহাজ নৌ-বাহিনীতে থাকবে, তিন থেকে পাঁচটি নৌ-অভিযানমূলক বাহিনী সেই সাথে অতন্দ্র তত্ত্বাবধানের ও সৈন্য পরিচালক ও সরবরাহের ব্যবস্থা যুক্ত থাকবে। যদিও পুনর্গঠনের কাজে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে, কিন্তু অস্ত্র প্রধানত ইসরাইল, রাশিয়া এখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনায়ন করা হবে এবং উন্নতমানের সৈন্য পরিচালনা ও সরবরাহের সুযোগ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা হবে। এ উদ্দেশ্যে গোয়ার ১০০ কি.মি. দক্ষিণে পশ্চিম তীরে প্রথম ও সর্ববৃহৎ নৌবাহিনী– আই.এন.এস কদম্ব, যুক্ত করে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে আধুনিকীকরণের প্রকল্প প্রাক্কলনে খরচ ধরা হয়েছে ৮.১৩ বিলিয়ন ইউ.এস ডলার, কদম্ব কর্ণাটকের কারওয়ারে অবস্থিত। এধরণের সৈন্য শিবির সুয়েজের এদিকে সর্ববৃহৎ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এশিয়াতে এটাই সবচেয়ে বড় সৈন্য শিবির বলে বিবেচনা করা হয় যা কিনা ৪৪০০০ টন বিমান পোত বহনার্থ জাহাজ এবং ২২ টি জাহাজ চলাচলে সক্ষম। এ্যাডমিরাল গ্রোসকভ (আই.এন.এস বিক্রমাদিত্য- চন্দ্রগুপ্ত-২ হিসেবে পরিচিত দক্ষিণ এশিয়ার এক বৃহৎ অংশকে শাসন করেছেন ও প্রভাবিত করেছেন)। আণবিক ডুবোজাহাজ তৈরি করেছেন। এটা একটি স্বতন্ত্র ঘাটি সম্পূর্ণ নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকবে। পশ্চিমে মুম্বাই এবং দক্ষিণ পূর্বে ভিজাগাপট্টমের মত নয়। ঘাটিটি ভারতীয় নৌবাহিনী সমুদ্রোপকূলে অতন্দ্র প্রহরীর কাজে শক্তি বৃদ্ধি, বিশেষ করে চলাচলে সুযোগ করে দিবে বলে বলা হচ্ছে। এটাও উল্লেখ্য যে উত্তর আরব সাগর বিশ্বের অন্যতম নিবিড়তম সমুদ্রোপকূল গমনাগমন এলাকা, সে সাথে বেসামরিক এবং নৌবাহিনীর চলাচল হরমুজকে যানজটে পরিণত করেছে।

সত্যিকার কারণ হল 'কদম্ব' একটি স্বতন্ত্র ঘাটি, তাৎক্ষণিকভাবে সঙ্কটকালে পাকিস্তানী আক্রমণ, এ অঞ্চলে চীনের নৌবাহিনীর উপস্থিতি এবং গোয়াদ্দার অন্যস্থানে

www.pathagar.com

যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সনাক্তকরণের সুযোগ করে দিবে। ভারতের বিখ্যাত সমুদ্রযাত্রা বিশেষজ্ঞ একই অভিমত ব্যক্ত করেছে। যখন কৌশলের সুফল সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল, তখন অন্যতম বিখ্যাত বিশ্লেষক, মাদ্রাজ খ্রিস্চিয়ান কলেজ এবং ইনিস্টিটিউট ফর ডিফেন্স এন্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ এবং সমুদ্র যাত্রার নিরাপত্তা গবেষকসঙ্গী অধ্যাপক লয়ারেন্স প্রভাকর বলেছেন, চীনের ডুবোজাহাজ, বিশেষ করে তাদের আণবিক আক্রমনের ডুবোজাহাজ নিকট ভবিষ্যতে বেলুচিস্তান প্রদেশের গোয়াদ্দারে অবাধে যাতায়ত কর (যা চীনের পারশ্য উপসাগরের খবরাখরব শোনার কৌশল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে)। অন্যদিকে এ অঞ্চলে চীনের নৌবাহিনীর তদারকির কারণে চলাচল, ভারতকে পাকিস্তানের সর্বশেষ প্রযুক্তি উন্নতকৃত ডুবোজাহাজের "নিউ এয়ার ইণ্ডিপেন্ডেন্ট প্রোপলসন (এ.আই.পি) যা "ফ্রেঞ্চ স্কোরপেন" মত সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারওয়ার ঘাটি যেটি এখন কাজে লিপ্ত ভারতের নৌবাহিনীর পশ্চিমের অধিনায়ক মুম্বাই থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে পারে। আণবিক সম্পদ সহ কৌশলগত অধিনায়কত্বের ও স্থানান্তর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অনেক বিশ্লেষক অনুধাবন করছে যে নৌবাহিনীর পূর্ণ উন্নীতকরণ পরিকল্পনা নৌবাহিনীর উন্নয়নের গতিশক্তি ও বহিঃসমুদ্রের শক্তি অর্জন করতে পারবে। ভারতকে এখনও বহিঃসমুদ্রের বিশিষ্টতা অর্জন করতে হবে, নৌবাহিনীর হরমুজের মত মালাক্কা প্রণালীতে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। কার্ডকে ভুললে চলবে না, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজীব গান্ধীর মতাদর্শ ছিল তিনি শুধুমাত্র ভারত শক্তিকে অসাধারণ ক্ষমতা ও দক্ষতা দিয়ে সমুদ্র পর্যন্ত প্রক্ষেপন করার প্রস্তাবকই ছিলেন না, তিনি ৮৯ সালে মালদ্বীপ সংকটকালে র‍্যাপিড এ্যাকশন ফোর্স সমর্থিত নৌবাহিনী প্রয়োগ করে কার্যপ্রণালী প্রদর্শন করেছেন। তিনি ভারতীয় নৌবাহিনীকে ভারত মহাসাগরে কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করতে পুনঃ তেজেদীপ্ত করার জন্য উদ্যমী হন যেমনটি আগ্রহ নিয়ে করেছিল কৌটিল্য (চানক্য) এবং এ্যাডমিরাল মোহন।

ইন্দো-ইউ.এস সমকেন্দ্রিকতা কৌশলগত স্বার্থ
(Convergence of Indo-US Strategic interest)

সাধারণ জ্ঞানের দ্বারাই বুঝা যায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সর্ম্পকের কৌশলগত অংশীদারীত্বের পূর্ণতা লাভ করেছে। এ পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতকে জাতীয় অথবা বিশ্বস্বার্থে বৈরী বিবেচনা করে না। ভারত মহাসাগর এবং মধ্যএশিয়া অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র তাঁর স্বার্থ রক্ষার্থে ভারতকে সমর্থক শক্তি বলে মনে করে। ঘটনা হল এ সম্পর্ক অবশ্যই এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত বিরোধে পিছিয়ে যাওয়া অবস্থার উন্নতি ঘটাবে। যখন ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত সম্পর্কের পরিমাপ করবে, তখন একজনকে ভারত যুক্তরাষ্ট্র বে-সামরিক আণবিক চুক্তির বিষয় চিন্তা করতে হবে, যদিও এখনও যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদন হয় নি, এখনই যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদন হয়, এন.পি.টি তে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর মধ্যে ভারতই একমাত্র দেশ যে এর বাহিরে আছে এবং আণবিক জ্বালানি ও অন্যান্য সুযোগ গ্রহণ করছে। এবং বেসামরিক কাজে ব্যবহার করা হয় বলে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে ভারতই প্রথম এধরনের সাহায্য পাচ্ছে, এমনকি তিনটি দেশের মধ্যে একজন হবে, যারা এন.পি.টি. তে (নন প্রোলিফিরেশন

www.pathagar.com

ট্রিটি) স্বাক্ষর করে নি। বলা হচ্ছে যে ২২ টি ভারতীয় আণবিক সংস্থার মধ্যে (যেমন প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে) ৮ টিতে সামরিক সুবিধা আছে যা আই.এ.ই.এ'র (ইন্টারন্যাশনাল এটমিক এনার্জি এজেন্সি) প্রাক-বীক্ষণের আওতার বাহিরে রয়েছে। বিশ্লেষকগণ প্রস্তাব করছেন যে চুক্তি অনুযায়ী এন.এস.জি (নিউক্লিয়ার সাপ্লাই গ্রুপ) থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি ভারতে ইউরেনিয়াম মওজুদের উপর থেকে চাপ কমাবে যা জমা করে স্বতন্ত্রভাবে সামরিক সুযোগ বৃদ্ধির কাজে লাগতে পারবে।

যা হোক, সংক্ষিপ্তাকারে বলা যাচ্ছে যে, শুধু ভারতই সামরিক অভিযানের অস্ত্রের কৌশলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাহায্য পাচ্ছে না, ওয়াশিংটনের অনুমোদন নিয়ে ইসলাইল যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিতে তৈরি সকল সামরিক সরবরাহ দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রযুক্তিকে বদলে দেয়া হয়েছে। সামরিক অভিযান, কৌশলগত অস্ত্র উভয়টি এবং অতন্দ্র তত্ত্বাবধানে পদ্ধতি এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সম্পর্ক নিয়ে রাজনৈতিক বিরোধিতা খুব কম, তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারতের বামপন্থী রাজনৈতিক নেতার ঝোক ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সর্ম্পক সন্দেহ প্রবণ যা কমিউনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে। বহু ভারতীয়ের অভিমত বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রে নীতির প্রভাব গণতান্ত্রিক ভারতের জন্য কৌশলগত সম্পর্ক কতটুকু ঠিক, তবে বর্তমান সরকারের অভিপ্রায় শুধুমাত্র ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগের অংশীদার হওয়া– বাগডোগরা বিমান ঘাটি দু'টি যৌথ বিমান অনুশীলন থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে (পশ্চিম বাংলা, পৃথকভাবে ইউ.এস.এ.এফ (ইউ.এস এয়ারফোর্স) এবং আই.এ.এফ (ইসরাইল এয়ারফোর্স) এতে বামপন্থীদের পক্ষ থেকে কোন প্রতিরোধ আসেনি এবং নিরপেক্ষ আন্দোলনের পতাকাবাহিরা কোন আন্দোলন করে নি। বাগডোরা বাংলাদেশ সীমান্ত শহর তেঁতুলিয়া থেকে ৬০৭ এন.এম (নটিকেল মাইল), চীন সীমান্ত লাসা, তিব্বত (চীন) সামরিক শহর থেকে ২৬৬ এন.এম. এবং বেইজিং থেকে ১৮৫৮ এন.এম যাকে দক্ষিণ চীনের তদারকীর কৌশলগত অন্যতম ঘাটি বিবেচনা করা হয়। এসমস্ত অনুশীলনগুলো চীনের প্রতি সংকেত, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কৌশল একই অভিমুখে যাত্রা এবং এরূপ ঐক্যের উদ্দেশ্যও উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা হল ভারতকে সাহায্য দিয়ে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে বড় করে গড়ে তোলা যেন প্রয়োজনে চীনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, এ উদ্দেশ্যে কার্যপ্রণালী প্রদর্শন করা।

যেভাবেই হয়, তা হতে পারে, ভারতকে বিশ্ব শক্তি হিসেবে গণ্যকরার জন্য ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সুনিশ্চিয়তা, অন্যতম প্রধান নিরাপত্তা বিশ্লেষক ডঃ সুভাষ কাপিলা লিখেছেন, "ভারতের সকল রাজনৈতিক মত পার্থক্য দুর করা এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতারক ভারতীয় সাংবাদিক এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অনুধাবন করতে হবে যে,–

(এ) ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্র-ভারত কৌশলগত অংশীদারিত্বের অত্যাবশ্যকীয়তা দাবী করছে।

(বি) ভারতের আকাঙ্ক্ষা বিশ্বের প্রধান শক্তিতে পরিণত হওয়া, জোট নিরপেক্ষতা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এবং বহুনীতি বিশ্ব না গড়ে (চীনের সমকক্ষ হওয়া) কাজ করা।

www.pathagar.com

(সি) ভারতের আকাঙ্ক্ষা বিশ্ব শক্তিতে পরিণত হওয়া এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া।

তিনি আরও লিখেছেন, "ভারতের অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা, ইরাকে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি আমাদের জোট নিরপেক্ষ প্রতারকদের অযৌক্তিক প্রতিক্রিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিজে (বাজপায়ী) এ দৃষ্টিকোণ থেকে দৃঢ়তার সাথে সম্মেলনে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন– "আমাদের দেশের অনেক লোক এখনও স্নায়ুযুদ্ধের সময়ের চাদরে ঢেকে আছে এবং কৌশলগত অনুমান গত শতাব্দীর" (ইন্ডিয়ান ডিফেন্স হাঁর ষ্ট্রাটেজিক ফ্রন্টিয়ার এন্ এ্যালাইসিসঃ সুভাষ কাপিলাঃ এস.এ.এ.জি. ৪ নভেম্বর ২০০৩)। ভারতীয় অভিলাষের বিশদ বর্ণনার মধ্যে যে ঐতিহাসিক ভুল সংশাধনের কোন প্রয়োজন নেই, ১৯৬২ সালে চীন ভারত সংঘর্ষের পূর্বে নেহরুর জোট নিরপেক্ষ নীতির জন্য এ ভুল করা হয়েছিল, সেই পরাজয়ের আঘাত এখনও অবলোকন করছে।

বঙ্গোপসাগরে চীন-ভারত-যুক্তরাষ্ট্র জটিলতা
(Sino-India-US Tangle in Bay of Bengal)

ভারত যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগত সমকেন্দ্রিকতা এবং উপসাগরে ও আরবসাগরের প্রতি ভারতের আগ্রহ সম্পর্কে ফলপ্রসুত আলোচনা আমরা করেছি। বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে ত্রিমুখী শক্তির প্রতিফলনের দ্বারা উদ্ভব পন্থানিয়ে এবং এ অঞ্চলের দেশগুলোর উপর বিশেষকরে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার এর প্রভাব পড়ে তা নিয়ে বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে। বঙ্গোপসাগর এর উপকূলবর্তী এলাকায় ভারতের কৌশলগত স্বার্থ হল আয়তন বৃদ্ধি করা কারণ আরব সাগরের কৌশল থেকে এটার গুরুত্ব বেশী উপলব্ধি করেছে। জানা গেছে, ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় নৌবাহিনী এখন ভিজাগাপট্রমে আবস্থান করছে। বিশেষ করে দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মুসলিম জঙ্গিদের সামুদ্রিক সন্ত্রাস সম্পর্কে অবহিত হয়ে ৯/১১ থেকে আক্রমণাত্মক অবস্থায় আছে। পরোক্ষভাবে মিয়ানমার এর কারণে চীন বঙ্গোসাগরে উপস্থিত রয়েছে এবং ষড়যন্ত্রাদির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে গোপন চুক্তির ব্যাপারে ভারতে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ও নীতি নির্ধারিকরা উদ্বিগ্ন। পূর্ব ভারত মহাসাগরে ভারতীয় নৌবাহিনীর কার্যকলাপ বৃদ্ধি, পাওয়ার বিষয়টি অলক্ষিত রাখার যায় না, কারণ ভারতীয় নৌবাহিনীর মতাদর্শ প্রস্তাব করেছে যে, মালাক্কা প্রণালীর নিরাপত্তা রক্ষাকারী ভারতের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা অর্থনীতির প্রাণ। বিশ্লেষণ করে ভারতের কৌশল সীমান্ত পর্যন্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বঙ্গোপসাগরে সামরিক বৃদ্ধির বিষয়টি তদারক করবে।

উপরোল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা যাচ্ছে যে, এটা খুব কৌতূহলোদ্দীপক যে ভারতের একজন বিখ্যাত সমুদ্র যাত্রা সম্পর্কিত নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশের ভূ-কৌশলের অবস্থান নিয়ে প্রস্তাব করেছেন, বিপরীতে এ অঞ্চলে ভারতীয় নৌবাহিনীর কৌশল নিয়ে বলেছেন "যে জাতি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেলিপ্ত হতে পারে সেই জাতির বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপেই দেশরক্ষা পরিকল্পনায় দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ভারতের ব্যাপারে পাকিস্তান, চীন এবং বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে আছে। এগুলোর মধ্যে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ সমুদ্রোপকূলের সীমানার কাছাকাছি। বাংলাদেশ

www.pathagar.com

নৌবাহিনী প্রধানতঃ কয়েকটি দ্রুতগামী রক্ষী জাহাজ নিয়ে উপকূল প্রহরীর কাজ করছে, কোন ডুবোজাহাজ নেই। সুতরাং আমাদের পুরাতন পরিবাহক (যা পুনস্থাপিত হতে পারে)। ভারত এবং কিছু দ্রুতগামী রক্ষী জাহাজ ছোট তথ্যানুসন্ধান অভিযান জাহাজসহ যুদ্ধ জাহাজ বিধ্বংসী অস্ত্র এবং দুটি ডুবোজাহাজ অবরোধ করার জন্য যথেষ্ট এবং বঙ্গোপসাগরে জলরাশির উপর প্রভাব বিস্তারে পূর্ণ সক্ষম। ডিজাগাপট্রমের বিমান ও নৌ-ঘাটি এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ (এশিয়ান সুনামীর সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত) সম্প্রসারণ করা হবে এবং আধুনিকায়ন করে ভূমিকা পরিপূর্ণ করতে হবে। বাংলাদেশের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা সুদূর, তবে আগামী পৃথিবীর জন্য প্রস্তুত থাকা সবচেয়ে ভাল, যখন তৈল (এর্নাজি) এবং জলরাশি নিয়ে ভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে বঙ্গপোসাগরের কৌশলগত ভূমিকা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, ভারতের শক্তির প্রতিফলন চীনের বিপরীতে কতটুকু তা সন্ধান করতে হবে। ভারতের বিশ্লেষক বঙ্গপোসাগরের উপর আসক্তি দেখিয়ে গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, "ভারতের ভূ-খণ্ড সম্পর্কিত কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, বর্তমানে আঞ্চলিক শক্তি হতে আগ্রহী, বঙ্গপোসাগর, ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে যাওয়ার কোন ইচ্ছা নেই, (আমরা আলোচনা করেছি) এবং সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালী হতে মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত যার মধ্যদিয়ে নিজস্ব এনার্জি সরবরাহ করা হবে এবং সাম্ভাব্য মিত্রদের (চীনকে বাদ দিয়ে) প্রস্তাব অনুযায়ী (এটা কি চীন হবে? চীন হতে পারে অন্যগুলি আমাদের)। এই বিশ্লেষক আরও প্রস্তাব করেছেন,- "অসম্ভাবনীয়, তবুও চীনের সঙ্গে যুদ্ধ ঘটে গেলে দৃশ্যপট বদলে যাবে, তাই যথোচিতভাবে নৌশক্তি ও যাবতীয় পরিসম্পদ দিয়ে মালাক্কাকে অবরোধ করতে হবে, চীনে তৈল সরবরাহের পথ বন্ধ করতে হবে"। (এস.এ.এ.জি পেপার ১৪০৬ তারিখ ৩১-০৬-০৫)। আরও মনে রাখতে হবে সামুদ্রিক জাহাজসহ ডুবোজাহাজ অবরোধ বহাল করতে পারে অথবা ভেঙ্গে দিতে পারে। ভিজাগাপট্রম এবং বালীর বন্দর আন্দামান এর মধ্যে দূরত্ব ৭৭২ এন.এম এবং চিটাগাং থেকে ভিজাগাপট্রম ৬৬০ এবং বেল্লাইর ৩০০ মাইল, মিয়ানমার ১৬৬ এন.এম (পুরাতন আকিয়াব)

ভারত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি
US Presence in Indian Ocean

এটা যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়, অত্যন্ত অসম্ভাবনীয় ওয়াশিংটন যে কোন পর্যায়ে ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব তুচ্ছ করে দিতে পারে। বরং দিয়াগোগার্সিয়া দ্বীপপুঞ্জকে অধিকতর শক্তিশালী করতে পারে- প্রাক্তন ব্রিটিশ অধিকারী জলসীমা ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর হাতে অর্পণ করে। দিয়াগোগার্সিয়া যা যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য চলাচলের ও সরবরাহের নৌবাহিনী ও কৌশলগত বোমারুদের শক্তিকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবে, আফগানিস্তান আক্রমণ করার সময় এবং ব্যাপক বিমান আক্রমণ করার সময় উৎক্ষেপন স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হয়, 'স্থায়ী স্বাধীনতা'র সমর্থনে তালেবান আল কায়েদার অবস্থানের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হয়। দ্বীপপুঞ্জের ভৌগোলিক অবস্থান অদ্বিতীয়, ১,১০৫ এন.এম. দূরে শ্রীলঙ্কার কলম্বোর দক্ষিণ পশ্চিমে আঘাত হানার মত দূরুত্বে– যে বিন্দুতে কোন ভূ-কম্পন পৃথিবীর উপরিভাগ স্পর্শ করে (এপিসেন্টার), অর্থাৎ হরমুজ প্রণালী যা ২৬১৩ এন.এম দূরত্বে অবস্থিত। শুধু হরমুজ নয়,

www.pathagar.com

দিয়াগোসার্সিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্র কৌশল বৃদ্ধি করে আরব সাগরের যে কোন প্রধান বন্দরে কোন সঙ্কটকালে আঘাত করার মত যোগ্যতা আছে এবং সহজেই জটিল সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করে আঘাত হানতে পারে। ভূ-কৌশল অনুযায়ী অবস্থান এত সুবিধাজনক যে যুক্তরাষ্ট্র চীনে তৈল সরবরাহের পথকে পশ্চিম হতে সেন্ট্রাল আফ্রিকা থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত তদারক করতে সক্ষম। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গোয়াদ্দার বন্দর, যা কৌশলগত সরবরাহ জমা করার স্থান হিসেবে গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাকিস্তান এবং চীন উত্তরে প্রায় ২,৩২৫ এন.এম এবং একই দূরত্বে ইরানের বন্দর এবং বেশীর ভাগ দক্ষিণের তৈল এবং আণবিক সুবিধাদি।

গত শতাব্দীতে সমন্বিতভাবে দক্ষিণ এশিয়াতে পৃথকভাবে এবং জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোতে সাধারণভাবে দ্বীপপুঞ্জে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ীত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে এবং নির্বিচারে স্বদেশীয় অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। ভারত এ ধরনের আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বকারী হয়েছিল, কিন্তু জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মৃত্যু হওয়াতে সবকিছু বদলে যায়। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারত সকল বহিঃশক্তিকে ভারত মহাসাগর থেকে চলে যাওয়ার দাবী করে এবং শ্রীলঙ্কা প্রধান আন্দোলনকারী যে ভারত মহাসাগরকে আণবিক অস্ত্র মুক্ত এলাকা রাখার দাবী করেছে, কিন্তু তা হওয়ার মত বিষয় ছিল না। তখন থেকে আণবিক অস্ত্রধারী ভারত ফিসফিস করে শ্রীলঙ্কাকে কিছু বলেছিল, ভারত স্বাভাবিকভাবে ওয়াশিংটনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত মিত্রতে পরিণত হয়ে আর্বিভুত হয়। অপর দিকে, যুক্তরাষ্ট্র আজ ভিয়েতনামের পর দখলকৃত ইরাকে অসংখ্য সৈন্যবাহিনী এনে জমা করেছে, উদ্দেশ্য মধ্য প্রাচ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে, পাকিস্তান আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান করতে এখানে উপস্থিতি দরকার এবং কৌশলগতভাবে মধ্য এশিয়াতে উপস্থিতি দিয়াগোগার্সিয়াতে আরও গুরুত্বপূর্ণ সৈন্য চলাচলও সরবরাহ এবং কৌশলগত ঘাটিতে এতদূর যুক্তরাষ্ট্র থেকে না হলেও এখান থেকে সুবিধা হবে। এখন ভারত পাকিস্তান উভয়েই বিশ্ব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত মিত্রের অংশ এবং শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধে রক্ত ঝরছে। দক্ষিণ এশিয়ার এদেশগুলো যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন ভারত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী উপস্থিতিকে মেনে নিবে না, এটা পুরোপুরি এবং অসম্ভাবনীয় এবং যুক্তরাষ্ট্র সার্কের পর্যবেক্ষক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, ওদিকে চীনকে এ সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াশ চলছে, আদৌ যদি হয় তা হলে সেটা কৌতূহললোদ্দীপক হবে। ভবিষ্যতে এটা হবে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, বরং তা খারাপও হতে পারে, ভালও হতে পারে। এ অঞ্চলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের অস্বাভাবিক প্রকাশ।

চীন মিয়ানমার কৌশলগত সহযোগিতা
Sino-Myanmar Stratagic Cooperation

আমরা যেমন দেখেছি যে এনার্জি নিরাপত্তা দিয়ে চীন আরব সাগরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে আগ্রহী, কিন্তু দক্ষিণ এবং পূর্ব এশিয়ার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, এনার্জি নিরাপত্তা এবং ভূ-খণ্ডগত পুরাতন বিতর্কই বঙ্গোপসাগর অঞ্চল তৈরি করেছে, যদি বেশী নাও হয়, তবুও বহুদিনের স্থায়ী প্রয়োজন সমান গুরুত্বপূর্ণ। দশক দশক ধরে চীন মিয়ানমারের সঙ্গে বহুদিন পরীক্ষান্তে কৌশলগত সম্পর্ককে উন্নতি করেছে।

www.pathagar.com

মিয়ানমারও বেইজিং নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের দ্বারা নিরীক্ষিত হয়েছে চীনের নমনীয় বন্ধু হিসেবে। সম্প্রতি মেনডালে-ইয়াঙ্গুন রাস্তা সিউল মিয়ানমার সীমান্ত শহর কুনমিং ইউনান প্রদেশের রাজধানীকে সংযুক্ত করে উন্নয়ন করা হয়েছে এবং সহজে ইয়াঙ্গুন প্রবেশের অধিকার দিয়েছে। এ রাস্তা পশ্চিম তীরবর্তী সিত্তই (আকিয়াব)কেও যুক্ত করবে। এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে বাংলাদেশ মায়ানমারের মধ্যদিয়ে কুনমিং এর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পরিকল্পনা করছে খুব জোরাল ভাবে মিয়ানমারের মধ্যদিয়ে এশিয়ান হাইওয়ে তৈরির প্রস্তাব করেছে। যা সংক্ষিপ্ত ও সরাসরি কুনমিং এবং চীনের উনান প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিবে।

মিয়ানমারের নৌবাহিনীকে সুযোগসুবিধা দিয়ে উন্নতমানের করার অংশ হিসেবে চীন ইয়াঙ্গুন এবং সিত্তই উন্নয়ন করেছে যা চীনের নৌবাহিনী সবসময় কাজে ব্যবহার করবে। জানা গেছে চীন উভয় বন্দরে প্রবেশের অধিকার চায় এবং পর্যবেক্ষণ চৌকির উন্নয়ন করে গোয়েন্দা সংকেত এর ব্যবস্থা করবে (এস.আই.জি.আই.এন.টি) কোকো দ্বীপে সিত্ত তীরবর্তী অঞ্চলে, ভারতের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ থেকে ৩০ এন.এম, জানা গেছে চীন তার মিসাইল পরীক্ষা করার জন্য সুযোগবৃদ্ধি করে তদারক করবে। গভীর সমুদ্রে রাখাইন (আরকান) উপকূলে বন্দর নির্মাণের কাজ চলছে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে, এতে চীন সাহায্য দিচ্ছে। ১৮ এপ্রিল ২০০৫ এ.এফ.পি জানিয়েছে যে, চীনের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিয়েছে একটি তৈল পাইপলাইন তৈরি হবে, তা মিয়ানমারের গভীর সমুদ্র বন্দরকে সিত্ত থেকে কুনমিং, চীনের ইউনান প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত যুক্ত করবে। জাতীয় উন্নয়ন এবং রিফর্ম কমিশন এপ্রিলে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে। বহুদিনের প্রতীক্ষিত এ পাইপ লাইন দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা থেকে আশোধিত আমদানি এবং এ লাইন পূর্বেরটির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার হবে, ফলে মালাক্কা প্রণালী দিয়ে আসার নির্ভরতা কমে যাবে। নিমার্ণ কাজ এ বছর নতুন করে আরম্ভ হবে। এটা হলে চীনে জনপূর্ণ ইউনান প্রদেশ, সিচুয়াং এবং চংকুইং পৌর এলাকার অপরিশোধিত তৈল নিষ্কাশনের জন্য পরিবহনে সুবিধা হবে, এ উন্নয়ন আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্ব বহন করে।

উপরোল্লিখিত উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হল বঙ্গোপসাগর চীনের বিবেচনায় কল্যাণকর, এর সংক্ষিপ্ত নিষ্কাশনের নালা দক্ষিণ-পূর্ব রাজ্য অর্থনৈতিক রূপান্তরের চলতি সাক্ষী। অতএব এখানে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, চীনের নীতি নির্ধারকেরা উপকূলীয় এলাকার দেশসমূহের সহযোগিতা অর্থাৎ প্রধাণত বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সহযোগিতায় এ অঞ্চলে তাঁরা আধিপত্য বিস্তারে গভীর আগ্রহী। আগামী দশকে উভয় দেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক হবে সংকটপূর্ণ। চীন-যুক্তরাষ্ট্র জটিলতা এ অঞ্চলে বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, বিশেষ করে এনার্জি প্রসঙ্গ এবং এর পরিবহন যে সমস্ত দেশের উপর দিয়ে হচ্ছে, অতীতের লেখ্যমান থেকে দেখা গেছে তাঁরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্থান দেয় নি এবং মানবাধিকারের বিষয়ে তাঁরা ভ্রুক্ষেপহীন রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিন্দা করার কারণে চীনের এনার্জির প্রচুর প্রয়োজনীতা বৃদ্ধি পায়, এতে তৈলের দাম দ্রুত উর্ধগতি লাভ করে। চীন তাঁর তৈলের চাহিদা পূরণের জন্য বিশ্বের চতুর্দিক থেকে সংগ্রহ করছে, চীন উচ্ছৃঙ্খল দেশগুলোকে সমর্থন করছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করার জন্য এদেশগুলোকে উৎসাহিত করছে। আফ্রো-এশিয়ান ল্যাটিনদেশের

www.pathagar.com

জনগোষ্ঠীর নিকট চীনের ভাবমূর্তি নষ্ট করার কারণে বেইজিং যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তরিকতাবিহীন বিবেচনা করে থাকে। যা হোক সাধারণভাবে চীনের উপলব্ধি হল যুক্তরাষ্ট্র সত্য স্বীকার না করে অথবা এনার্জি উৎসে সহজে প্রবেশের ক্ষেত্রে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে চীনের অর্থনীতির উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়। চীনের নিরাপত্তা বিশ্লেষক অনুধাবন করছে যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের নৌবাহিনীর উদ্ভব উভয়টি চীনের তৈল সরবরাহ পথে খুব সম্ভব ব্যাহত করছে সুতরাং এদের থেকে দূরে থাকা উচিত। বেইজিং একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষেই দ্রুততার সঙ্গে বহিঃসমুদ্রে নৌবাহিনী গঠন করা প্রয়োজন বলে চীন মনে করে।

অন্যদিকে ভারত বিমান এবং ছোট নৌবাহিনী, এবং কার্নিকোরব দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে দূরবর্তী অংশে তথ্যানুসন্ধান কেন্দ্রসহ ঘাটি তৈরি করছে। নিকবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে মালাক্কা প্রণালীর দূরত্ব কম মাত্র ৯৫০ এন.এম বিপরীতে, অধীকন্ত ভারত সিত্তুর দক্ষিণে আন্দামান সাগরে আন্দামানের পূর্বে গভীর সাগরে বন্দরের উন্নয়ন করছে বলে প্রতীয়মান হয়, এটা হ্যানয় পর্যন্ত স্থলপথের দূরত্ব কমাবে এবং পূর্বদিকের প্রতি দিল্লীর আগ্রাসনের বৈদেশিক নীতি। চীনের অভিপ্রায় মোটামুটি বড় ধরনের তদারকি করার জন্য এ পদক্ষেপ গ্রহণ, ভারতের প্রভাব বলয়ের মধ্যে, ভারতীয় বিশ্লেষকের মতে চীন আগ্রাসন নীতি অবলম্বন করায় আবর সাগরের মত বঙ্গোপসাগরে উপস্থিতি প্রয়োজন।

প্রাপ্তিসাধ্য প্রতিবেদন অনুযায়ী, পূর্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া চীন অন্য একটি সংযোগ রাস্তার প্রস্তাব করে, তাহল সিনখাম পর্যন্ত যুক্ত হলে ইরাবতী নদী পর্যন্ত প্রবেশে সুবিধা হবে এবং ইয়াংঙ্গুণ হয়ে আন্দামান সাগর পর্যন্ত পৌঁছা যাবে। যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে চীনের মালামালও জাহাজ থেকে নিয়ে বজরা দিয়ে যে কোন সময় সহজে নদী দিয়ে যাতায়ত করতে পারে। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে যতদিন পর্যন্ত মালাক্কা প্রণালী চীন কর্তৃক অবরোধ করার ভয় থাকবে এবং তাইওয়ানের পদমর্যাদা ঠিক না হবে ততদিন পর্যন্ত চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাইওয়ানকে ছাড়া ও চীনের সঙ্গে পূর্বচীন সাগরে জাপানের সঙ্গে এবং দক্ষিণ চীন সাগরে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ আছে। কৌশলগতভাবে এসব এলাকাগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি মালাক্কা প্রণালীর ভবিষ্যৎ মর্যাদা নিয়ে চীনকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। আজও মাল্লাক্কা প্রণালী যেমন জীবন শক্তি হিসেবে চীনের নিকট গুরুত্বপূর্ণ, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জন্যও গুরুত্বপূর্ণ, অতএব বোধশক্তি দ্বারা কৌশলগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে চীন যতটুকু সম্ভব বঙ্গোপসাগরে তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজন মনে করে ততটুকুর জন্য বিকল্প পথের উন্নয়ন করতে সে বাধ্য।

যা হোক, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে মিয়ানমারের সামরিক জান্তার উপর অর্থনৈতিক অবরোধ থাকার কারণে, মিয়ানমারের অবকাঠামো, অর্থনৈতিক মর্যাদা এবং সামরিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করার চীনই হল প্রধান উৎস ও শক্তি। মিয়ানমারের এনার্জি সেক্টরে চীন প্রচুর বিনিয়োগ করেছে, বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাস সেক্টরে। বছরের পর বছর ধরে একমাত্র উৎস দেশ হিসেবে চীন ইয়াঙ্গুন একচ্ছত্রভাবে সুবিধা ভোগ করছে। কিন্তু বিশ্ব ঘটনার ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তাতে মিয়ানমারে চীনের প্রভাব ভীষণভাবে ভারত দ্বারা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে, কারণ দিল্লী সামরিক জান্তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, ঐ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি ভাবনাচিন্তা না করে

www.pathagar.com

হট্টগোলের সমর্থন দিচ্ছে। সম্প্রতি মিয়ানমারে রাষ্ট্রপতির সফরে কোন প্রকার কুটনৈতিক অনুষ্ঠান এন.এল.ডি নেতা (ন্যাশনাল নীগ ফর ড্যামোক্রেসী) অংসাং সুতিকে প্রদান করা হয় নি, যিনি কোন এক সময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিমা হিসেবে বিবেচিত হত এবং ভারত সরকার সমর্থন করত। এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য অবরোধ থাকা সত্ত্বেও ভারত মিয়ানমারের এনার্জি সেক্টর দ্বিতীয় বৃহত্তম বিনিয়োগকারী হিসেবে পরিগণিত। এটা হতে পারে, যেমন ছিল অর্থাৎ আবর সাগরের ক্ষেত্রে, ভারতের কৌশলীরা মনে করে যে চীন-মিয়ানমার কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের অবকাঠামো উন্নয়ন সম্পূর্ণ হলে চীন পূর্ব দিক দিয়ে ভারতকে ঘিরে ফেলতে পারবে, যেমনটি তাঁরা পশ্চিম দিয়ে করেছে। এটা লক্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক যে ভারতের একজন বিশ্লেষক রাহুল বেদী এ বিষয়ে লিখেছেন যে, "পাকিস্তান এবং চীন ঐ সমস্ত কিছু দেশের অন্তর্ভুক্ত যারা আন্তর্জাতিক মতামতকে উপেক্ষা করেছে এবং ১৯৮৮ সালে দৃঢ়তার সঙ্গে ইয়াঙ্গুন এর সামরিক জান্তার সর্ম্পক স্থাপন করেছে, এবং চালাকির সাথে ভারতকে বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলার কাজটি পূর্ণ করতে চাচ্ছে"। বিশেষ এ উপলব্ধি থেকে দিল্লী মনে করছে চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক হবে অন্য একটি পদক্ষেপ যা চীনের কৌশলগত বেষ্টনের কাজকে সমৃদ্ধ করবে। তৎসত্ত্বেও রাহুল বেদীর মত লেখক ভারতের প্রতারণমূলক বৈদেশিক নীতিকে উপেক্ষা করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যখন অন্যের হয়ে এ অঞ্চলে কর্তৃত্ব করতে চেষ্টা করছে তখন চীনের ক্রমবৃদ্ধিকে ভারত বিরুদ্ধাচরণ করছে।

চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সর্ম্পক-ভারতের বিমূর্তকল্পনা
Sino-Bangladesh Relation-Indian perception

ভারতের মতে, মিয়ানমারের মতো নয়, চীন-বাংলা সম্পর্ক কৌশলগত পর্যায়ে এখনও পর্যন্ত দৃঢ় আছে, কিন্তু এখনও সম্ভাবনীয় আছে যে কৌশলের আর এক রূপে সামরিক অভিযানের সম্পর্কে রূপান্তর করা যেতে পারে, তাহলে ইন্দো-বাংলা সম্পর্কের জন্য তাহবে অবশ্যই বিপজ্জনক। চীন-বাংলা বিদ্যমান সামরিক সম্পর্ক সে রকম হতেও পারে, ঘটনা হলো এ সম্পর্ক সামরিক অভিযান পর্যায়ের সর্ম্পক– দিল্লীর মতে এটা ভারতের অভ্যন্তরীণ সমুদ্র যা বঙ্গপোসাগরের নিকটবর্তী চীনের অবাঞ্ছিত প্রবেশের ইঙ্গিত। বাংলাদেশ বিকল্পভাবে সংক্ষিপ্ত সমুদ্র পথ চট্টগাম বন্দর দিতে কুনমিং যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে পারে। ইউনানের নিকট দিয়ে চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে মিয়ানমর থেকে এশিয়ান মহাসড়ক নির্মাণের বাংলাদেশী প্রস্তাবকে বাংলাদেশের সরকারের কৌশলগত পদক্ষেপ (২০০৬) বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যা ভারতকে পাশকাটিয়ে চলার ব্যবস্থা। এ পর্যায়ে ভারতের দু'মুখো প্রস্তাবের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। ভারতের প্রস্তাব হল মহাসড়ক ভারতের উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে খাড়া পাহাড়ের পাশ দিয়ে মিয়ানমার পর্যন্ত যাবে, এ প্রস্তাব একটি দীর্ঘ মেয়াদি এবং বাংলাদেশের জন্য অনিশ্চয়তা স্বরূপ, এটার অর্থ হল মহাসড়কের একটি বিরাট অংশ ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে-এটা অনুমোদন করা হলে অথবা গ্রহণ করা হলে দিল্লী বাংলাদেশ-চীনকে তদারকি থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলোচনার প্রস্তাব দিবে, ভারত মনে করে বাংলাদেশ এ সময়ের মধ্যে চীনের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে এমন কি ব্যবসা বাণিজ্যের

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হাজারিকার লিখিত প্রতিবেদনের প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করেছি। তাঁর প্রতিবেদনটি ২০০৬ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ান সেমিনারে অংশগ্রহণ করে উপস্থাপন করা হয়েছিল। আমার প্রাথমিক মন্তব্য ছিল মিঃ সঞ্জয়ের প্রতিবেদনটি আমার নিকট কয়েকটি কারণে খুব কৌতূহলোদ্দীপক ছিল।

প্রথমতঃ প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি অনেকটা এন, ই, আই এর চলতি প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা, ভারতীর কর্তৃপক্ষ মনে করে যে কোন ভাবে বাংলাদেশ এটার সঙ্গে জড়িত আছে। আমরা এন,ই,আই এর উন্নয়নের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন কারণ এর সঙ্গে নিজের নিরাপত্তা সম্পৃক্ত।

তৃতীয় কারণ হল বিষয়টি সরাসরি একজন উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশেষজ্ঞের বক্তব্য এসেছে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই এবং তাঁর পরিচিতি হল তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের লোক, অতএব তাঁর প্রতিবেদনটি শুধু পরিশ্রম সাধ্যই ছিল না বরং নির্ভরযোগ্যও ছিল। তিনি আন্তর্জার্তিকভাবে প্রশংসিত একজন গবেষক, বর্তমানে দিল্লী ভিত্তিক সেন্টার ফর পলিসি রির্সাচ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন এবং একই সময়ে তিনি দি স্টেটসম্যানের একজন নিয়মিত লেখক এবং ভারতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের একজন প্রাক্তন সদস্য।

চতুর্থতঃ তার প্রতিবেদনে আমার লিখিত "পলিটিক্যাল ভায়লেন্স এন্ড টেরোরিজম ইন সাউথ এশিয়াঃ ইন বাংলাদেশ পারেসপেক্টিভ" শিরোনামটি পুরোগামী হিসেবে উল্লেখ করেছেন, সেটাও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দিল্লীর ধারাবাহিক উৎসাহ দানের প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় দিচ্ছে প্রমাণবিহীন এই বিবৃতি দিয়ে দিল্লী বাংলাদেশের উপর দোষ চাপাচ্ছে, শুধু তাই নয়, আসামের পাঁচটি মুসলিম সংল্যালগিষ্ঠ জেলার ধর্মীয় সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করছে।

সরকার সসর্থিত অনেক বিখ্যাত ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে অনবরতভাবে বাংলাদেশ অবৈধ মুসলিম বসবাস কারিদের দ্বারা বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরা সৃষ্টি করছে বলে কাঠোর শাস্তি দেয়ার পক্ষপাতি, এগুলো পাকিস্তানের আই,এস,আই এর সঙ্গে ষড়যন্ত্র মূলকভাবে করা হচ্ছে বলে তাঁদের ধারণা এবং শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য হল বাড়তি ভূখণ্ড আবিষ্কার করে অযথা পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করবে যা কৌশলগতভাবে বাস্তব রূপে গুরুত্বপূর্ণ। মন ইতস্তত করছে এবং স্ববিরোধী, দোষারোপ করার যুক্তির স্থিতিকাল অতিক্রম করে গেছে। বাংলাদেশ এমন কোন মাপের শক্তি নয় যে প্রতিবেশী ভারতের মত অতিশয় ক্ষমতাবানের বিরুদ্ধে বিলাস বহুল কলহ সৃষ্টিকারীদেরকে সমর্থন করবে। অন্যদিকে বাংলাদেশীদের উপর বোমা নিপেক্ষ করা হচ্ছে এবং আত্মঘাতী দল নিজের সুস্থিত অবস্থাকে হুমকি দিচ্ছে। আশ্চর্যজনক যে এ সমস্ত সন্ত্রাসীরা যে কাঁচামাল ব্যবহার করছে সবই ভারতে প্রস্তুত হচ্ছে এবং অলঙ্ঘনীয় সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাচার হয়ে আসছে। এই বিশেষ দলকে পরামর্শ দাতার (থিন্ক ট্যাংক) অনবরতভাবে ভারতের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে প্রচারণা চালাচ্ছে যে বাংলাদেশের পাকিস্তানের গেয়েন্দা সংস্থা আই,এস,আই এর সঙ্গে ঐক্য করে উত্তর-পূর্ব ভারতকে অস্থিতিশীল করে চূড়ান্তভাবে তাদের রাজ্যাংশ হিসেবে দখলকরে বৃহৎ বাংলাদেশ গঠন করতে

www.pathagar.com

চায়। এ ধরনের উপলব্ধি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং বিভ্রান্তিকর। এ সমস্ত আন্তরিকতাবিহীন পরিবর্তন ঢাকার প্রশাসনে পরিবর্তন এনেছে। দিল্লীর ও পরিবর্তন হয়েছে, এটা সত্য নয়। বাংলাদেশের প্রতি যারা ভুল ইঙ্গিত দিয়েছিল তাঁরা দূরে গেছে, তাঁরা হয়তো সংঘাতমূলক রাজনৈতিক আদর্শে বিভক্ত হয়ে যাবে। সত্য কথা হল অসম এর কয়েকটি জেলা যেগুলোর কথা বাংলাদেশের সন্নিকটে বলে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো ১৯৪৭ সালের বিভক্তির বহু পূর্ব থেকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ঐতিহাসিকভাবে অসম বা আসাম ঔপনিবেশিকভাবে ভারতীয় বেঙ্গল প্রশাসনের অধীনে বহুদিন ছিল এবং বিপুল সংখ্যক অভিবাসী বেঙ্গল প্রশাসন থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে আসামে বসবাস শুরু করেছিল।

উপরোল্লিখিত ঐ বর্ণনার প্রেক্ষিতে বলা যাচ্ছে যে, মিঃ সঞ্জয়ের লেখায় বাংলাদেশকে সরাসরি দোষারোপ করেছে, তা নয়, আবার মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেটাও বলা হয় নি যেমনি মি. জয়দীপ সাইকিয়া এবং অন্যরা করেছে, কিন্তু তিনি অবৈধ বসবাসকারী এবং বিচ্ছিন্নতাবাসীদের আশ্রয়দেয়া উভয়টি সম্পর্কে ভারতের দাবীর যুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। মি. সঞ্জয়ের লেখা কৌতূহলোদ্দীপকরূপে স্বীকার করেছেন যে বিদ্রোহীদের দৃঢ়ভারে প্রতিষ্ঠিত, উত্তর-পূর্ব ভারতীয়দের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী সংস্থার বদলে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী সংস্থার সদস্য বলেছেন, ভারতের অন্য বিশ্লেষকরা তাই বলেছেন। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন যে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এ অঞ্চলে সবচেয়ে পুরাতন এবং কাশ্মীর প্রসঙ্গের চেয়ে জটিল এবং অতি উত্তেজক বিষয়। তাঁর লেখা প্রতিবেদন অনুযায়ী শুধু তাই নয়, এরা উত্তর-পূর্ব ভারতের মিশ্রিত জাতিগত বিপথগামী, প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে তাঁরা উৎপাত করছে এবং ছোট বড় বিদ্রোহী দল ভারত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দশক ধরে যুদ্ধ করছে। তাঁর মতে ৩০টি বড় দল বিদ্যমান আছ, কিন্তু ভারতীয় গোয়েন্দাদের মতে প্রায় ১৩০টি বড়ও ছোট দল যুদ্ধ করেছে। এদের মধ্যে জনসাধারণের একটি বিরাট অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে যারা ভারতীয় ইউনিয়নে থেকে রাজনীতিবাদ সমাজে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন তাদের হয়ে। যা হোক, এটা এমন কোন প্রধানতম সংস্থার সংখ্যানয় যে গুরুত্ব দিতে হবে, ঘটনা হল, প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্য বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিবেশ দিয়ে ঘেরাও করেছে, শত সহস্র নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিকে যুদ্ধের আহবান জানিয়েছে, তাদের দণ্ডাভার লাঘব করে সক্রিয়ভাবে কাজ হচ্ছে যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমিল, যুক্তি দিয়ে সক্রিয়ভাবে নিজের স্বার্থের বিবেচনা করছে।

যে কোন উপায়েই হোক না কেন, মিঃ সঞ্জয় ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়ে প্রতিফলিত করেছেন যে দক্ষিণ এশিয়াতে সবচেয়ে পুরাতন এবং অন্যতম দীর্ঘ দিনের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যুদ্ধ হল নাগালিম আন্দোলন যা এখনও সমাধান হয় নি। আসলে নাগা আন্দোলনকে দক্ষিণ এশিয়ার সকল বিদ্রোহের 'মা' বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যদিও আন্দোলন মূলগতভাবে পরিবর্তন হয়ে অন্য আকারে রূপান্তর হয়েছে, কিন্তু এখনও ভারতের জন্য একটি রসকশমূন্য ও আনুষ্ঠানিক উদ্বিগ্নতা রয়েছে, কারণ এ অঞ্চলের সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী সংস্থাকে এ আন্দোলন পরিচালনা করছে। ১৯২৯ সালে ডঃ এ্যানগামী জাপো ফিজোর নেতৃত্বে পৃথক মাতৃভূমির দাবীতে নাগা আন্দোলন

www.pathagar.com

আরম্ভ হয়, তাঁর দলের নাম এন,এন,সি (নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল) যা এখনও চলছে। বর্তমানে এর নাম দেয়া হয়েছে ন্যাশনালিষ্ট শোসিয়ালিষ্ট কাউন্সিল যার নাগল্যান্ড [এন,এস,সি,এন (আই-এম)] নেতৃত্ব দিচ্ছেন মিঃ ইসাক চিশহী এবং টি, মুহিভা বর্তমান যুদ্ধের অগ্রদূত, যদিও অন্য বিরোধীদল মূল দল এন,এস,সি,এন এর বাহিরে, (খাপ্লান) চুক্তির পক্ষের দল হলেও শুরুত্ব কম। এ এলাকা সম্পর্কে সঞ্জয়ের মত একজন বিশেষজ্ঞও স্বীকার করেছেন যে উত্তর-পূর্ব ভারতের সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে নাগা আন্দোলন। অতএব, যে কেউ বুঝে সুজে নাগাল্যান্ড আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনার প্রস্তাবের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করবে যেন উত্তর-পূর্ব ভারতের জটিলতা বুঝতে পারে, সমস্ত ভূখণ্ডগত রাজনীতির কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ অন্যতম হেতু। ভারতের ইতিহাসবিদগণ এবং কৌশলীগণ যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে স্পষ্টভাবে আলোচনাকালে উল্লেখ করেছেন যে ভূ-কৌশলের দিক দিয়ে বাংলাদেশের এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের অবস্থান মুখোমুখি এবং এটাই অন্যতম হেতু। ভারতের কৌশলগত সিদ্ধান্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে বাংলাদেশের লোকদেরকে সাহয্য করে মুক্ত করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পরিষ্কারভাবে তাঁদের উদ্দেশ্য জানিয়ে দিল যে স্বাধীন পার্বত্য নাগাল্যান্ড ঔপনিবেশিক ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে তখন নাগা বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এটা ছিল ১৯২৯ সালে নাগারা প্রথম প্রশাসনিক সংস্কারকে অপমানজন মনে করে নাগালিম (বৃহৎ নাগাল্যান্ড) অখণ্ড নাগাল্যান্ড গঠনের জন্য ১৮৪৫ সালের সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘন করে।

নাগা নেতৃবৃন্দ সাইমন কমিশনের নিকট সনির্বন্ধ আবেদন করেছিল কিন্তু তাতে তাঁরা কোন ভ্রুক্ষেপ করে নি। নাগারা পাহাড়ে বাস করত, ডঃ এ্যানগামি জাপো ফিজোর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এন,এন,সি নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করে। ডঃ ফিজো ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয় এবং স্বাধীনতা দাবী করে তাদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত পৃথক মাতৃভূমির মেনে নেয়ার জন্য দাবী জানায়। কারণ নাগাদের দাবী তাঁরা জীবন দিয়ে হলেও ভারতের সঙ্গে কোন অবস্থাতেই থাকবেনা। কিন্তু কেবিনেট মিশন ভারত বিভক্তির দাবী পূরণ করে নাগাদের দাবীকে অগ্রাহ্য করে। অভিযোগে বর্ণিত যে কেবিনেট মিশন ভারতের কংগ্রেসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল নাগাদের অনুরোধ বাতিল করে দেয়। ১৯৪৬ সালের ১৯ মে এন,এন,সি তাঁদের দাবী পরিবর্তন করে স্বাধীনতার বির্চায বিষয়টি সমাধানের জন্য দশ বছর স্থগিত রেখে গণভোটের কথা বলেছিল, স্বাধীন ভারত সরকার সিদ্ধান্ত মূলতবি রেখেছিল, স্বাধীন ভারত সরকার মীমাংশ করবে। এটা বলা হচ্ছে যে যদিও মিঃ গান্ধী পাহাড়ীদের দাবী বিবেচনা করতে চেয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী ঔপনিবেশিক ভারতীয় মন্ত্রী পরিষদ নাগাদের স্বাধীন মাতৃভূমির দাবীকে স্বীকার না করে প্রত্যাখান করে, উপরন্ত সম্ভাব্য গণঅভ্যুত্থানকে মোকাবেলা করার জন্য সৈন্য সমাবেশ করে। দু'বার বিশ্বাসঘাতকতা করে অবমাননা করার কারণে এন,এন,সি নাগা জাতীয় সামরিক বাহিনী গঠন করে, ডঃ ফিজো সামরিক বাহিনীর প্রধান হয়ে জাতীয় মুক্তির জন্য অবিরতভাবে শসস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ করে। শুধু নাগারাই কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি বরং তাঁরা গুপ্ত ফেডারেল গর্ভমেন্ট অব নাগা ল্যান্ড এফ,জি,এন) গঠন করে নাগা পাহাড়ী এলাকার শাসন কার্য চালায়।

তবে, ১৯৬২সালে চীন ভারত যুদ্ধের কারণে নাগা স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন ভাবে গতিশক্তি পায়। চায়নীজ কমিউনিষ্ট পার্টি এন,এন,সি এবং এন,এন,এ (নাগা ন্যাশনাল আর্মি) কে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছিল, এটা শুধু নাগাদের জন্যই নয়, মিজো বিদ্রোহীরা অস্ত্রতুলে নেয় এবং একই ভাবে। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। মিজো বিদ্রোহের তখন নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মিঃ লালদেঙ্গা যিনি ফিজোর পথ অনুসরণ করেছিলেন। সাধারণ জ্ঞানের দ্বারাই বুঝা যায় ঢাকা তখন পরিণত হয়ে ছিল বাহিরের সঙ্গে বিদ্রোহের যোগাযোগেরও প্রবেশধিকার প্রস্থানের কেন্দ্ররূপে। নূতন স্বাধীন বাংলাদেশের অবির্ভাবে ১৯৭১ সালের পরে দৃশ্য পটের পরিবর্তন হয়। সরকার এ নূতন দেশটি থেকে সমস্ত দৃস্কৃতকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে তাড়িয়ে দেয়। এর ফলে নাগা এবং মিজো বিদ্রোহীদের উত্তেজনাকর অবস্থার আকাস্মিক এবং প্রচণ্ড পরিবর্তন হয়, কিছু দিনের মধ্যে ফিজোকে গ্রেফতার করে রাখা হয়েছিল পরে ছেড়ে দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তিনি ঢাকার মধ্য দিয়ে পালিয়ে চলে যান। ফিজো রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে ব্রিটেনে বসাবস করছিলেন এবং ১৯৯১ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ফিজো কখনও ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেনি। বিরোধীদলের নেতা ইসাক-মূহিবা ও তাই করেছে। অপরদিকে মিজো নেতা লাল ডেঙ্গাও ভারত থেকে পালিয়ে গিয়ে ব্রিটেনে বসবাস করছেন। মিজোরা ১৯৮৬ সাল থেকে অনবরত ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকলে ১৯৮৭ সালে ভারত ইউনিয়নের মধ্যে পৃথক রাজ্য হিসেবে মীমাংসা করা হয়।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মিজোরা মীমাংসা করলে নাগা বিদ্রোহীরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে, তৎসত্ত্বেও ১৯৭৫ সালে শিলং চুক্তির ফলে এন,এন,সি, দুটি দলে ভাগ হয়ে গিয়ে এন,এস,সি,এন (খাপলান) এবং এন,এস,সি,এন (আই,এম) বিষয়টি ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। বর্তমানে এন,এস,সি,এন (আই-এম) দল টিকে সবচেয়ে শক্তিশালী বিদ্রোহী দল হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে সক্রিয়ভাবে ভারত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এখন পর্যন্ত (আই-এম) ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতিতে আছে এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে একটি সম্ভাব্য রাজনৈতিক মীমাংসায় এন.এস.সি.এন আসার জন্য সমঝোতার দ্বার খুলে দিয়েছে। অনেক ভারতীয় বিশ্লেষক মত প্রকাশ করেছেন যে খৃষ্টিয়ান ব্যাপটিষ্ট মিশনারীরা যে ভাবে এ অঞ্চলে ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করছে, ঠিক সেভাবে আলোচনার মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করে মুহিবাকে মীমাংসায় আনতে। এটা যুগপৎ সংঘটন, কারণ খ্রিস্টিয়ান মিশনারীরা অষ্টদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে প্রবেশ করে আদিবাসী নাগাদেরকে খ্রিস্টিয়ান ধর্মে দীক্ষিত করেছে, মিজোরাও তাই। আজকে মিজোরাম ও নাগাল্যান্ড উভয়টি খ্রিস্টিয়ান কর্তৃত্বপূর্ণ রাজ্য।

তা সত্ত্বেও, প্রকৃত ঘটনা হল দীর্ঘদিনের নাগা বিদ্রোহের পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাব উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্য অংশে ও পড়ছে। ইতোপূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে প্রচণ্ড বিদ্রোহ রয়েছে বিশেষ করে অসম ও নাগা আন্দোলনকে উত্তর-

www.pathagar.com

পূর্ব ভারতের বিদ্রোহের জন্মদাত্রী বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। ভারতে নীতি নির্ধারকেরা এখন অভিযোগ করে ১৯৭১ সালের পূর্বের মতই একইভাবে এ সমস্ত বিদ্রোহীদেরকে খুঁজে বের করতে বাংলাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঢাকা পুরাতন ভূমিকার মত তাদেরকে সহযোগিতার ব্যবস্থা করে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী অনেক নেতাকে বিদেশে যাওয়ার পথ করে দিয়েছে। ঘটনা হল, অভিযোগ করা হচ্ছে যে উত্তর-পূর্ব ভারত ও অন্যান্য স্থানে চোরাচালানের মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশকে সংযোগ পথ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। দু'টি প্রধান বিদ্রোহীদল এন,এস,সি,এন (আই,এম) এবং ইউ,এল,এফ,এ (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম) বাংলাদেশের অবৈধ অভিবাসীদের সাহায্য নিয়ে এ সমস্ত চোরাচালানী কাজে সম্পৃক্ত আছে বলে অভিযোগ বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবেই সন্দেহ করা হচ্ছে যে বিদ্রোহী দলকে নিরাপত্তার আশ্রয় দিচ্ছে, বিশেষ করে উলফাকে, ঢাকার সরকার অনড় অবস্থান গ্রহণ করে এ অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অন্যদিকে আন্তরিকতাবিহীন ধৈর্যচ্যুতি ঘটনা প্রত্যাশা করেছে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের দাবীর স্বপক্ষে কোন তথ্য উপস্থিত করে নি এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ছাউনিস্থান প্রকাশ্য ভাবে পরিদর্শনের প্রস্তাবের প্রতি সাড়া দেয়নি।

ইতোপূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী মিঃ সঞ্জয় ঢালাওভাবে বাংলাদেশকে অপ্রতিহত বিদ্রোহীদের জন্য দোষ দেয় নি, বরং তিনি উদ্ধিগ্নতা দূর করার জন্য উত্তর-পূর্ব ভারতের সকল প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোকে ডেকে স্থায়ী সমঝোতা করার পরমর্শ দিয়েছেন। বাস্তবিকপক্ষে আজ উত্তর-পূর্ব ভারত পরোক্ষেভাবে সামরিক শাসনের অধীনে বিশেষ ক্ষমতা আইন (সামরিক) দ্বারা সম্ভাব্য সকল শান্তির ঝুঁকি ব্যতিরেকে শাসিত হচ্ছে। তৎসত্ত্বেও, ভারত সরকার অবস্থার সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে অপারগ হচ্ছে। উত্তর–পূর্ব ভারতের সমস্যা সত্যিকার অর্থে তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিচার্য বিষয়, দশক ধরে উপেক্ষিত এবং ভারতের প্রধানধারার সঙ্গে সংহত করার ব্যর্থ কারণে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু ভারতের বিশ্লেষকদের মধ্যে অনেকেই বহিরাগতদের দোষ দিচ্ছে এবং বিভিন্ন কারণে পার্শ্ববতী বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করছে । ঐ ধরনের একজন বিশ্লেষক হলেন মিঃ আর উপাধ্যায় । তিনি তার সর্বশেষ নিবন্ধ "উত্তর-পূর্ব ভারতের সহিংসতাঃসামগ্রীক পর্যালোচনাতে লেখেছেন উত্তরপুর্বের অদ্বিতীয় ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা বিরাট আর্ন্তজাতিক সীমান্ত নিরাপত্তার দিক দিয়ে অরক্ষিত। এছাড়া বিদেশী শত্রুদের উষ্কানি সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলছে। ব্রিটিশ সরকার জেড এ ফিজোকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে, বিখ্যাত নাগা বিদ্রোহ এবং মিজো বিদ্রোহী লালডেঙ্গাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান, চীন এবং বাংলাদেশ নিয়মিতভাবে বিদ্রোহী দলকে অস্ত্র সরবরাহ করছে। মাইকেল স্কট এর মত ব্যাপটিস্ট খ্রিস্টিয়ান মিশনারীজ পার্বত্য রাজনীতিতে অনধিকার চর্চা করছে। এ সমস্ত্র পরিচিত বিদেশী শক্তির অপকর্মই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট, প্রস্তাব করা যাচ্ছে যে ভারত সরকারকে বিদেশী প্রতিপক্ষ দুষ্ট চক্রকে প্রতিরেধে করার জন্য কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, তা না হলে চলতি বিদ্রোহ কে ব্যর্থ করা যাবে না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে জোর করে দেশ থেকে বিতারণের কারণে হিন্দু উদ্বাস্তুদের ত্রিপুরার আদিবাসীদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয়েছে এবং মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের রাজনীতির

www.pathagar.com

ফলে আসামীদের একই ভাগ্য রবণ করতে হয়েছে। ঘটনার সর্বশেষ পর্যায় হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় নেতৃত্ব চেষ্টা করা থেকে বিরত এবং পক্ষপাতহীনভাবে সমস্যা অবধাবনে মনোযোগ দিচ্ছে না। মিঃ উপধ্যায়ের শেষ প্রস্তাব হল আজ আসামে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ একটি বিন্যস্ত অনড় অবস্থানে ভারতের প্রচার যা বাংলাদেশের মত একটি ছোট প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। মিঃ উপাধ্যায়ের মত অনেকেই ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে উত্তরপূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক অঙ্গীভূতকরণে ব্যর্থতাকে ঢালাও ভাবে দোষী করেছে। অভিযোগ করেছে যে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে চলে গিয়ে বসতি স্থাপনকে মৌলবাদের উত্থানের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা ও নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছে।

বিপরীত দিকে মিঃ উপাধ্যায় এবং অন্য স্থানীয় বিশেষজ্ঞ মিঃ হাজারিকা কি মত প্রকাশ করে, তা থেকে বিষয় সম্পর্কে অধিক বাস্তব বিষয়বস্তু যোগানো যাবে, বিশেষ করে আসামের মুসলমান সংখ্যা লঘুদের ব্যাপারে। "দি লিটিল ম্যাগাজিনের, ৩য় খণ্ড, সংখ্যা ৫ ও ৬ তে প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন, "এ্যাথনিক কনফ্লিক্ট এণ্ড সিভিল সোসাইটি ইন নর্থ ইস্ট, একজন বিষয়ের ব্যাপারে কোন প্রতিফলন ঘটাতে পারে না, যতক্ষণ না তিনি উত্তর পূর্বের অবৈধ বসবাসকারী এবং মৌলবাদের উত্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ না দেবেন। মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়ছে এ বিষয়ে কোন কথা হচ্ছে না, কিন্তু কম দৃশ্যমান প্রান্তিক অঞ্চলে যুবক ও যুবতীদেরকে সমাজ কাঠামোর আমূল সংস্কারে বিশ্বাসী করছে, উন্নয়নের ছোঁয়া পায় নি, আসামের অন্যান্য স্থানে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি দেখা যায়। এ অবস্থার অবসান হওয়া উচিত, ঐ সমস্ত যুবক যুবতীরা চাকরি এবং কাজের জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এবং শাসন প্রক্রিয়ার ব্যর্থতার তিক্ত অনুভূতি জাগাচ্ছে। এ সমস্ত লোক ভারতীয়, সঙ্গে কিছু বাংলাদেশী আছে। এরা পূর্ব ভারতের এলাকাগুলোতে হাজারো বাংলাদেশীরা সহজে এবং নির্বিঘ্নে বছর ব্যাপিয়া যাতায়াত করে থাকে। যেখানে দায়িত্বহীন ডানপন্থী অন্য ধর্মে বিশ্বাসীদের দ্বারা শিষ্টাচারে শিক্ষা দেয়া হয়। আসামে তাদেরকে বিবেচনার অযোগ্য করা যাবে না। তারপর মিঃ হাজারিকা অবিরাম বলতে থাকেন, "স্পর্শকাতর বিষয় হল বাংলাদেশে আল-কায়দা ছাউনি বিদ্যমান আছে কি নেই সেটা কোন বড় বিষয় নয়। প্রশ্ন হল উত্তর-পূর্ব কি জাতিগত কারণে আমূল সংস্কারবাদী মতবাদ থেকে দূরে থাকতে পারবে। এ হতে পারে না এবং হবেও না, বিশেষ করে প্রচুর পরিমাণে অন্য দেশ থেকে আসা লোকদের বসবাসের সুযোগ দেয়ায়, তৎসঙ্গে আপাত দৃশ্যমান মৌলবাদের উত্থান বিস্ময়কর"। তারপর মিঃ সঞ্চয় প্রস্তাব করেছেন, এ সমস্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের মোকাবেলা করার জন্য তিনটি জিনিষ জরুরী, শাসন প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক ও ভিত্তিগত পর্যায়ে রক্ষা করতে হবে, বিশ্বাস অর্জন করতে হবে যে স্বদেশীয়দেরকে সংখ্যালঘু করা হবে না, শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলনের শত্রুভাবাপন্ন দলগুলো একত্র করে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে।

এটা কেহ উপেক্ষা করতে পারবেনা যে উন্মুক্ত সীমান্ত যেমন ভারত-বাংলাদেশ, না অনতিক্রমনীয় না বসবাস অবৈধ, ব্যবসায়ীদের দ্বারা লঙ্ঘিত হয়েছে, কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতকে অঙ্গীভূতকরণের ব্যর্থতার জন্য তা ক্ষমা করা যাবে না। এটা বিপদ সংকেত যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ উত্তর-পূর্ব ভারতের চলতি সমস্যা জরুরিভাবে অস্বীকার করে দশক ধরে থামিয়ে রেখেছে, অবস্থা এবং দিল্লীর উত্তরাধিকারী সরকারগুলোর

www.pathagar.com

একই মনোভাব, এটাই প্রমাণ করে যে তাঁরা ভারতের ঔপনিবেশিক শাসকদের উত্তরাধিকারী। অতএব ভূ-কৌশলের প্রেক্ষিতে বঙ্গোপসাগরের পরিবেশগত পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ভারতীয় বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে চীন-বাংলা সম্পর্ক-যুক্তরাষ্ট্রের দুর্দশা
Sino-Bangla relation US predicament as seen by Indian analyst

দক্ষিন এশিয়ার ভুখণ্ডগত রাজনীতিতে চীনের ব্যাপারে আমরা বিশ্লেষন করে দেখছি যে, ভূখণ্ডগত কৌশলে পরিবেশ পরিবর্তনে বেইজিং এর প্রভাব কি হবে, বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল অংশীদারীত্ব পরিধি পর্যালোচনা করা হয়। ডঃ সুভাষ কাপিলা ইউ.এস নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য খুব শক্তভাবে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে,–

(১) পাকিস্তানের সঙ্গে সংযোগ সম্পর্ক স্থাপন করে যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগতভাবে উপসাগরীয় অঞ্চলে তাঁর স্বার্থের দিকে নজর দেয় যা চান প্রথমেই বর্হিদিকে প্রবাহমান করেছে।

(২) চীন এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত স্বার্থের পার্শ্বভাগ পরিবেষ্টন করে শক্তি বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে দেশরক্ষা সহযোগিতার কৌশলগত বন্ধন স্থাপন করতে পারে।

(৩) দক্ষিণ এশিয়াতে ইউ.এস এর বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে ছাড়া চীন বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করেছে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টিকরার জন্য।

(৪) চীন তাঁর প্রভাব বলয় বিস্তৃত করার জন্য কোন রাষ্ট্রকে বাধাদানের নীতির জন্য এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে কৌশলগত কারণে বন্ধন স্থাপনে ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের জটিল আকার ধারণ করবে।

ডঃ কাপিলা প্ররোচিত করে বলেছে "দক্ষিণ এশিয়াতে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত উদ্বেগকে পুনঃমূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। ইতোমধ্যে এ অঞ্চলে চীনের প্রভাবের উত্থানকে গুরুত্ব দিয়ে র‍্যান্ড কর্পোরেশন ২০০১ সালের প্রতিবেদনে প্রস্তাব রেখেছে যে, শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলে চীনের হয়ে (বাংলাদেশ ও মিয়ানমার) তাদের কাজ করার জন্য অধিকার দিয়েছে, এ দেশ গুলি হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ট হতে অনিচ্ছুক, এ ঘটনায় বিরাজমান উত্তেজনা তীব্রতর হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র তাঁদের দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত নীতি পর্যালোচনা করছে এবং বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি রাখার তালিকায় আছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে তাদের উপস্থিতি বৃদ্ধি করছে এবং এনার্জি খাতে অল্প হলেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করছে এবং বঙ্গোপসাগরে ও অন্যান্য স্থানে তথ্য তদন্তের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করছে, এ চেষ্টা করা হচ্ছে চীনের অনুপ্রবেশের পাল্টা জবাব হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো এখনও চট্টগ্রাম দ্বিতীয় কন্টেইনার বন্দর ও গভীর সমুদ্র বন্দর উন্নয়নে আগ্রহী এ বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোন সুদৃঢ় সামরিক শহযোগিতা নেই; কিন্তু পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র অন্যের ইচ্ছাকে আগ্রাহ্য করে সন্ত্রাস বিরোধী শক্তির উন্নয়ন করার জন্য নির্দেশ করেছিল। সম্প্রতি তথাকথিত মৌলবাদী সন্ত্রাসের উত্থান

www.pathagar.com

যে কোনভাবে হোক অতি প্রাচুর্য এর কারণ। বাংলাদেশের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি এগুলি নির্দেশক, কৌশলগত না হলেও সামরিক অভিযানের গুরত্ব আছে।

উপসংহার ঃ আমি ভারত মহাসাগরে কৌশলগতভাবে পরিবেশ পরিবর্তনের সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে চীন– ভারত এবং চীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্ক যেখানে ভারত এ অঞ্চলে বৃদ্ধিশীল হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করছে।

মালাক্কাপ্রণালীতে ভারতীয় নৌবাহিনী কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক জাহাজের সহযাত্রী রক্ষী বিষয়টি সম্প্রতি প্রথমবারের মত বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অব্যবহিত নিকটবর্তী, মালাক্কা, ভারত কৌশলগত অবস্থানের কারনে এবং স্বাভাবিক ভাবেই আইনগত অধিকার আছে বিবেচনা করে এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানের উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। যে এলাকাটি ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরকে সংযুক্ত করছে। আর্ন্তজাতিক সমুদ্র পথ ভারত যেভাবে দাবী করেছে তা ভারতের ই.ই.জেড অতিক্রম করেছে, অতএব দিল্লী ভারতমহাসাগরে তাদের দাবীকে বৈধ করার জন্য উদগ্রীব, বিশেষ করে পূবাংশের জন্য। ঐ কারণগুলো আলোচিত হয়েছে, চীন সবলে অধিকার রাখতে চাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র ও তাই করবে, প্রশান্ত মহাসাগরে তাদের উপস্থিতি সংকট সৃষ্টি করতে পারে। তা হতে পারে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত সন্ত্রাসী কারণে অথবা চীন এবং তাইওয়ানে মধ্যে উদ্বেগ্নীতার কারণ যা ব্যতিক্রমহীনভাবে যুক্তরাষ্ট্রেকে সম্পৃক্ত করবে। তা সত্ত্বেও, ভারতীয় নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তাদের রাজনৈতিকদলের অন্তর্গত শিক্ষা ও উন্নয়ন থেকে কি প্রতীয়মান হয়, ভারত মহাসাগরের পূর্বাংশের ব্যাপারে ভারত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, অর্থাৎ পশ্চিমে আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরের থেকে বিষয়টি প্রধান।

ভূখণ্ডগত কৌশলের পরিবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে বাংলাদেশে ভারতের আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতির প্রাধান্য লাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

পরিবর্তনশীল উত্তর-পূর্ব এবং অবশিষ্ট ভারতের মধ্যে বাংলাদেশকে অগ্রদূত বিবেচনা করা হয়। চীনের সঙ্গে ঢাকার সম্পর্কের বৃদ্ধি পাওয়াকে ভারতীয় বিশ্লেষকদের নিকট উদ্বিগ্নতার কারণ। এ সমস্ত বিশ্লেষকরা ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন যে দু'দেশের মধ্যে বর্তমানে সামরিক সহযোগিতাকে সীমিতকালের জন্য সংহত কারণের পর্যায় বলা হবে, যা শক্তিশালী গুরুত্বর কৌশল নির্মানে নিহিত আছে এবং ভারতীয়রা যুক্তরাষ্ট্রকে এ আশ্বাস দিতে চাচ্ছে যে এ শক্তি শুধু ভারতের উদ্বীগ্নতার কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের ও ব্যাপার আছে।

অতএব, ভারতীয় নীতি নির্ধারকেরা সকল প্রকার ব্যবস্থা বিবেচনা করবে, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক উভয়ভাবে বেইজিং এর সঙ্গে কৌশলগত উন্নয়নের কোন কাজ করা থেকে বিরত রাখবে। আমি রাহুল বেদী'র লেখা নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি, "ভারত এবং চীন: প্রতিবেশী সুলভ সমস্যা" শেষ মন্তব্য হিসেবে এশিয়া টাইমস' এর ১৭ জানুয়ারী ২০০৩ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এভাবে, "ইয়াঙ্গুনে চীনের প্রভার কে নিষ্ক্রীয় করে ভারত বাংলাদেশ মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডকে নিয়ে একটি অর্থনৈতিক সহযোগিতা দল তৈরীর জন্য পাঁচ বৎসর পূর্বে প্ররোচিত

www.pathagar.com

করেছে, (১ম বি.আই.এম.টি.ই.সি)। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। তখন থেকে বি.আই.এম.এস.টি.ই.সি কিছুটা রূপ পরিগ্রহ করেছে। একটি সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ করে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে তিনটি প্রধান পরস্পর বিরোধী দেশের মধ্যে বঙ্গোপসাগর হবে প্রতিদ্বন্দ্বী এলাকা, দেশগুলো হল একদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত এবং অন্যদিকে চীন।

অর্থনৈতিক ও দেশরক্ষা সহযোগিতার কারণে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুব গুরুত্ব হবে বলে প্রমাণিত। অন্য দিকে ভারত নিকটতম প্রতিবেশী হওয়াতে ভারতের সংশয়বাদকে উপেক্ষা করা যায় না, কিন্তু এটা অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দ্বারা প্রতিপালন করা প্রয়োজন, আসলে বিষয় শুধু এটাই নয় ঃ বাংলাদেশের অবস্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভূ-খণ্ডগত কৌশলের ব্যাপারে ভারতের কৌশল বল প্রয়োগে বাধ্য করার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্ক নির্ভর করছে। ভারতের নীতি নির্ধারকেরা বাংলাদেশের স্পর্শকাতরতাকে বিবেচনার বিষয়ীভূত করেছে অপর পক্ষেও তাই।

অন্যদিকে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বৃদ্ধিশীল কৌশলগত সম্পর্কে পরবর্তী দেশকে এ অঞ্চলে সরাসরি অথবা অন্যের হয়ে কাজ করার জন্য উন্নয়ন কল্পের যথাযথ প্রস্তুতি ও কর্মসূচি গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এবং ভবিষ্যৎ ইউ.এস এর নীতিকে নিশ্চয়তার সঙ্গে ধরে নিতে পারে না। ওয়াশিংটন মনে করে ভারত চীনকে সম্পূর্ণ রূপে মোকাবেলা করতে পারবে কিনা এবং তাতে হয়তো অভ্যন্তরীণ এবং বহির্দিকের আঞ্চলিক সম্পর্ক জটিল হতে পারে। বাস্তব তথ্যপূর্ণ সমাপ্তি হল ইউ.এস নীতি নির্ধারিকেরা নূতনভাবে বেড়ে উঠা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অতিকথায় সন্দেহ প্রবণ হচ্ছে যেমন চীনের প্রতি সচেতন রয়েছে। এতে অবস্থা উপলব্দি করতে সক্ষম যে আগামী দশকে হয়তো বেরিয়ে আসতে হবে, বাংলাদেশ আঞ্চলিক ও বহি:আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে স্থাপনে কৌশলগত ভাবে কাকে বাছাই করে নেবে সে বিষয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। সত্য কথা হল আগামী দশক হবে বাংলাদেশের জন্য পরীক্ষার সময় একমাত্র দেশ বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্তের শীর্ষে অবস্থান করছে।

শেষ করার পূর্বে আমি সুপারিশ করতে ইচ্ছুকঃ-

(এ) চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের কৌশলগত সম্পর্কের উন্নয়ন করা উচিত, জাতীয় স্বার্থেকে বিবেচনায় রেখে অর্থনৈতিক এবং দেশরক্ষা উভয় বিষয়ে হতে হবে।

(বি) যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রাণবন্ত গতিময় সম্পর্ক অবশ্যই রাখতে হবে এবং কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মূল্যের বিপরীতে নয়।

(সি) ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হিসেবে পেশাদার ক্রীয়াশীল কাজে বেশী জড়ানো উচিত।

(ডি) জাতীয় স্বার্থে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অপরিহার্য। উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের কারণে কৌশলগত উন্নয়নের সুযোগ আছে। আমাদের সম্পর্কের বর্তমান পর্যায়ের উন্নতি করা প্রয়োজন আছে এবং সহযোগিতার পর্যায় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(ই) সার্ক দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অবশ্যই শক্তিশালী করতে হবে।

www.pathagar.com

(এফ) এটা প্রমাণিত যে এ অঞ্চলে কোন সংকট হলে বাংলাদেশকে ভারতের নৌবাহিনীর অবরোধের দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। এধরনের সম্ভাব্য ঘটনা থেকে বঙ্গোপসাররে নিজদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন নৌবাহিনীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সমরাস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করা যেন অবরোধ হলে আংশিকভাবে যেন ভাঙ্গাতে সক্ষম হয়। নৌ-বাহিনীকে ডুবোজাহাজ দিয়ে সজ্জিত করে সামুদ্রিক জাহাজ যুক্ত করে সমুদ্র পথকে যতটুকু সম্ভব খোলা রাখা উচিত।

(জি) বঙ্গোপসাগরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে এ ধরণের কোন সংকটে জড়িয়ে বাংলাদেশকে শোষিত হতে দেয়া।

(এইচ) জাতীয় স্বার্থ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে বিবেচনা করতে হবে। প্রতিবেশী দেশকে কৌশলগত কোন সুবিধার অনুমতি দিতে হলে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতে হবে।

www.pathagar.com

হিমালয়ে বিপ্লবঃ নেপালের অগ্নিপরীক্ষা
(Himalayan Revolution testing time for Nepal)

– ব্রিগ্রেডিয়ার জেনারেল এম, সাখাওয়াত হোসেন (অবঃ)

আমি কাঠমুন্ডুতে ছিলাম, দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষুদ্র অস্ত্র (বিস্তার বিরোধী) নেপালে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় (এ,জি,এম) উপস্থিত হয়েছিলেন। নেট– একটি সংস্থা, বৈধ এবং অবৈধ উভয় প্রকারের অস্ত্র দ্বারা সকল সন্ত্রাসীরা অপরাধ কাজে ব্যবহারের ফলে যে খারাপ পরিণতি হচ্ছে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার কাজ করছিল। এ সংস্থাটি গঠন করা হয়েছিল অস্ত্র প্রস্তুতকারক, ব্যবহারকারী এবং সরকারের উপর জনগণের দ্বারা চাপ সৃষ্টি করে। আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সমাজে অবৈধ অস্ত্রের দ্রুত বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। বাংলাদেশে এ ধরনের একটি সংস্থা আছে যেটি এন,এস,এ,এফ (ন্যাশনাল স্মল আর্মস ফোরাম) নামে পরিচিত, এখনও এটি জন্মগ্রহণের পর্যায়ে আছে, অবৈধ ক্ষুদ্র অস্ত্রের ব্যবসার বিরুদ্ধে এবং সমাজে এর পরিণতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্ব আন্দোলনের অংশ হল এ সংস্থাটি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সম্প্রতি একটি যুগ্ম জরিপ কাজ ভারত সরকার এবং অক্সফাম (ও,এক্স,এ,এম) কর্তৃক করা হয়েছে, তাতে হিসেব করা হয়েছে সারা বিশ্বে জ্ঞাত ভাবে ৭৪ মিলিয়ন অবৈধ ক্ষুদ্র অস্ত্রের মধ্যে প্রায় ৪০ মিলিয়ন অস্ত্র উপমহাদেশে আছে, বিশেষ করে ভারতে।

যাই হোক, বার্ষিক সাধারণ সভা (এ, জি, এম) অনুষ্ঠিত হয় ২২-২৩ মে, ২০০৬ এ উপলক্ষে কাঠমুন্ডু সফরের সুযোগ হয়েছিল এমন সময়ে যখন সার্ক এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য দেশটি ইতিহাসের একটি কঠিন সময় অতিবাহিত করছিল। যদিও আমার লিখিত প্রবন্ধটিতে নেপালের সম্প্রতিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আন্দোলন এর মধ্যে মাওবাদীদের আন্দোলনকে পরিবর্তন সাধনকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয় তবুও আমি দ্রুত বিস্তার বিরোধী সংস্থা সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই।

এ,জি,এম আমাকে সুবর্ণ সময়ে দ্বিতীয়বার নেপাল সফরের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। নেপাল আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও নিকটতম প্রতিবেশী দেশ, সুযোগ হয়েছিল বিপুলসংখ্যক নেপালী নাগরিক সমাজের লোকের সঙ্গে দেখা করার, এবং আমার পুরাতন সামরিক বাহিনীর দুই বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল, উভয়েই চাকরিতে ছিল এবং উচ্চপদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। নেপাল শুধু আমাদের প্রতিবেশী নয়, বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হিসেবে প্রমাণ করা যায়। আমার অভিমত হল, সংযত ভাষায় প্রমাণ করতে পারি যে, যদি দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রের প্রতি কেউ লক্ষ্য করি এবং বাংলাদেশের ও নেপালের উভয়ের ভৌগোলিক অবস্থানের, বিপরীতে ভারত এবং এশিয়ার অন্য শক্তি চীনকে দেখি তাহলে বুঝা যাবে। এটা লক্ষণীয় যে, তেঁতুলিয়া থেকে নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডু মাত্র ২৬২ এন,এম (নটিক্যাল মাইল)। সেখানে সুবিন্যস্ত কৌশলগত পথ আছে, যা নেপালকে তিব্বত (চীন) কাঠমুন্ডুকে) নেপাল থেকে দূরে কোডারী পর্যন্ত যুক্ত করেছে। বাংলাদেশের উত্তর প্রান্ত থেকে কোডারির দূরত্ব ৫৪২ এন,এম। বাংলাদেশ থেকে সহজে এবং

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত পথে চীন যেতে পারে, ভারত কি জলপাইগুড়ি দিয়ে সংযোগ পথ ব্যবহার করতে দেবে?

আমি যখন নেপাল সফরে গিয়েছিলাম তখন নেপালের চরম সংকটপূর্ণ সময় চলছিল। রাজা জ্ঞানেন্দ্র ভেঙ্গে পড়েছিল এবং স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের শাসনের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান হচ্ছিল। ১৯ দিন পর্যন্ত শান্ত কাঠমুন্ডু বুলেট, টিয়ারগ্যাস, গোলাসহ হত্যা, এবং ধ্বংস বিস্ফোরণ হয়, তা ছিল গণতন্ত্রের সংরক্ষণ এবং সংসদ পুনঃবহাল করার যা রাজা ২০০৩ সালে বাতিল করে দিয়েছিলেন। কাঠমুন্ডুতে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান নেপালের ইতিহাসে রাজার বিরুদ্ধে এটাই প্রথম ছিল না তার পরও রাজতন্ত্র পূর্ণক্ষমতা নিয়ে টিকে ছিল, অসন্তোষকে শান্ত করার জন্য যতটুকু সম্ভব জনগণকে ছাড় দেয়া হয়েছিল, এমনই করা হয়েছিল যে রাজা এবং নির্বাচিত সংসদের সহ-অবস্থান ছিল, যে আইন অনুমোদন হত তা রাজার পুরস্কার বলে জনগণের জন্য উদ্বেগজনক ছিল, কয়েক দশক ধরে তাই চলছিল। অনুমোদিত আইনের কোন ক্ষমতা ছিল না বলে রাজার জারিকৃত ডিগ্রীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়। ২০০৬ সালের এপ্রিলে পট পরিবর্তন হয়ে দশকের পুরাতন সসস্ত্র উত্থান যার দ্বারা হয়েছে দূরের থেকে পরিচিত সি,পি,এন(এম) নামে সাধারণভাবে মাওবাদী নামে পরিচিতি। মাওবাদী এবং তাঁদের প্রধান নেতা মিঃ পুষ্প দহল ধল ইলিয়াস প্রচন্দ আজকে জনপ্রিয়তার উর্দ্ধে উঠে গিয়ে বর্তমান এস,পি,এ (সেভেন পার্টি এলায়েন্স) এর বর্ষীয়ান ও গুরুতর অসুস্থ নেতা গিরিজাপ্রসাদ কৈরালার সরকারকে কাঁপিয়ে তুলেছে। ২৪ এপ্রিল ২০০৬ রাজার এক ডিগ্রি জারি করে এস,পি,এ সংসদকে সার্বভৌমকরে সরকার গঠন করে, রাজাকে প্রত্যক্ষভাবে সিংহাসনচ্যুত করার গণআন্দোলনের দ্বারা সৃষ্টি সহিংসতাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে এটা ছিল মাওবাদীদের আন্দোলন এবং এখন যারা ক্ষমতায় আছেন তাঁরা মাওবাদী গেরিলা, জয়লাভ করে কাঠমুন্ডু উপত্যকা ছাড়া ৮০% নেপালের প্রশাসন চালাচ্ছে। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৯ দিনে মারাত্মক অভ্যুত্থান রাজপ্রসাদের ২৪তম ঘোষণাপত্র জারির মাধ্যমে শেষ হয়েছে, রাজনৈতিক দলের বিজয়সূচিত হয়েছে, কিন্তু মাওবাদীরা স্বীকৃতি বা ন্যায্যতা পায় নি, তাঁরা নেপাল সরকার কর্তৃক অপরাধী ঘোষিত হয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী তালিকায় নাম ছিল, এখনও দুটি দলের মধ্যে এস,পি এবং সি,পি,এন(এম) অবিশ্বাসের পরিবেশ বিরাজ করছে যা সাধারণ নেপালীদের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার কারণ। সি,পি,এন(এম) এর কিছু সংখ্যক শীর্ষ নেতা এখনও ভারত এবং চীনে সন্ত্রাসী দলের সদস্য হিসেবে জেলে আছেন। নেপাল সে অভিযোগ তুলে নিয়েছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের তালিকা থেকে অভিযোগ তুলে নেয়া বাকী আছে। আমেরিকানরা মাওবাদীদেরকে এখনও সন্দেহ করছে, যদিও তাঁরা মীমাংসায় আসার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

সাত দলীয় মৈত্রীকে সংসদীয় আইন সভা প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যে নির্বাচন একটি নূতন গণতান্ত্রিক সংবিধান তৈরি করবে এবং জাতীয় সরকার গঠন করে প্রশাসন পরিচালনা করবে এবং নূতন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কাজ করে যাবে। কিন্তু দেশের জনগণ বিশেষ করে মাওবাদীরা অনতিবিলম্বে সংস্কার দাবী করে রাজাকে জোর করে অপসারণ করে

www.pathagar.com

তাঁর শাসনমূলক নির্বাহী ক্ষমতা এবং সামরিক বাহিনীর আদেশদানকারী ক্ষমতার অবসান দাবী করে। রাজা জনগণের দাবীর নিকট কিছু ক্ষমতা ছেড়ে দেয় কিন্তু বর্তমান সংবিধান তা সমর্থন করেনা। এমনকি মাওবাদীরাও সন্তুষ্ট হতে পারেনি. এস,পি,এ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যত শীঘ্র সম্ভব পরিবর্তন আনার দাবী করা হয়। এস, পি, এ সরকার দ্রুত শর্তাধীনে আত্মসমর্পন করে। দেশ রক্ষা মন্ত্রণালয়কে বেসামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে দেয়া হয় এবং প্রধানমন্ত্রী দেশরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং নেপালকে হিন্দু রাজ্য থেকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণার সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়, কিন্তু প্রচুর সংশয়বাদ বিদ্যমান থাকার ফলে প্রশ্ন উঠেছে দেশের ৮০% হিন্দু নাগরিক কি তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় বিশেষ করে উঁচু শ্রেণীর হিন্দু নাগরিকরা পরিত্যাগ করবে। তৎসত্ত্বেও রাজা সুপ্রিম কমান্ডার এবং রাজকীয় নেপালি আর্মির পদমর্যাদা ত্যাগ করেন এবং রাজকীয় নেপালি আর্মির পুননামকরণ হয় "নেপালি আর্মি", অধিক গরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে রাজাকে ক্ষমতাহীন করা হয়। আজ রাজা জ্ঞানেন্দ্রর কোন নির্বাহী ক্ষমতা নেই।

সেখানে বিরোধী দল আছে এবং নেপালের হিন্দু পরিচিতিকে পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এখনও মতামত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নেপালের "বিশ্ব হিন্দু পরিষদ" সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছেন যে, বিশ্বে যদি ৫৬টি খ্রিস্টিয়ান এবং ৪২টি মুসলিম রাষ্ট্র থাকতে পারে তবে একটি হিন্দু রাষ্ট্র কেন থাকবে না? কিন্তু মাওবাদীদের কর্মসূচি তাদের নিজস্ব। যখন রাজা মহেন্দ্র একবার নেপালকে হিন্দু রাষ্ট্র বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন নেপাল সমাজ হিন্দু সম্প্রসায়ের রীতি অনুযায়ী সে দায়িত্ব পালন আরম্ভ করে। এটা সর্বত্র সাফল্যের সঙ্গে পালিত হচ্ছে। সমগ্র মাওবাদী আন্দোলন সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে অমান্য করে শেষ পর্যন্ত এক দশক যাবত সি,পি,এন(এম) প্রতিবন্ধকতা ধ্বংস করে নিম্নবর্ণ এবং অতি নিম্নবর্ণের একটি শক্তিকে একত্র করেছে।

উপরে আলোচিত পরিবর্তনগুলোকে প্রধান সংস্কার হিসেবে তালিকাভুক্ত করা যায়, কিন্তু গতানুগতিক সীমিত পরিবর্তনগুলোই নয় বরং সকল দলের সম্মিলিত গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে। কিন্তু সি,পি,এন(এম) তাঁদের অধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবী অন্যকে প্ররোচিত করেছে। যা হোক, মাওবাদীদের অধিক চাপে নেপাল রাজতন্ত্র থেকে অতি তাড়াতাড়ি গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। তবুও মাওবাদীরা যে সমস্ত দাবী নিয়ে যুদ্ধ করছে সেগুলো সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ করতে চাচ্ছে। সকল দাবীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবী হচ্ছে পরবর্তী নির্বাচন হওয়ার পুর্বেই নেপালকে গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা এবং রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে একজন রাষ্ট্রপতিকে স্থলাভিষিক্ত করতে হবে এবং তিনি হবেন সামরিক বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার। মাওবাদীরা যথোচিতভাবে আক্রমনাত্মক ভঙ্গি নিয়ে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধানের জন্য দশক ধরে পরিকল্পিত অভিযান চালিয়ে সুফল লাভ করেছে। এখন নেপালের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে তাঁরা প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য আক্রমনাত্মক ভঙ্গি গ্রহণ করতে চাচ্ছে। সরকারি শক্তির সঙ্গে মাওদাবীদের মধ্যে তিন মাসের যুদ্ধবিরতি বিদ্যমান, কিন্তু প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে, মাওবাদীরা শক্তি সঞ্চয় করছে এবং পি,এল,এ (পিপলস লিবারেশন আর্মি) দলে নূতন সদস্য নিয়োগ দিচ্ছে। ইতোপূর্বে এস,পি,এ ও মাওবাদীরা ১২টি শর্তে একটি চুক্তি করে এবং ১২টি শর্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল উভয় পক্ষ যুদ্ধের শক্তির জন্য

www.pathagar.com

অধিকতর নিয়োগদান বন্ধ রাখবে। এটাও যুদ্ধ বিরতির চুক্তি অনুযায়ীই হয়েছে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে শুরু মনে হলেও তা হয় নি এবং প্রদত্ত শর্ত ভঙ্গ করেছে বলে একে অন্যকে দোষারোপ করছে।

ইতোমধ্যে এস,পি,এ সরকার উচ্চ পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করে যারা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে এবং ফলে অনির্দিষ্ট সংখ্যক লোক মারা যায়। কিন্তু এতে মাওবাদীরা সন্তোষ্ট হতে পারে নি। মাওবাদীরা এখন দৃঢ়তার সাথে দাবী করছে সামরিক বাহিনীর কাঠামো পরিবর্তন, রায়মাজী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর প্রধানসহ উচ্চ পর্যায়ের কমান্ডারদের চাকুরিচ্যুত করা এবং একজন নূতন সামরিক প্রধান নিযুক্ত করা যাকে তাঁরা গ্রহণ করবে। আর একটি প্রধান স্পর্শকাতর দাবী হল সামরিক বাহিনীকে নূতনভাবে পি,এল এর মত অনুযায়ী গঠন করতে হবে এবং পি,এল সদস্যদের আত্মীকরণ করতে হবে। ফলে রাতারাতি সামরিক বাহিনীতে রীতিনীতির পরিবর্তন হয়ে যাবে। বর্তমানে ৮০% কর্মকর্তা এবং এন,সি,ও দল উচ্চ বর্ণের হিন্দুরের মধ্য থেকে বেশিরভাগ ব্রাহ্মন এবং ক্ষৈত্র। পি,এল,এ তাঁর সদস্যদেরকে গ্রামীণ পটভূমি ধারণা থেকে পিছিয়ে থাকা নিম্নবর্ণ থেকে নিয়েছে এ ধারণা নেপালি আর্মির সঙ্গে মিলছে না।

মাওবাদীদের কর্মসূচির এ সমস্ত দাবীনামা জানা আছে, কিন্তু এস, পি, এ সরকার এগুলো কম অধিকার দিয়ে শর্তাধীনে চাপ প্রয়োগ করে স্থগিত রেখেছে, শান্তি এবং মীমাংসার আলোচনার দ্বার খুলে দেয়, আরও একটি বিষয় হল নির্বাচনের পূর্বে সরকার পদ্ধতিকে নিরস্ত্রণ করতে হবে (ডি,ডি,আর) এবং এটা হবে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী প্রবঞ্চনার প্রমাণ। মাওবাদীদের দৃঢ়তায় নিরস্ত্রকরার কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে, একই সঙ্গে বিদ্যমান সামরিক বাহিনীকেও, তবে তা নির্বাচনের আগে নয়। মাওবদীরা কখন কিভাবে শান্তি আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজি, সেভাবে অনেক রাজনীতিবীদ মত প্রকাশ করে এ,পি,এ কে জাতিসংঘের সাহায্য চাওয়া ও তদারকির কথা বলার জন্য বলেছে যা, ডি,ডি,পি-কে ও প্রভাবিত করবে।

সে যা হোক, শান্তি আলোচনার ফলাফল যাই হোক না কেন, এটা না বলে পারা যাবে না যে এস,পি,এ সরকার অত্যন্ত কঠিন একটি সময়ের মুখোমুখি হচ্ছেন তা হল সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠন সংক্রান্ত যা সমঝোতা করা সম্ভব নয়। যতটুকু মাওবাদী সংক্রান্ত এবং অতি ধার্মিক হিন্দুদের উপর ধর্ম নিরপেক্ষতা আরোপ এবং রাজা "বিষ্ণু" পুনর্জন্মকে বিবেচনা করে তদন্তের প্রয়াত রাজা মহেন্দ্র এটা পুনস্থাপন করেছেন। এ সমস্ত বিষয়গুলো অবশ্যই পরিবর্তন সাধনকারীদের কাজ বলে পরিগণিত হবে এবং নেপালে সামাজিক অভ্যুত্থান মারাত্মক হবে, অনেকেই বলেছেন যে, কয়েক মাস সময়ের মধ্যেই এ ঘটনা হতে যাচ্ছে। অন্যদিকে দুটি রাজনৈতিক শক্তি অর্থাৎ এস,পি,এ এবং সি,পি,এন(এম) এর মধ্যে ফাঁটল দেখা দিবে, সম্ভবত বিভিন্ন বিষয়ে তা আরম্ভ হয়ে গেছে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সি,এ,এস চীফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল পিয়ার জঙ্গ থাপা এবং তাঁর ডেপুটি লেফটান্যান্ট জেনারেল রূপমাঙ্গা কাটুওয়াল কে তাৎক্ষনিকভাবে অপসারণ করা এস,পি,এ সরকারের পক্ষে সহজ নয়। এ ব্যাপারে দ্রুত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে মাওবাদীদের ইচ্ছার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন রূপদান করা হতে পারে। তাতে এস,পি,এ অন্তর্ভুক্ত দলগুলির পক্ষে

www.pathagar.com

নির্বাচন করা সহজ হবেনা। ঠিক একইভাবে সৈন্য বাহিনী পুনগঠন এবং পি,এস,এ সদস্যদেরকে অন্তর্ভূক্ত করে হঠাৎ শ্রেণী গঠনে পরিবর্তন নেপালে স্থিতিশলীতা এবং নবজন্ম গণতন্ত্রের রক্ষা করা সংকটপূর্ণ হবে। নেতাদের সংসদীয় গণতন্ত্র চালানোর অভিজ্ঞতা নামে মাত্র আছে। স্পর্শকাতর বিষয়টি হল নেপালের সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াই হবে তাঁদের জন্য সবচেয়ে বড় বাঁধা। অন্যান্য কন্টকময় বিষয়গুলো হবে রাজার প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ। মাওবাদীরা প্রজাতন্ত্র ছাড়া চরমাবস্থার সঙ্গে সমঝোতা করবে না এবং প্রতিবেদন সমর্থন করেছে যে, কৈরালা সি,পি,এন(এম) কে প্রথম রাষ্ট্রপতি করার প্রস্তাব দিয়েছে তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে যেমন মাওবাদীরা চায় রাজপ্রসাদকে ভ্রমণকারীদের গন্তব্যে রূপান্তর করার জন্য বেইজিং এর নিষিদ্ধ শহরের সমান্তরাল হবে, একজন মাওবাদী আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছে। যেমনটি হওয়ার তেমনই হবে, পর্যবেক্ষকগণ বলেছেন এই সংকট সময়ে চীফকে অপসারণ করে অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত করা হলে সি,পি,এন(এম) যেমন প্রস্তাব করেছে, প্রবীণ রাজনীতিবিদদের দ্বারা পূর্বেই রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহত করা না হলে মাওবাদীদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হবে।

ইতোমধ্যে সি,পি,এন(এম) সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে, কমিটিতে সদস্য ছিলেন কৃষ্ণা বাহাদুর মহরা, দেব গুরাং এবং দীন নাথ শর্মা। বিদ্রোহের সূত্রপাতের পরে এই প্রথম বারের মত কাঠমুন্ডুতে আগমণ করে। তাঁরা তথাকথিত একটি শুভেচ্ছাদল গঠন করে নেপালের ভবিষৎ নীতি সম্পর্কে প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা গেছে সি,পি,এন(এম); এস,পি,এ দল থেকে পরিকল্পনা ও কাজে তাঁরা এগিয়ে আছে। কাঠমুন্ডুতে আলোচনা শুরু হয় এবং গিরিজা প্রসাদ কৈরালা এবং এক সময়ের অবৈধ নেতা পুষ্প কমল দাহাল যিনি প্রচন্দ নামে খ্যাত মধ্যে শীর্ষ বৈঠকের পর্যায়গুলো তৈরি করে।

যা হোক, রাজনীতিবিদরা যেটুকু অনুমান করেছেন ভবিষ্যৎ হয়তো তত সহজ নাও হতে পারে। মাওবাদীদেরকে মোকাবেলা করা সহজ হবে না, কারণ তাঁরা কঠিনভাবে স্বাভাবিক মান থেকে চ্যুত হয়ে তাঁদের লক্ষ্য অর্জনে এক দশক ধরে যুদ্ধ করে জীবন বিসর্জন দিয়ে আসছে। মাওবাদীরা রাজনৈতিক ভাবে দুর্নীতির উপর এবং অত্যাচারিত রাজনৈতিক দলগুলো যাদেরকে অধিকাংশ নেপালিরা বিশ্বাস করেনা তাঁদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। নিম্ন শ্রেণীর নেপালিদের ছাড়া পূর্ববর্তী সরকার এবং রাজা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদেরই সেবা করেছে। এস,পি,এ তাঁদের থেকে বাদ নয়। মাওবাদী আন্দোলন ফলপ্রসূভাবে সামাজিক বৈষম্যতাকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের সমান্তরাল প্রশাসনে সি,পি,এন(এম) স্তরগুলো ভেঙ্গে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সামাজিক বাঁধাকে অতিক্রম করে অস্পৃশ্য নিম্ন সম্প্রদায়ের মহিলাদেরকে পুরুষের মত শক্তিশালী বিবেচনা করে পুরুষ শাসিত নেপালী সমাজে প্রভুত্ব স্থাপন করেছে। নেপালে এটা একটি নূতন বিস্ময়কর ঘটনা। আগেই বলা হয়েছে পি,এন,এ'র ৪০% যোদ্ধা মহিলা নিম্নশ্রেণী থেকে এসেছে এবং বাকীগুলো পুরুষ সদস্য।

উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী এবং আমি যেটুকু জেনেছি এবং প্রখ্যাত লোকদের অভিমত থেকে যেটুকু বিশ্লেষণ করতে পেরেছি। বিভিন্ন প্রকার আলোচনা এবং

www.pathagar.com

সহজলভ্য প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এস,পিএ সরকার দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংকটের সম্মুখীন, এদিক থেকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবিধানিকভাবে রাজার ভবিষ্যৎ কিহবে? এগুলোর একটি হল, সামরিক বাহিনীর পুনগঠন, দ্বিতীয়টি হল, নির্বাচনের পূর্বে ফলপ্রসূ ডি,ডি,আর মাওবাদীরা অস্ত্র জমা দিতে ইচ্ছুক নয়, আশ্বস্ত করেছে যে, তাঁরা পর্যবেক্ষণে থাকবে। এ সরকার বিলুপ্ত হওয়ার পর মাওবাদীরা অন্তবর্তী সরকারের যোগ দিতে আগ্রহী নয়।

উপরোল্লিখিত সকল বিবরণ থেকে এটা প্রত্যাশিত যে, নেপালের অত্যন্ত মারাত্মক দিনগুলো সামনে আছে এবং সামরিক বাহিনীতে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া হতে পারে এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধনকারী। মাওবাদীরা যেভাবে পরিকল্পনা করেছে সে ভাবে শতাব্দীর পুরাতন উচ্চ পর্যায়ের সম্প্রদায় কর্তৃক সামরিক আধিপত্যকে নিস্প্রভ করে দেয়া সহজনয়। ডি,ডি, আর যদি রাজি হয়, তা হলে বহু রকমের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে, যদিনা এ অবস্থা আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রীত না করা হয়। সম্ভবত নেপালের জন্য কঠিন দিনগুলো সামনে আছে, যদি না উভয় পক্ষ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে একটি কার্যকরি পদক্ষেপ নিয়ে অগ্রসর হয় এবং যে জন্য তাঁরা দশক যাবত যুদ্ধ করেছে সেই নেপাল অর্থাৎ হিমালয়ের এ দেশটিকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে পারে।

নেপাল যেহেতু আমাদের নিকটবর্তী প্রতিবেশী আমাদের পর্যবেক্ষণ করার প্রয়েজন আছে এবং ভবিষ্যৎ নেপালীদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। নেপাল শুধু বাংলাদেশের প্রতিবেশীই নয় বরং সার্ক এবং বি,আই,এস,এস,টি,ই,সি এর অর্থনৈতিক অংশীদার,ভূ-বেষ্টিত দেশ হিসেবে অন্যান্য দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ান দেশগুলো বিশেষ করে বাংলাদেশের সঙ্গে কৌশল গত সম্পর্কের উন্নয়নে অতি আগ্রহী হবে। দুটি এশিয়ান শক্তিশালীদেশের মাঝখানে থাকতে নেপালকে ব্যবহার করছে এবং ভারত নির্বোধ বিবেচনা করছে এবং চীন ও ভারতের মধ্যে সংঘর্ষ রোধার্থ মধ্যস্থলে স্থাপিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। নেপালের ভূ-কৌশলগত অবস্থান বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক সীমান্ত নির্ধারণে জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থলপথ সংযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যের জন্য সংক্ষিপ্ত পথের ব্যবস্থা করতে পারে।

অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেছে যে, মাওদের অথবা মাওবাদীদের উত্থান নেপালের শাসন ক্ষমতা তদের হাতে গেলে ভারতের নীতি নির্ধারকেরা মনে করেছে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ন্যস্ত হতে পারে, এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সহজে গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্য দিকে নেপালে আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতির বৃহৎ খেলায় অনেক পাকিস্তানী অংশীদার হিসেবে উপস্থিত ছিল, সম্ভবত তাঁরাই উদ্যোগ নিয়েছিল। নেপাল সব সময় প্রতিযোগিতার অঞ্চল ছিল, তা ছিল "সম্রাটের শাসন" এর মধ্যে এবং আবার যে অবস্থা ছিল সে অবস্থায় রেখে চলে যেত। নেপাল সে রকমই থাকত, কিন্তু মাওবাদীরা সম্পূর্ণ দখল করাতে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালও হতে পারে আবার নাও হতে পারে। বিশেষভাবে ভারতের জন্য কারণ সেখানে একশত জেলারও অধিক মাওবাদী আন্দোলনে চলছে এবং পিপলস্ ওয়ার গ্রুপ এদের সমর্থন করছে। আমরাও সম্ভবত আমাদের সীমান্তবর্তী বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলে সি, আর, জেড এর মধ্যে পড়তে পারি।

www.pathagar.com

যা হোক, আমি দেখলাম, নেপাল সম্ভাব্য সামাজিক বিরাট পরিবর্তনে সাহসি ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যখন অকল্পনীয় সমাজ গঠনের পরিবর্তন চলছে, তখন অধিকাংশ নেপালীদের জন্য সমন্বয় করা সহজ হবে না, কারণ সমাজ রূপান্তরের অভিজ্ঞতার অভাব আছে। তাঁদের সাহায্য কারতে হবে এবং বিশ্ব সমাজ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনে সমবেদনা জানাতে হবে। আমরা নেপালের ভাল বন্ধু হিসেবে অক্ষম হয়ে নয়, কৌশলগত অবস্থার সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রস্তাব দেয়া উচিত কার্যকরভাবে ডি,ডি,আর এর নিকট যদি নেপালের জনগণ প্রয়োজন মনে করে তবে জাতিসংঘের মাধ্যমে আমাদের গ্রাম উন্নয়নের অভিজ্ঞতা এবং ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার প্রস্তাব করতে পারে। এখানে আমি সুপারিশ করতে চাই যে, নেপালের সঙ্গে আমাদের একটি ক্রিয়াশীল নীতির উন্নয়ন করা উচিত, তাহলে পুনঃকার্যকর নীতি তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তার লাভ করবে। উপসংহারে আমরা চাই নেপালিরা এই কঠিন সময়কে অতিক্রম করতে সক্ষম হোক, তাহলে হয়তো তাঁরা একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবে। একটি শান্তিপূর্ণ প্রগতিশীল নেপাল হোক দক্ষিণ এশিয়াকে শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করার অন্যতম উল্লেখযোগ্য দেশ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নেপালঃ হিমালয়ে নৈরাজ্য এবং অকীর্তিত ভারতের সংশ্লিষ্টতা
(Nepal: The Himalayan Chaos & the unsung Indian Involvement)

– নিশ্চল এম, এস, বসন্ত

হিমালয় কন্যা নেপালে পুনরায় রাজনৈতিক দুর্যোগের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। বর্তমান অবস্থা ১৯৯০ সালের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল প্রয়াত রাজা বিরেন্দ্রর স্বেচ্ছাচারী পাঞ্চায়েত ব্যবস্থা থেকে ক্ষমতা নিয়ে অপসারণ করা। সে যাই হোক, এক দশক পরে "গণতন্ত্র", ১৯৯০ এর পরে দেখা গিয়েছে নেপালে মোটের উপর বিশৃঙ্খল সরকার, অকল্পনীয় পর্যায়ে দূর্নীতি এবং তীব্র গৃহযুদ্ধ। তখন থেকেই অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। একদা এক ক্ষুদ্র এবং অসজ্জিত মাওবাদী আন্দোলনের গণহত্যার ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও এখন নেপালের বেশীর ভাগ গ্রামাঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে।

নেপাল আবারও একটি পরিবর্তন চাচ্ছে এবং এ উদ্বিগ্নতা ঐতিহাসিক একটা পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। ২০০৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারী রাজা জ্ঞানেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ্ নির্দয়ভাবে রাজকীয় হত্যাকাণ্ডের মত বিরোধের মধ্যে ক্ষমতা গ্রহণ করেন, সংসদ স্থগিত করেন এবং তিন বছরের মধ্যে দেশকে একটি সঠিক পথে নিয়ে আসার ঘোষণা জারি করেন। রাজার অত্যুচ্ছ আশাকে গণ আন্দোলনের দ্বারা অভিযুক্ত করা হয় যা তাকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করে, সংসদ পুনবহাল করা হয় এবং সে সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা তাঁর ভাগ্য নির্ধারিত হয় যাদেরকে রাজা অযোগ্য বলে দোষারোপ করেছিলেন। রাজতন্ত্রের অদ্বিতীয় এদেশটি এখন গণতন্ত্রের সমর্থক এবং সকল সময়ে বৃদ্ধিশীল কমিউনিজমের প্রতি আকুল আকাঙ্ক্ষা এখন পথের প্রধান কাঁটা হলেও সঠিক পন্থা বের করে এক সময়ের শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী দেশটি ব্যর্থ রাষ্ট্র হতে চায় নি।

স্পষ্টতঃ বহু সমস্যা থাকায় অপ্রসংশিত এবং অলক্ষিতে ছোট সমস্যায় নেপালের কার্যপ্রণালী সফল না হওয়াতে দেশ আজকের অবস্থায় এসেছে। দীর্ঘ দিনের সমস্যার কারণে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাই শুধু অস্থিতিশীল হয় নি, বরং ভবিষ্যৎ অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। দেশের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে আমরা পিছিয়ে আছি কারণ আমরা অগ্রগামী হওয়ার পরিকল্পনা ভুলে গিয়েছি।

ভারতীয় হুমকি ঃ আমাদের তথাকথিত বড় দাদার উদ্দেশ্য বুঝতে আমরা অপারগ নই। ভারত, এ অঞ্চলের বৃহৎ শক্তি। পরোক্ষভাবে নির্দেশ করছে নিকটবর্তী এদেশটিতে কি হচ্ছে, এমনকি নীতিতে কোন ছোটখাটো পরিবর্তন হলে খুববেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং নেপালের মত একটি ক্ষুদ্র দেশকে ভেঙ্গে ফেলার মত আচরণ দেখায়। সে রকম সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে এ বড় দেশটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে কর্তৃত্ব করতে চায়। এখানে অর্থাৎ নেপালে ভারতের ভূমিকা হল ভারত কর্তৃক নেপালকে প্রদত্ত পাঁচ হুমকির প্রতি তাঁরা সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভাবে পরিক্ষিত করবে এবং এই দুর্বল দেশটির উপর ভারতের প্রভাব সম্পর্কে চূড়ান্ত বিচার করার দায়িত্ব পাঠকদের উপর ছেড়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

মাওবাদী এবং ভারতের হস্তক্ষেপঃ অতএব, আমরা মাওবাদী নেতাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য লক্ষ্মৌ গিয়েছিলাম। আমরা হাঁটতে ছিলাম এবং খোলাখুলিভাবে কথা বলছিলাম। আমরা ভবঘুরের ন্যায় একটি জনাকীর্ণ রাস্তা অতিক্রম করে একটি ছোট চায়ের দোকানে গিয়ে বসেছিলাম, আরও অনেক আলোচনা হল তারপর আমরা তাদের আস্তনায় ফিরে গিয়েছিলাম। আমরা আশ্চার্যন্বিত হলাম যে তাঁরা কোন রকম কিছুমাত্র বিচলিত নয়, আমরা কে বা কি এবং নেপালি জনগণ কতটুকু তাঁদের চায় কিছুতেই তাঁরা উদগ্রীব নয় এই চমকপ্রদ আলোচনাগুলো শেষ রাত্রে ব্রাসেলসে নেপালের একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদের সঙ্গে হয়েছিল। নেপালের মাওবাদী নেতা ডঃ বাবুরাম ভট্টরাই এবং প্রচন্দ ভারতে এই উভয় নেতার সঙ্গে কি ভাবে দেখা হয়েছিল তা জানার জন্য তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল।

নেপালের অভ্যন্তরীণ বিবাদের মধ্যে উত্তরটি স্পষ্ট যা আমরা দেখতে পাই নি। তথাপি উৎকর্ষে এগিয়ে গিয়েছে বলে স্বদেশবাসীর হিতসাধনের প্রবচন আছে, ভারত নেপালের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ ধরে রেখেছে, শুধু রাজনৈতিক প্রধান ধারার পথ নয়, বিপদাপন্ন করার জন্য মাওবাদীদের ক্ষেত্রেও তাঁদের কার্যকলাপ তীব্রতরভাবে বৃদ্ধির জন্য সহায়ক করছে। স্বীকার করা হয়েছে যে, নেপালি মাওবাদীদের আন্দোলনের শিকড় অনেক গভীরে, এ আন্দোলন দেশের ভিতরেই উৎপত্তি হয়েছে, কাজেই এটাকে জয় করা বা পরাস্ত করার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন আছে, আমাদের নিজেদেরকেই সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হবে কারণ স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে ভারত নেপালের আঘাত প্রাপ্ত রাজনীতিতে লবণের ছিটা দেয়া বন্ধ করবে না।

অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য পথে ভারত নেপালের বিপ্লবকে সাহায্য করছিল। প্রথমতঃ নেপালের মাওবাদী নেতাদের জন্য ভারত অভয়াশ্রম। এটা একটি অকাট্য প্রকৃত ঘটনা যে ভারত নেপালের সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিচ্ছিল। রাজকীয় নেপাল সরকার এবং রাজকীয় নেপালী সামরিক বাহিনীসহ মাওবাদী নেতাদের অবরুদ্ধ করতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করেছে। ভারত যখন রাজনৈতিক খেলা খেলে নেপালের সন্ত্রাসীদেরকে অনুসন্ধান ও অনুসরণপূর্বক গ্রেফতারের জন্য আশ্বাস দিয়েছে তখন ভারতীয় রাজনীতিবিদরা এবং সরকারী কর্মকর্তারা গোপনে শীর্ষ পর্যায়ের মাওবাদী যেমন ডঃ ভাট্টারাই (ঘটনাটি ব্যাপক প্রচার করা হয়েছিল) এর সঙ্গে দেখা করে। সম্প্রতি দিল্লীতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং মাওবাদীদের মধ্যে সভা অনুষ্ঠান এবং এখনও আলোচনা সভা এন,সি এবং ইউ,এম,এল এবং ভারতের মাওবাদীদের মধ্যে চলছে, এটা হচ্ছে আরও একটি উদাহরণ যে ভারত ইচ্ছাকৃত ভাবে মাওবাদীদের গ্রেফতার করছে না।

দ্বিতীয়তঃ মাওবাদী নেতাদেরকে খুঁজে বের করা এবং বন্দি করা খুব কঠিন কাজ নয়। গীরিজা প্রাসাদ কৈরালা এবং মাধব কুমার নেপাল এর মত আমাদের বিজ্ঞ রাজনীতিবিদরা স্বাচ্ছন্দ্যভাবে অনুরোধ জানায়, যদি আমাদের সাংবাদিকরা এবং গণমাধ্যমগুলো তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং বিদেশী সাংবাদিকরা যদি তাদের বের করার জন্য নিষচেষ্ট হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারি না যে একটি বৃহৎ শক্তির গোয়েন্দা সংস্থা নেপালের মাওবাদীদের অনুসন্ধান ও অনুসরণপূর্বক গ্রেফতার করতে পারবে না কেন? এমনকি একটি বেসরকারি তহবিল প্রাপ্ত "বাউন্টি হানটিং"

www.pathagar.com

নামের দল ভারতের মাওবাদী নেতাদের খুঁজে বের করতে পারবে। তাহলে শীর্ষ পর্যায়ে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় তহবিলের সংস্থান করা হলে ভারতের গোয়েন্দারা কেন তা করতে পারবে না।

তৃতীয়তঃ অস্ত্র কোথা থেকে আসছে? আমরা যদি সাদাসিধেভাবেও চিন্তা করি যে মাওবাদীরা যে সমস্ত অস্ত্র তাঁদের অধিকারে রেখেছে সেগুলো রাজকীয় নেপালী সামরিক বাহিনী ও নেপালি পুলিশ বাহিনীর নিকট থেকে যুদ্ধোত্তর সময়ে লুট করে নিয়েছিল। তাঁরা নিশ্চিত যে এ সমস্ত অস্ত্র বাংলাদেশ, ভূটান, পাকিস্তান অথবা তিব্বত থেকে আসে নি। আমাদের সঙ্গে ভারতের সুদীর্ঘ সীমান্ত এলাকা নেপালের সন্ত্রাসী আন্দোলনের জন্য সামরিক সম্ভার সংগ্রহ স্থান, আমরা অল্প পরিমাণ পিস্তলও বুলেটের চোরাচালানের কথা বলছি না। এগুলো বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, হাজার হাজার পদাতিক বাহিনীকে সজ্জিত করার জন্য যথেষ্ট। তারপর আমরা এ প্রশ্নের উপর চিন্তা করতে পারি যে কে তাদের নিকট অস্ত্র বিক্রি করছে? ভারতের মাওবাদীরা এবং অন্যান্য দল যারা নেপালের মাওবাদী আন্দোলনকে সমর্থন দিচ্ছে তারা অত্যন্ত দুর্বল এবং অস্ত্র সরবরাহের মত সামর্থ্য তাদের নেই। এ ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে, যা হোক, অপ্রচলিত ভারতীয় সৈন্যদের অস্ত্রগুলোর কি হয়েছে। ঐ গুলি নষ্ট করাও ব্যয়সাপেক্ষ এবং সংরক্ষণ করাও ব্যয়সাপেক্ষ। তাহলে এ সমস্ত অনাবশ্যক অস্ত্র বিক্রি করে লাভ করাই ভাল। ফলস্বরূপ আমি জানতে পেরেছি যে, বিহারের মত কুখ্যাত পার্শ্ববর্তী রাজ্যের দুর্নীতিগ্রস্ত জেনারেলগণ গোপনে নেপালের মাওবাদীদের নিকট সেকেলে এবং ব্যবহারের অযোগ্য অস্ত্রগুলো বিক্রি করে দেয়। নেপালের সাংবাদিকগণ ভারতের একজন অবসর প্রাপ্ত সৈনিকের সাহায্য নিয়ে পূর্বে যে গবেষণা করেছে তাতে দৃষ্টি গোচর করা হয়েছে যে আশ্চর্যজনকভাবে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর একটি বিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সঙ্গে নেপালের মাওবাদী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে। তাঁরা এটাও দাবী করেছে যে বিরোধী অবসর প্রাপ্ত ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাগণ ৩ থেকে ৪ দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে নেপালি মাওবাদীদের নিয়োগের ক্ষুদ্র অংশ তৈরি করছে।

চতুর্থতঃ অধিকাংশ নেপালি মাওবাদী নেতা ভারতে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। আমরা কিভাবে পরিমাপ করব যে, ডঃ ভট্টারাই এর মত একজন নেতা যোগাযোগ করে তাঁর পি, এইচ, ডি অর্জন কালে জওহারলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থান করেছে। আমরা কিভাবে তাদের পরিচিতি পরিমাপ করব, চেয়ারম্যান প্রচন্দ "দি পিপলস ওয়ার গ্রুপ" (পি,ডব্লিউ,জি), দি মাওস্টি কমিউনিস্ট সেন্টার (এম,পি,সি), এবং কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কস-লেনিন) এবং এর পুর্বে নেপালের তথাকথিত "পিপলস ওয়ার" এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন? আজকে নেপালের মাওবাদী আন্দোলন যুক্ত হয়েছে, বৈপ্লাবিক আন্তর্জাতিকতাবাদ আন্দোলন (আর,আই,এম) এর সঙ্গে এবং ভারতের মাওবাদী সমর্থকদের নিকট থেকে নিরাপত্তাও অস্ত্র সাহায্য পাচ্ছে। নেপালের বিদ্রোহের জন্মকাল থেকে ভারতের হস্তাঙ্গুলির ছাপ পাওয়া যায়।

পঞ্চমতঃ নেপাল সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ করার পরও ভারতে গ্রেফতারকৃত মাওবাদী নেতাদের হস্তান্তর করে নি। অত্যন্ত দুঃখজনক খবর আসে যে যখন মোহন বৈদ্য এলিয়াস কিরণ (পাঁচজন শীর্ষ মাওবাদী নেতাদের মধ্যে তিনি

www.pathagar.com

অন্যতম) গ্রেফতার হয়। তাঁকে ভারতের আদালত একজন রাজনৈতিক নেতার পদমর্যাদা অনুমোদন করে এবং রাজনৈতিকদের জন্য নির্ধারিত সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় যা সাধারণ বন্দিরা পায় না। কিভাবে নেপালের মাওবাদী নেতারা, যাদের হাত রক্ত মাখা এবং ভারত যাদেরকে সন্ত্রাসী বলে স্বীকার করেছে তাদেরকে শান্তির বদলে নমণীয়তা দেখাচ্ছে।

ষষ্ঠতঃ ভারতে বসবাসরত নেপালের নাগরিকরা মাওবাদীদের আন্দোলনে ইন্দন যোগাচ্ছে। "অল ইন্ডিয়া নেপালি ইউনিটি সোসাইটি," "অল ইন্ডিয়া নেপালী স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন", "অল ইন্ডিয়া নেপালী ইয়থ এসোসিয়েশন", এবং "অল ইন্ডিয়া এথ্‌নিক সোসাইটি" এ সমস্ত বড় দলগুলো ভারতে সক্রিয় এবং মাওবাদীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এমনকি এক সময়ের নিরপেক্ষ "অখিল ভারতীয় নেপালে একতা সমাজ" (এ,বি,এন,ই,এস) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতে নেপালী সমাজের একতাও উন্নতি সাধনের জন্য, এখন ভিন্নমতালম্বী ব্যক্তিদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে গভীরভাবে গবেষণা করছে। যখন ভারত নেপালকে আশ্বস্ত করেছে যে সে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করতে চেষ্টা করছে, অন্যদিকে সারা দেশব্যাপী মাওবাদীদের কার্যকলাপের প্রতি অন্ধদৃষ্টি দিয়ে রেখেছে। ২০০১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে সি, পি, এন (এম) এর দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে প্রচন্দ তার বক্তৃতায় বলেছেন যদি ভারতে বসবাসকারী নেপালিরা এ আন্দোলন থেকে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে নেপালের জনগণের যুদ্ধ এবং বিপ্লবের সফলতা চিন্তা করা যায় না।

সপ্তমতঃ ভারতের মাওবাদীরা নেপালিজ "পিপলস ওয়ার্ক" কে ইতোমধ্যে পরিব্যাপ্ত করে ফেলেছে। ২০০৪ সালে মুগা/ধানকূটা আক্রমণের সময় উচ্চ পর্যায়ের বহু রাজকীয় নেপালি সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়, জানা যায় ভারতীয় নারীরা শিরচ্ছেদের অন্তরালে কাজ করেছে। তেরাই অঞ্চল ভারতীয় মাওবাদীদের অভয়াশ্রম, একইভাবে নেপালিজ মাওবাদীরা ভারতে নিরাপদ আশ্রয় পায়।

অতএব আমরা আশ্চর্যান্বিত হই যে, নেপালের অশান্তির মধ্যে ভারত কিভাবে স্থায়ী লাভবান হচ্ছে। যথাযথ ভাবে শুধু অর্থনৈতিক লাভবান হওয়ার কথাই চিন্তা করি। কোডাক কোম্পানির কথা স্মরণ করলেই দেখা যায় তাদের বাণিজ্য কুটি টি নেপাল থেকে ভারতে চলে গিয়েছে। নেপালের অস্থিতিশীলতা দেখে তাঁরা প্রাথমিকভাবে এ কাজটি করেছে। পর্যটনের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় নেপাল থেকে ভারতে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে, পর্যটকদেরকে বাধা দেয়ার কারণে ইতোমধ্যে যারা নেপালে ভ্রমণের ইচ্ছা করেছিল তাঁরা ভারত ভ্রমণে চলে গিয়েছে। নেপালের ব্যবসায়ীদের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় ব্যবসায়িরা ভারতে বিনিয়োগের সুযোগ পেয়ে চলে গিয়েছে এবং গরীব নেপালী শ্রমিকরা কাজের খোঁজে ভারত চলে গিয়েছে। বহুজাতিক কোম্পাণী গুলির কথা চিন্তা করলে দেখা যায় নেপালে বিদ্রোহের কারণে ভারতে শস্তা শ্রমিক পাওয়া যায় দেখে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো ভাল ব্যবসার জন্য বিনিয়োগ করছে। পছন্দ করুক আর না করুক, নেপালের এ নিদারুণ যন্ত্রণার সুযোগে ভারত আয় করে নিচ্ছে।

অতীতেও আমরা ভারতের বড় দাদা, ছোট দাদা গিরির মানসিকতার সম্পর্কে পরিচয় পেয়েছি, তারপরও আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে আর কতদিন ভারত

www.pathagar.com

আমাদেরকে প্রতারণা করবে। যখন আমরা কাঠমুন্ডুর রাস্তায় গাড়ির চাকা পোড়াচ্ছিলাম, নিজের ঘরেই গণতন্ত্রের নামে প্যারেড করছিলাম, তখন নেপালের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ভারত পরিচর্যা করছিল দেখেও এড়িয়ে গিয়েছি। যখন দেশের ভিতরে এক দাদা আর এক দাদাকে খুন করছে, ভারত ঐ সমস্ত খুনীদের গণ হত্যার সুযোগ দিয়ে হৃদয়হীন অত্যাচার করিয়েছে। এটা সত্য যে দেশেও আমাদের কোন গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না। এখনকার নেপালে মুখের কথার চেয়ে বন্দুক জোরে কথা বলে, এখন গণতন্ত্রের প্রতিবাদ আরম্ভ করার পূর্বে আমাদের জাতিকে নিরাপদ ও নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতে হবে।

এটার অর্থ এই নয় যে একদলের দোষারোপকে অন্য দলের উপর চালিয়ে দেয়ার আহ্বান। আমরা আমাদের মানসিক যন্ত্রণা এবং প্রকোপ বৃদ্ধি করাকে ভুল পথে পরিচালিত করছি, অতএব এটা করে আমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করছি এবং দেশের উন্নয়নে যে কোন প্রকারে বাধার সৃষ্টি করছি।

এক সময়ে আমরা কোণঠাসা হয়ে পড়ি এবং মাওবাদীরা আমাদেরকে সকল দিক থেকে আক্রমণ করে, এটা আমাদের মনে রাখা উচিত যে এখনও এ যুদ্ধে আমাদের জয়ের সম্ভাবনা আছে। যা হোক, আমরা বড় দাদার সঙ্গে মুখোমুখি হতে চাই। মনে হয় এটাই উপযুক্ত সময় আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে আমাদের দেশকে পঙ্গু করে দেয়ার জন্য ভারত আর কতটুকু করবে।

চীন এবং পাকিস্তান যখন রাজকীয় নেপালি সামরিক বাহিনীকে একদিকে নূতন অস্ত্রসস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করছিল, অন্যদিকে ভারত মাওবাদীদেরকে সজ্জিত করছিল। কতদিন পর্যন্ত আমরা স্ববিরোধীতার কাজ করব? কতদিন পর্যন্ত আমাদের বিদ্যালয়গুলোকে বন্ধ করে রাখব, কতদিন আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে রাখব?

যখন আমাদের নেপালের বিচক্ষণ রাজনীতিবিদগণ ভারত সরকারের রাজনৈতিক আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য ভারত সফর করছেন, তখন ডঃ ভট্টারাই ভারতে মুক্তভাবে নেপালি বিবিসি সার্ভিস থেকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। দেশের আরো ভাইদের হত্যার অদ্ভুত খবরটি যখন আমরা পড়েছি, তখন টেলিভিশন খুলে দেখতে পেলাম মাওবাদী মুখপত্র কৃষ্ণ বাহাদুর মাহ্‌রা সি,এন,এনকে সাক্ষাৎকার দিয়ে মুক্তভাবে ধীরে সুস্থে ভারতের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রমোদোদ্যান দিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমরা আর কতদিন এ স্পষ্ট প্রমাণ দেখেও অন্ধ হয়ে থাকব? এ রহস্য সমাধানের সূত্র একত্র করার এখনই সময়।

নেপালের এ গুরুতর অবস্থার সমর্থনের জন্য রাজা কোনও সমস্যা নয়, না কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে। সত্য কথা হল এর উত্তর এখন আর দেশের মধ্যে নেই। আমাদের এ দুর্গতি লাঘবের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায় এর সমাধান দেশের সীমান্তের ওপারে অর্থাৎ ভারতের হাতে।

www.pathagar.com

জাতিগত প্রথার রাজনীতি
(Caste politics)

হিন্দু সমাজ শক্তিতে প্রভাবে সংখ্যায় শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে দেশ হিসেবে নেপাল জাতি প্রথার রীতির গভীর শিকড়ের আস্থা থেকে শান্তি ভোগ করছে। সস্তা রাজনৈতিক কৃত্রিম বাগড়ম্বর পূর্ণ নীচু ও অস্পৃশ্য জাতি প্রথাকে উন্নত করার প্রতি মনোযোগহীন হয়ে দেশ দুটি প্রধান জাতির দ্বারা সকল সময় শাসিত হয়েছে, উভয় জাতিই শীর্ষ হিন্দু ছিল।

ব্রাহ্মণরা যারা পুরোহিত নামে পরিচিত এবং শিক্ষকরা হিন্দু সমাজের রাজনীতিতে এবং আমলাতন্ত্রে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিল। অধিকাংশ আমলা শীর্ষ পদে আসিন এবং অধিকাংশ প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা এখনও প্রাধান্যপূর্ণ ব্রাহ্মণ। প্রয়াত মহান গণেশ মান সিং নেপালের অন্যতম গণতন্ত্রের মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন, "গণতন্ত্র দেশের জন্য কোন কিছু আনতে পারবে না একমাত্র ব্রাহ্মণ ধর্ম ছাড়া। এমনকি মাওবাদী দল যাদের দর্শন নিম্নজাতি প্রথা থেকে ক্ষমতা এনে সমাজকে পরিবর্তন করবে, তাঁরাও বক্রাঘাতপূর্বক ব্রাহ্মণদের দ্বারা শাসিত।

চেট্রিস যিনি যোদ্ধা এবং হিন্দু সমাজের সম্রাট বলে পরিচিত, তিনি নেপাল সমাজের শাসক ছিলেন। নেপালের রাজাদের (দি শাহ) সময় থেকে, কমান্ডার ইন চীফ এর পদ (কাজীস প্রাধান্য পূর্ণ থাপারা এবং বাগনেট্স) রানাদের রাজত্বকাল ১০৪ বছর স্থায়ী ছিল, চেট্রিসরা শক্ত মুষ্টি হাতে দেশ শাসন করেছে। এজাতিও সামরিক বাহিনীতে কর্তৃত্ব করে। এত বেশী কর্তৃত্ব করে যে, সামরিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে শুধু চেট্রান গোষ্ঠী থেকে নিয়োগ দেয়া হত, এ গোষ্ঠীই ছিল দেশে সবচেয়ে শক্তিশালী।

ভারতের শক্তি হিন্দু ভিত্তিক সমাজ কর্তৃত্বকারী সম্প্রদায়, রীতি ভিত্তিক সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছে। ভারতের রাজপূত এবং মহারাজারা ছিল চেট্রিশ, রাজনীতিতে অগ্রসর মান ছিল প্রাধান্যপূর্ণ ব্রাহ্মণ পরিবার, যেমন নেহেরু এবং গান্ধী পরিবার। ভারতের রাজপূত্রদের এখনও নেপালের রাজ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, বিশেষ করে জয়পুর এবং গোয়ালিয়রের রাজপূতদের সঙ্গে ঠিক অনুরূপভাবে ভারতের কংগ্রেস দল এবং নেপাল শুধু একই রাজনৈতিক ধারার অংশীদার নয়, একই সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বপূর্ণ।

যদিও কখনো গণমাধ্যমে প্রচারিত হয় নি, এখনই উপযুক্ত সময় নেপালি জনগণকে উপলব্ধি করতে হবে যে সম্প্রদায় গত প্রভাব ভারত কর্তৃক নেপালে চালাচ্ছে। এটাই রাজনীতিবিদ এবং তথাকথিত সমাজ সংস্কারকদের সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মোকাবেলা করে সমগ্র নেপালে জনগণের সমন্বয় করে ক্ষমতা অর্জন করে সমাজে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা যাতে ব্যর্থ না হয়। সবশেষে বলা যাচ্ছে যে, এটা মনে করা অত্যন্ত সমস্যামূলক যে দেশটি প্রত্যেকটি নেপালির শুধু তাদের নয় যারা সমাজের সেরা অংশ। একটি বাড়ি তৈরি করলে প্রত্যেকটি ইটের দরকার হয়, বাদ দিয়ে করা হলে বাড়ি ভেঙ্গে যেতে বাধ্য।

www.pathagar.com

নেপালের বাণিজ্যে ভারতে প্রভাব
(India's Influence in Nepal's Business)

নেপালের মারওয়ারীবা হল দেশের লব্দ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। বৃহৎ পাঁচ তাঁরা হোটেল থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র স্বর্ণ ব্যবসায়ী পর্যন্ত তাদের প্রভাব নেপালের ব্যবসায়ের গভীর শিকড়ে গ্রথিত। আসল কথা হল সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী এবং তৎ সাধ্য নেপালের সবচেয়ে বড় ধনী, মোহন গোপাল খেতান সরাসরি ভারতের অন্যান্য মারওয়ারীদের মত ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারত পরিত্যগ করে নেপালে চলে আসে। যখন আমরা নেপালের অর্থনীতিতে সাহায্য করার জন্য তাদের উপর সর্বাধিক আস্থা স্থাপন করছি এবং নেপালের অশান্ত অর্থনীতিকে সময়ের প্রেক্ষিতে ব্যবসায়িক নির্দেশনা কথা বলছি, আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, নেপালে ব্যবসার ক্ষেত্রে মারওয়ারী এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রচুর প্রভাব আছে। কারণ অর্থনীতিকে প্রভাব করার ক্ষমতা তাদের আছে, ব্যবসায়ীদের এদলটি রাজনৈতিক শক্তি ধারণ করে, এবং ভারতের স্বর্থে তাঁরা ক্ষমতা সহজেই ব্যবহার করতে পারে।

ধর্মঃ একটি রাজনৈতিক কৌশল
(Religion: A Polical Strategy)

সারা পৃথিবীতে ৯০০ মিলিয়ন হিন্দু আছে এবং অধিকাংশ বাস করে ভারতে। নেপালই হল বিশ্বে একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র (২০০৬ সালের মে মাসে সংসদীয় সিদ্ধান্তে পরিবর্তন হয়েছে) এবং নেপালের রাজা একমাত্র হিন্দুরাজা ভারত ও নেপালের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা একত্র করে মীমাংসার চেষ্টা করছে। এ ধরনের একটি দেশে কয়েক বছর যাবত গণপ্রজাতন্ত্রী হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে, নেপালের রাজ পরিবার এবং যারা প্রতিষ্ঠানিক রাজতন্ত্রের সমর্থন করে তাঁরা সম্ভবত ২৩৭ বছরের পুরাতন রাজতন্ত্রকে রক্ষার জন্য ধর্মের বানী প্রয়োগ করতে চেষ্টা করছে। ভারতের গোড়া ধর্মীয় দল এবং হিন্দু রাজনৈতিক দল, যেমন বি,জে,পি দাবী করে যে নেপালের রাজা একমাত্র হিন্দু রাজা হিসেবে সত্যিকার ভাবে লর্ড বিষ্ণুর পুনরায় দেহ ধারণ করেছে, জনপ্রিয় পুরান শাস্ত্র তাই বলে। রাজার অনুগতদের সঙ্গে এ সমস্ত দলের মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোজন সৃষ্টি হয়েছে, তাঁরা হয়তো দেখবে যে, ভারতীয় ধর্মীয় বিরোধীদল গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আঘাত করবে। বি,জে,পির মতদল এবং অন্যান্য হিন্দু সংস্থাগুলো ধর্মীয় কারণে এখনও নেপালে রাজাকে ক্ষমতায় দেখতে চায়, সে করণে নেপালের রাজানুগত ব্যক্তিরা ভারতে বি,জে,পির মত দলকে ক্ষমতায় দেখতে চায়। উভয় অঞ্চলে এ ধরনের স্বার্থান্বেষী প্রয়োজনীয়তাকে উৎসাহিত করা হলে পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল সম্পর্ক গড়ে উঠবে, নেপালে রাজতন্ত্রের সমর্থকরা ভারতে ঐ সমস্ত দলের পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রস্তুত রয়েছে এবং বিপরীতেও আছে। যদিও গণমাধ্যম এ বিষয়ে এখনও কোন আলোচনা করে নি, ভবিষ্যৎ বাণী করা যায় না এমন অবস্থা বেছে নেয়ার অধিকারকে আমরা অসম্মান করি না, করতে পারি না।

www.pathagar.com

জনহিতকর প্রতারণা
(Humanitarian Blackmail)

নেপাল বিশ্বের তৃতীয় দেশ, বিদেশী সাহায্য ছাড়া টিকে থাকতে পারবে না। আমেরিকার সাহায্যই বিদেশী সাহায্যের সবচেয়ে বড় অংশ নেপালের রাজত্বকে টিকিয়ে রেখেছে, নেপালের জন্য ভারতের সাহায্যও গুরুত্বপূর্ণ। ভারত সরাসরি আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে নেপালে অন্যদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছে এবং সামরিক সাহায্যও করেছে। এ ধরনের সাহায্য নেপালের নিকট অপরিহার্য, ভারতের মত বৃহৎ শক্তির নিকট থেকে সাহায্য ব্যতীরেকে এক মাসের মধ্যে নেপালের পতন হয়ে যেত। সেই সঙ্গে জনহিতকর অনুভূতি দিয়ে ভারত নেপালের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করছে যা তাঁরা একটি সুবিধা জনক সময়ে ব্যবহার করবে। বর্তমান রাজার পিতা রাজা মাহেন্দ্র যখন ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে ক্ষমতা গ্রহণ করে ভারত সকল প্রকার আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেয়। ১৯৯০ সালে যখন গণতন্ত্রের আন্দোলন তুঙ্গে তখন অবরোধ বলবত করে এবং সাহায্য কমিয়ে দিয়ে বর্তমান রাজার ভাই রাজা বীরেন্দ্রকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে শক্তি প্রয়োগ করে। একই ভাবে ২০০৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রাজা জ্ঞানেন্দ্র ক্ষমতা গ্রহণ করলে ভারত সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে নেপালকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ ধরার জন্য বলে কারণ রাজতন্ত্র কোন প্রশ্নের উত্তর নয়। নেপালের জনগণের জন্য ভারতের গণতন্ত্রের ধারণা প্রশংসাযোগ্য। যা হোক নেপালের মত একটি দরিদ্র দেশকে ভারত অন্যভাবে প্রভাবিত করার দাবী করতে পারে, সেক্ষেত্রে সাহায্য প্রত্যাহারের হুমকি দিতে পারে। ভারত থেকে সাহায্য আসার অর্থ হল দুর্ভাগ্য; যে ধরনের সরকারই হোকনা কেন তাকে অগ্রাহ্য করা, কারণ নেপাল গরীব দেশ এবং তাই অপরিহার্য। নেপালে কি ধরনের সরকার হবে এ ব্যাপারে তার বলার কে? সেখানে কি রাজতন্ত্র থাকবে, গণতন্ত্রমনা কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হবে যাই হোক, গরীব গরীবই থেকে যাবে। এভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলো জনহিতকর সাহায্যের আকারে লুকিয়ে থাকেব, ভারত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজে লাগানোর জন্য নেপালের মত একটি কমনীয় দেশকে প্রতারণা করবে।

অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বঃ নেপাল তিনটি বড় ধরনের অপরিলক্ষিত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছে যেগুলি ভারতের ও নাগালের বাহিরে বরং এ সমস্যাগুলো সম্পর্কে নেপালেরই নিজের বলা উচিত তাঁর সার্বভৌমত্বও এ অঞ্চলের শক্তি রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য।

বিকেন্দ্রীকরণ
(Decentralize)

যদি এদশেটি দীর্ঘ মেয়াদি কোন সমৃদ্ধি অর্জন করতে চায়, তবে সম্পদের ভৌগোলিক বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য। নেপাল একটি সঠিক উদাহরণ, যখন একটি অবস্থানের উপর জোর দেয়া হয়, তবে ভুল হয়ে যাবে কি– কাঠমুন্ডুর ব্যাপারেই বলা যায়, অন্য অঞ্চলগুলো ভুলে গিয়েছিল। এটা সত্যই বিরক্তিকর যে শুধু কাঠমুন্ডুই ভিত্তিগত প্রয়োজনীয়তা আছে। সকল প্রকার মনোরম আবশ্যকীয় বস্তুর ব্যাপারে উন্নয়নশীল দেশের সকলেরই চাহিদা আছে। কাঠমুন্ডুর কোন একটি বিশেষ এলাকায়

www.pathagar.com

হেঁটে গেলে তাঁর চতুর্দিকে দেখা যাবে যে সুবিধাপ্রাপ্ত সেরা অংশের লোকেরা বিলাস বহুল গাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সজ্জিত দোকান থেকে জিনিস পত্র, সর্বাধুনিক টেপ রেকর্ডার যন্ত্র এবং চটকাদার আনুষাঙ্গিক উপকরণ ক্রয় করছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এটাই বাস্তবতা। ধনী এবং গরীবের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে। ভাগ্যবানেরা যখন এ সমস্ত সুবিধা ভোগ করছে, রাজধানী থেকে ৫০ মাইল দূরের বিবর্ণ বাস্তবতা দেখে মনে হবে নেপাল কি দেশ। সঠিক বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই, স্বাস্থ্যসেবা অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ভিত্তিগত প্রতিষ্ঠানের দাবী বহু দিনের। যাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে তাদের জন্য খুব কম চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে। এগুলোই হল মাওবাদীদের আন্দোলনের নির্ভুল শক্তি, গরীবদেরকে ভুলে গিয়ে নেপালের সেরা অংশ তাদেরকে পিছনে ফেলে রেখেছে। অযোগ্যতা এবং মনোযোগ না দেয়ার কারণে বিরাটভাবে নৈরাজ্যের কারনই মাওবাদীদের বিদ্রোহের ইন্ধন যুগিয়েছে।

সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের কারণে দেশে দুটি প্রধান সমস্যা বিরাজ করছে। প্রথমতঃ শিক্ষিত জনগণের সঙ্গে বিরাট গড়মিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে গ্রামের যুবকেরা শিক্ষার জন্য শহরমুখী হতে বাধ্য হচ্ছে। প্রয়োজনীয় কাজের সংস্থান নেই, কর্মমুখী যুবকের দল বাধ্য হয়ে যে কোন ধরনের কাজ করতে শহরমুখী হচ্ছে। এ ধরনের অসংখ্য লোক গ্রাম থেকে কাঠমুন্ডুর দিকে আসার ফলে দীর্ঘ মেয়াদী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন উন্নয়ন দেশে হচ্ছেনা। যারা আর্থিক এবং ব্যক্তিগত কারণে শহরে যেতে পারছেনা তারাই গ্রামে থেকে যাচ্ছে। এ অংশটি প্রজন্মের জন্য কোন প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারছেনা এবং বেঁচে থাকার জন্য পছন্দনীয় আর্থিক সংস্থান করতে ব্যর্থ হচ্ছে ফলে পরবর্তী প্রজন্মের অবস্থাও অনুরূপ হবে। এভাবেই যারা ভাগ্যবান নয়, গ্রামের বিবর্ণ দশা দুর করতে সমর্থ হচ্ছেনা তারাই অবর্ণনীয় দারিদ্রতার মধ্যে বাস করছে।

একটি দেশের সমৃদ্ধির জন্য সমগ্র দেশের সমান উন্নয়ন প্রয়োজন, কোন একক শহর নয়। এ বিষয় গুলি মনে রেখে, অনেক দিনের অপরিশোধিত কাজে দেশের অধিকতর ভালর জন্য সম্পদের বহুমুখিতা করে সমাধান করা নেপাল সরকারের জন্য কঠিন হবে।

উন্নততর জীবিকার সন্ধানে প্রযুক্তি বিদ্যা, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়ে সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের বিদেশ গমন এবং বৃহৎ বিভাজন (The brain drain and the great divide)

নেপালের যুবকেরা পাসপোর্ট নিয়ে সারিতে দাঁড়িয়েছে এবং নিরাপত্তা কর্মীরা ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পরীক্ষা করছে, স্বপ্নের দেশ আমেরিকা যাওয়ার আশায়, তাঁরা একটি বিচূর্ণীত ক্ষত বিক্ষত রাজনৈতিক হৈচৈপূর্ণ অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে দেশকে ফেলে রেখে যাচ্ছে। দেশ প্রেমের অনুভূতি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তারা প্রস্থান করছে এবং আচার অনুষ্ঠানে দক্ষতার চিহ্ন হিসেবে নেপালের পতাকা তাদের কলেজের থাকার ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখে যাচ্ছে। তারপরও তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নেপালে ফিরে এসে প্রিয় মাতৃভূমির দায়িত্ব গ্রহণ করবে, অগ্রাধিকার দিয়ে দূরে গিয়ে

www.pathagar.com

একবার অন্তত স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং বস্তুতান্ত্রিক জীবনে বিদেশের স্বাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হতে চায়। ভবিষ্যৎ জাতীর জন্য এটা বিপজ্জনক, এমনকি মাওবাদীদের বিদ্রোহ, রাজনৈতিক অশান্তি এবং অর্থনৈতিক সংকটে ভেঙ্গে পড়বে। দেশকপটাচারী দেশপ্রেমিকের দ্বারা উল্লেখযোগ্য উদাহরণের মত অন্য একটি বাধার সম্মুখীন হবে।

সন্তানদের বিদেশে লেখাপড়া করানোর একটি প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এই মুহূর্তে যা ঘটছে তা হল তরুণ বয়স্করা যারা ধনী, মেধাবী এবং ভাগ্যবান তাঁরা বিদেশে গিয়ে আর ফিরে আসছে না, ফলে আমি বলতে চাই এটা "বৃহৎ বিভাজন" বলা চলে। এমন একটি দেশ যেখানে শিক্ষিত সেরা অংশ সরকারকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে প্রস্তুত, কিন্তু কেউ এ কাজ করছে না। একটি জাতির ভিতর যে সকল নাগরিক বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন এবং সম্ভবত দেশের সমস্যার বিষয়ে অবহিত, কিন্তু কেউ পাঁচ অথবা ছয় হাজার টাকার মাসিক বেতনে কাজ করতে আগ্রহী নয়। এ সমস্ত দেশ প্রেমিকদের কি ঘটছে? কি ঘটছে "জয় নেপাল" এর সমস্ত আন্তরিকতাবিহীনদের? নিজেদের সন্তুষ্টির জন্য একটি দেশের বিলাপ করা নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার। নেপালিরা যারা বিদেশে যাচ্ছে তাঁরা একদিকের বিমানের টিকেট নিয়ে আসে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত সফরের জন্য। দুর্ভাগ্য বশতঃ এরাও একই ধরনের মানুষ যাদের গলার জোর বেশী, এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত নেপালের রাজনৈতিক বিরোধ।

এ ধরনের উন্নততর জীবিকার সন্ধানে সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের বিদেশ গমন নেপালের ক্ষতি সাধন করবে যা এখন আমাদের নিকট অকল্পনীয়। আমাদের ভবিষ্যৎ সরকারের এ ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে। এটা কোন ব্যাপার নয় যে, কতজন বিচক্ষণ ব্যবসায়ী, জ্ঞানী সাংবাদিক, "উত্তমরূপে ওয়াকিবাহল" এন,জি,ও কর্মী অথবা মানবাধিকার কাজেরকর্মী নেপালের থাকতে পারে। একটি দেশের সমৃদ্ধির জন্য আমাদের একটি শক্তিশালী সরকার প্রয়োজন। একটি শক্তিশালী সরকারের জন্য উত্তম মানুষের প্রয়োজন যারা সত্যিকার ভাবে সরকারের জন্য কাজ করবে। দেশের ভবিষ্যৎ আমলাতন্ত্রবাদী কে হবে? বিংশ শতাব্দীর শেষের অর্ধ শতাব্দি নেপাল থেকে বাহিত হয়ে গেছে যখন উত্তম এবং বিজ্ঞ লোকেরা সরকারি পদের জন্য আগ্রহান্বিত ছিল, সে সময় চলে গেছে। শিক্ষিত যোগ্য এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন লোকেরা খুব সাধারণ বেতনে সরকারি চাকরি করতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। তৎপরিবর্তে যারা কোথাও চাকরি পেতে অসমর্থন ছিল, অথবা যাদের যোগ্যতা কম ছিল, তাঁরাই এখন সরকার চালাচ্ছে, এতে সুবিধা প্রাপ্তদের কিছু এবং সরকারের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করছে এবং ভবিষ্যতে একটি বুদ্ধিমানদের সঙ্গে একটি গৃহযুদ্ধ হতে পারে।

আমি যখন এঘটনাটি প্রকাশ করেছি তখন আমি এর বিপরীত যুক্তি শুনতে পাই, স্বদেশভক্ত ভণ্ড পণ্ডিতগণ দাবী করেন যে নেপাল থেকে মেধার বন্যা বিদেশে বয়ে গেলেও নেপালের কোন ক্ষতি হবে না। কেউ কেউ দাবী করছেন যে, ভারত এবং চীন থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন বিদেশে গিয়ে কাজ করছে এবং লেখাপড়া করছে, তাদের দেশগুলো শুধু উন্নতিই করে নি বরং অধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যদিও এ ধরনের আশাবাদ করা অবাধ কল্পনাপ্রসূত, বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে বলা যায় যে, ঐ দু'টি শক্তিশালী দেশের সঙ্গে আমাদের কোন তুলনা হয়না, শুধুমাত্র সীমান্ত এলাকার অংশীদারিত্বের কথা বলতে পারি। অনুরূপভাবে আমরা নেপালের জনসংখ্যার সঙ্গে ভারত এবং চীনের জনসংখ্যার ও তুলনা হয় না। যদি মিলিয়ন মিলিয়ন ভারতীয় বিদেশে শিক্ষার জন্য, চাকুরীর জন্য যায়, মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ সফলভাবে শিক্ষিত এবং যোগ্য হয়ে দেশে ফিরে আসে। আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান সবচেয়ে ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য যে রকম প্রতিযোগিতা হয়, তার চেয়ে বেশী প্রতিযোগিতা হয় বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয় এবং আই,আই,টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির ব্যাপারে।

www.pathagar.com

এছাড়া দেশে থাকার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করা হয় যা নেপালে করা হয় না। ভারত এবং চীন ভৌগোলিকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ মেধা শক্তির ভাণ্ডারের সুবিধা ভোগ করে, অথচ নেপালে যারা শুধু কাঠমুন্ডু থেকে আসে এবং সামান্য কিছু লোক অন্যান্য শহর থেকে আসে তাঁরাই প্রকৃত শিক্ষার জন্য প্রচুর সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে এবং বিদেশে যেতে পারে। অতএব নেপালের প্রত্যেক তরুণ বয়স্ক ব্যক্তি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। নেপাল ক্রমে ক্রমে আরও কঠিন অবস্থায় পড়ছে।

অবশ্যই যারা দেশে ফিরে আসে তাদের প্রশংসা করা হয়। কিন্তু এ সংখ্যা অতি নগণ্য। এমনকি সামান্য বেতনে যে সমস্ত সাহসী তরুন বয়স্ক ব্যক্তি সরকারের কাজ করার জন্য তৈরি হয়ে আসে, তাঁরা পুরাতন ও কঠোর নিয়মানুবর্তী নেপালভিত্তিক "লোকসেবা" সরকারি পরীক্ষা যা অলক্ষনীয় দিতে হয়। অত্যধিক জনসংখ্যা দৃঢ়তার সাথে তৈরি করা হয় দেশপ্রেমিক হয়ে ফিরে আসার জন্য, কিন্তু প্রাথমিক পদক্ষেপই পিছিয়ে থাকে।

যদিও মেধা পাচারের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়ে নিয়ে আসার বিবর্ধনমূলক প্রক্রিয়া, বৈপ্লবিক কিছু নয়, আমরা এখন সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য দুটি প্রধান আবেদন বিবেচনা করতে পারি। আমি তরুণ বয়স্ক শিক্ষিত সেরা অংশকে সমালোচনা করেছি যা তাদের দেশের ক্ষেত্রে সত্য নয়, আমি সরকারের ভুলগুলোকে স্বীকার করি। প্রথমতঃ সেকেলে লোকসেবা পরীক্ষার সংস্কার করতে হবে এবং ইংরেজি মাধ্যমে যারা লেখাপড়া করেছে তাদের মতই যেন কাজ করতে পারে সেজন্য নিরুৎসাহিত হওয়ার কারণকে কমিয়ে আনতে হবে। এটাই হবে একটি কার্যকরি পদেক্ষপ যারা সত্যিকারভাবে সরকারি কাজ করতে ইচ্ছুক। দ্বিতীয়তঃ তাইওয়ানে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে সে পদ্ধতি আমাদের এখানেও অবলম্বন করতে পারি। প্রায় দু' দশক পূর্বে, তাইওয়ান, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও অল্প সংখ্যক তাইওয়ানীজ প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদেরকে রাজনৈতিকও অর্থ উপদেষ্টার পদে নিয়োগের অঙ্গীকার করে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তাঁরা এ মহৎ কাজটি তৃপ্তি সহকারে বাস্তবায়ন করেছিল, ফলে বাস্তব অবস্থা হল যে তাদের নীতি সফলভাবে সকলের নিকট তুলে ধরা হয়েছে এবং আজকে যে তাইওয়ান তা তাদেরই দৃষ্টি নিক্ষেপের ফলে সমৃদ্ধি এসেছে। নেপালের অতিশয় মেধাবীও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তরুণ বয়স্কদের থেকে অনেক দূরে রেখেছে কারণ এখন যেমন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে তাঁরা দেশে আসলে সেই রকম অবস্থা হবে।

সিঙ্গাপুরের পদ্ধতি ও অন্য একটি প্রথা যা নেপাল অনুসরণ করে দেশের বৃহৎ স্বার্থে তাদেরকে প্রলুব্ধ করে এনে কাজে লাগালে একই সাথে উচ্চ পর্যায়ে ক্ষমতার দুর্নীতি কমে যাবে। সিঙ্গাপুর দুর্নীতি উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল, সরকার অদ্বিতীয় একটি কৌশল অবলম্বন করে সরকারি কর্মচারিদেরকে বিশেষ করে উচ্চ পর্যায়ে অনেক বেতন দেয়ার নীতি বাস্তবায়ন করে। এ ব্যবস্থা শুধু মেধাবীদের সরকারি চাকরিতে আসার জন্য খুব বড় ধরনের উৎসাহিতই করা হত না এতে সরকারের মধ্যে দুর্নীতিকে নির্মূল করা হয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তনই হল একমাত্র চাবি, এতে শুধুমাত্র তরুণদেরকে প্রলোভিত করাই হবে না, দীর্ঘ মেয়াদী দেশের উন্নয়নের কাজ হবে।

সরকারের চেষ্টাকে অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত বিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সের যুবকদের হাতে বাছাই করার বিষয়টি চলে যাবে যা পার্থক্য সৃষ্টি করবে। পূর্ববর্তী প্রজন্ম নিজের স্বার্থ চরিতার্থের জন্য দেশের সম্পদ লুট করে যে অমর্যাদা করেছে, এই পরবর্তী প্রজন্ম এসে কিছু কঠোর শ্রম সাধ্য সংস্কারের কাজ করে দেশকে নূতনভাবে সাজাবে। এর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আর কোন সমস্যা হবেনা যদি তাঁরা নিজের দেশের প্রতি তাঁদের কর্তব্যকে ভুলে না যায়। আমরা গরীব হতে পারি, তবুও এ

www.pathagar.com

বিশ্বের একটি অংশের ধনীদের অসংখ্য সম্পদের, প্রাকৃতিক এবং বিজ্ঞ জনগণের আশীর্বাদ আছে। দেশ যদি নিজের পায়ে দাড়াতে চায় তবে এ উভয়বিদ সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করা উচিত হবে। তরুণরা যদি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে তবে দেশকে দীর্ঘ মেয়াদী সমৃদ্ধি পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। অধিকাংশ তরুণবয়স্করা দেশে ফিরে আশার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দেশের বাহিরে গিয়েছে, দেশে এখন ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে, এর মধ্যে অনেকেই তাঁদের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেছে।

আমলাতন্ত্র এবং বিভক্ত রাজনীতি
(Separation of Bureaucracy and Politics)

পৃথিবীর কিছু দেশ আমলাতন্ত্র রাজনীতির সঙ্গে একত্রে বিজোড়িত। দেশের রাজনীতির পরিবর্তন হলে আমলাদের নিয়োগের নির্দেশ আসে, কোন কোন আমলা পদোন্নতি পায়, আবার কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে লাভবান হন। ১৯৯০ সালের পূর্বে স্বৈরতান্ত্রিক পাঞ্চায়েত (রাজকীয়) সরকার, আমলারা যারা গণতন্ত্র দাবী করেছে আমরা যারা রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিলাম, সেই সব আমলাদেরকে সরকার থেকে বিতাড়নের বিষয় ছিল, পদ মর্যাদা লাঘব করা অথবা কখনও পদোন্নতি দেয়া হয় নি। নেপালের জনগণ আশা করেছিল ১৯৯০ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে পরিবর্তন আসবে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়েছে। আত্মীয়পোষণ এবং প্রিয় ব্যক্তিদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পায় যা পূর্বে দেখা যায় নি এবং গণতন্ত্র সাধারণ মানুষের জন্য আসে নি, এসেছিল রাজনীতিবিদ এবং তাঁদের পরিবারসমূহের জন্য।

বিপরীত দিকে আমি সব সময় যে উদাহরণের কথা বলি সেটা হল ভারত। ভারতে রাজনীতিবিদরা অবিশ্বাসী হতে পারে এবং কিছু বিশ্বের মধ্যে অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত যা তর্ক সাপেক্ষ। তবুও ভারত আমলাতন্ত্রণকে রাজনীতি থেকে পৃথক করে রেখেছে, তাতে সম্পূর্ণ সফল না হলেও ভারত দেখাতে পেরেছে যে, একটি দেশ সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে যদি আমলারা নিজেরা চলতে পারে এবং নিজেরাই গড়ে উঠে। এধরনের করতে গিয়ে ভারত কৌশলে শত কোটি লোক নিয়ে দেশ চালাতে পারছে, প্রতি দিনের রাজনৈতিক পরিবর্তনকে কোনভাবে প্রভাবিত করা হয় নি।

নেপাল সব সময় পিছনে পড়ে থাকে, কারণ রাজনৈতিক পরিবর্তন আমলাতন্ত্রের উপর সুরক্ষিত আশ্রয়। নেপালের মত দেশে প্রতি ছয় মাস অন্তর প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন হয়। আমরা তাহলে কি পাব, যদি আমরা আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করি যা প্রত্যেক সময়েই সরকার পরিবর্তন করে। আমরা ইতোমধ্যে সামরিক বাহিনীকে রাজার হাত থেকে পৃথক করেছি, পরবর্তী পদেক্ষপ হল রাজনীতি থেকে আমলাতন্ত্রকে পৃথক করা যা যুক্তিসঙ্গত।

www.pathagar.com

এক ধাপ এগিয়ে
(A step forward)

নেপাল এখন ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে। দেশ সম্পূর্ণভাবে রাজার হাত থেকে রাজনৈতিক নেতাদের কর্তৃত্বেও মাওবাদীদের নিয়ন্ত্রণে। আমাদেরকে আশাবাদি হতে হয়েছে যে অবস্থা ভাল হবে, তারপরও সব সময় বিপদ লেগেই থাকে, তাই অবস্থা আরও খারাপের দিকে মোড় নিতে পারে। নেতারা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বাহিরের জনস্রোতকে খুশী করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, নেপালি সমাজের দুঃখের সমাধান করার দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিশ্রুতি ছাড়া এদেশ সকল সময়ের জন্য দুর্বল থাকবে। জাতিকে নূতনভাবে গড়ে তোলার জন্য আমাদেরকে চিন্তা করে অগ্রসর হতে হবে, যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বর্তমান প্রজন্মের পরিকল্পনাবিহীন কাজের জন্য সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়। এ ধরনের একটি ভঙ্গুর রাষ্ট্র হওয়ার প্রেক্ষিতে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী প্রতিবেশী যেমন ভারতকে অনুভূতিতে আঘাত করতে হবে। বিশ্বের এই বৃহৎ নূতন শক্তির সঙ্গে আমাদের কাজ করতে হবে এবং সাহায্যের যে হাত বাড়িয়ে দেবে তা গ্রহণ করতে হবে। আমরা সাবধানতা অবলম্বন করব এবং জাতীয় স্বার্থে কাজ করে যাব। আমাদের মনে রাখা উচিত যে একটি শক্তিশালী নেপাল শুধু আমাদের স্বার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা দিবে না, অনাগত প্রজন্মকে সমৃদ্ধি দিবে, কিন্তু একটি শক্তিশালী নেপাল চূড়ান্তভাবে সমগ্র উপ-মহাদেশে দক্ষিণ এশিয়ার শক্তি হিসেবে দাঁড়াবে।

www.pathagar.com

মাওবাদী বিদ্রোহ

নেপালে বিরোধের আগুন জ্বালাতে ভারতের কৌশল

Maoist insurgency India's Incendiary Device in Nepal)

– মদন প্রসাদ খানাল

ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক নির্ধারণকে নতুন দিল্লীর নীতি নির্ধারকেরা প্রত্যাখ্যান করেছে, তথাপি এটা অলিখিত যে তাঁরা ক্ষুদ্র ভূ-বেষ্টিত উত্তরের প্রতিবেশী দেশক স্বাধীন ও সার্বভৌম হিসেবে বিবেচনা করেছে। বিগত ছয় দশক যাবত এ মনস্তাত্ত্বিক দিকটি বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে। যেমন সরাসরি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, অর্থনীতির টুটি চেপে ধরে চলাচল রোধ, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়ে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সরাসরি গণমাধ্যমের উপর হস্তক্ষেপ এবং অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে সাংস্কৃতিক চেহারা জাহির করা। কিছু সংখ্যক জেষ্ঠ্য ভারতীয় নেতা এখনও দুঃখ প্রকাশ করে বলে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জাওহারলাল নেহেরু নেপালকে ভারতীয় ইউনিয়নভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

নেপালকে ভারতের আলিঙ্গন করার অর্থ হল শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা। ভারতের পরিক্রমণ পথ ক্ষতিকারক প্রবণতাকে এড়িয়ে চলা একান্ত প্রয়োজন, কারণ, রাজনৈতিক শ্রেণী সকল সময় নেপালিদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ভারত অস্থিরতা সৃষ্টির অসম পথের প্রতি সাড়া দিয়ে গণতন্ত্রের উত্তরণের ভান করেছে। বর্তমান সময়ে প্রধান শক্তি কেন্দ্রগুলোর একটিকে অন্যটির বিরুদ্ধে ঝামেলায় ফেলে দিয়ে নতুন দিল্লী রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ গ্রহণ করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও রাজ্যে নিরাপত্তার স্বার্থে কাজ করছে। ১৯৯০ এবং ২০০২ সালের মধ্যে নেপালের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার উৎকর্ষতার সময়ে রাজনৈতিক পরিপক্কতার অভাবে নয়, গড়পড়তা প্রত্যেক বছর একজন প্রধানমন্ত্রীর বদল হত।

দেশের মধ্যে তাদের প্রচণ্ড বিদ্বেষ থাকা অবস্থায় নেপালি কংগ্রেস (এন.সি) এবং নেপালের কমিউনিস্ট দল-ইউনিফাইড মার্কসিষ্ট লেলিনিস্ট (সি.পি.এন-ইউ.এম.এন) গণতান্ত্রিক ধারার দু'প্রধান দল ভারতের উদ্দেশ্য সাধনের আবরণ এর কাজ করবে। মধ্য ১৯৯০ এর নতুন দিল্লীতে নীতি নির্ধারকদের নিকট এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে নেপালের বহুদলীয় প্রথা জনগণের প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যাবে না। ভারত তাঁর কর্মসূচি চিরস্থায়ী করার জন্য অন্য উপায় খুঁজছে, এর জন্য বেশীদিন অপেক্ষা করা যায় না। মাওবাদী বিদ্রোহীরা নেপালের সাংবিধানিক রাজতন্ত্রকে পরিবর্তন করে কমিউনিস্ট সমর্থক বহুদলীয় সংসদীয় প্রথা চালু করার জন্য ১৯৯৬ সালে জনযুদ্ধ আরম্ভ করে।

গভীরে প্রথিত নেপালের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সমাজে অসমতা সেই সঙ্গে কাঠমুন্ডুর অকর্মন্য সরকার ও উত্তরাধিকার সূত্রে দুর্নীতি একসঙ্গে মাওবাদীদের দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। রাষ্ট্রের বর্বর নিরাপত্তা ভেঙ্গে পড়লে বিদ্রোহীদের প্রতি জনপ্রিয়তা উৎসাহিত করে। মাওবাদীদের বার্তা (গরীব এবং অনগ্রসরদের ক্ষমতায় আরোহন) এবং নীতি ব্যাপক এবং তারতম্যহীন হিংস্রতা সাধারণ মানুষ এবং উন্নয়নও

www.pathagar.com

অগ্রগতির বিরুদ্ধে যারা নেপালকে স্থায়ীভাবে দুর্বল এবং ক্রীতদাস তুল্য দেখতে চেয়েছে তাদের জন্য এ কর্মসূচি সঠিক ও সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

একটি ধ্বংসের নোংরা রূপকাহিনী
(A Sordid Saga of Subversion)

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার বছর থেকেই এধরনের ধ্বংসের নোংরা রূপকাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকবাদীরা এখান থেকে চলে যাওয়ার পর নেপালের ছাত্ররা যারা অধিকাংশই কোলকাতা বারানসীতে কেন্দ্র করে ছিল তাঁরা স্বেচ্ছাচারি উত্তরাধিকারী রানা প্রধানমন্ত্রীদের শাসনকে উলটিয়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল, তাঁরা শতাব্দীকালের ও পূর্বে রাজাদের ক্ষমতা দখল করেছিল। ১৯৫১ সালে সংকটের চরম পরিণতিতে চলে গেলে নেহেরু দালালি করে চুক্তি করে, যার ফলে রাজতন্ত্র পুনরায় রাজনৈতিক ক্ষমতা ফিরে পায়। একটি উদ্ভট স্থির করা ব্যবস্থায় রানারা এবং নেপালি কংগ্রেস, বিপ্লবীরা, এখনও যাদের সঙ্গে মিটমাট অসম্ভব এমন শত্রুগণ, কর্তৃক বিভিন্ন দল দ্বারা গঠিত সরকার গঠন করে। অদ্ভূত মিত্রতা এবং দুর্বৃত্তিপূর্ণ প্ররোচনা সৃজনকারীদেরকে সহজেই প্রতীয়মান করা যায়। যখন কিছু দেশপ্রেমিক নেপালী দিল্লী সমঝোতার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়, তাদেরকে বর্বরভাবে দমন করা হয়েছে, কোন কোন সময় সরাসরি ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। পরবর্তী নয় বছর পর্যন্ত দেখা গিয়েছে যে ভারতীয় উপদেষ্টারাই সত্যিকার শক্তির উৎস ছিল, কারণ রাজনীতির খেলোয়ারদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বি শত্রুদের সঙ্গে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। ভারতীয় কুটনীতিকরা মন্ত্রী সভায় বসে ছিল এবং অন্যান্য সমস্যামূলক সরকারি সভাতে উপস্থিত হত। নেপালের রাজনীতিকরা দিল্লীর প্রতি বাধ্যগত হয়ে তাদের অত্যন্ত ছোটখাট অভ্যন্তরীণ বিতর্কীত বিষয়ও সমাধান করত।

১৯৫৯ সালে নেপালে প্রথম নির্বাচিত সরকার গঠিত হয়, প্রধানমন্ত্রী বি.পি. কৈরালা তাঁর স্বোপর্জিত ভারত সমর্থকদেরকে দূরে সরিয়ে দেন। এতে নূতন দিল্লী নেপালের স্বাধীনতায় ক্ষুব্দ হয় কারণ প্রধানমন্ত্রী নেপালের বিদেশী নীতির ব্যাপারে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, বিশেষ করে চীন এবং পশ্চিমাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছিলেন। কৈরালার কংগ্রেস দলের কিছু লোক নিজেদের অনেক কিছু ভাবছিলেন, কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিক শ্রেণী তাঁদেরকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। যদিও রাজা মহেন্দ্র সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা চালাচ্ছিল, কিন্তু ১৯৬০ সালে কৈরালা সরকারকে পদচ্যুত করায় তাঁকে দোষারোপ করা হয় এবং পরবর্তীতে সংসদীয় গণতন্ত্রকে বর্জন করে, পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী নিজেই পরে অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের কথা লিখেছিলেন।

রাজা মহেন্দ্র অপরিহার্যভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করায় প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারত সংকটপূর্ণ কঠোরভাবে মরণ কামড় দেয়। এ ব্যাপারে প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে রাজা নেপালের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সখ্যতা লাভের জন্য প্রার্থিতা হয়। পশ্চিমাদের মাধ্যমে যখন রাজা মহেন্দ্র এবং কৈরালার মধ্যে পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টাকে উৎসাহিত করা হচ্ছিল, তা বাধা দেয়া হচ্ছিল, বন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে দোষারোপ করেছিল নেপালের দক্ষিণের প্রতিবেশীর ষড়যন্ত্রকে। রাজা মহেন্দ্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনকে রাজ্যের উত্তরের প্রতিবেশীর সঙ্গে যখন শক্তিশালী করার জন্য

www.pathagar.com

চেষ্টা করছিল। তখন এ বন্ধনকে অর্থহীন বলে সমালোচনা করে চীনের তাস খেলার অস্ত্র বলা হয়েছিল। ভারত সহজেই তার নিজের গণতন্ত্রের তাস খেলা অব্যক্ত রেখে রাজকীয় শাসনের মুখোমুখি হয়েছে। যখনই রাজা রাষ্ট্রনীতির পন্থা অনুসরণ করতে চেয়েছে ভারত সবসময় তার স্বার্থের বিরুদ্ধে বলে বিবেচনা করেছে। নতুন দিল্লী সশস্ত্রবাহিনী প্রেরণ করে রাজার শাসনের বিরুদ্ধে নেপালি কংগ্রেসের লোকদেরকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। এ সমস্ত নির্বাসন তাঁদের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত নৈরাশ্যের কারণ হয়েছিল। এর দ্বারা ভারত সরকার জোর করে তাদের কার্যসূচি বন্ধ করে দেয়- এটা একটি পরিষ্কার ইঙ্গিত তাদেরকে দেয়া হয় এবং কাঠমুন্ডুর সঙ্গে নতুন দিল্লীর দর কাষাকষি হচ্ছে বলে প্রকাশ করে।

১৯৭৪ সালে হিমালয় রাজ্য সিকিমকে ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার পর মহেন্দ্রের ছেলে এবং উত্তরাধিকারী রাজা বীরেন্দ্র নেপালের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পথ খুঁজে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাজ্যকে একটি শান্তির অঞ্চল বলে ঘোষণা করে (জেড.ও.পি)। নতুন দিল্লী কিভাবে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিবেশী বৌদ্ধ রাজ্যের সার্বভৌমত্বের অস্থিত্ব শেষ করার জন্য রাজনৈতিক ঘটনা ঘটায় নেপালি জনগণ তা প্রত্যক্ষ করতে থাকে। ১৮৩৫ সালে সিকিম একটি ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ভারতকে উত্তরাধিকার সূত্রে স্বাধীনতা প্রাপ্ত পদমর্যাদা দেয়া হয়েছিল। যাহোক, পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ এবং ভারতীয় শাসকদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল না, তাঁরা নেপালি অভিবাসীদেরকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করে এবং চোগিয়াল রাজতন্ত্রকে উৎখাতের চেষ্টা করে। ১৯৭৪ সালে ভারতের সৈন্যবাহিনী রাজপ্রাসাদ অবরোধ করে এবং চোগিয়ালকে অতন্দ্র তত্ত্বধানে রাখে। সংসদ সর্ব সম্মতিক্রমে রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘোষণা করে এবং সিকিমকে ভারতের সাংবিধানিক একটি একক অংশ হিসেবে ঘোষনা করে। ভারতের সৈন্য বাহিনীর তত্ত্বধানে একটি গণভোট গ্রহণ করা হয়। সংসদের প্রস্তাবকে সমর্থন করা হয়। নতুন দিল্লীর সংসদ সিকিমবাসীদের 'অনুরোধ' কে গ্রহণ করে এবং সিকিমকে অন্তর্ভুক্ত করে ভারতে ২২তম রাজ্যে পরিণত করা হয়।

রাজা বীরেন্দ্রের শান্তি এলাকা ঘোষণার প্রস্তাব ১১৬টি দেশের সমর্থন পায়। নতুন দিল্লী এ কর্ম পরিকল্পনাকে ভারতের নিরাপত্তার প্রভাবকে ভেঙ্গে ফেলা হিসেবে বিবেচনা করে। ১৯৯০ সালের প্রথমদিকে যখন নেপাল গণতন্ত্রকামীদের প্রতিবাদে মুষ্টিগত হয়েছিল, ভারত তখন ৮০পৃষ্ঠার চুক্তির খসড়া রাজার নিকট উপস্থাপন করেছিল এবং তাতে নেপালের স্বাধীনতাও সার্বভৌমত্বের উপর কঠিন সীমাবদ্ধতা আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছিল। রাজা তা প্রত্যাখ্যান করে। বহুদলীয় গণতন্ত্র রক্ষার নামে প্রথম বলা হয়েছিল শান্তি এলাকা ঘোষণার প্রস্তাব। এমনকি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন সর্ম্পকে যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা দেয়ার পূর্বেই, নূতন গণতান্ত্রিক নেতারা ভারতকে খুশি করার জন্য হটকারিতার সঙ্গে সম্মুখে এগিয়ে যায় এবং প্রস্তাব বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অন্তবর্তী সরকার বাকরুদ্ধ হয়ে যায় যখন নূতন দিল্লী ৮০ পৃষ্ঠার খসড়ার সারমর্ম যথাশীঘ্র উপস্থাপন করে যা রাজা কর্তৃক কয়েক সপ্তাহ পূর্বে প্রত্যাখান করা হয়েছিল।

নেপালে প্রগতিশীল গণতন্ত্র তাঁর নিজের তৈরি বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের দুর্নাম সত্ত্বেও আদর্শ নেপালে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নেপাল কংগ্রেসে দলাদলির যুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ কৈরালাকে সংসদ স্থগিত করতে বাধ্য করে এবং ১৯৯৪ সালে নূতন

www.pathagar.com

নির্বাচন করার আহবান জানায়। ইউ.এম.আই ঝুলন্ত সংসদে বৃহৎ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং একটি সংখ্যালঘু সরকার গঠন করে। অনেক নেপালি কমিউনিস্ট নেতারা তাদের কংগ্রেস সহকর্মীদের মত লেখাপড়া করেছে এবং ভারতে নির্বাসনের বাস করেছে। কিছু কিছু লোক নূতন প্রধানমন্ত্রী মনোমোহন অধিকারিকে পছন্দ করত, তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগহণ করেছিলেন। এ সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও নতুন দিল্লী চিন্তিতি ছিল, কারণ সম্মুখ কাতারের কমিউনিস্ট শাসিত পশ্চিম বাংলার সঙ্গে ইউ.এম.এল. এর সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কংগ্রেস দল নতুন দিল্লীর শিরস্ত্রান, কিন্তু তবুও ভয় পাচ্ছে যে ইউ.এম.এল পরিচালিত নেপাল কমিউনিজমকে গরীব এবং অনুন্নত সীমান্ত এলাকার রাজ্য উত্তর প্রদেশ এবং বিহার রাজ্যে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে। নেপালের ব্যাপারে ভারতের নীতির পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।

বিদ্রোহহয় বিদ্ধেষবশতঃ অন্যের ঘরে আগুন দেয়ার অস্ত্র (Insurgency as an Incendiary Instrument)

সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। মাওবাদীদের কঠিন আদর্শ ইউ.এম.এল দলের স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দকে আকৃষ্ট করে, তাদের নিজেদের দলের বিপ্লবিদের সঙ্গে একত্র করে উৎসাহিত ও মোহমুক্ত করে। ইউ.এম.এল এর ক্ষতি হলে দলের লোকদেরকে নির্বাসনে দিয়ে নেপালের রাজনীতিতে একটি সীমায় আসতে হবে। এতে ভারত সমর্থক নেপালিরা লাভবান হবে। দলের অভ্যন্তরেই কর্তৃত্বের যুদ্ধ, সরকারের উত্থান ও পতন বারংবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। নেপালি কংগ্রেস ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে অধিক ভোট পেয়ে জয়লাভ করে, আশা করা হয়েছিল শূন্য থেকে স্থিরতার দিকে যাবে। কিন্তু তাঁরা বেশীদিন থাকতে পারেনি। কারণ ক্ষমতাধারী দলকে হৈচৈ পূর্ণ কলহে লিপ্ত করে কলঙ্কিত করা হয়, বিরোধীদল সংসদের ভিতরে মূল কাঠামো বেশী পরিবর্তন করে ফেলে এবং বাহিরেও তাই করে। মাওবাদীদের হিংস্র তীব্রতার মধ্যে নেপালীদের মুখোমুখী সংঘর্ষ ২০০১ সালের ১লা জুন রাত্রে অকল্পনীয় এক বিয়োগান্ত ঘটনার অবতারণা হয়। যুবরাজ দিপেন্দ্র রাজপ্রাসাদের এক অনুষ্ঠানে গুলি বর্ষণ করে রাজা বীরেন্দ্র, রাণী ঐশ্বরিয়া সহ রাজ পরিবারের আরও নয় সদস্যকে হত্যা করে। এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে মাদক এবং নেশাগ্রস্ত দিপেন্দ্র তার দীর্ঘ দিনের প্রেমিকাকে বিয়ে করতে চাইলে রাজা তা প্রত্যাখান করায় পরিবারের সবাইকে হত্যা করে, বন্দুকের নল নিজের দিকে ঘুরানোর আগেই সেক্ষেত্র কাজ করে। মাওবাদী ডঃ বাবুরাম ভট্টরাই ভারতকে দোষারোপ করেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র সহযোগিতা করা হয়েছে, নেপালকে সিকিমের পরিণতির মত করার জন্য পরিকল্পনা করে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে যা নীতির একটি অংশ। এ জটিলতার মধ্যে মাও বিদ্রোহীরা মরাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

তাদের আদর্শের উৎসের কথা বিবেচনা করে পশ্চিমারা সাধারণভাবে ভুলধারণার বশবর্তী হয়েছে, যে কেহ আজকের দিনে অটলভাবে চালিয়ে যেতে পারে যে মাওবাদীরা চীন থেকে সহযোগিতা পাচ্ছে। ভারত এ প্রতারণামূলক অবস্থা থেকে সবচেয়ে বেশী লাভবান হচ্ছে। এটা সহজেই বলা যায় যে, মাওবাদী বিদ্রোহীরা

www.pathagar.com

সবসময়েই ভারতের মাটিকে পবিত্র স্থান হিসেবে পেয়ে থাকে এবং সাধারণ নেপালিদেরকে হতবুদ্ধি করে তুলছে। কাঠমুণ্ডু মাওবাদীদেরকে সন্ত্রাসী ঘোষণার পূর্বেই ভারত তাদেরকে সন্ত্রাসী ঘোষণা দিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাচ্ছে। ভারতীয় কর্মকর্তারা মাঝে মাঝে নিম্নপদস্থ কর্মভারপ্রাপ্ত মাওবাদীদেরকে গ্রেফতার করে বহিষ্কার করে নেপালে পাঠিয়ে দিচ্ছে। উচ্চপদস্থ বিদ্রোহী নেতাদের, যেমন মোহন বৈদ্য এবং চন্দ্র প্রকাশ গাজুরেল যারা নতুন দিল্লীর প্রভাবে সংগঠনের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেছে তাঁরা ভারতের তত্ত্বাবধানে থেকে যায়। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা মাওবাদীদের সঙ্গে আই.এস.আই এর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে বলে গণমাধ্যমে প্রচারের চেষ্টা করেছে। মাওবাদী দলের চেয়ারম্যান পুষ্প কমল দহল (প্রচন্দ), প্রধান ভাববাদী ডঃ ভট্টরাই, এবং মুখপত্র কৃষ্ণ বাহাদুর মাহরা ভারতের গোপন অবস্থান থেকে নিয়মিত ভাবে পশ্চিমা গণমাধ্যম সংগঠনে সাক্ষাৎকার দিয়ে থাকে।

শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর ২০০১ সালের শেষে নেপাল সরকার মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায়, বিদ্রোহীরা এতে সুর নামিয়ে ফেলে, পরিণামে ভারতের সমালোচনা থেকে বিরত থাকে। ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে তফশীল অনুযায়ী নির্বাচন করতে ব্যর্থ হওয়ার প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেওবার নির্বাচিত সরকারকে পদচ্যুত করার তিন মাস পর মাওবাদীরা রাজার নিয়োগকৃত সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনার যোগদান করে। এ সমস্ত আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পরের বৎসর মুক্ত কুকুরের মত মারাত্মক সর্পিল গতিতে হিংস্রতা চালায়। ভারত গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়াবহ মনে করে বিদ্রোহ চালিয়ে যেতে সহযোগিতা করে। উচ্চ পদস্থ নেতারা রাজতন্ত্রকে কার্যাদির জন্য মনোনীত করবে, না ভারতকে তাঁদের প্রধান প্রতিপক্ষ ভাববে তা নিয়ে ভিন্নমত হয়ে যায়। ২০০৪ সালের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ভারতকে প্রাথমিক শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে, যা মাওবাদীরা বিশ্বাস করেছে যে সামরিক হস্তক্ষেপ অথবা ধ্বংসাত্মক কাজের ভয় দেখিয়ে রাজার সঙ্গে তাঁদের আলোচনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। ডঃ ভট্টরাই নতুন দিল্লীর জওহারলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন, তিনি ভারতের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের প্রস্তাব করেন। মধ্য ২০০৫ রাজা জ্ঞানেন্দ্র সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণের কয়েকমাস পর প্রচন্দ এবং ডঃ ভট্টরাই এর মধ্যে এবং যারা ভারতে ছিলেন তাদের সহ মতদ্বৈততা হলে তাঁরা সাধারণ নাগরিকে পরিণত হন। প্রচন্দ ডঃ ভট্টরাইকে তাঁর শীর্ষপদ থেকে বিচ্যুত করে, দলকে বিভক্ত করে ফেলে।

আর.এন.এ কর্তৃক একটি শব্দযন্ত্র ছাড়া হয়, প্রচন্দ শুনছিলেন যে ভারত সরকার দাবী করেছে যে তাঁকে আলোচনার আমন্ত্রণ জানান হয়েছে, প্রচন্দ বলেছে যে, ভারত বৈদ্যও গাজুরেলকে মুক্তি দিতে রাজি হয়েছে তবে বিনিময়ে ডঃ ভট্টরাই এর উপর থেকে দলের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে। ভারত সরকার তা অসত্য বলে জোরালো ঘোষণা করে। প্রচন্দ যখন আর.এন. এ'র কে পুরাতন শব্দ যন্ত্র চালানোর জন্য সমালোচনা করছিল, তখন বিষয় বস্তু নিয়ে কোন বিতর্ক উঠে নি। তারপর ডঃ ভট্টরাই ভারতের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে সেভেন পার্টি এলায়েন্স (এস.পি.এ) এর সঙ্গে একটি সার্বজনীন দল গঠন করে রাজা জ্ঞানেন্দ্র এর শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমশ অগ্রসর হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে বলে। প্রচন্দ রহস্যপূর্ণভাবে

www.pathagar.com

ডঃ ভট্টরাই এর উপর থেকে দলগত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিয়ে তাঁকে অধিকারিকভাবে কার্যাদির জন্য মনোনীত করে নতুন দিল্লীতে আলোচনা চালানোর জন্য বলা হয়। ভারতে গণমাধ্যমের একটি অংশ প্রচার করে যে ডঃ ভট্টরাইকে ভারতে গোয়েন্দা সংস্থা সহচররূপে থাকার কথা বলছে।

মাওবাদীদের সঙ্গে সাময়িকভাবে মিটমাট করার জন্য নতুন দিল্লীর উপযুক্ত সময় আসে। রাজা জ্ঞানেন্দ্র চীনের সঙ্গে শাক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলার পর একটি ফলপ্রসু চেষ্টা হয় তাহল দক্ষিণ এশিয়ান এসোসিয়েশর আঞ্চলিক সম্মেলনে পরিদর্শক হিসেবে অর্ন্তভুক্তি, শর্ত থাকে যে আফগানিস্তানকে পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা দেয়া হবে। নতুন দিল্লী, ২০০১ সালে তালেবান সরকারের পতনের পর কাবুলকে অধিষ্টিত করনের জন্য প্রচারাভিযান চালায়, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান সহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল, নেপাল সমর্থন দিয়ে উৎসাহিত করে। রাজা প্রথম সারির দলগুলোকে ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে, কৌশলে দিল্লীর প্রভাব হ্রাস করা হয়। রাজার বিরুদ্ধের একজন বড় মিত্রকে প্রয়োজন ছিল। অতএব, এস.পি.এ এবং মাওবাদী সমযোতার জন্ম হয় নূতন দিল্লীতে। এটা কোন সমকালীন ঘটনা ছিলনা, রাজা এবং সৈন্য বাহিনী নেপালের স্বার্বভৌমত্বের ও স্বাধীনতার শেষ বাহিনী, ভারত এস.পি.এ এবং মাওবাদীদের সার্বজনীন লক্ষ্য ছিল এটাই।

ক্ষোভের পথ সম্মুখে
Bumpy Road Ahead

২০০৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে ভারত নেপালের গণতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য বন্ধুত্বের ভান করে উচ্চ পর্যায়ের সহযোগিতা পুনরায় লাভ করে। গণতন্ত্রকামীদের ব্যাপক প্রতিবাদের ফলে এস.পি.এ পুনরায় ক্ষমতা লাভ করে। রাজার ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত অধিকার ও সুবিধা কঠোরভাবে ছিনিয়ে নেয়া হয়। এস.পি.এ এবং মাওবাদীরা একটি সাংবিধানিক সংসদ গঠনের জন্য আলোচনা করে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাজার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যাহোক নতুন দিল্লী হয় তো সম্মুখে অগ্রসর হওয়া পথ সহজে খুঁজে পাবে না।

মাওবাদী বিদ্রোহীরা ভারতে তাদের অনুরূপ দল নক্সালিষ্ট নামে পরিচিত, সঙ্গে শক্তিশালী বন্ধন স্থাপন করে। একসময়ের ভিষণ শত্রু দি পিপলস ওয়ার গ্রুপে এবং মাওবাদী সমন্বয় কেন্দ্রকে এক সঙ্গে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে (মাওবাদী) পরিণত করার আংশিক কর্তৃত্ব নেপালের বিদ্রোহীদের প্রাপ্য। যদিও প্রচন্দ তাঁর দলকে নক্সালিষ্টদের থেকে পৃথক রাখার চেষ্টা করছিল, পরবর্তীরা দাবী করছিল যে তাঁরা নেপালি মিত্রদের নিকট থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ভারতের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে ১৩টি রাজ্যে মাওবাদীদের পূর্ণ সদস্যের পদপ্রাপ্ত বিদ্রোহীরা আছে কিছু নেপাল সামান্তে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ বলেছেন ভারতের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা এবং গণতন্ত্রের চর্চার জন্য একমাত্র নক্সালিষ্টদের হিংস্রতা বৃহৎ হুমকি স্বরূপ। ভারতের সৈন্য বাহিনী এবং অভ্যন্তরীন নিরাপত্তার অশংবিশেষ অনেকদিন থেকেই বিশ্বাস করে আসছে যে মাওবাদীদের নেপাল দখল নক্সালিষ্টদেরকে ভারতীয় রাজ্যে তাদের যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে পারে এবং উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

পূরণের জন্য সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় বৈপ্লবিক অঞ্চল গড়ে তুলতে পারে।

নেপালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য প্রধানধারা মাওবাদীরা আশা প্রকাশ করছে। তারপর কিছু মাওবাদী নিয়মিত সদস্য পরিপূর্ণ প্রজাতন্ত্রী হলে তাঁরা তৃপ্ত। এমন কি ভারত যদি রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি চায় সেটা যদি হিংসাত্মক প্রতিবাদ করে অথবা সংসদের রায় দিয়ে হয় কিছু কিছু প্রস্তাব করেছে বিদ্রোহীরা প্রধানধারার সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে চালিয়ে যেতে চায়। অল্প সংখ্যক মাওবাদী ভুলে গেছে যে প্রধানধারার দলগুলো রাজার সঙ্গে একত্র হয়ে মুক্ত কুকুরের মত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে রাজ্যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবে। রিভ্যুলিউশনারী ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট (আর.আই.এম) এর প্রভাব এর বিষয়টি সঠিক নয়, বিশ্বব্যাপিয়া মাওবাদীদের মিত্র আছে, নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যে নেপালের বিদ্রোহীরা আছে। আর.আই.এম এর জন্য, নেপাল হল শিখর, কমিউনিজমের পতনের কারণ হল ইউ.এস পরিচালিত অর্থপূর্ণ কাহিনী। মাওবাদী দলের বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রদল যে কোন নেপালি শান্তি প্রক্রিয়াকে বিক্রয় অথবা নষ্ট করে দিতে পারে। বিশেষ করে যদি জাকজমকপূর্ণ রাজতন্ত্রের পক্ষে ভোট দেয়া হয়। এ ক্ষুদ্রদলটি ভারতের মিত্রদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সর্বদিক দিয়ে নিখুঁত পূর্ণতাপ্রাপ্ত কাল্পনিক রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষপাতি।

ভারত নেপালকে একটি স্থায়ী সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখার জন্য প্ররোচিত করছে যা এখন বৃদ্ধি পেয়ে পশ্চিমাদের নিকট স্বীকৃত হচ্ছে, ভারত নেপালকে সিকিমের মত অন্তর্ভুক্তি করতে চায় না, বিশেষ করে পূর্ববর্তী রাজ্য ভারতেরই তত্ত্বাবধানে আছে, ভুটানের ধরনের সম্পর্কের মত প্রয়োজন নেই। হয় নেপাল স্বাধীন আন্তর্জাতিক পরিবেশ তৈরি করবে অথবা সাধারণ নেপালিদের মধ্যে ভারত বিরোধী শক্তিশালী প্রচেষ্টা চালাবে। ১৯৯০-২০০২ সময়ে গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে প্রজাতন্ত্রী নেপাল হবে রাষ্ট্রপতি এভং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে চিরস্থায়ী সংকট ও ক্ষত তৈরির রাষ্ট্র। সংসদে অসংখ্য লোক অচল অবস্থার সৃষ্টি করবে এবং মূল কাঠামোর পথে অস্থিতিশীলতা গভীর হবে। ভারতে কৌশলগত বিশ্লেষণ এবং নীতি নির্ধারকেরা অন্য একটি হতাশাগ্রস্ত দলকে সম্ভবত স্বীকার করে ভুলশুদ্ধ যাই হোক হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে রাজনৈতিক কারণে অগ্রসর হবে। গণতন্ত্র, শেষ পর্যন্ত ভারতকে প্রস্তাব দিবে এবং প্রচুর সম্ভাবনা আছে নোপলকে অস্থিতিশীল করে তোলার জন্য, কোন সমালোচনা করে নয় বরং নির্লজ্জের মত হস্তক্ষেপ করা হবে।

রেফারেন্স

১. বি.গৌতম– ইন্ডিয়া পেয়িং ডিয়ারলি ফর ইটস বুলিইমেজ

২. রেপার উইলিয়াম এণ্ড হুইলপটম জন– পিপল, পলিটিক্স এন্ড আইডিয়াল ডেমোক্রেসি এন্ড সোসিয়াল চেইঞ্জ ইন নেপাল।

৩. শর্মা, গনেশ রাজ– বিশেস্বর প্রসাদ কৈরালাকো আতস্বরিতা

৪. দত্ত-রায় সুনান্দা কে– স্মাশ এন্ড গ্রাবঃ এনেক্রসেশন অব সিকিম।

www.pathagar.com

নেপালে ভারতীয় নীতির মতবাদ
(India's Policy Tenet in Nepal)

সকল জটিলতার জন্য ভারত-নেপাল সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। এটা জ্বলন্ত যে আপাত দৃষ্টিতে আত্মবিরোধী বলে মনে হলেও সত্য বিরোধি নহে। এর কারণ হল শক্তিশালী সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ভাষাগত এবং অন্যান্য যোগাযোগ বিশাল এবং উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকা, নেপালের সঙ্গে ভারত পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উত্তরের প্রতিবেশী চীনের থেকে অনেক কাছাকাছি। সমুদ্রের নির্গম পথ ব্যাতিরেকে উপায় নেই, তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং যাতায়াতের সুযোগ বিষয়ে নেপাল সম্পূর্ণরূপে ভারতের উপর নির্ভরশীল। বিগত দশকে ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে এবং ভৌগোলিক কারণে পরামর্শাদি দিয়ে নেপালের সঙ্গে অর্থনৈতিক যোগাযোগ শক্তিশালী করেছে।

এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে আংশিক ঔপনিবেশিকবাদ এর পাশাপাশি ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিকে তাকালে দেখা যাবে নেপাল হল একমাত্র দক্ষিণ এশিয়ান দেশ কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বৃটিশদের শাসনে ছিল না। এ কারণে নেপালি জনগণ সকল সময় তীক্ষ্ণভাবে সর্তক ছিল যেন তাদের ভূবেষ্টিত দেশের অনুভূতিতে আঘাত না আসে এবং এশিয়ান দু'শক্তিধর দেশের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত করে। তৎপর তাদের সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের অর্থনৈতিক পূর্ণতাদায়ক পর্যায়ে উন্নতি হয়, চীন ভারত সম্পর্ক রাজনৈতিক নীতির পরিবর্তনের কারণে প্রভাবিত করে এবং তাদের প্রতিযোগতামূলক উদ্দেশ্য আঞ্চলিক ও বিশ্বের প্রতি ভূমিকার কথা জাহির করে। নেপালের জন্য উভয় প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখা একান্ত প্রয়োজন যা নেপালের প্রতিষ্ঠার অনুশাসন বাক্যে প্রতিফলন পাওয়া যাবে, রাজা পৃথ্বি নারায়ন শাহ যিনি দুশতাব্দীও বেশীপূর্বে বলেছিলেন যে দেশ এখন "দু'শীলাখণ্ডের মধ্যে মিঠেআলুর" মত আঘাত আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত।

স্বাধীনতার প্রায় ৪৩ বছর পর, ভারত নেপাল সম্পর্কে তাদের নীতির বিস্তৃতভাবে "বিশেষ সম্পর্কের" মাপকাঠিতে স্থির করে। দু'দেশের মধ্যে বহু আকারের সম্বন্ধ, সদয়তর্ক চলছিল, পারস্পরিক লাভের জন্য বহু ধরনের সুযোগের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। যাহোক, নেপালের জন্য 'বিশেষ সম্পর্ক' একটি অশুভ স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, ১৯৫০ সালে একটি বিতর্কিত শান্তি ও বন্ধুত্বের চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ঐ বছর চীনের কমিউনিস্ট বাহিনী তিব্বত আক্রমণ করে। যা নতুন দিল্লী সংগ্রামরত এলাকা হিসেবে বিবেচনা করে উপমহাদেশকে চীনের বহিরাক্রমণ শক্তি দিয়ে প্রতিহত করা হয়। ভারত কর্মশক্তি প্রয়োগে আন্দোলিত করে। ১৯৫০ সালের চুক্তির ব্যাপারে কমপক্ষে নেপালের পক্ষ থেকে আপাত দৃষ্টিগোচর হয় যে নতুন দিল্লীর প্রত্যক্ষকরণের উপর সিদ্ধান্তের সূত্ররূপে বর্ণনা করে। দক্ষিণ এশিয়ার অখণ্ডনীয় নিরাপত্তা ইউনিট ভারতের নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করবে। অনেক নেপালি নাগরিক এ ধরণের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ জানায় এবং ভারতকে দোষারোপ করে এবং তাদের স্বাধীনতার প্রতি অশংবেদী হয়? নতুন দিল্লী কার্যকর ক্ষমতা দ্বারা দোলায়মান সামন্ততান্ত্রিক রানা শাসনের উপর চুক্তি প্রয়োগ করতে চায়, এটা বহু দিনের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের

www.pathagar.com

পৃষ্ঠপোষকতা ছিল এবং এর পরিবর্তে তাদের চলমাল সমর্থন ছিল। এছাড়া চুক্তির এক দশক পরে জনসাধারণকে চুক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত করার জন্য পত্রাদি আদান প্রদান করা হয়। ১৯৫০ সালের চুক্তি অনুযায়ী চিরস্থায়ীভাবে একমত হয়, নেপাল-ভারত সম্পর্ক নিয়ে শয়তানি চালিয়ে যাওয়া।

নেপালে ১৯৯০ সালে বহুদলীয় গনতন্ত্র প্রকাশ্যভাবে ভারতের সমর্থন নিয়ে রক্ষার জন্য প্রস্তাব করা হলে নতুন দিল্লী সুযোগ বুঝে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে একটি সংশোধিত নিজেদের ইচ্ছাঅনুযায়ী নীতি তৈরি করে। দু'টি মতাদর্শের ভিত্তিতে নতুন দিল্লীর পরবর্তী সরকারগুলো সে অনুযায়ী কাজ করে, জোর দিয়ে বলা হয় যে নেপালে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য সাংবিধানিক রাজতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে একই সূত্রে গৃহীত করা হয়েছে এবং এটাই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সবচেয়ে ভাল ও ফলপ্রসূ জামিনদার। বাস্তবতা হচ্ছে, যদিও ভারত দায়িত্ব গ্রহন করে তিন দলকে নিয়ে নীতি নির্ধারণ করে থাকলেও রাজ্যে তাঁরাই মূখ্য ভূমিকা পালন করেবে।

রাষ্ট্রের শক্তির ভারসাম্য রাখার ঐতিহাসিক আইন (Historical Balancing Act)

ভারশাম্য রক্ষার আইনটি রাজাপৃথ্বি নারায়ণ শাহ কর্তৃক প্রবর্তন করা হয়েছিল, ১৭৭৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর আইনটি বাতিল করে দেয়া হয়। তাঁর ছেলে এবং উত্তরাধিকারী প্রতাপ সিংহ শাহ দু'বৎসর পর তিনিও মারা যান, তাদের সন্তান এবং দুর্বল রাজার মধ্যে ক্ষমতার দলাদলির দ্বন্দ্বের কারণে দ্রুত পতন ঘটাতে সাহায্য করে। আদালতের বিষয়ে সামরিক হস্তক্ষেপকে পরিহার করার জন্য জেনারেলদেরকে স্বশাসন অনুমোদন করেছিল। কাজেরত থেকে বড় বিজয় অর্জন করতে নেপালের এলাকা বৃদ্ধির জন্য উপমহাদেশের ব্রিটিশ ঔপনিবশিক শাসকদের বিরুদ্ধে প্রচারনা চালায়। ১৮১৪-১৬ সালের বৃটিশ ভারতের যুদ্ধেতীব্রভাবে আক্রমণ করে ভীষণ ক্ষতি সাধিত করলেও নেপালের পরাজয় এবং মন ভেঙ্গে যায়। ব্রিটিশরা দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিক দিয়ে এবং চীন উত্তরদিক দিয়ে নেপালকে ঘিরে ফেলে, নেপাল দেশ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য অভ্যন্তরীণভাবে নিশ্চিত হয়। সামরিক বাহিনীর বিজয়কে সাময়িক থামানোর ফলে রাজতন্ত্রের মধ্যে দলাদলি গভীরে চলে যায়। তাতে ১৮৪৬ সালে অভিজাততন্ত্র রানাদের উত্থানের পথ হয়ে যায়। জং বাহাদুর রানার উত্থানের জন্য ব্রিটিশ ভারত যথাযথ ভূমিকা পাল করে, একজন নিম্ন পদস্থ জুনিয়র সামরিক কর্মকর্তা তীক্ষ্ণভাবে বাকবিতন্ডা চালাতে থাকে। জঙ্গ বাহাদুর এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা খুব নিশ্চিতভাবে ব্রিটিশ শাসকদেরকে সেবা দেয়ার জন্য চেষ্টা চালায়। রানা শাসনের আবির্ভাবে উপলব্ধি করা গিয়েছে যে তাঁরা ক্ষমতা পায় নি অথবা বর্তমান বৈদেশিক কর্তৃত্বকারীদের আর্শীবাদ ছাড়া ক্ষমতা রক্ষকরা সম্ভব হয় নি, ফলে উচ্চকাঙ্ক্ষার কামণা ভীষণভাবে লুপ্ত হয়।

এক শতাব্দীর পর ব্রিটিশরা উপমহাদেশ থেকে চলে যায় এবং রানাদেরকে নিরাপত্তাহীন রেখে যায়। বিশেষভাবে তাঁরা তরুণবয়স্ক নেপালি বিদ্রোহীদেরকে ভয় করত, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং নতুন দিল্লীর নব্য নেতৃত্বের সঙ্গে আদর্শিকভাবে ঘনিষ্ঠ ছিল এবং ব্যক্তিগত ভাবে

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্ট ছিল। রানারা যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে যোগাযোগের পথের চেষ্টা করিছিল, তাতে খুব বেশী সুফল হয়নি। ১৯৪৯ সালে নেপাল জাতিসংঘে যোগদানের চেষ্টা করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন তাঁদের আবেদনের বিরোধিতা করে, যুক্তি দেখানো হয় যে নেপাল ব্রিটিশ ভারতের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ সম্পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়।

রাজা ত্রিভুবন যখন রানাদের স্বেচ্ছাচারিতায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে নতুন দিল্লী নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন, প্রধান মন্ত্রী ত্রিভূবনের শিশু নাতি জ্ঞানেন্দ্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। তিনিই একমাত্র উত্তরাধিকারী এখনও কাঠমুন্ডুতে আছেন। নেহেরু ওয়াশিংটন এবং লন্ডনকে নেপালে হস্তক্ষেপে বাঁধা দিতে দৃঢ় সঙ্কল্পিত হয়, একটি শান্তি পরিকল্পনা তৈরি করেন, কারণ নেপালি কংগ্রেসের নেতৃত্বে গনতান্ত্রিক আন্দোলন রাজ্যের বাহিরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পরিকাল্পনা অনুযায়ী ত্রিভুবনকে সিংহাসনে পুনরাধিষ্ঠিত করা হয় এবং রাজতন্ত্র পুনরায় ক্ষমতা ফিরে পায় যা ১০৪ বছর পূর্বে রানাদের নিকট হারিয়ে ছিল। যদিও তাঁরা প্রকাশ্যে প্রতিপক্ষ থেকে যায়। রানারা এবং নেপালি কংগ্রেস সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করে, যা মাত্র নয় মাস টিকে ছিল। তাঁরা ক্ষমতা হারায়, রানারা রাজপ্রাসাদের ছাউনিতে বিগঠিত হতে আরম্ভ করে, কেহ কেহ নেপালি কংগ্রেসে যোগদান করে। সঙ্গী সাথী সহকর্মী প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত করার শক্তিধারী গি,পি, কৈরালার নেতুত্বে নেপালি কংগ্রেস রাজনৈতিক শূন্যতার পূরণের জন্য আশাবাদ ব্যক্ত করে। এ সময়ে নেপালের কমিউনিস্ট এবং কম গুরুত্বপূর্ণ দলগুলো নতুন দিল্লীর নিকট আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য বি,পি-কে আমন্ত্রণ নাকরে রাজা ত্রিভুবন তাঁর সৎভাই এবং দলের বিদ্রোহী মেট্রিকা প্রসাদ কৈরালার নাম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রস্তাব করে।

ভারত নেপালের সামরিক বাহিনীকে স্বীকার করে নিতে সাহায্য করে, অত্যন্ত কঠিনভাবে সংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয় এবং পুনর্গঠিত করে ভারতের নিয়মানুযায়ী প্রশিক্ষণও সংগঠনিক শিক্ষা দেয়া হয়। ভারতের উপদেষ্টারা গণসেবা এবং পুলিশকে প্রশিক্ষণ এর ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করে। কাঠমুন্ডু এবং নতুন দিল্লীর মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে রাজনৈতিক আলোচনা হত, এ আচরণে অনেক নেপালি অসন্তুষ্ট ছিল। ত্রিভুবনের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মহেন্দ্রার সময় থেকে ভারতের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে ১৯৫৫ সালে জাতিসংঘ সদস্য পদ লাভ করে। নেপাল সংস্থাগুলোতে সক্রিয় সদস্য হয়।

১৯৫৯ সাল, নেপালি কংগ্রেস দু'তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জয়লাভ করে। রাজা এবং কামিউনিস্ট ও কম গুরুত্বপূর্ণ দলগুলো ইতোমধ্যে দু'পৃথক মেরুতে উদ্ভব হয়। প্রধানমন্ত্রী বি,পি, কৈরালা, যিনি নেহেরু এবং ভারতে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, তাই তিনি নেপালের আন্তর্জাতিক পরিচিতি বিস্তারের জন্য বাধা আসতে পারে এ ধরনের চিন্তা করে বিশেষ সম্পর্কে কথা ভাবেন নি। দু'বৎসরের ও কম সময়ের মধ্যে রাজা মহেন্দ্র কৈরালা মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুতি করে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে দেয়। রাজা শাসনভার গ্রহন করে, নেপাল ভারত সম্পর্কের ক্ষতিসাধন করে যত ক্ষন পর্যন্ত চীন ভারত সীমান্তে কঠিন চাপ বিস্ফোরিত হয়ে ১৯৬২ সালে যুদ্ধ বেধে যায়। এতে নেপাল

www.pathagar.com

জড়িত হয় নি, যুদ্ধে দেশের নিরাপত্তহীন অবস্থার কথা বিবেচনাধীন ছিল। নেহেরু চীন এবং ভারতের মধ্যে সংর্ঘষরোধার্থে বন্ধুত্বের প্রয়োজন মনে করেছিল, নেপালকে সীমিতভাবে স্বীকার করে এবং রাজার মুখোমুখি হয়।

যুদ্ধে ভারতের পরাজয়ের পর রাজা মহেন্দ্র পাঞ্চায়েত নামে পরিচিত গ্রাম্য কাউন্সিলের উপর ভিত্তি করে দলহীন রাজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে ছিল। গোপনে রাজা ভারতের নিরাপত্তায় সংশ্লিষ্ট হতে রাজি হয়। ভারত থেকে অস্ত্র ক্রয় করতেও রাজি হয় এবং সেগুলো বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি হবে যদি নতুন দিল্লী সরবরাহ করতে অপারগ হয়। কিছুর বিনিময়ে নতুন দিল্লী রাজার বিরোধী নির্বাসিত বিদ্রোহীদেরকে আটকিয়ে রাখে। রাজা জনগণের সঙ্গে সব সময় একটি দূরত্ব অবস্থানে থাকে ভারতীয় সৈন্যরা নেপালের উত্তরের সীমান্ত এলাকা চৌকিদারি অবস্থানগুলো বন্ধ করে দিতে বাধ্য করে। কাঠমুন্ডু অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ১৯৬৮-১৯৭০ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের অস্থায়ী ভাবে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য পদ লাভ করে এবং আর্ন্তজাতিক সীমারেখা বৃদ্ধির জন্য অনবরত চেষ্টা করতে থাকে।

ভারতের প্রভাব থেকে বের হয়ে আসার জন্য রাজা মহেন্দ্রর সময় নেপাল চীনের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তুলে, এ নীতি রাজা বীরেন্দ্রের সময় চলে আসছিল, তিনি ১৯৭২ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিন বছর পর তিনি প্রস্তাব করেন যে, নেপাল হবে 'শান্তির অঞ্চল' (জেড ও পি), নতুন দিল্লী এ চেষ্টা বিশেষ সম্পর্ককে অবরোধ করা হিসেবে বিবেচনা করে। ১৯৮৮ সালে যখন নেপাল চীন থেকে বিমান প্রতিরক্ষার অস্ত্রাদি ক্রয় করে তখন থেকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে নতুনভাবে ভাটা পড়ে। ভারত প্রতিবাদ করে জানায় যে একাজ ১৯৫০ সালের চুক্তির মূলনীতিকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও এ সমস্ত অস্ত্রসস্ত্র কখনো হুমকি প্রদানে ব্যবহার হয় নি, ভারত বিবেচনা করেছে যে এগুলো বিপজ্জনক অবস্থা, কাজেই বিনা শান্তিতে ছেড়ে দেয়া যায়না।

উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, ভারত শ্রেণীবদ্ধভাবে অভিযোগপত্র যুক্ত করে। ১৯৮৯ সালে মার্চ মাসে যখন বাণিজ্য ও যাতায়াতের চুক্তির নবায়ণের সময় আসে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নেপাল রাজাকে নতুন দিল্লীর নিরাপত্তার সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে প্রথম আলোচনার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। উভয় পক্ষ নিজেদের পায়ে কুড়াল মারে, ভারত চুক্তি বাতিল করে দেয়। পনরটি চৌকিদারি ছাউনির মধ্যে ১৩টি ছাউনি যেগুলো দিয়ে নেপাল তৃতীয় দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত সেগুলো বন্ধ করে দেয়। এতে নেপালের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকটে পড়ে যায়। নতুন দিল্লী উদ্বিগ্ন ছিল যে, রাজা বীরেন্দ্র নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার জন্য জনসাধারণকে দিয়ে অর্থাৎ রাজার সমর্থকদের দ্বারা প্রতিবাদ জানাতে। নেপালি কংগ্রেস এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিষ্ট বিরোধীদল ভারতকে দুটি বিষয়ে চাপ দেয়ার জন্য প্রস্তাব করে। ভারতের আশীর্বাদসহ প্রকাশ্যে দু'টি শক্তি গণতান্ত্রিক মৈত্রী রাজার শাসনের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে ক্রমশ অগ্রসর হয়। সপ্তাহব্যাপী গণবিক্ষোভে নত হয়ে রাজা বীরেন্দ্র ১৯৯০ সালের এপ্রিলে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনস্থাপন করেন।

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার অভাব
(Democratic deficit)

নূতন নেতৃত্বের অধীনে নেপাল ভারত সম্পর্কের উন্নতি আরম্ভ হতে থাকে। নতুন দিল্লীর সঙ্গে আলোচনা না করে আর কোন অস্ত্র বিদেশ থেকে কাঠমুন্ডু ক্রয় করবে না বলে রাজি হয়। ১৯৯১ সালের ফেব্রয়ারীতে প্রধানমন্ত্রী পি,ভি নর সিমারাও নেপাল পরিভ্রমণ করেন, ১৪ বছরের মধ্যে এই প্রথম ভাতের সরকার প্রধান এ কাজ করেন। নতুন চুক্তির মধ্যে বাণিজ্য, যাতায়াত এবং অবৈধ বানিজ্য নিয়ন্ত্রন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গিরিজা প্রসাদ কৈরালা তাঁর মন্ত্রীসভা নিয়ন্ত্রণ করেন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত নেপালি কংগ্রেসকে দৃঢ় মুষ্ঠিতে শক্তিশালী করেন।

ভারত হতবুদ্ধির রাজার প্রতি আগ্রহভরে সম্পর্ক পুনজ্জীবিত করে। বাস্তব বিষয়গুলো সম্পর্কে রাও এর প্রতিনিধিবর্গ সত্যিকার নিমন্ত্রণ বার্তার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনার ছেয়ে রাজা বীরেন্দ্রর সঙ্গে কর্মসূচি অনুযায়ী রাতের ভোজ সভায় আলোচনাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। ১৯৯০ সালের প্রথম ছয়মাস নেপালি কংগ্রেস এবং ঐক্যবদ্ধ মাওবাদী লেনিনবাদীরা (ইউ.এম.এল) সংসদের ভিতরে ও বাহিরে ছিল তিক্ত বিদ্রোহী দল। নতুন দিল্লীর জন্য তাঁরা একই মেরুতে সংসদীয় প্রধান ধারায় একীভূত হয়। মাওবাদী বিদ্রোহীরা শীঘ্রই তৃতীয় মেরু দখল করার জন্য উদ্ভব হয়।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনতা দল (বি.জে.পি) ১৯৯০ সালের শেষে ক্ষমতায় আসে, আশা করা গিয়েছিল যে বিশ্বের একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্রের ব্যাপারে নতূন অধ্যায়ের কোন ঘোষণা করবে। তৎপরিবর্তে সম্পর্ক অতিবিপজ্জনক হয়ে যায়। একটি শীর্ষস্থানীয় সাময়িকী অফিসিয়াল প্রতিবেদনে ফাঁস করে দেয় যে ভারত বিরোধীদের জন্য নেপাল একটি গর্ত যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নতুন দিল্লীর মতে, নেপাল পাকিস্তান ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (আই.এস.আই.) কে সাহায্য ও সহযোগিতা করছিল। ভারতের ওপারে অশান্তকে বলীয়ান করতে। ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর কাঠমুন্ডু থেকে নতুন দিল্লী যাওয়ার পথে একটি ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের বিমান ছিনতাই করা হয়। বিমানটি ভারতের অমৃতসর শহরে অবতরণ করে। একটি অনির্দিষ্ট গন্তব্যে যাওয়ার পূর্বে শেষ পর্যন্ত আফগানস্থানের কান্দাহারে শেষ হয়। ভারতীয় গণমাধ্যমে কাঠমুন্ডু বিমানবন্দরের স্থল নিরাপত্তাকে প্রথম দোষারোপ করে। সময়ানুক্রমে কিভাবে পূর্বেই আই.এস.আই. কার্যকর ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্রপাতি বিমানবন্দর নিরাপত্তায় নিয়ে আসে। একটি ভারতীয় টিভি চ্যানেল ঐ বিমানে ছিল একজন নেপালি ব্যবসায়ীকে ছিনতাইকারী বলে মনে করে। একটি নেপালি সংবাদপত্র আর একটি চমৎকার দিকের কথা বলেছে। কাঠমুন্ডু স্টেশনের প্রধান একজন ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার গবেষনা ও বিশ্লেষণ শাখার লোক, এ কাজে তিনি জড়িত, ঐ বিমানেই ছিলেন, অন্যান্য বেশীর ভাগ গণমাধ্যম বিষয়টি এড়িয়ে যায়।

২০০০ সালের আগস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ কৈরালা নতুন দিল্লী সফর করেন, নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে কাঠমুন্ডু পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থাকে তাঁদের দেশে ভারতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে দিবে না। এ সময়ে ভারতের গণমাধ্যমগুলো প্রচার করতে থাকে কিভাবে আই.এস.আই. বিদ্রোহী মাওবাদীদেরকে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। ডিসেম্বর মাসে কাঠমুন্ডুতে সিংস্রতার বিস্ফোরণ ঘটে এবং গুজব ছড়িয়ে পড়ে

www.pathagar.com

যে ভারতের চিত্র তারকা ঋত্তিক রওশনকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে বলে নেপাল টিভিতে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন। চিত্র তারকা অস্বীকার করে বলেছেন এধরনের কোন মন্তব্য তিনি করেন নি এবং এখন ও কেহ দাবী করেননি এ সাক্ষাৎকার দেখেছে। এতে তিনটি হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়। প্রায় এক ডজন লোক আহত হয় এবং দশ লক্ষাধিক রুপির সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিছু সংখ্যক মন্তব্যকার বর্ণনা করছেন যে, জনপ্রিয়তার ক্রোধের প্রতিফলন হল ভারতের "বড় দাদা সুলভ আচরনই" সম্প্রদায়িক বিদ্রোহের কারণ। ভারতের নেতৃবৃন্দ এতে আই.ইস.আই'র হাত আছে বলে দেখেছে।

রাজনৈতিক স্থায়িত্বের অভাবের বৃদ্ধির মধ্যে এবং মাওবাদীদের প্রচণ্ড হিংস্রতার কারনে অনুমান করা হয়েছিল যে রাজা বীরেন্দ্র গভীর ভাবে চিন্তা করছেন কঠোর ভাবে হস্তক্ষেপ করার। তৎপরিবর্তে ২০০১ সালের ১ জুন রাতের বেলায় বীরেন্দ্রর পরিবারের সকল সদস্য এবং আরও অর্ধ ডজন রাজকীয় সদস্য প্রাসাদে নির্দয়ভাবে নিহিত হন। সরকারিভাবে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে রাজকুমার দীপেন্দ্র যে মহিলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তাঁর পিতামাতা অনুমোদন না করায় নিরাশ হয়ে নিজের বন্দুক দিয়ে আত্মহত্যার পূর্বে পরিবারের সদস্যদের উপর গুলি বর্ষণ করে। দীপেন্দ্র একটি সামরিক হাসপাতালে বেচে থাকার সংগ্রাম করছিলেন, কিন্তু পরদিন সকালে অভিষিক্ত রাজা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নতুন রাজার মৃত্যুর দু'দিন পর তাঁর চাচা জ্ঞানেন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম যে কাজগুলো তিনি করেছেন সেগুলোর মধ্যে একটি হল নেপাল সরকার কিছু ভারতীয় টিভি চ্যানেল বন্ধ করে দেয়, কারন কতক জ্বলনশীল খবর প্রচার করছিল।

এক বছরের ও কিছু বেশী সময় পর রাজা জ্ঞানেন্দ্র প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেওবার মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করেন, কারণ তিনি সময় মত নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে ব্যর্থ হয়েছেন, ওয়াশিংটন এবং লন্ডনের মত নতুন দিল্লী কোমলভাবে কিছু সমালোচনা করে। গুরুত্বপূর্ণ হল কে.ভি. রাজন এবং এম.এস. রাসগোত্রা উভয়ে কাঠমুন্ডুতে রাষ্ট্রদূত ছিলেন দেখা করেন। সে সঙ্গে আমেরিকান ও চীনের রাষ্ট্রদূত ও ছিলেন, রেডিও টিভি ভাষণে তাঁর হস্তক্ষেপের কথা প্রচারের পূর্বে রাজা তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। ঐ সমস্ত বেসরকারি বক্তৃতায় যা কিছু প্রকাশ হোক না কেন নতুন দিল্লী জনগণের নিকট দ্বৈত মতাদর্শের কথা পুনঃ দৃঢ়তাসহ করে উল্লেখ করে।

মাওবাদী বিদ্রোহীদের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা শান্তি আলোচনা ভেঙ্গে গেলে এবং রাজা কর্তৃক নিয়োজিত মন্ত্রীসভা সংসদ নির্বাচন করতে ব্যর্থ হলে রাজা জ্ঞানেন্দ্র ২০০৫ সালে ১ ফেব্রয়ারি সরাসরি নিয়ন্ত্রন গ্রহণ করেন, এসময়ে ভারত তীক্ষ্ণ এবং দ্রুত সাড়া প্রদান করে। নতুন দিল্লী রাজকীয় নেপালি বাহিনীকে প্রতি বিদ্রোহে সাহায্য স্থগিত করে দেয়। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং দক্ষিণ এশিয়ান এসোশিয়েশন আঞ্চলিক সহযোগিতা (সার্ক) ঢাকার শীর্ষ সম্মেলন পরিত্যাগ করে আইন সম্মত বৈধ রাজাকে ভান করে এড়িয়ে যায়। ভারতের গণমাধ্যম খবর প্রচার করে যে নতুন দিল্লী রাজার সরাসরি ক্ষমতা গ্রহনের বিরুদ্ধে পরামর্শ প্রদান করে। অবশ্যই এটা বিশৃঙ্খলা ছিল। পূর্ববর্তী মাসগুলোতে কাঠমুন্ডু এবং নতুন দিল্লী রাজা জ্ঞানেন্দ্র প্রায় ভারত সফরের কর্মসূচি গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। কিছু ভারতীয় বিশ্লেষক তাদের নিজেদের সরকারকেই নিয়মতান্ত্রিক বাধা দেয়ায় দোষরোপ করে।

www.pathagar.com

যখন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়, রাজা জ্ঞানেন্দ্রর ভ্রমণের কর্মসূচিতে নেপালের সীমান্ত এলাকার ভারতের পাঁচ রাজ্যের মধ্যে চারটি আন্তর্ভুক্ত করা হয় রাজা ভারতের নেতৃস্থানীয় সংবাদ পত্রের সঙ্গে এক সাক্ষাৎ করে স্পষ্টভাবে তাঁর সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেছেন নেপালে মাওবাদীদের বিদ্রোহের ব্যাপারে ভারতের আপত দৃষ্টি গোচর চেহারা দেখতে চায়। ২০০৪ সালের ২৩ ডিসেম্বরে, প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী রাও এর মৃত্যুজনিত করণে শেষ মুহূর্তে রাজা তাঁর সফরসূচি বাতিল করেন। অনুমান করা হচ্ছে যে রাজা জ্ঞানেন্দ্র ভারতের বন্ধুত্ব সম্পর্কিত এক রাজনীতিবিদকে বহুদলীয় কাউন্সিল অব মিনিষ্টার এর চেয়ারম্যান করার নাম প্রস্তাব করায় ভারত রাজার শাসন গ্রহণকে নীরবে মেনে নেয়। ২০০৫ সালে প্রথম অর্ধেক সময় রাজা জ্ঞানেন্দ্রর তাস খেলার প্রচেষ্টাকে নতুন দিল্লী বিদ্রুপ করে। যখন বিশ্বের অধিকাংশ দেশ রাজার শাসন গ্রহণকে সমালোচনা করছিল তখন পাকিস্তান এবং রাশিয়ার মত চীন এটা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে বিবেচনা করে।

চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও দক্ষিণ এশিয়া সফরের সময় নেপালকে বাদ দিয়ে চলেন, কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রী লী কুটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি পালনের জন্য কাঠমুন্ডুতে আসেন। ঢাকায় নভেম্বর মাসে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের পুন কর্মসূচি করা হলে নেপাল সফল ভাবে আফগানিস্তানের পূর্ণ সদস্যপদ প্রদানের এবং চীনকে পর্যবেক্ষক রূপে অন্তর্ভুক্তির নেতৃত্বে দেন। এক সপ্তাহ পরে নেপালের প্রধান সেনাপতি বেইজিং থেকে ফিরে আসেন। চীন নেপালকে সামরিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে। নেপালের তাস খেলার প্রতি ভারতের কৌতূহলের উদ্রেগ হয় এবং দক্ষিণ এশিয়াতে বেইজিং এর উদ্দেশ্য কি তা জানার জন্য ভারত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। কিছু ভারতীয় বিশ্লেষক সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে কারণ এক সময়ে চীন নেপালের অস্ত্রাগার থেকে প্রচুর অস্ত্র নিয়ে ভান্ডার জাত করেছিল। ভারতের শীর্ঘস্থানীয় সংবাদপত্রগুলো সম্পাদকীয়তে তাদের সরকারকে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের অবাধ্য রাজকীয় শাসনকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য প্ররোচিত করে।

শতদল মৈত্রী (এস.পি.এ.) এবং মাওবাদী বিদ্রোহীরা নিয়মিতভাবে নতুন দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে, একাজে বামপন্থী দলের যারা মনমোহন সিং এর সম্মিলিত মন্ত্রী সভাকে সমর্থন করছেন তাদের সুনজরে থেকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। নেপালের তিন মেরুর বিরোধকে দু'মেরুতে পরিবর্তনের আবির্ভাব ঘটে, পরিতৃপ্ত না হলেও, এখন হয়ত অধিকারকের অনুমোদন জরুরি ভেবে তা লাভ করেছে। এস.পি.এ. এবং মাওবাদীরা বার দফা সমঝোতার দাবী নিয়ে পূর্ণ গনতন্ত্র অর্জনের জন্য প্রকাশ্যে আসে। তাতেও প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে গুরুতর অনিশ্চয়তা ছিল যেমন রাজতন্ত্র, বিদ্রোহীদেরকে অস্ত্রবিহীন করা এবং বাহিরের তত্ত্বাবধানের বিষয়। তথাপি রাজাকে রাজি করাতে ব্যর্থ হয়, নতুন দিল্লী সত্যিকারভাবে সামঞ্জস্য বিধান থেকে অধিকার হারায়নি। মাওবাদী নেতা প্রচন্দ এর নিকট থেকে একজন জনগণের অঙ্গীকার নামার প্রতিলিপি গ্রহণ করে এই বলে যে তাদের বিদ্রোহ নেপালেই সীমাবদ্ধ আছে। ঐ বিবৃতিটি ভারতের মাওবাদী নেতা জনগণের সাথে যোগদানের একদিন পর আসে। অঙ্গীকার করে যে তারা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ চলিয়ে যাবে যতদিন পর্যন্ত না সাম্রজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত সমূলে ধবংস না হয় এবং

www.pathagar.com

জনগণের জন্য নেপাল তার এবং সাড়া বিশ্বে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত না হয়।

অতীতের পথধরে ফিরে আসা
(Backyard wide open again)

ত্রিমুখী বিরোধ গভীরতর হওয়ার বিষয়টি মীসাংসার জন্য যারা অংশ গ্রহন করেণ তাদের মধ্যে জাতিসংঘ, সুইজারল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার গভীর আগ্রহ নিয়ে শান্তি আলোচনার আরম্ভ করেন। চীন নেপালের ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপকে দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করছিল, অন্যদিকে ভারত মধ্যস্থতাকে অত্যন্ত উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছে। আমেরিকার প্রতনিধি পরিষদের স্পিকার ডেনিস হাসটার্ট এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল এপ্রিলের প্রথম দিকে কাঠমুন্ডু সফরে আসেন সেই কর্মসূচি অনুসরণ করে মে মাসে কার্টার সফর করেন। এস.পি.এ পূর্ব ঘোষিত রাজার বিরুদ্ধে 'কর অথবা মর' মতবাদ প্রকাশ করার জন্য এগিয়ে যায়, তখন মাওবাদী বিদ্রোহীরা পরিবহন অবরোধ করে শক্তভাবে ফাঁস লাগানোর মত ব্যবস্থা করে। রাজশাসন দায়ী করে যে মাওবাদীরা প্রতিবাদ করে নিরাপত্তার ব্যাপক ক্ষতি করার আদেশ দিয়াছে। ছড়িয়ে পড়া বিদ্রোহের মধ্যে হেসটার্ট প্রতিনিধিদল এবং কার্টার সফরসূচি বাতিল করে দেয়, ভারতের জন্য ক্ষেত্রটি ফেলে রেখে চলে যায়। প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের জেষ্ঠ্যসদস্য করন সিং এবং কাশ্মীরের শেষ মহারাজার ছেলেকে কাঠমুন্ডু প্রেরণ করেন। করণ সিং বৈবাহিক সূত্রে নেপালের রাজ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রাজা জ্ঞানেন্দ্র এর সঙ্গে আলোচনায় সন্তুষ্ট হওয়ার বিষয়টি প্রকাশিত হয় তবে কোন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় নি। দু'দিন পর রাজা বেতারের ও টেলিভিশনে ভাষণে এস.পি.এ.কে একজন প্রধানমন্ত্রীর নাম প্রস্তাব করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ভারত সেই সঙ্গে জাতিসংঘ এবং ইউরোপিয়ান দেশ সমূহ তাৎক্ষণিকভাবে অভিনন্দন জানায়। এতে প্রতিবাদকারীরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে, অধিকাংশ মাওবাদী সদস্যরা ভারতের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীগত যুদ্ধনাদ ধ্বনি দিতে থাকে। নেপালে নিয়োজিত প্রাক্তন কুটনৈতিক ও ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শ্যাম সরণ দ্রুত নতুন দিল্লীর অধিকারীর অবস্থা সংশোধন করেন এবং সংসদীয় রাজার নিকট লিখে পাঠান।

আরও একচক্র উত্তেজনাপূর্ণ কুটনৈতিক উদ্যমে ভারতের পরিচালনায় রাজা জ্ঞানেন্দ্র পুনরায় প্রতিনিধি পরিষদ বহাল করে, ২০০২ সালে প্রধানমন্ত্রী দেওবা লুপ্ত করে দিয়েছিল। সন্তোষজনকভাবে মিলিত হওয়ার জন্য এস,পি. এ.র প্রধান দাবী ছিল। নেপালের কংগ্রেস প্রশাসন সভাপতি গিরিজা প্রসাদ কৈরালা পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি দেন যে সংসদ নির্বাচন করে রাজা ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন এটা ছিল কেন্দ্রীয় মাওবাদীদের দাবী। এ সমস্ত বিষয়গুলো নেপালের সাদৃশ্যতা অনায়ন করেছে, কিন্তু নিশ্চয়তা কাম। নতুন দিল্লীর ত্রি মেরুর উদ্দেশ্য যদিও রাজপ্রশাদ প্রধান ধারার দলগুলি এবং মাও বিদ্রোহীর প্রধান যোদ্ধা হিসেবে থেকে যায়।

www.pathagar.com

রেফারেন্সঃ-

১. ব্লেইক, পি.এম. ক্যামেরুন জে, এবং শীভন, ডি - নেপাল ইন ক্রাইসিসঃ গ্রোথ এন্ড স্ট্যাগনেশন এ্যাট দি পেরিফেরি

২. স্টিলার, লুডউইগ, এফ - নেপালঃ গ্রোথ অব এ ন্যাশন

৩. বসন্ত লোহানী - দি মেকিং অব এ ন্যাশন

৪. হেলটন, মার্টি, রেপার, উইলিয়াম এবং লুইলপটন, জন - পিপল, পলিটিক্স এন্ড ইডিওলজি ঃ ডেমোক্রেসি এন্ড সোসিয়েল চেইঞ্জ ইন নেপাল

৫. মুনি, এস, ডি - ইন্ডিয়া এন্ড নেপাল ঃ এ চেঞ্জিং রিলেশনশীপ

৬. শরল, জান - ডেমোক্রেসি উইদাউট রুটশ।

www.pathagar.com

নেপালের অব্যক্ত মর্মযন্ত্রনা (৩)
(The untold pains of Nepal)

– ডঃ শাস্ত্র দত্ত পন্থ

অবতারনিকা
(Introduction)

ভারত এবং নেপাল উভয় দেশ স্বাধীন এবং সার্বভৌম। এ দু'দেশের অদ্বিতীয় সম্পর্ক শুধু কুটনৈতিক ভিত্তির উপর নয় বরং রাজনৈতিক পর্যায়ে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। ভৌগোলিকভাবে নিকটতম ও অদ্বিতীয় গুরুত্ব বহন করে, কারণ নেপাল হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালু অংশে অবস্থিত এবং নেপালের সকল নদী ভারতের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। অতএব ভৌগোলিক গঠনের প্রথানুযায়ী শিল্প ও বাণিজ্য শাখাতে কর্ম সম্পাদন অধিক হবে।

ভারত নেপালের নিকটতম প্রতিবেশী বন্ধু। নেপাল অন্যতম সুন্দর দেশ, হিমালয়ের দক্ষিণে সূর্য করোজ্জল ক্রোড়ে অবস্থিত, পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের উত্তরে স্বশাসিত তিব্বত অঞ্চল এবং দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে প্রজাতন্ত্রী ভারত এ দু'দেশের ভিতরে পড়ে চাপে নিপিষ্ট হচ্ছে। বিশ্বে নেপাল একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র হলেও সকল ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি সমান শ্রদ্ধাবান।

যদিও ভারত একটি ভাল বন্ধুদেশ, নেপাল অনুধাবন করে যে বহুক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করছে। বিষয়গুলো নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হল।

নেপালিরা অব্যক্ত ঘটনাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছে, ক্ষমতায় যে কোন সরকারই থাকুক না কেন বিশ্বের সমকক্ষ সঙ্গীদের নিকট ঘটনাদির বিবরণ প্রকাশ করার ঝুঁকি নিচ্ছে না। এমনকি এন.জি.ও. সাংবাদিকগণ, নাগরিক সমাজ এবং সমাজ উন্নয়ন সংস্থাগুলো খোলাখুলিভাবে এবং মুক্তভাবে ঘটনার বহু কারণ প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছে না। নেপাল যখন দুর্বল ও ভঙ্গুর রাষ্ট্র ছিল তখন নির্দয়ভাবে শোষিত হয়েছে। একটি উদাহরণ দেয় হচ্ছে, যে সময়ে নেপাল সমাজ পরিবর্তন করণের সরকার শাসিত ছিল, প্রচণ্ড বিরোধ এবং সন্ত্রাসের পথ ভারতীয় বি.এ.এফ. কেন্দ্রীয় নেপালে সাস্তা এলাকার রাজ্যাংশে তৈরি করে দিয়েছে। অতএব তারা নেপালে জলসম্পদ গ্রাস করে এবং রাজনৈতিক সংকটকালে এবং প্রশাসনিক অবস্থায় আরও অনেক কিছু করেছে।

১. রাজ্যাংশ বিষয়সমূহ
(Territorial issues)

উন্মুক্ত সীমানা (Open Border) ঃ

১৯৫০ সালের শান্তি এবং সৌহার্দ্য চুক্তিতে প্রস্তাব করা হয়েছিল দু'দেশের মধ্যে সীমান্ত উন্মুক্ত রাখা হবে। উন্মুক্ত সীমান্ত থাকার কারণে উভয় দেশের নাগরিকরা বিনা ভিসায় ভ্রমণ করবে, এবং উন্মুক্ত সীমান্তের কারণে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে কোন কিছু লিপিবদ্ধ হবে না, ভারত এ জন্য কোন সমাধান করতে প্রস্তুত নয়। ভারত ক্ষতি

www.pathagar.com

স্বীকার করে সীমান্ত উন্মুক্ত রাখতে রাজি। এটা হল ভারতের কায়েমী স্বার্থ ও দুশ্চরিত্রের পরিচয়।

উন্মুক্ত সীমান্ত থাকার ফলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। সমাজের দুর্বৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংক্ষিপ্তাকারে এ সমস্ত দুর্বৃত্তির আমি সামান্য প্রামাণিক সাক্ষ্য বের করতে চাই। নেপাল বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় অপরাধীদের কেন্দ্র (চোরাচালানি, আত্মসাৎকারী এবং ডাকাত) যারা ঘনঘন আইন অমান্য করে কলরোলপূর্ণ প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁরা সীমান্ত এলাকায় আশ্রয় নিয়ে নেপালে চুরি, ডাকাতি, হত্যা লুটতরাজের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। এ ধরণের অপরাধমূলক কাজ প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষতির কারণ হয় এবং স্থানীয় নির্বাচন বানচাল করে, অতএব, এ অবস্থা নেপালের গণতান্ত্রিক চর্চাকে ব্যাহত করছে। বি.এস,এফ, অপরাধীদের নিরাপত্তা দিচ্ছে, ফলে তারা মুক্তভাবে তাদের কার্যকলাপ চালাচ্ছেন এবং নেপালিদেরকে কষ্ট দিচ্ছে। ২০০৫ সালে বিরাটনগর মিউনিশিপ্যালিটিসহ ডি.ডি.সি'তে মাসব্যাপী গণধর্ষনকে জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যখন অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন সকল প্রকার ভারতীয় অপরাধীদের দ্বারা একই অনুপাতে তাদের সংখ্যা দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়।

অতঃপর বি.এস.এফ সীমান্তের রাস্তাগুলো তৈরি করেছে, সীমান্ত এলাকাগুলো ভারতীয় অপরাধীদের আবাস স্থলে পরিণত হয়েছে, তারা অবাধে নেপালে প্রবেশ করে লুটতরাজ ও হত্যা করে ব্যাপক ধ্বংস চালায়। অতএব, নেপালিরা সীমান্ত এলাকায় বসবাস করতে রাজি নয়। এতে সহজেই অবৈধভাবে সীমা লংঘন করছে। ভারতের নাগরিকরা নিরাপত্তা বাহিনীর সাহায্যের সুযোগ নিয়ে অবৈধ ভাবে জমি দখল করে যুদ্ধ বিরোধী দু'দেশের মধ্যবর্তীস্থলে বাড়িঘর নির্মাণ করছে এবং কৃষি কার্য চালাচ্ছে।

ভারতীয়রা গৃহপালিত পশু চুরি করছে, কাঠ এবং বন্য পশুর চোরাচালান করছে, অন্যায়ভাবে বলপূর্বক ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করছে এবং নেপালি মহিলাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে। এ সমস্ত অপরাধীরা পরোক্ষভাবে ভারতের অধিকারীদের নিকট থেকে সাহায্য পাচ্ছে। উন্মুক্ত সীমান্ত বনাঞ্চল জ্বালানি কাঠ হিসেবে ধ্বংস করেছে, এবং প্রাকৃতিক সম্পদ এর মধ্যে কাঠ, ঔষধি গাছ, দুষ্প্রাপ্য পশু এবং পাখি চোরাচালান হচ্ছে।

ভারতে প্রতি পাঁচ মিনিটে একজন মহিলার উপর অত্যাচার করা হয়, অপহরণ করা হয় অথবা ধর্ষণ করা হয়। প্রতি চার মিনিটে একজন মহিলাকে পুড়িয়ে মারা হয়। এ ধরনের অপরাধ কার্য ৩৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। যা হোক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ সমস্ত ঘটনার অনীহা প্রকাশ করেছে। প্রত্যেক বছর জানা অজানা ৩-৫ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। এছাড়াও ভারতীয় অপরাধীরা ভারতে হত্যাকান্ড ঘটিয়ে মরদেহকে নেপালের অভ্যন্তর ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

অনেক ভারতীয় প্রতারক নেপালে এসে মানুষকে প্রতারিত করে। পিত্তলকে পরিবর্তন করে স্বর্ণ বানিয়ে মানুষকে প্রলুব্দ করে, এবং একশত রুপির নোটকে হাজার রুপিতে পরিণত করে এবং আরও অনেক কিছু করে। ভুয়া চিকিৎসক ভারতীয় শিক্ষকরা সার্টিফিকেটসহ, জ্যোতিষরা (ভবিষ্যৎ গণনা করা) সরল ও সাধরণ সৎ নেপালিদেরকে প্রত্যেক দিন প্রতারণা করছে। নেপালি যুবকরেদকে আমেরিকা

www.pathagar.com

পাঠানোর কথা বলে প্রতারণা করছে এবং তাদের সম্পদ লুট করছে। ভারতীয়রা চলচিত্রের নামে, চাতুরী কৌশলে, যাদুকর, গণক এবং সাধুগিরি দেখিয়ে সবসময় নেপালিদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। ভারতীয় ভুয়া আর্থিক কোম্পানিগুলো মানুষের সাথে প্রতারণা করছে। ভারতীয়রা চুরির উন্নতি বর্ধনের জন্য অকেজো বস্তু সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

মাদকদ্রব্য, অস্ত্রসস্ত্র, নকল মুদ্রা, শিশু এবং অবাধে মাহিলা অপহরণ করে পাচার করে থাকে। ভারতীয় চোরা চালানিরা পুলিশ বাহিনীর চেয়ে বেশী শক্তিশালীও অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত থাকে। তাই, শট, চোরাচালানি এবং অপরাধিরা সীমান্ত এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে। উন্মুক্ত সীমান্ত থাকার কারণে হাজার হাজার কিশোর শিশুকে বিভিন্ন বেশ্যালয়ে এবং ভারত সার্কাস দলে বেশ্যাবৃত্তি করার জন্য এবং শিশু অপরাধ অপব্যবহার করার জন্য বিক্রি করা হয়। ১৯৯০ সালের পর নেপালে অসংখ্য নিম্ন মধ্যবিত্ত ভারতীয় চোরাচালানিদের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তারা নেপালে ভাং তৈরি করতে সাহায্য করে। মাদকদ্রব্য চোরাচালান কিছু নেপালি যুবকবয়স্ককে চারিত্রিকভাবে বঞ্চিত করেছে।

তৃতীয় দেশ থেকে যখন মালামাল আমদানি রপ্তানি করা হয় তখন নেপালি ব্যবসায়ীরা ঘনঘন ভারতীয় ডাকাতদের আক্রমণে যন্ত্রনা ভোগ করছে। অবৈধ ব্যবসা ও উচ্চপর্যায়ে চলছে। কনটেইনারের শীলমোহর সামান্য না ভেঙ্গে বা চাবি না খুলে মালামাল উধাও হয়ে যাচ্ছে। ওয়েলডিং এবং পেইন্টিং কেটে এমনভাবে চুরি করা হচ্ছে যে মালিকরা বীমা কোম্পানির নিকট দাবী করতে পারছে না। ফলে নেপালি ব্যবসায়ীরা মিলিয়ন মিলিয়ন রুপি লোকসান করে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছেন। এটা হিসেব করা গিয়েছে যে, ৩৫,০০,০০০ ভারতীয় স্থায়ীভাবে কাজ করছে, এবং ১০-১৫ লক্ষ মৌসুমী শ্রমিক প্রত্যেক বৎসর কাজে যোগ দিচ্ছে। তাঁরা চোরাচালানি, ভেজাল, নিম্মানের দ্রব্যাদি উৎপাদন, চুরি, প্রতারণা, সংক্রমিত খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য অকেজো দ্রব্যাদি বিক্রির কাজে জড়িত রয়েছে।

ভারতীয়রা সিমেন্টের সঙ্গে মাটি মিশায়, চাউলের মধ্যে পাথর, ফল পাকনোর জন্য অন্যান্য বস্তু, বিষপূর্ণ শাকসব্জি, দৈ দুধ, মাখন ইত্যাদিতে ভেজাল করে অগুনীয় লোহাল্কড় বস্তুর আই,এস,আই এর চিহ্ন বসিয়ে বিক্রি করে থাকে। ভেজাল তামাক, মদ, বিষাক্ত সরিষার তৈল এর কারণে পান্ডুরোগ, গলগন্ড রোগ হচ্ছে এবং কিডনিও ফুসফুসের ক্ষতি হচ্ছে। ১৯৯০ সালের ১০ জুন ভারত ও নেপালের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ চুক্তিতে ভারতীয়রা যানবাহন দিয়ে অবাধে নেপালে চলে আসতে পারবে বলে অনুমোদন করা হয়, অথচ নেপালিরা ভারতে যানবাহন নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কড়াকড়ি ছিল, ফলে কালোবাজারীরা নিম্নমানের মালামাল সরবরাহ করত, এর মধ্যে ঔষধ ও কীট নাশক সার কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যাদির প্রচুর ক্ষতি করছে। ভেজালের জন্য মানুষ জীবন মরণ সমস্যায় আছে।

বাতিলকৃত বিষপূর্ণ তৈল, কৃষিজাত খাদ্যে ভেজালের ফলে পেটফোলা রোগ হচ্ছে, ভারত সেগুলো নেপালে বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে। অনুরূপভাবে কাগজের নোট/নগদ রুপি চোরাচালান করছে এবং ভারতীয়রা নেপালে নকল মুদ্রার ব্যবসা করছে। যে সমস্ত বিদেশী মুদ্রা সহজে পাওয়া যায় না সেগুলো নকল ছাপিয়ে বিক্রি

www.pathagar.com

করছে। নেপাল চোরাচালানিদের নিরাপদ স্থান, ভারতের নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি তৃতীয় দেশে বিক্রি করা হচ্ছে। ভারতে ১০০০০ লক্ষেরও বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এবং ভুয়া সার্টিফিকেট দিচ্ছে। প্রতিদিন ১০০ বেশী অবৈধভাবে লোক নেপালে ঐ সমস্ত ভুয়া কাজের জন্য আসছেন।

ভারত অবৈধ অস্ত্র তৈরি করছে এবং নেপালে রপ্তানি করছে। একারনে মাওবাদীরা বিস্তার লাভ করছে। চোরাচালানিরা দেশের তৈরি জটিল কলকব্জার অস্ত্র, গোলা বারুদ সরবরাহ করছে। ভারতের বিহার ও উত্তর প্রদেশ থেকে রাস্তার গুন্ডা ও রংবাজ ছেলেদেরকে ভাড়া করে এনে নেপালে ঘনঘন বোমাবাজি করছে। তারা সাধারণ নির্বাচনের সময় বোমামেরে ভোট কেন্দ্র দখল করে এবং বন্ধ হরতালের সময় অথবা শত্রুতা বশত মানুষের সম্পদের ধ্বংস চালাচ্ছে।

নেপাল সীমান্ত সমস্যার মীমাংসা করতে আগ্রহী তাই চীনের সঙ্গে সমাধান করা হয়েছে। ঠিক অনুরূপ ভাবে ভারতের সঙ্গে চুক্তি করতে চায়। ভারত এ বিষয়ে আলোচনা করতে রাজি নয়।

২. অবৈধ পথে কোন কিছু লাভ (Encroachments)

যে কোন দিক দিয়ে হোক না কেন সীমান্ত এলাকার জমি দখল নিয়ে প্রায় সকল স্থানেই বিস্তৃত এবং ভারতের সঙ্গে যুক্ত। যতটুকু সীমান্ত অধিকারের বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে তা হল ২১টি জেলার ৮৫টি স্থান। ভারতের দিক থেকে অব্যাহতভাবে সীমানা খুঁটিগুলো সরিয়ে অথবা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে ধ্বংস করে দিয়ে আইন লঙ্ঘন করে জায়গা দখল করে মীমাংসা করছে। সীমান্ত খুঁটিগুলো হচ্ছে জাতীয় অখণ্ডতার প্রহরী, এবং সীমান্তের স্বাক্ষী। যদি সত্যের উপর ভিত্তি করে দেয়া নিষ্প্রাণ স্বাক্ষীগুলোকে প্রতারণাপূর্ণ জীবন্ত মানুষ ধ্বংস করে দেয়, তাহলে সেখানে অবিচার, অনৈতিক এবং ভুলনীতি প্রবেশ করে তবে তা আদিমকালের "জোর যার মুল্লুক তার" অবস্থায় পৌঁছে যাবে। এ নীতি হচ্ছে বিরুদ্ধ নীতি এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, উদারনীতি, বিশ্বায়ন এবং মুক্তি ইত্যাদি শব্দের অর্থের বিরুদ্ধে তাদের আচরণ।

সীমান্তের খুঁটিগুলো উভয় দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে তৈরি করা হয়েছে কিন্তু ধ্বংস করা হয়েছে এককভাবে এবং গোপনে। ধারণা হচ্ছে যে কোন কোন সময় নদীগুলোর প্রবাহ পরিবর্তন করে ফেলে, এবং তাতে সমস্যার সৃষ্টি হয়, কিন্তু খুঁটিগুলো হল সীমান্ত চিহ্ন যা সকল সমস্যা থেকে মুক্ত এসমস্ত চিহ্নগুলো এককভাবে পরিবর্তন করার কোন অধিকার নেই। তাছাড়া যে পতিত অঞ্চলের উপর ন্যায্য দাবী নেই ভারত এখানকার সময়ে সে স্থান দখল করে বিভিন্ন এলাকায় প্রচণ্ড তীব্রতা বৃদ্ধি করছে। যেস্থানের উপর কারও ন্যায্য দাবী নেই সেখানের কংক্রিটের নির্মিত খুঁটিগুলো সড়িয়ে দিতে ভারতের অস্ত্র সজ্জিত পুলিশ সম্পৃক্ত রয়েছে। সীমান্তে পতিত জমি গুলি ভারতের অধিকারিদের সঙ্গে পুলিশের লোকেরা অকথিত বুঝাপড়ার মধ্যে দখল করে নিচ্ছে। সরকারি অধিকারিরা তাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছে। যে স্থানের উপর কোন দেশেরই ন্যায্য অধিকার নেই সে স্থানের উপর ভারত সরকার বাণিজ্য দূতের বাসভবন এবং কাষ্টমস দফতর নির্মাণ করেছে। ভারত রাতারাতি কৃত্রিম খুঁটি বসিয়েছে,

www.pathagar.com

নেপালের অভ্যন্তরে বহুস্থানে মোর ফিরিয়ে দিয়ে তৃতীয় পতিত এলাকা তৈরি করেছে। যদি কেহ বিশ্লেষণ করতে সেখানে যায়, তবে সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে এত সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটে যে স্থানে সাধারণ মানুষ অবগত নয় এ সমস্ত খবর সারা বছরে কেউ জানতে পারে না ফলে চিহ্নগুলো মুছে ফেলে। এগুলো হয়েছে ভারতের ইতর প্রকৃতির প্রবণতার জ্বলন্ত উদাহরণ। সীমান্তের খুঁটিগুলোর স্থান পরিবর্তন করে ফেলে, অপসারণ করে ফেলে, বদল করে ফেলে এবং সমূলে উৎপাটন করে ফেলে। অনেক খুঁটি ধ্বংস করে ফেলে যেগুলোর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, যেমন- ভারতীয়রা খুঁটিগুলো ভারত সীমান্তের ৩.৫ কিলোমিটার উত্তরে নেপাল ও সান্তাতে বসিয়েছে। ভারতের সীমান্ত রক্ষীরা খুটি নং ৩৩ শিরসীয়া থেকে অপসারণ করে ফেলেছে। দু'দেশের যুক্তদল ২৫ বার আলোচনার বসেছে, কিন্তু দখলকৃত জয়গা যেমন ছিল তেমনই আছে। ১৯৬৬ সালে ৬ জুলাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে সীমান্ত এলাকার পতিত জমি দখলের বিষয়ে মিমাংসা করার জন্য উভয়দিক থেকে ৩ কিলোমিটার জায়গা মুক্ত রাখা হবে। ভারত এখন এড়িয়ে যাচ্ছে। এভাবে যদি বিষয়টিগুলো চলতে থাকে তাহলে সীমান্তের খুঁটি বসানোর কোন অর্থ হয় না এবং আগামী দিনগুলোতে সেভাবেই চলতে থাকবে।

৩. জলমগ্নতা
(Water Loggings)

বড় এবং দীর্ঘ নদীগুলো যেমন কেশী, গন্ধকী, মহাকালী, হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার নদীগুলোকে বাঁধা দিয়ে রেখেছে এবং নদীর উভয় দিকে জল স্রোতকে বাঁধ দিয়ে এর সম্পদ, মানুষ, জমি এবং বসতি বসিয়ে সংরক্ষণ করছে। নেপালের সংঙ্গে কোন প্রাকার আলোচনা না করেই জলস্রোতকে আটকানোর জন্য ভারতের দিকে বাধ তৈরি করেছে, নেপালের অংশ জলমগ্ন হয়ে বন্যার সৃষ্টি করেছে। মিলিয়ন মিলিয়ন রুপির সম্পত্তি ধ্বংস করা হচ্ছে, ভারত যদি বাঁধ তৈরি করে নদীর স্রোতধারা বন্ধ না করত তাহলে স্রোত ধারা প্রাকৃতিক নিয়মেই বয়ে যেত এবং নেপাল বন্যা কবলিত হত না।

ক্ষুদ্র নদীগুলো নেপালের মহাভারত পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং নেপালে তিরাই অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ছাড় পাহাড়ে রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্মিত বাঁধ পর্যন্ত চলে গিয়াছে। ভারতের দিকে নেপালের সীমান্ত সংলগ্ন বাঁধ নির্মাণ করে কৃষি কাজ করছে। তৃতীয় ধাপের নদীগুলো ছড়ি পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর জলপ্রবাহ স্থানীয়/ জেলা কমিটি, গাউন পঞ্চায়েত কর্তৃক কল দিয়ে ভারতের ভোক্তাদেরকে দেয়া হয়। এতে নেপালকে জলে নিমজ্জিত এবং ভারতকে জলসেচে সাহায্য করছে।

নদীর ঢেউ উভয় তীর শুধু ভাঙ্গছে না, নেপালিদের দেশকে বন্যা কবলিত করে নিমজ্জিত করে রাখছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাচ্ছে বাগমতির বাঁধের ফলে নদীর ভাঙ্গন এককভাবে ৩৭ ভি.ডি.পি মিউনিসিপ্যালিটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দক্ষিণের সীমান্ত এলাকায় এ ধরণে শত অভিযোগ রয়েছে জলাবদ্ধতার কারণে বসতি এলাকা এবং কৃষি ভূমি বালিতে পূর্ণ হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষকে উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে বাধ্য করেছে,

www.pathagar.com

তারা তাদের বসতবাড়ীও গ্রামকে হারিয়ে ফেলেছে। বহুমানুষ এবং গৃহপালিত পশু মারা গিয়াছে এবং খাদ্যদ্রব্য অখাদ্যে পরিণত হয়েছে। জলমগ্নতার কারণে প্রায় যথাযথভাবে সীমান্তের সমান্তরালে নদীগুলোর জলকে ভাণ্ডারে পরিণত করা হয়েছে এবং ভান্ডার জল নেপালের জমিগুলোকে ক্ষয় করছে। নদীগুলো বেশীবেশী প্লাবিত হয়ে অঞ্চলকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। হাজার হাজার হেক্টর জমির ফসল জলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। নদীগুলো অতিক্রম করা কঠিন হচ্ছে। এতে বাড়ীঘর এবং খামার ডুবে যাচ্ছে। সীমান্ত এলাকার বসবাসকারী মানুষ মৌসুমী বায়ুর ফলে এক দুঃশহনীয় জীবন অতিবাহিত করছে।

৪. বৃহত্তর নেপাল
(Greater Nepal)

সুগাওলী চুক্তির পূর্বে (যাকে বৃহৎ নেপালের সীমান্ত সমস্যা বলা হত) নেপালের অধিকারভুক্ত এলাকা নেপালের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। ১৮১৫-১৬ সালের সুগাওলী চুক্তির কারণে নেপাল তার বৃহৎ অধিকারভুক্ত এলাকা সংক্ষিপ্ত করে ক্ষদ্রায়তনে পরিণত হয়। পূর্বে তিস্তা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পশ্চিমে সুতলেজ নদীর ওপারে কাঙ্গগারা, দক্ষিণে গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থল এবং পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশকে স্পর্শ করে প্রবাহিত হচ্ছে। বৃহৎ নেপালকে ২,০৪৯১৭ থেকে ১৪৭১৪১ বর্গ কিলোমিটার রূপান্তরিত করা হয়েছে। ১৯৫০ সালের বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তির পর ৫৭.৭৭৬ বর্গ কিলোমিটার জায়গা ভারত এখনও ফেরত দেয় নি।

ব্রিটিশদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বিশ্ব যুদ্ধগুলোতে নেপাল অনেক অবদান রেখেছে। কিন্তু ব্রিটিশরা নেপালি জনগণের সঙ্গে সব সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে তারা নেপালের একটা বৃহৎ অংশকে ভেঙে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। তারা অসৎভাবে এবং প্রতারণা করে নেপালের জায়গা নেপালকে না দিয়ে চলে গেছে। ব্রিটিশের সঙ্গে সুগাওলী চুক্তিই সীমান্ত নির্ধারণের একমাত্র ভিত্তি হয় যা ১৯৫০ সালে ভারত এবং বৃটেনের সঙ্গে চুক্তির দ্বারা পূর্ববর্তী সকল চুক্তি সুগাওলী চুক্তিসহ বাতিল করে দেয়া হয়। এর অর্থ হল সুগাওলী চুক্তি হওয়ার পূর্বের সকল জায়গা নেপালের দখল করার অধিকার আছে। এটা ভিক্ষা চাওয়া নয় বরং নেপালের আইনগত অধিকার, এখন যদি ত্রিদেশীয় একটি সমঝোতা হয়, তা হলে দেখা যাবে সুগাওলী চুক্তির পূর্বের নেপালই সত্যিকারের নেপাল, ভারত যখনই চার সংখ্যার চর্চা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছে তখনই সকল প্রকার আদর্শ চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, সমঝোতা, আইন, নৈতিকতা এবং ভাল প্রতিবেশীর আচরণের কথা ভুলে গিয়ে সিকিমকে গ্রাস করে ফেলে।

অতঃপর ১৮১৫ সালের সুগাওলী চুক্তি পুন:বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, যে চুক্তি ১৮১৬ সালে দৃঢ় ভাবে অনুমোদন করা হয়েছে এবং ১৯৫০ সালের বন্ধুত্বের চুক্তি অনুযায়ী ভারতের গ্রাস থেকে হারানো রাজ্যাংশ ফিরে পাবে। এই আধুনিক যুগেও ভারত কালাপানির মত বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে অবস্থিত বাগডোগ্রা গ্যালগালিয়াকে সামরিক বাহিনী দিয়ে নেপালকে দখল করার ভয় দেখিয়ে উল্লেখিত এলাকা গ্রাস করে রেখেছে। নেপালী কংগ্রেস সরকার ঘিশিং এর গোরখা রাজ্য

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে, পরিবর্তে কোলকাতায় নিযুক্ত নেপালের কাউন্সিলর জেনারেল দৃঢ়ভাবে পশ্চিম বাংলা সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন। ইরাক যেভাবে কুয়েত দখল করে উদ্ধত ভাবে ১৯তম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করেছিল, ঠিক অনুরূভাবে ভারত নেপালের জায়গা দখল করে রেখেছে। নেপাল এবং ভারতের ইতিহাস এবং চুক্তিসমূহ এবং দু'দেশের মধ্যে সমঝোতার বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন, কারণ নেপালের জায়গা ভারত কিভাবে দখল করে রেখেছে তা বুঝা উচিত। বৃহৎ নেপালের দাবীর ঐতিহাসিক নজিরসমূহ নেপাল বাতিল করে রেখেছে। উদারহণ স্বরুপ বলা যায় ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মি. নেহেরু ১৯৫৯ সালে নেপাল ভ্রমণের সময় ১৯৫০ সালের বাণিজ্য চুক্তিকে সংশোধনের জন্য রাজি হয়েছিলেন। তিনি আরও কথা দিয়ে ছিলেন ভারতের পরিদর্শন চৌকি নেপাল থেকে উঠিয়ে নেবে। নেহেরু বলেছিলেন দেরাদ্দুন, কুমাত্ত এবং নৈনিতাল ও শিমলা নেপালের রাজ্যাংশ যা ব্রিটিশরা দখল করে রেখেছিল। লেখক ই.সি. কোজল. ব্রীফ ডিকশনারী অব দার্জিলিং এ লিখেছেন এ সমস্ত রাজ্যাংশের মালিক নেপাল।

ব্রিটিশ ভারত শক্তি প্রয়োগ করে নেপালকে সুগাওলী চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। তাদের ভয় ছিল পাহাড়ী অঞ্চলে প্রশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী তাদের রাজ্য পূর্বে ব্রাহ্মপুত্র নদ, পশ্চিমে পামির পর্যন্ত বিস্তৃত করে ফেলবে। সুগাওলী চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল নেপালিরা যাতে যুদ্ধ করতে না পারে সেজন্য তাদেরকে চাকরিচ্যুত করবে ফলে তারা তাদের রাজ্য পূর্ব দিকে তিতাস নদী এবং পশ্চিমে সাতলাজ এর বেশী বৃদ্ধি করতে পারবেনা। ১৯৫০ সালের চুক্তির ধারা ৮ অনুযায়ী সুগাওণী চুক্তির পূর্বের সকল চুক্তি, পত্রাদি এবং সমঝোতার পত্র বাতিল করা হয়। এ চুক্তি বাতিলেল প্রস্তাবে বলা হয় সুগাওলী চুক্তির পূর্বে নেপালের যে রাজ্যাংশ ছিল প্রথা অনুযায়ী নেপালের অধিকারে থাকবে।

ব্রিটিশরা কৌশলে সুগাওলী চুক্তি স্বাক্ষর করে যাতে নেপালকে প্রতিহত করার জন্য সিকিম, আসাম ও অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চার না করতে পারে। সুগাওলী চুক্তির পূর্বে অথবা পরে দেখা গিয়েছে যে চুক্তি ধারা ৬ এ নেপালের পূর্বে সিমান্তে তিসতা নদী পর্যন্ত বিস্তত। চুক্তিতে ধারা ৬ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সিকিমকে নিরাপদ রাখার জন্য যাতে নেপাল দখল করতে না পারে।

ইস্ট ইন্ডিরা কোম্পনির সঙ্গে সিকিম এর টিটালিয়া চুক্তি হয়, ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে নেপালের চুক্তি পত্রটি ছিল পশ্চিম তেরাই ফেরত দেওয়ার জন্য, যক্তি ছিল যে দার্জিলিং নেপালের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনুরূপভাবে ১৭৭৯ সনের ৪ এপ্রিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ভূটানের চুক্তি হয়, এবং সর্ব শেষ চুক্তি হয় ১৮৪৯ সালের ৮ আগস্ট তাতে যুক্তি দেখান হয় যে মেছি থেকে তিসতি নেপালের মধ্যে অবস্থিত। অতঃপর সংবিধানের ১(৩)(সি) অনুযায়ী ভারত উক্ত এলাকাগুলো অন্তর্ভুক্ত করে নি এবং দার্জিলিংকে ও (ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। ১৯৪৭ সালে তৎকালীন সমন্বিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (আই.সি.পি) দার্জিলিং কমিটি ভারতের সংসদীয় আইন সভাকে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল যে দার্জিলিংকে অন্তর্ভুক্ত করে স্বাধীন জাতীয় গোরখাস্তান গঠন করতে, এবং সিকিম নেপালের সঙ্গে থাকবে। উপরোল্লিখিত ১৯৫০ সালের চুক্তি দলিলের ধারা ১ এবং ৮ এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

চুক্তির ধারা ২ অনুযায়ী ভারত ক্রমান্বয়ে নেপালের হারান রাজ্যাংশ ফেরত দেবে। ধারায় বলা হয়েছে, ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে গোরাখপুর জেলা এবং রাপ্তি নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র নিম্নভূমি, এবং কালি এবং রাপ্তনদীর মধ্যবর্তী সমগ্র নিম্নভূমি যা সুগাওলী চুক্তির পূর্বে নেপালের রাজাদের অধিকার ছিল এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকারের নিমন্ত্রণে ছিল সেগুলো সার্বভৌম নেপালের রাজাদেরকে ফেরত দেয়া হবে। ১৮৬০ সালে ১ নভেম্বর ভারত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল নেপালের রাজ্যোংশ ফেরত দেয়া হবে। সুগাওলী চুক্তি বলবৎ করা হয় নি, এমনকি সিকিমের সঙ্গে চুক্তি বলবৎ করার পরও তাহয়নি, পরস্পর বোঝাপড়া এবং চুক্তি বলবৎ না করা হলে স্বাভাবিকভাবেই মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। কোন চুক্তি বলবৎ না করে ভারত চুক্তির মেয়াদ স্বীকার করতে রাজি নয়। কিন্তু সুগাওলী চুক্তি আত্মবিরোধী অথচ সত্য।

১৯৫০ সালের বন্ধুত্ব ও শান্তি চুক্তির ধারা ৮ অনুযায়ী সুগাওলী চুক্তি অকার্যকর করা হয়। অতএব ১৯৫০ সালের চুক্তি ধারা ৮ থাকুক অথবা চুক্তি স্বীয় প্রকৃতিগতভাবে সুগাওলী চুক্তির পূর্বের দার্জিলিং এবং অন্যান্য রাজ্যাংশের উপর নেপালের অধিকার আছে। নেপালেল হারান রাজ্যাংশ বৃটেন কর্তৃক ইজারা নেয়া হয়, যেমন চীনের নিকট থেকে হংকংকে ইজারা নেয়া হয়েছিল। চীন এবং বৃটেনের সঙ্গে হংকং চুক্তির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে একটি প্রবাদ বাক্য 'চিরকালের জন্য' চিরকালের জন্য' উক্তিটি সুগাওলী চুক্তিতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটার অর্থ দু'দেশর সম্মতিতে যে চুক্তি হয় তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে একশত বছর পর। চুক্তির ধারা ৪ অনুযায়ী কোম্পানি সরকার যে জমি ইজারা নিয়েছে তার পরিবর্তে বার্ষিক দু'লক্ষ রুপি সম্মানী বাবদ দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি বন্ধ হয়। একই চুক্তির ধারা ৯ অনুযায়ী ভারত চিরস্থায়ীভাবে পরগনা জেলাকে (বর্তমানে বিজয়পুর জেলা বলা হয়) নেপালের দখলে দেয়া হয়।, ভারত একই ধারা অনযায়ী রাজ্যাংশে দখল পুনরায় ফিরিয়ে নেয়। ১৯৫০ (এ.ডি) সালের ৩০ অক্টোবর নেপাল এবং ইউ,কে'র মধ্যে চুক্তি করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নেপালের রাজ্যাংশাতে ভারতের অর্ন্তভূক্ত করে ফিরিয়ে নেয়া। ভারত এবং পাকিস্তান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৮২৩ সালের ২১ ডিসেম্বর কাঠমুন্ডু চুক্তির কার্যকারিতা বাতিল হয়ে যায়। বিষয়টির মুখবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। নেপাল এবং বৃটেন উভয়ে সম্মত হয়ে নিম্নবর্ণিত ধারা অনুযায়ী নতুন চুক্তি করে।

অতএব বৃহৎ নেপালের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নূতন কিছু নয় এবং অস্বাভাবিকও নয়, এবং আন্তর্জাতিক আইন চুক্তি এবং সন্ধির বিরুদ্ধে নয়। উপরন্ত বৃহৎ নেপালের প্রশ্নটি অমিমাংসিত রয়ে গিয়েছে, উম্মুক্ত সীমান্ত থাকার ফলে হাস্যকর অবস্থা সৃষ্টির বিষয়টি বিশ্লেষণও সনাক্ত করা প্রয়োজন।

মনোভাবের বিচার্য বিষয়
(The Attitude Issues)

ভারত অব্যবহিত কাছের প্রতিবেশী দেশগুলোকে প্রভাবিত ও কর্তৃত্বাধীন রেখে দেখাতে চায় যে তারা খুব শক্তিশালী জাতি। ভারত চায় প্রতিবেশী দেশগুলো প্রত্যেক আর্ন্তজাতিক আলাপ আলোচনার স্থান এবং সংস্থার জাতিসংঘ সহ তাদের পক্ষে ভোট

www.pathagar.com

প্রদান করতে। কিন্তু নেপাল ভারতের কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন থাকতে, দমন ও নূতন ঔপনেবেশিক শাসন থেকে মুক্ত, সার্বভৌমত্বকে সুদৃঢ় এবং সুগাওলী চুক্তির পূর্বের অবস্থান বজায় রাখতে চায়। ভারত চায় নেপালকে তার সামরিক বন্ধন ও দেশ রক্ষা কৌশল দিয়ে আটকিয়ে রাখতে। কিন্তু নেপাল সে ছত্রছায়ায় ও কৌশলকে প্রত্যাখান করেছে। নেপালের ইচ্ছা দেশ রক্ষার জন্য তার নিজস্ব নীতিও কৌশল অবলম্বন করবে।

নেপালের মত, বর্তমান ভারত বায়টির বেশী ক্ষুদ্র সার্বভৌম ও স্বাধীন এবং রাজ্য নৃপতি সাশিত রাজ্য নিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে। ব্রিটিশরা ভারতে এসে ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো নৃপতি শাসিত রাজ্য নিয়ে একত্রিতকরে বৃহৎ ভারত গঠন করেছিল। ঐ ধারণার বশবর্তী হয়ে ভারত ব্রিটিশের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এছাড়া নেপালকে গ্রাস করার জন্য ব্রিটিশ ভারত মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ চালাত। যা হোক, প্রত্যেক যুদ্ধে তারা পরাজয় বরণ করেছে। ব্রিটিশরা ছেড়ে যাওয়ার পরও ভারত ঔপনিবেশিক কার্যকলাপকে ত্যাগ করতে পারে নি। ফলস্বরূপ গোয়া, দমন, দিউ, হায়দরাবাদ, জন্মুকাশ্মীর এবং সিকিমকে ভারতের আন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ভুটান অংশত উপনিবেশ। ভারতের ঔপনিবেশিক মনোভাবের কারণে নেপাল অস্বীকার করে।

১৯৪৭ সালে ভারতের আবির্ভাব, নেপালের চেয়ে বেশ ছোট হয়েও নেপালের সঙ্গে বড় দাদা শুলভ আচরণ করতে চায়, মনে করে নেপাল তার হাতের তৈরি এবং এককভাবে অবরোধ আরোপ করে দুর্বল করতে চায়, এছাড়া আরও অনেক কিছু। ভারতের ব্যবহারে মনে হয় নেপাল ভারতের করদরাজ্য। ভারতের এই আমলাতান্ত্রিক মনোভাবকে নেপাল সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার ও ঘৃণা করে। ভারত নেপালের দরদী হতে চায়, অথচ নেপাল তার নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। নেপাল, ভারত এবং চীনকে সমান দূরত্বে রাখতে চায়; এবং উভয় দেশের সঙ্গে একই আচরণ করতে চায়।

ভুটান যদিও স্বাধীন, সার্বভৌম এবং রাজা শাসিত দেশ, সেখানকার জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার দাবী করছে কারণ তাদেরকে শাসনাধীনে রাখার জন্য নিপিড়ন, শোষণ ও অত্যাচার চালাচ্ছে। যখন ভুটানের নেপালীরা জীবন যাত্রাকে ঝুকিপূর্ন মনে করছে তখন তারা রাজনৈতিক উদ্বাস্ত হিসেবে ভারতে প্রবেশ করছে। ভারত তাদেরকে ট্রাকে করে নেপালের দিকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। স্বৈরতন্ত্র ভুটান ভারতের নিকট থেকে নিরপত্তা পাচ্ছে। নেপালের দৃঢ় অবস্থানের জন্য ভারত সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে দমন করছে। সত্য কথা হল নেপালে ভূটানের চেয়ে অনেক বেশী গনতান্ত্রিক চর্চা হচ্ছে। ভারত দু'লক্ষ ভুটানের উদ্বাস্তকে (একজন রেকর্ড করা এবং একজন রেকর্ড ছাড়া) নেপালে তাড়িয়ে দিচ্ছে। ভারত না নেপালের প্রতি সুবিচার করছে না ভুটানীদের প্রতি করেছে। বিশ্লেষকদের মতে ভারতের বৃহৎ কৌশলের নিকট ভুটান হবে পরবর্তী সিকিম। নেপাল সে ধরনের অবিচারকে প্রত্যাখান করবে।

ভারত ব্রিটেনের নিকট থেকে ঔপনিবেশিকতার শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং একই ধরনের পুরাতন কৌশলে চর্চা করছে ভারত সস্তা সাহিত্য ও চলচিত্র নেপালে প্রেরণ করে জনসাধারণের মধ্যে দুর্নীতের অভ্যাস গড়ে তুলছে। নৈতিকতার অধঃপতন ঘটাচ্ছে এবং সংস্কৃতিকে বিপথে পরিচালিত করছে। এসমস্ত বিষয়াদি অবাধে নেপালে

www.pathagar.com

আসছে, এতে নেপালী জনগণকে শুধু নৈতিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা নয়, তাদের সনদ ভারতে স্থানান্তরিত হয়ে চলে যাচ্ছে। এ ধরনের অভ্যাসগুলোকে কিছু সংখ্যক দর্জিয়ানরা উৎসাহিত করছে এবং ভারতের দূতাবাস নিরাপত্তা দিচ্ছে। ভারত চাচ্ছে ভারতের কিছু নাগরিককে সার্ক দেশগুলোতে স্থানান্তরিত করতে, তাহলে অধিক জনসংখ্যার ভার কিছুটা লাঘব হত। ভারত আরও চায় গৃহহীন, গরীব অশিক্ষিত এবং ভিক্ষুকদের প্রতিবেশী দেশে পাঠিয়ে দিতে। ভারতীয়দের অন্যত্র প্রেরণের কোন সুযোগ না পেয়ে ভারত তার সীমান্ত এলাকায় বৈদ্যুতিক তারের বেড়া দিয়ে রেখেছে, এখনও সেখানে অনধিকার প্রবেশের সম্ভাবনা আছে, তবে নেপাল অস্বীকার করেছে।

ভারত ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তির রোগে ভুগতেছে এবং দাসত্বের মানসিকতা নেপালের উপর আরোপ করতে চাচ্ছে। ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তির কারণে নেপাল তার হারানো রাজ্যাংশ ভারতের গ্রাস থেকে ফিরে পাচ্ছে না। ভারত প্রথাগতভাবেই নেপালের সার্বভৌমত্বকে অসম্মান করছে এবং নিজের সিদ্ধান্তকে আরোপ করছে। ভারত অবরোধের ব্যাপারে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সামরিক শক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ছড়িয়ে দিবে অথবা সমস্ত পুলিশ অথবা নেপালের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে গ্রেফতার করে সীমান্ত বিরোধ, জলমগ্নতা, আত্মরক্ষামূলক প্রতিবন্ধকতা এবং বাঁধ নির্মাণকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। নেপালিদের আন্তরিক ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে ভারত মধ্যে মধ্যেই অসৌজন্য আচরণ করছে। সে যা হোক নেপালিরা সকল সময়েই ভারতকে সমকক্ষ সঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করে।

সানশারী জেলার কোশিতে বাঁধ নির্মার্ণের জন্য নেপাল ভারতের নিকট কিছু পরিমান জমি ইজারা দিয়েছিল। কিন্তু ভারত একদশক পরও ইজারা দেয়ার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও জায়গা ফেরত দেয় নি। ভারত না প্রকল্প বন্ধ করে দিয়েছে না জমি ফেরত দিয়েছে। না তারা কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। না প্রকল্প নবায়ণ করেছে। ভারত কোশি, গন্ধকী এবং মহাখালী বাঁধ নির্মাণ করছে একমাত্র তাদের লাভের জন্য। যদি বাধটি নেপালের পাহাড়ের পদদেশে তৈরি করা হত তা হলে প্রচুর বিদ্যুত উৎপন্ন হোত। এ ছাড়া নেপালের তেরাই বলয়ে কর্ষণোপযোগী জমিতে সেচের কাজ করা যেত এবং নেপাল প্রধান বিদ্যুতবাহি তারজালি নিয়ন্ত্রণ করতে পারত।

একমাত্র খারাপ ইচ্ছার মনোভাব এর কারণে ভারত নেপালের সীমান্ত এলাকা দখল করছে। এটা হচ্ছে নেপালকে হয়রানি করার অন্যতম কারণ। পশ্চিমে মহাখালি নদীর তীর দিয়ে ভারতের অন্যায় ভাবে জমি দখলের বিরুদ্ধে যখন জনসাধারণ প্রতিবাদ জানাচ্ছিল তখন ভারতীয় জরিপকারীরা ভদ্রপুর মিউনিসিপ্যালিটির পূর্ব দিকে সীমান্ত খুঁটি বসাচ্ছিল শুধুমাত্র হয়রানি করার জন্য। অতএব ভারত চীনের মত ভদ্রতা এবং প্রতিবেশী দেশের প্রতি স্পষ্ট মনোভর দেখায়নি। হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি এসব কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, যেমন-সীমান্তে খুঁটিগুলো উধাও করে দেয়া, রাজ্যাংশ দখলকরা, প্লাবনের সৃষ্টি করা, জলমগ্ন করে রাখা এবং আরও অনেক গর্হিত কাজ করা, কিন্তু এ সমস্ত অপকর্ম বন্ধ করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। নেপাল তার নাগরিকদের জন্য কাজের অনুমতি পত্র চালু করার নিয়ম বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল কিন্তু ভারত বিরোধিতা করে।

www.pathagar.com

ভুটানের গণতান্ত্রিক নেতা রংথেনে কিনলে দর্জি নেপালে ভুটানের উদ্বাস্তুদের বিষয়ে ভারতের মধ্যস্থতায় রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য দিল্লী যান। ইতোমধ্যে ভারত সরকার ভবিষ্যৎ কিছুর আসঙ্কা করে গণতন্ত্রের নিয়ম বিরুদ্ধ ও মানবাদিকারের প্রতি অসত্য দেখে তাকে করাগারে নিক্ষেপ করে সন্ত্রাসী ঘোষণা করা হলে মাওবাদীরা মধ্যস্থতা করে এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ব্যবহারের জন্য ঘোষনা দেয়া হয়। দুর্বলেরাই অবিচার সহ্য করে? নেপালিরা ভারতের কর্তৃত্ব মেনে চলছে কারণ নেপাল ক্ষুদ্ররাষ্ট্র এবং শক্তিতে দুর্বল। মেছি এবং মহাখালির লোকদের কোন স্থান ছিল না, এমনকি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও তীর্থস্থান ছিল না। ভারত সীমান্ত এলাকার চারিদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। ভারতের দখল থেকে নেপালকে বাচানোর জন্য সকল নেপালি তাদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এতে ভারত নেপালিদের নিকট যে সম্মানপেত তা হারিয়ে ফেলে।

হস্তক্ষেপের বিষয়
(The Issue of Interferences)

১. অবিরত হস্তক্ষেপ

দু'দেশের মধ্যে ১৯৫০ সালের বন্ধুত্বের চুক্তি হওয়ার ঠিক পর থেকেই নেপালে অবিরাম হস্তক্ষেপের বিষয় হয়ে দাড়ায় যদি তারা তাদের সার্বভৌমত্ব নিরাপদ রেখে নিজেরা প্রকল্প তৈরি নিজেদের সিদ্ধান্তে কাজ না করে তবে নেপালি জনগণের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতি অসম্ভব হবে।

ভারত ইতোমধ্যে সীমান্ত অবরোধ করে দিয়েছে এবং অতীতের দু'বার করেছে। নেপালে রাজনৈতিক পরিবর্তন আরোপ করেছিল। ১৯৯০ সালের ১০ জুন সমঝোতা হয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অর্থনৈতিক এবং নিয়োগ দানের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। ১৯৯৮ সালে চীনের একজন প্রেয়োগবিদকে হঠাৎ আক্রমণ করা এবং বানেশ্বরের কাহিনী নেপালে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপের উদাহরণ। নেপাল মনস্থ করেছে জাতীয় অখণ্ডতা ও অগ্রগতিকে সমৃদ্ধ করে নিজস্ব পৃথক পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে। অন্যদিকে ভারত চাচ্ছে, নেপালকে আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির সঙ্গে সদৃশ্য করে তুলতে। এভাবে বিভিন্ন প্রকারের বাঁধার সৃষ্টি করে নেপালকে একত্র হওয়া থেকে বঞ্চিত করা। নেপাল চায় গণতান্ত্রিক চর্চাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে। কিন্তু ভারত এটা পরিত্যাগ করার জন্য পিছনে লেগে আছে। ভারতের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হল নেপালকে তাদের কুক্ষিগত করে রাখা। ভারতের জন্য ভুটান হল গণতান্ত্রিক দেশ এবং মানবাধিকার আছে যেখানে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা আছে অথচ যেখানে কোন বেসরকারি নিবন্ধকৃত সংবাদপত্র নেই। এ দিকে নেপাল, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে কোন কিছু নেই বলে ভারত প্রচার করে।

নেপাল বিশ্বাস করে যে সমুদ্র বন্দরসহ একটি সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব ভূ-বেষ্টিত দেশেরই, সে সাথে সবচেয়ে কাছের সমুদ্র উপকূলে যাতায়াত সহজতর করা। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারত এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। নেপাল চায় প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যবসা হবে অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যাদির উদ্দেশ্যের মত। কিন্তু ভারত স্পষ্টভাবে এ কৌশলের বিরোধিতা করছে। নেপাল এমন একটি দেশ যেখানে বিভিন্ন জাতি, বর্ধ, বর্ণ এবং সংস্কৃতি বিদ্যমান। রাজার নিশ্চিত আশ্রয়ে সকলকে মিলিত করে নেপালি জাতি গঠিত হয়েছে। নেপাল

www.pathagar.com

তার নিজের অবস্থাতেই খুশি, কিন্তু ভারত বিভিন্ন আঞ্চলের জাতিগত দলের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তজনা সৃস্টি করার চেষ্টা করছে।

ভারত তার পার্শ্ববর্তী সকল প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে কর্তৃত্ব করার ব্যবহার করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাচ্ছে যে, বিধিবহির্ভুতভাবে ভারতের সেনাবাহিনী প্রধানের শ্রী বীপিনচন্দ্র জোসীর বাংলাদেশ সফরের সময় ভারতীয় সেনা বাহিনীর দু'টি বিমান পোত অবৈধভাবে জোর করে বাংলাদেশের লালমুনিঘাট এলাকায় প্রবশ করে। ঠিক একই ভাবে ভারতীয় সৈন্য জোর করে শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপে প্রবেশ করে এবং সিকিম এর কথা উল্লেখ করা হল না।

২. রাজনৈতিক মনোভাব ঃ অবৈধ হস্তক্ষেপ (Political game plan Interference)

উম্মুক্ত সীমান্তের সুযোগ গ্রহন করে 'র' নেপালে শিকড় গেথে নিয়েছে। এ সংস্থাটির কার্যকলাপ নেপালের রাজনীতিতে এবং প্রসাসনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নেপালের রাজনৈতিক নেতারা বুঝে নিয়েছে যে 'র' এর সমর্থন ছাড়া ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব নয়। উম্মুক্ত সীমান্ত থাকার কারণে ভারতীয় নাগরিকরা সহজে নেপালে অনুপ্রেবেশ করে নেপালি নাগরিকত্ব গ্রহণ করছে। এঅবস্থার ফলে অদূর ভবিষ্যতে নেপালিরা সংখ্যালঘু নাগরিকে পরিণত হবে। ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে দশকপুরাতন অনির্বাচিত সংসদে সীতারাম ইঅছউরি এবং অন্যান্য ভারতীয় নাগরিকাদেরকে নেপালে জাতীয় প্রধান হিসেবে অভ্যর্থনা জানায়, একই সময়ে তথাকথিত এস,পি.এ. ঐ শ্রেনীর এম.পি. দেরকে নিষিদ্ধ করা হয় সংসদকে সমাহিত করা যেমনটি ভারত বলেছে। ১৯৯০ সালে রাজনৈতিক পরিবর্তনে মিঃ চন্দ্র শেখর এবং স্বামী সুব্রামানিয়াম অনুরূপ করেছিলেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে একরাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যেতে চাইলে ভারতের নাগিরিকরা পূর্বানুমতি গ্রহণ করত। তৎসত্ত্বেও ভারতীয় পুলিশ এবং উর্দি পরিহিত সামরিক লোক এবং সামরিক বাহিনী একটি সার্বভৌমদেশের আদর্শ যথাযথ ভাবে পালন না করে জোর করে নেপালে প্রবেশ করে। তারা সর্বত্র তর্জন গর্জন করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে হয়রানি করে থাকে। পুকুরে সাবলীলভাবে ভেকের সাতার কাটায় বিঘ্ন ঘটিয়ে মহিষ প্রবেশ করে, এরা জানে না এ ধরণের অনধিকার প্রবেশ করার কারনে তাদের জীবন রক্ষা করা কাঠিন। মহিষ গুলি কি বুঝতে পারে যে কতটি ভেক ফাঁদে আটকিয়েছে, মৌলিক অধিকার এবং নিরাপত্তার জন্য ভেক যতই উচ্চস্বরে আওয়াজ করুক না, 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে।

১৯৭৬ সালে নেপালকে শান্তি অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব করা হয়, সাতটি দায়িত্ব সহ প্রস্তাব বিশ্বের ১১৬টি দেশ অনুমোদন করে। ভারত এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, এখনও অনুমোদন করেনি, এতে বুঝা যায় ভারত চায়না তাদের দেশরক্ষা নীতি থেকে নেপাল স্বাধীন থাকুক। বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে নেপাল ভারতের প্রভাবেই রয়েছে। একটি দেশ যখন অন্য একটি দেশের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে তখন মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সকল কিছুর সমৃদ্ধি

www.pathagar.com

হ্রাস পেতে থাকে। ভারত ইচ্ছাকৃত ভাবে ষড়যন্ত্র করে নেপালকে বাণিজ্যিকভাবে এবং সামরিক প্রভাব দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়।

৩. অর্থনীতির উপর হস্তক্ষেপ
(Interference on Economics)

বাণিজ্যি ও যোগাযোগ দু'টিকে পৃথক অস্থিত্ব বলে গ্রহণ করেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা নেপালের মৌলিক অধিকার, বাণিজ্য নির্ভর করে দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার উপর। ভারত যখন দু'টি চুক্তির বিষয় প্রত্যাখান করল, নেপাল তখন শুধু মাত্র যোগাযোগ চুক্তি স্বাক্ষর করতে মনস্থ করে। পুনরায়, সাতবছর পর ২০০১ সালে এবং ২০০৬ সালে, দু'টি চুক্তিকে একত্র করে একটি চুক্তি করার জন্য নেপালকে জোর করা হল। নেপালকে আরও জোর করে বলা হল দেশ রক্ষার বিষয় ও জনসম্পদদের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যা প্রয়োজন ছিল না।

যে কোন উপায়ে ভারত তার উৎপাদিত নিম্নমানের সামগ্রী নেপালের বাজারে একক ব্যবসা করতে চায়। ভারতীয়রা নেপালের উৎপাদিত সামগ্রী ভারতের বাজারে প্রবেশে নিষিদ্ধ করে, এতে বাণিজ্য ক্ষেত্রে নেপাল সব সময় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। অপর দিকে নেপাল বিশ্ববাজার থেকে উচ্চমানের সামগ্রী বাছাই করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ভারত কর্তৃক কায়েমী স্বার্থের অংশীদার হওয়ার কৌশলকে স্পেশাল প্রত্যাখান করে। নেপাল তার বানিজ্য ব্যবস্থাকে স্বাধীনভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য গ্রহণ করে। নেপাল তার বাণিজ্য ব্যবস্থাকে পুরোদমে বিভিন্ন দিকে চালাতে চায়, নেপাল তার ব্যবসাকে অত্যন্ত প্রিয় দেশ (এম,এফ,এন) হিসেবে কর্ম চালাতে চায়। নেপাল ভারতের একক ব্যবসাকে সম্পূর্ণ লোপ করে দিতে চায়। একটি ভূ-বেষ্টিত দেশ হিসেবে নেপাল স্থল পথ সমুদ্র উপকুল পর্যন্ত অবাধে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী নেপাল রেলপথ, সমুদ্রপথ এবং স্থলপথ ব্যবহারের ইচ্ছা করেছে। নেপাল বিকল্প পথও ব্যবহারের ব্যবস্থা নিয়েছে। যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থা তাদের নিজেদের অধিকার, অথচ ভারত হল তাদের আর্শীবাদক।

ভারতের নাগরিকরা নেপালের ব্যাপারে অধিক পরিমাণে নাগ গলাচ্ছে। তাদের জন্য নেপাল হয়ে যাচ্চে হংকং অথবা ইউ,এস,এ,। ভারত চায় নেপালে বসবাসকারী ভারতের নিম্ন পর্যায়ের মিলিয়ন মিলিয়ন জনগণকে সহজে বিশ্বাস করতে । এছাড়া নেপালের গতিকে ব্যবহত করতে মনস্থ করেছে। ভারতের চাপে নেপাল বিদেশে নিয়োগ নীতি, নাগরিকত্ব আইন এবং শ্রম আইন সংশোধন করেছে। এ সমস্ত করার সর্বশেষ উদ্দেশ্যে হল ভারতের নাগরিকদেরকে নেপালে প্রেরণের পথ খুলে দেয়া। ১৯৬১ (এ.ডি.) সালে ৩,২৪,১৫৯ জন ভারতীয় নেপালে বাস করছিল। ২০ বছর পর ১৯৮০ সালে ৩৮,০০,০০০ লক্ষে পৌঁছেছে (পি.ভি. নরসিংহ রাও এর মতে। ইতোমধ্যে ২৩,৮৭,৯৭৩ জন নেপালের নাগরিকত্ব পেয়েছে। যদি নেপাল সচেতন না হয়

www.pathagar.com

তবে ভারতের ইচ্ছা নেপালের সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিকার করবে। যারা নেপালি নয় তাদেরকে কোন স্থায়ী সম্পত্তি করতে দেবে না। যদি নেপাল এ সিদ্ধান্তে আটল থাকে তবে এখন থেকে ২০ বছরের মধ্যে নেপাল হবে ধনী ভারতীয়দের রাজনীতিক ও শিল্পপতিদের গ্রীষ্মকালীন অবকাশের প্রাসাদ স্বরূপ। ফলে নেপালিরা নিজের দেশেই উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। ভারতের কৌশল হলো, নেপালকে সব সময় চরম অভাবের মধ্যে রাখা হলে তার সূদূর প্রসারি দর্শন থেকে সড়ে আসবে।

যদি একটি সার্বভৌম দেশের জন্য বাণিজ্য বৈচিত্র এক 'পা' হয়, তা হলে অন্য 'পা' হবে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা। অতএব, নেপাল অনুভব করছে যে ভারতের কারণে নেপাল উন্নয়ন করতে পারছে না। নেপাল আন্তর্জাতিক টেন্ডারের মাধ্যমে কোন প্রকল্প আরম্ভ করতে চেষ্টা করলে ভারত বিরোধিতা করে (অর্থাৎ বীরগঞ্জ ড্রাই পোর্ট, মহেন্দ্র হাইওয়ে) ফলে দশক ধরে মূলতবি হয়ে থাকে। অন্যদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ভারতের চোরাচালান এবং কালোবাজারী ব্যবসা নেপালের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রধান বাধা হয়ে আছে।

৪. প্রাকৃতিক সম্পদের উপর হস্তক্ষেপ-
(Interference on Natural Resources)

নেপাল এশিয়াতে বৃহৎ জল সম্পদের অধিকারী এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বিশ্বাস যোগ্য ও স্থায়ী সম্পদ হল ৬০০০ হাজারের ও বেশী নদী বিধৌত দেশ। নেপাল তার সম্পদকে স্থায়ীভাবে অধিকারে রাখত চাচ্ছে যেহেতু এগুলো হচ্ছে নেপালের সঞ্চিত সম্পদ। নেপাল এ সম্পদ থেকে উৎপাদন, ব্যবহার ও বিক্রি করতে সক্ষম হওয়ার পূর্বেই ভারত চাচ্ছে এ সমস্ত সম্পদ তাদের অধিকারে নিয়ে যেতে। জল সম্পদের কারণে ভারতের দুষ্ট চক্ষু পড়েছে নেপালের দেশ রক্ষার দিক। যে কোন সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে জনসম্পদ সংরক্ষণ করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে।

এখন থেকে ৫০ বছর পর ভারতের কর্মশক্তি ও খাদ্য শস্যের অভাব অধিক হবে। ভারত খাদ্য শস্যের ভাণ্ডার ১৬৩৩ শত হাজার থেকে ৩৭৫০ শত হাজার টনে উন্নীত করতে চেষ্টা করছে। এ উদ্দেশ্যে জলশেচন প্রয়োজন। ১৩৩৩ শত হেক্টর জমির মধ্যে মাত্র ৮৬২ শত হাজার জমি গঙ্গা নদীর চার পাশে আছে যার জল সেচন সম্ভব। নেপালের জল সম্পদ এ অভাব পূরণ করতে পারে। ভারত যদি জল এবং বিদ্যুৎ ক্রয় করতে রাজি হয় তবে নেপাল সম্মতি দিবে।

উপসংহার
(Conclusion)

১. চৌর্যকার্যের চোর এবং আত্মসাৎকারীঃ

ভূ-বেষ্টিত একটি দেশের জন্য গমনাগমনের সুযোগ খুব সীমিত। একাধিক অংশ দ্বারা গঠিত অবস্থার মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্য শাখাতে নেপালকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। যদি আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী নেপাল সুযোগ পায় তবে শিল্প/বাণিজ্যে উন্নতি

www.pathagar.com

সাধন করতে পারবে। শর্তারোপ করে নেপালকে ভারতের উপর নির্ভরশীল করতে চেষ্টা করা উচিত হবে না। আলবেনিয়া বাকী বিশ্বের কারো সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে অন্যান্য দেশের মত বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। ইসরাইল একটি ছোট দেশ হয়েও ২০০ বছর থেকে যুদ্ধে জড়িত রয়েছে। এবং চারিদিক থেকে শত্রু পরিবষ্টিত। তারপর ও সম্মানের সঙ্গে সমৃদ্ধি লাভ করে বেঁচে আছে। মালদ্বীপ প্রমোদ ভ্রমণের উন্নয়ন না করেও বেঁচে থাকার পথ পেয়েছে। জাপান কোন প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উর্ব্বরা জমি না পেয়েও বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করছে। তাহলে নেপাল কেন বিশ্বের মধ্যে সাফাল্যপূর্ণ দেশ হবে না? সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন স্থান দিয়ে আমদানি রপ্তানির উপর ধার্য শুল্ক কৌশলে ফাঁকি দিবে ভারত থেকে নেপালে খুব সহজে মালামাল আমদানি করা যায়। মিথ্যা বলাও এক প্রকার দুর্নীতি। এতে নেপালিদের অর্থনৈতিক জীবনে ধ্বংস সৃষ্টি হবে। এ ধরনের অমার্জিত মনোভাব, একটির পর আর একটি মিথ্যা বলা, ভারতের মত বৃহৎ দেশ এবং সাফল্য পূর্ণ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করে নেপালকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের ফাঁদ থেকে মুক্তি দিতে হবে। চিটাগং, হংকং এবং করাচি সমুদ্রবন্দর বাংলাদেশের সঙ্গে পাতাল পথ দিয়ে যুক্ত করে তিব্বতের রেলপথ এবং কমদামে জল শক্তি হতে উৎপন্ন বিদ্যুত সরবরাহ করে ব্যবসা করতে পারে। চিটাগং সমুদ্র বন্দরকে সহজে কাজে লাগাতে পারে। নেপালের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারত বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের কারণেই কানকাই বাধ, কারনালী জল বিদ্যুৎ প্রকল্প, সিকতা প্রকল্প, অরুন থ্রি, পশ্চিম সেটি, বোধগন্ধকি প্রকল্প বাতিল হয়ে যায়। এ সমস্ত প্রকাল্পের কাজ কি সমাপ্ত করা হয়েছিল, দু'দশক ধরে বিদ্যুতের কোন অভাব ছিল না, এতে আর্থিক মান দ্বিগুণ হত।

২. নেপালের দুর্বলতাঃ দর্জিয়ানদের মনোবৃত্তি-
(Weaknesses of Nepal: the Dorjian attitudes)

ভারতকে নিরাশ করা হলে তারা কখনও ক্ষমতায় যেতে পারবে না, এ সমস্ত হীনমন্যতার জন্য নেপালের নেতারা যন্ত্রণা ভোগ করছে। নেপালের অর্থনীতিতে জাতীয়তাবাদের এবং রাজ্যাংশে ভারতের হস্তক্ষেপ দেখেও তারা হতবাক এবং নির্বাক, মনে হয় ঠিক যেন অজগরের মত গলধকরণ করছে। নেপালের রাস্তা জাতিকে রক্ষার জন্য অটল ভাবে দাঁড়ায় নি এবং সীমান্ত এলাকা নিয়ে সমস্যার কোন বিশ্লেষণ করে দেখে নি যে ফলাফল কি হতে পারে।

বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রকাশের ব্যাখ্যা দিচ্ছে, এটা উদ্দেশ্য মূলক কোন মনোভাব থেকে নয়। তাদের কায়েমী স্বার্থ জাতীয়তাবাদের চেয়ে আরও উচু মানের। দলগুলোর মধ্যে অনৈক্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক দুর্বলতা, এবং বিরোধ সবকিছুই ভারতের স্বার্থে হচ্ছে। ১৯৯০ সালে ১ এপ্রিল এস,কে, সিং এবং ২০ এপ্রিল ২০০৬ শ্যাম শরন কর্তৃক ভূমিকা প্রকাশ করে দেয়া হয় যা জলন্ত উদাহরণ, যেমনটি দক্ষিণ ব্লক চেয়েছিল।

এখন, আমাদেরকে অবশ্যই ভূ-অবরোধ প্রবাদকে এড়িয়ে যেতে, দেশপ্রেমিক হওয়ার জন্য আমাদেরকে জ্ঞান আহরণে অংশ নিতে হবে, নেপালিরা স্বদেশিকতা শিক্ষা করেছে ভারতীয়দের নিকট থেকে, যার মধ্যে স্বদেশভক্তি নহে, বরং অসভ্যতা,

www.pathagar.com

রুক্ষতা, এবং অগণতান্ত্রিক চরিত্র পাওয়া যায়। উম্মুক্ত সীমান্ত প্রথা বিলোপ করতে হবে, জায়গা দখল করা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, প্রশাসকদেরকে সচেতন এবং জাতীয় স্বার্থের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে, সকল সময় গণতান্ত্রিক চর্চা করতে হবে, এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে একই দূরত্ব এবং একই ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করতে হবে। আশ্রয় ব্যতীত উন্নয়ন করতে হবে, নেপালের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থকে এড়িয়ে যেতে হবে, ভারতের মনোভাবকে পরিবর্তন করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে হবে, ফেরত যোগ্য রাজ্যাংশের জন্য সঠিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সবার উপরে আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে সকলে একত্র থাকলে আমরা দাঁড়াতে পারব, আর বিভক্ত হলে পতন অবশ্যম্ভাবী। এখন থেকে বাকী বিশ্বকে যা বলা হয় নি তা বলতে হবে। তাদেরকে আমাদের সমস্যার অংশীদার করতে হবে এবং সহমর্মীতা অর্জন করতে হবে।

ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের বিভিন্ন বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ আদায় করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, নেপালের ভদ্রাপুর থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত/চাঁটগাঁও পর্যন্ত বিমান পরিবহন সেবা স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে। নেপাল গৌতম বুদ্ধের দেশ, ভারতের অনুমতি নিয়ে নেপালকে প্রস্তাবিত শান্তি অঞ্চলের কেন্দ্র করা হবে, ইতোমধ্যে ১১৬ দেশ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

ভারতকে অবশ্যই বাধ্যতামূলক ভাবে নেপালের বন্যা কবলিত এলাকার দুঃস্থদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং আর যাতে অবনতি না হয় সে জন্য বন্যা বন্ধ করতে হবে। 'র' নেপালের প্রত্যেকটি কর্ম পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়, উদ্দেশ্য হল নেপালের অর্থনীতির অগ্রগতি করা, প্রকৃতিক সম্পদ শোষণ করা এবং নেপালীদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা। কিন্তু অকপটে, সৎ লোক আমদের উন্নয়নের জন্য উপকারী। নেপাল আশা করে নেপালিদের বিভিন্ন স্থানে 'র' এর মাধ্যমে সম্প্রদায়, ভাষা, লিঙ্গ, ধর্ম, এবং প্রতারণা করে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে বিভক্ত করার মনোভাব পরিবর্তন হবে। সকল নেপালিকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে এক হতে হবে।

রেফারেন্সঃ-

১. ডঃ শাস্ত্র দত্ত পান্থ– কন্টিনিউয়াস ইন্টারফেয়ারেন্স
২. ডঃ শাস্ত্র দত্ত পান্থ– নেপাল ইন্ডিয়া বর্ডার প্রবলেম
৩. ডঃ শাস্ত্র দত্ত পান্থ– কম্পারেভিট কনিস্টিটিউশন অব নেপাল
৪. ডঃ শাস্ত্র দত্ত পান্থ– ম্যাকিনেশন অব 'র' ইন সাউথ এশিয়া
৫. কায়সার ব্রিগেড.কে.সি– নেপাল অফটার রিভ্যুলেশন

www.pathagar.com

মাওবাদ এবং ভারত
(Maoists and India)

– ডাঃ শাস্ত্র দত্ত পন্থ

নেপালের সকল বিষয়ে ভারত তত্ত্বাবধান করছে। রাজনীতি হচ্ছে প্রথম বিষয় যা নিয়ে ভারত উদ্বিগ্ন। মাওবাদী বিদ্রোহ, সাত দলের মৈত্রী (এস.পি,ও.) রাজা (এইচ, এম) এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার এগুলো হল এখনকার সময়ের উদ্বিগ্নতা। এস.পি.এ এবং মাওবাদীরা ১ নভেম্বর এবং পুনরায় ১১ মার্চ ২০০৫ নতুন দিল্লীতে আলোচনা করেন এবং ১২ দফা বিশিষ্ট চুক্তি চূড়ান্ত করার পর যুক্ত ইশতেহার প্রকাশ করেন। ১৯ মার্চ মাওবাদী এবং এস,পি.এ. দ্বিতীয় ইশতেহারে স্বাক্ষর করে চুক্তির প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি প্রকাশ করে। যুক্তরাষ্ট্রের পররষ্ট্র বিভাগ চুক্তির নিন্দা করে মাওবাদীদের সঙ্গে কোন প্রকার কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুশিয়ার করে দেয়। এখন ভারতের পূর্ব্বতী কৌশলগত ঘটনা সমূহের পরিকল্পনার ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে কাজের মূল্যায়ন এবং অধিকতর পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে ২০০৬ সালের ২২ মে, সোমবার নতুন দিল্লীতে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয় (অন্নপূর্ণাপোষ্ট, মে ২০)।

পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার জন্য রাজা এস, পি, এ'র বিরুদ্ধে কর্মশক্তি প্রয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং মাওবাদীদের ক্রমে ক্রমে এবং অলক্ষিতে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে এবং ৬-৯ এপ্রিল এর পরিকল্পিত এস,পি,এ'র গণতন্ত্র সমর্থনের আন্দোলন এবং নেপালে বন্ধদ্ (জেনারেল ষ্টাইক) এর বিরুদ্ধে হুশিয়ার করে দেন। এ পটভূমির বিরুদ্ধে মাওবাদীরা কাঠমুন্ডু উপত্যকায় সাময়িক যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে এবং গণতন্ত্র সমর্থকরা প্রতিবাদ আরম্ভ করে যা রাজ্যের বাহিরেও ছড়িয়ে পড়ে (ডঃ মাইকেল ভ্যান ডি. ভের, ফ্রিল্যান্স জর্নালিষ্ট ১৮ এপ্রিল ২০০৬)। সোবিয়া নিশার, ভারতের সংবাদিকরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, বাস্তবতা হল বাংলাদেশ এবং নেপালে ভারত বিদ্রোহের কাজ চালায়।

প্রতিবেশী দেশগুলিতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে এ অঞ্চলে কর্তৃত্ব অর্জন করার চেষ্টাই ভারতের প্রধান কাজ। বাংলাদেশের পরে শ্রীলঙ্কা কে ধ্বংস করে সিকিমকে ধ্বংস করতে এবং এখন তাদের বিপজ্জনক তালিকায় আছে নেপাল।

'র' এখন ভারতীয় মাওবাদী কমিউনিস্ট কেন্দ্র এর (এম.সি.সি) পিপলস ওয়ার গ্রুপ (পি.ডব্লউ.জি) মাধ্যমে নেপালে মাওবাদী গেরিলাদের সঙ্গে সখ্যতা করছে। এম.সি.সি, এবং পি.ডব্লিউ জি নেপালি মাওবাদীদেরকে প্রশিক্ষণের সুযোগ, অস্ত্র, গোলা বারুদ, সৈন্য চলাচলের ও সরবরাহের শিক্ষা এবং উদ্বাস্ত শরণার্থীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সহায়তা করে। ভারত তাদের সংগ্রামরত সংস্থা সমূহের মাধ্যমে নেপালে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে উৎসাহ দিচ্ছে। মাওবাদীরা এদেরকে পুলিশের লোক বলে সন্দেহ করছিল।

'র' বিলুপ্ত সংসদকে পুনঃবহাল করার জন্য রাজাকে অসাংবিধানিক সিদ্ধান্ত নিতে চাপ প্রয়োগ করে সফল হয়। বর্তমানে নেপালি সৈন্য বাহিনী দুর্বল হয়ে গেছে সেনাপতি বিহীন এবং ভঙ্গুর। এমতাবস্থায় ভারতীয় সৈন্য সহজেই নেপালে হস্তক্ষেপ করতে

www.pathagar.com

পারে। ভারত ইতোমধ্যে বহুসংখ্যক বি,এস,এফ নেপাল ভারত সীমান্ত এলাকায় প্রেরণ করেছে। এটাও জানা গেছে যে বিমানবাহিনীও সতর্ক অবস্থায় আছে। বাংলাদেশের মত তাঁরা বলবে যে নেপালে অবস্থানরত ভারতীয় নাগকিদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। নেপালি মাওবাদীরা এস.পি.এ-কে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছে এবং উভয়কেই তহবিল এবং কাজ করার জনবল দেয়া হয়। হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিক নেপালের রাস্তায় প্রতিবাদে বের হলে কিছু আহত হয় এবং কয়েজন নিহত হয়। এস.পি.এ. তাদেরকে নেপালের নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করে, আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে এবং মৃতদেরকে শহীদের সম্মান প্রদান করে। গুলি করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মিছিলে যোগদান করার আহব্বান জানান হয়। কমপক্ষে প্রত্যেক বাড়ী থেকে একজন এবং প্রতিদিনের জন্য ৫০০ রুপি বিতরণ করা হয় এবং গাড়ী চালক/ শিক্ষকদেরকে ১০০০ রুপি দেয়া হয়। তাদের এ সব কার্যকলাপের প্রকাশ পাওয়া যায় যখন এস,পি.এ.র সেনাপতিরা জনসমক্ষে প্রচার করে যে 'বন্ধদ্' এর সময় ক্ষমতায় থাকা কালে পরিবহন কোম্পানিগুলোকে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। এস.পি.এ. সরকারকে ভারতীয় পুতুল হিসেবে বিবেচনা করা হত। ১৯৯০ সালে চন্দ্রশেখের, সীতারাম ইয়ছবি, ভারতের বামপন্থী নেতা নেপালের মাওবাদীদের সঙ্গে দৃঢ় যোগাযোগ রক্ষা করেছিল, এখনও নেতৃত্ব দিচ্ছে। অসাংবিধানিকভাবে পুনঃবহালকৃত নেপালের সংসদের তার দলকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানিয়ে ছিল। যা সাধারণ কোন দেশের প্রধানকেও দেয়া হয় না, অপর দিকে একই সংসদে, তাদের যারা বিরোধিতা করেছিল সে সমস্ত সংসদ সদস্যকে তারা প্রত্যাখান করে। সিকিমকে অন্তর্ভুক্তির ইতিহাসের ধারণা যদি কারও জানা থাকে তবে সে রকমই পরিকল্পনা নেপালের ব্যাপারে ভারত বাস্তবায়ন করছে। দু'ধরণের শক্তি- এস.পি.এ এবং অসাংবিধানিক বিদ্রোহী শক্তিকে এনে, 'র' এখন ভারতের নিরাপত্তা বলয়ে নেপালকে নিয়ে আসতে সফল হল। এ ধরণের প্রস্তাবই ১৯৮৯ সালে পররাষ্ট্র সচিব এস,কে সিংহ দিয়েছিল, রাজা বীরেন্দ্র প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বলেছিল ভারতের হাতে দেশের সার্বভৌমত্বকে না দিয়ে নিজের দেশের মানুষের নিকট ক্ষমতা ছেড়ে দিবে, সে কাজটিই এখন অন্যভাবে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করা হয়েছে।

আর একটি মজার ঘটনা হল আমেরিকা এখন ভারতের মাধ্যমে নেপালের দিকে উকি মারছে এবং পরিবর্তে ভারত দালাই লামাকে নেপালে বসানোরজন্য ব্যবস্থা করছে। যদিও এটা স্বীয় সম্পর্ক স্থাপন হবে, চীন অনিচ্ছাকৃতভাবে চুপ থাকবে, কারণ তা না হলে তার প্রথম বৃহৎ ব্যবসায়িক অংশীদার ইউ,এস,এ অসন্তুষ্ট হবে এবং দ্বিতীয় বৃহৎ অংশীদার ভারত সেও অসন্তষ্ট হবে। এ সমস্ত কারণেই ভারত নেপালের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে কলহের সৃষ্টি করতে চায়। মোটের উপর যুক্তরাষ্ট্র নিবাচিত হামাজ সরকারকে প্রত্যাখ্যান করে নেপালের সন্ত্রাসীদেরকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে অনুমোদন দেয়ায় ভারতের পরিকল্পনাকে সাংবিধানিক শক্তির সঙ্গে একত্র করে দেয়। যদি ভারত এবং ইউ.এস.এ. গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় তবে তারা নেপালের সাংবিধানিক রাজাকে দমিয়ে রেখে স্বেচ্ছাচারি ভুটানের শাসনকে সমর্থন করতে পারে না। এ দেশগুলো গণতন্ত্রের জন্য কোন কাজ না করে তাদের স্বার্থের খুঁটি গাড়ছে।

www.pathagar.com

এ সমস্ত কাজগুলো গণমাধ্যম, মানবাধিকার কর্মী আইন ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পেশাদার সংস্থা/ এন,জি,ও-দের কারণে হচ্ছে, কারণ তারা পশ্চিমা টাকায় চলে। টাকাই সবকিছু। নেপালের ৮০% সংবাদপত্র ভারতের টাকায় চলে। নেপালের অধিকাংশ নাগরিক ভারতের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। তারা ভারতের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করছে এবং অন্যান্য বিদেশীদের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করছে ২০০৬ সালের মে, থেকে ভারত আরও শক্তভাবে হস্তক্ষেপ করে বাকস্বাধীনতার মৌলিক অধিকার এবং বিরোধীদেরকে সম্পূর্ণরূপে দমন করে রেখেছে। দাঙ্গা হাঙ্গামাকারী জনতার ধারনা এখন আর চলে না। যে কোন বিষয় এখন প্রশ্নবিদ্ধ। বিরোধিতাকে গণভোটের মাধ্যমে বলবৎ করতে হবে। গণভোটকে কেন অগ্রাহ্য করা হয়েছে? গণভোটকে অগ্রাহ্য করার অর্থ হচ্ছে ৯৭% নাগরিককে অগ্রাহ্য করা। ব্যাপক ধ্বংস এবং ভাবপ্রবণতার উদ্রেক করে প্রজন্মের শাসন ব্যবস্থা হতে পারে না। তাহলে প্রত্যেক প্রজন্ম একই ভুল করতে থাকবে এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা কখনও শেষ হবে না। বর্তমানে যারা এ সমস্ত ঘটনার হোতা তাদরে সুবিধা হবে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কোন উপকার হবে না।

নেপালের মাওবাদীদের প্রতি ভারতের অযৌক্তিক মহানুভবতার কারণে তারা পরাজিত হয়েও গুপ্ত আশ্রয় ভারতে নিরাপদে থাকে। নেপালের রাজনীতিবিদরা দাবী করছে যে ভারত অতিরিক্তভাবে তাদের দেশে হস্তক্ষেপ করছে। নেপাল ৩৫ জন পরিচিত মাওবাদীদের তালিকা তাদের নিকট দিয়েছে এবং বিশ্বাস করছে দার্জিলিং এর আশেপাশে এরা লুকিয়ে আছে। যখন নেপাল মাওবাদীদের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের সহযোগিতা কামনা করছিল, তখন ভারতে এস.পি.এ সঙ্গে নেপালি কংগ্রেসের (এন,সি) মাধ্যমে মাওবাদী বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য তারাই চেষ্টা করে। নেপালে তাদের কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য মাওবাদীদেরকে উত্তম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনীতে নেপাল রাজকীয় সৈন্য বাহিনীর ভূমিকার (আর.এন.এ) প্রশংসায় ভারত ঈর্ষান্বিত হয়ে মাওবিদ্রোহীদের দ্বারা আটকানর চেষ্টা করে যাতে ফিরে আসে এবং চুপ করে থাকে নেপালের মাওবাদী সদস্যদেরকে ভারতে এল.টি.টি.ই এর দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। ইউ.এন শান্তি মিশনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে ভারত বহুবার আপত্তি করেছে।

নেপালে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি ও রাজনীতিতে দেউলিয়া করে দেয়ার সমস্যার ফাঁদ পাতা হয়, যেমন এস.পি.এ এবং এস.পি.এ.এম এর চুক্তির ১২ দফা, জাতিগত সংকটে ভুটানের গৃহহীনরা নেপালে বাস করছে এবং আরও অনেক কিছু। কোন কারন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে আর্ন্তজাতিক সমাজ নেপালের মাওবিদ্রোহীদের সঙ্গে ভারতের এত সম্পর্ক কেন তা দেখছে না, এবং প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশগুলোতে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করছে। নেপালের মাওবাদীদের জন্ম হয়েছে রাজার বিরুদ্ধাচরণের জন্য, তাদের জন্ম হয়েছিল এন.সি./সি.পি.এন ইউ.এন.এল এর ক্ষতিকর প্রশাসনের বিরুদ্ধে। এন.সি বহুবার দাবী করেছে যে তাদের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য রাজার সমর্থন ছিল। এখন তারা কিভাবে ভাল বন্ধু হল। এটার কারণ হল স্বার্থের জন্য।

নেপালিদের নিঃসঙ্গতার মতভেদের কারণ নিজেদেরকেই খুঁজে দেখতে হবে এবং তা একটি নিরপেক্ষ পক্ষপাতহীন মন্ত্রী সভার পরিচালনায় গণভোটের মাধ্যমে নির্ণয়

www.pathagar.com

হবে। সকল রাজনৈতিক দল ভারতীয়দের দৃঢ় মুষ্টির ভিতরে আটকান। এটার কারন হল নেপাল ভারত উন্মুক্ত সীমান্তের অংশীদার এবং অবাধে গণনাগমন করছে, প্রায় ৪.৮ মিলিয়ন ভারতীয় ইতোমধ্যে নেপালের নাগরিকত্ব লাভ করেছে এবং একই পরিমাণ হওয়ার পথে। নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে যুক্ত করা হয়েছে যে প্রতি বছর এক মিলিয়ন ভারতীয় নেপালে নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে, এতে এক সময় নেপালিরা সংখ্যালঘু নাগরিকে পরিনত হবে। দেশের সার্বভৌমত্ব এখন নেপালিদের অধিকারে, কিন্তু তা সম্প্রতি সংসদের নিকট "জনআন্দোলন" নামে হস্তান্তর করা হয়েছে। ইতিহাস বলে সংসদ সদস্যরা বিক্রয় হয়ে যায়। ভারত প্রত্যেক সদস্যকে ১০ মিলিয়ন রুপি দিয়ে ক্রয় করতে পারে। এছাড়া সংসদ নির্বাচন এর প্রস্তাব যেভাবে দেয়া হয়েছে তাতে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বিভক্তি আসবে এবং চূড়ান্তভাবে দেশের মধ্যে 'বাইসি' এবং 'চৌবাইনি' তে বিভক্তির সৃষ্টি হবে, যা ভারতেরই স্বার্থে রক্ষা হবে। ১৯৯০ সালে ধীরে ধীরে মনে সঞ্চারিত করে বহুদলীয় এবং সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে এবং দুর্নীতিবাজ লোকদেরকে দায়ি করেছে যারা গত দেড় দশকের মধ্যে নদীগুলো এবং ভূমি বিক্রি করে দিয়েছে। নেপালের অর্থনীতির মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদ/ কমিউনিজম (Terrorism/ Communism)

ভারতের ভূমিকার কথা বলার পূর্বে আমরা বর্তমান মওবাদ ও সন্ত্রাবাদ এবং দৈনন্দিন গণতন্ত্রের বিষয়ে উপস্থাপন করতে চাই। যেহেতু ভারত নেপালের তিনটি শক্তিকে নিয়ে রাজনৈতিক খেলা আরম্ভ করেছে এবং সে সমস্ত শক্তির মধ্যে মাওবাদীদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলছে না, কিন্তু বিদ্রোহী অথবা নেপালের সসস্ত্র বিদ্রোহী বলছে। গণতন্ত্র নিয়ে নেপালে কোন বির্তক নেই, এ বিতর্ক জাতীয়তা নিয়ে, প্রধান বিষয়টিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে।

নিরীহদের হত্যার জন্য সন্ত্রাসবাদ অর্থাৎ সামরিক বাহিনী নয়, পুলিশ নয় এবং রাজনীতিবিদ ও নয়। মাওবাদীরা পেরু, কলম্বিয়া, নেপালে সন্ত্রাসবাদের চর্চা করছে। এখানে আমি তৎকালীন রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপিয়ান মার্কা সন্ত্রাসবাদ সংযুক্ত কমিউনিজমকে সংশ্লিষ্ট করতে চাচ্ছিল। আয়ারল্যান্ড এবং স্পেনের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সন্ত্রাসী, কিন্তু কমিউনিস্ট নয়, সাধারণত আমূল পরিবর্তনকারী সন্ত্রাসীরা কমিউনিষ্ট নয়। কার্যকলাপে কেন কমিউনিজমকে নিষ্ঠুর সন্ত্রাসবাদ এবং কায়িক শ্রমের কাজের দল বলে। ব্যক্তি স্বাধীনতা অপেক্ষা কর্তৃপক্ষের বশ্যতা স্বীকারের পক্ষপাতির সঙ্গে কমিউনিজমকে সংশ্লিষ্ট করার কোন তত্ত্বীয় বা ধারণাগত কোন কারণ নেই, কিন্তু আসলে ঐ ভাবেই চলে আসছে। গণতান্ত্রিক কমিউনিজম সমাজ সব সময় ছোট আকারের এবং খুব অল্প সময়ের জন্য হয়।

নেপালের মাওবাদীরা একই ধরনের, যাদেরকে এস,পি.এর নেতৃত্বে তৎকালীন সরকার সন্ত্রাসবাদী বলে ঘোষণা করে ছিল। (প্রধানতঃ এন.সি এবং সি.পি. এন.ইউ.এম.এল) বিপজ্জনক বিজ্ঞাপ্তি দিয়ে প্রত্যেক মাওবাদীর মাথার দাম উল্লেখ করে প্রচার করা হয়েছিল। দ্রুততার সঙ্গে অনুলিপি করে ভারত, ইউ,এস,এ এবং

www.pathagar.com

অন্যান্য অনেক ধনতান্ত্রিকাদেশ তা ঘোষণা করেছিল। দলের অভ্যন্তরীণ বিরোধ যা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ক্ষমতার গদি দখলের ও টাকা অর্জনের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল সে কারণে এস.পি.এ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল, আর এখন তারা গণতন্ত্রের অংশীদার এবং ভারত, ইউ.এস.এ এবং ই.ইউ এর সমন্বয়ে গঠিত মৈত্রীর প্রতি নির্লজ্জভাবে সমর্থন করছে। তাদের সকলেই সরকার থেকে বদলিও সরবরাহের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, এবং পরোক্ষভাবে ভারতীয় গোয়েন্দা ও মাওবাদীদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। একই সময়ে অস্ত্রসস্ত্র ও গোলাবারুদ ভর্তি ট্রাক ও উন্নতমানের অস্ত্রসহ যা আর, এন.এ.দেরও ছিল না, সেগুলো মাওবাদীরা, যাদেরকে সন্ত্রাসী ঘোষণা করা হয়েছিল তারা আমদানি করেছিল। মাওবাদী সমর্থক এস.পি.এ সমর্থক ভারতের স্বার্থকে ইউ.এস.এ এবং ই.ইউ. কেন বিশ্লেষণ করে দেখে নি, দেখা হলে নেপালের রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে দেউলিয়া করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হত নেপালের দেশরক্ষা কৌশলকে গ্রাস করে ফেলতে পারত।

এটা বলা যাচ্ছে মাওবাদীদের সম্মিলিত শক্তি এ অঞ্চলে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং তারা বাংলাদেশ এবং ভুটানে সামরিক বাহিনীকে উন্নত করানর চেষ্টা করছে। বর্তমানে ১৬০০০ প্রকৃত যুদ্ধ করার জন্য নিযুক্ত, ৩২০০০ সৈন্য বাহিনী, ১৪০০০ নিয়মিত সদস্য, ৭০০০০ দৃঢ় অনুসারী এবং ৬০০০০ সহমর্মীতার সদস্য আছে। তারা এক ডজনের বেশী জাতিগত ও আঞ্চলিক শ্রেনীর লোকের চেয়ে সম্মিলিত আছে, তারা কিছু বিশ্বকমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সমর্থন ও সাহায্য চেয়েছে। যদিও তারা চরমপন্থী আবেদনের সঙ্গে সমঝোতা করে নি, তবুও তাদের সহানুভূতি আছে এবং উদ্দেশ্য একই তা হল জনসাধারণকে উদ্ধার করা। এ দিনগুলিতে সাংগঠনিক কাজ ও গুপ্ত আশ্রয় হল ভারতীয় সীমান্ত এলাকা।

পশ্চিম বাংলার পুলিশের সঙ্গে মিলে সৈন্য পরিচালনার সকল কার্যক্রম সর্বোচ্চ গোপন অবস্থায় রাখা হয়েছিল। তিনটি দলের ২০টি সৈন্য বাহিনীর ছাউনি ভুটানের সৈন্য বাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছিল। এখন আমরা ভারতের অভ্যন্তরের অবস্থা দেখি। ভারতের ৬০২টি জেলার মধ্যে ১৪টি রাজ্যের ১৬২টি জেলা আক্রান্ত হয় এবং মাওবাদীদের গুপ্তচক্রান্তের হুমকিতে ছিল। জম্মু এবং কাশ্মীরে সন্ত্রাসীদের দ্বারা ১২টি জেলা আক্রান্ত হয়। ২০০২ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত সময়ে জম্মু ও কাশমীরে এবং মাওবাদীদের আক্রমণে মারাত্মক আক্রান্তের সংখ্যা ৩১৪৬০ (মাওইস্টঃ দি ট্রুথ উইল নট্ গো এওয়ে, অজয় সাহনি, এডিটর এস, এ, আই, আর)। ১২টি অন্যান্য আক্রান্ত রাজ্যের অবস্থা মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রণে ছিল, একটি ট্রেন ছিনতাই করা হয়েছিল, আইন পরিষদের সদস্যকে হত্যা, কয়েকটি পুলিশস্টেশনও নিরাপত্তা বাহিনীর উপর আক্রমন, বিভিন্ন রাজ্যে পরিবহন সমস্যায় ভারত মুখোমুখি হয়। সম্প্রতি ভারত অনুধাবন করেছে যে সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণ কারীর শক্তি রাজ্য সরকারের নেই।

জাতীয় গড় হিসেব অনুযায়ী প্রতি ১০০০০০ জন সংখ্যার মধ্যে ১২৩ জন পুলিশ এবং কিছু শান্তিপূর্ণ রাজ্য এর অনুপাত ৭৬০/১০০০০০ হতে ৫৬/১০০০০০ যা অপ্রতুল বিবেচনা করা হয়। সংবিধানের ৩৫৫ ধারায় কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে প্রচুর এবং স্থায়ী কৌশল সৃষ্টি করে সমন্বিতভাবে যেন সন্ত্রাসের মোকাবেলা

www.pathagar.com

করতে পারে এবং প্রক্রিয়া চলছে। এভাবে ভারতে অনেকগুলো রাজ্য মাওবাদী সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আমাকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসাবাদ এবং ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের আবেদন সম্পর্কে গণসাম্যবাদের দৃশ্যাবলী বর্ণনা করতে দিন। এশিয়ার মাওবাদীদেরকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, চীনের শোধনবাদ এবং ভারতের বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দেশীয় দালাল ধনতান্ত্রিক এবং সম্প্রসারনবাদী হিসেবে উপস্থিত করছে। তারা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিরোধিতা করতে পারে এবং চীনে ধনতন্ত্রবাদকে সংরক্ষণ করতে পারে। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির (মাও) প্রতিষ্ঠার ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য একত্র করে যৌথভাবে বক্তব্য দিয়েছে। ফিলিপাইনের, তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্স-লেলিনিস্ট) এবং ইন্দোনেশিয়ার (কমিউনিস্ট লীগ) মাওউত্তোর চীনের নেতৃত্বকে অত্যন্ত তীব্রভাবে সমালোচনা করেছে, কারণ তারা মাও এর আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং চীন ধনতন্ত্রের পথ ধরছে বলে সমালোচনা করছে। তাদের চিন্তা হল বিত্তহীনদের একনায়কত্ব সাম্রাজ্যবাদ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত একক ধনতন্ত্রবাদ, বিত্তহীন এবং শোষিত জনগণের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করার জন্য সম্পূর্ণ সক্ষম, সেটা কিভাবে, তাহল বিশ্বায়নের ধূয়া তুলে খোলা বাজার ব্যবস্থা করে, জাতিগত বৈষম্যমূলক আচরণ সৃষ্টি করে, উৎপীড়ন করে দমিয়ে রেখে এবং আগ্রাসন করে। মনমোহন সিং সরকারকে দোষারোপ করা হচ্ছে। কারণ তারা আমেরিকা থেকে বিদ্রোহী দমনের অভিজ্ঞ লোক আমন্ত্রণ করে এনে ভারতে নিরাপত্তার কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে যাতে মাওদের বিরুদ্ধে কার্যকরিভাবে অত্যাচার চালাতে পারে।

স্পাম এবং ভারত

আজকের দিনগুলোতে স্পাম হল আটটি দলের সমন্বয়ের মৈত্রী। গণতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়ে কমিউনিষ্টরা ক্ষমতা দখল করার পরের অবস্থা সম্পর্কে (এস.পি.এ) বুঝতে হবে। একই ভুলের জন্য কম্বোডিয়া, ইথিওপিয়া এবং আফগানিস্তান অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ সমস্ত দেশের অবস্থা থেকে নেপালকে শিখতে হবে। কম্বোডিয়া ধীরে ধীরে পূর্বাবস্থা ফিরে পাচ্ছে, কারণ কম্বোডিয়ার জনগণ মাওবাদী খেমাররুজদেরকে বিতাড়িত করে বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে এনেছে। ইথিওপিয়াতে কমিউনিস্টরা ২৯ বছর ক্ষমতা দখল করে থাকার ফলে ইথিওপিয়া বিশ্বের সবচেয়ে দ্ররিদ্রতম দেশে পরিণত হয়েছে। আফগানিস্তান থেকে বাদশাহ জহির শাহকে বের করে দেয়ার পর সেখানের জনগণ অবর্ণনীয় দুর্দশায় ভুগেছে। আজকের দিনেও ছয় মিলিয়নের ও বেশী ইউক্রেনিয়ান, দু'মিলিয়ন কম্বোডিয়ান, মিলিয়নস উত্তর কোরিয়ান, জিম্বায়ের অধিবাসী এবং যুগোশ্লভিয়ান নাখেয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। কম্বোডিয়া, তুরস্ক, ইরান অথবা আফগানিস্তান এর সমগ্র জনগণ তাদের জীবন হারিয়েছে অথবা ক্ষুধা, অপুষ্টি, রোগ নির্ণয় না করতে অথবা চিকিৎসার অভাবে শাস্তি যন্ত্রনা ভোগ করছে। লক্ষ লক্ষ লোক কারারুদ্ধ থাকায় তাদেরকে গণনা করা হয় নি ফলে তারা না খেয়ে মৃত্বরণ করেছে অথবা প্রকট অবস্থায় মেরে ফেলা হয়েছে।

www.pathagar.com

সংস্কারকামী কমিউনিস্টরা ধনীদেরকে গরীবে পরিণত করার চেষ্টা করেছে বলে অনুমিত হয়, তবে গরীবদেরকে ধনী করার জন্য কিছু করে নি। তারা বিশ্বাস করে যে মার্ক্সইজম মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণ ক্ষমতা নিয়ে আসবে এবং সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষমতা দ্বারা পর্যদুস্ত করে দেবে, কিন্ত কার্যক্ষেত্রে এ নীতি গড়পড়তা মানুষের কোন অগ্রগতি হয় নি, তৎপরিবর্তে মানুষের জীবন যাত্রার মান আরও খারাপ করে তুলেছে। আমরা কি এই বন্দি ধারণার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারি, তাতে গরীব অবস্থায় জীবন যাত্রা করতে হবে। এটা জেনে দুঃখ হয় যে ১৯১৭ সালের পরে কমিউনিজম এর আদর্শ ব্যাপক যন্ত্রণার সৃষ্টি করে এবং তাতে বিশ্বের ১০০ মিলিয়ন মানুষ জীবন হারায়। স্টালিনের সন্ত্রাসের কারণে মানুষ বলিরূপে জীবন উৎসর্গ করেছে। চীনের সংস্কৃতিক সংস্কার, কম্বোডিয়ার গণহত্যা, ল্যাটিন আমেরিকার যুদ্ধ, কিউবার গৃহযুদ্ধ, পূর্ব ও কেন্দ্রীয় ইউরোপিয়ানরা ১৯৫৩, ১৯৫৬ এবং ১৯৬৮ সালের বিদ্রোহের কারণে কমিউনিস্টরা গণহত্যা করে, এগুলো হল কিছু উদাহরণ। তাদের জাতিগত, গোষ্ঠীগত, ধর্মীয় অথবা ভাষাকে বিবেচনা করে কসাইখানার মুরগী জবাই করার মত মানুষ হত্যা করে। স্বপ্নপূরণের একটি জাতি গঠনের স্বপ্ন যেখানে সবাই সমান হবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বব্যাপী মানুষ না খেয়ে এবং অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছে।

খেমারুজ সৈন্যরা এবং কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যরা মহিলাও পুরুষ যে কাউকে পছন্দ করে বিয়ে করত। এছাড়া অপরিমিত খাদ্য খেত, স্বর্ণের জন্য তারা প্রায় পাগল ছিল, অলংকার, সুগন্ধি, আমদানিকৃত ঘড়ি, পশ্চিমাদেরশের ঔষধ, গাড়ি, মটরসাইকেল এবং বাইসাইকেল, সিল্ককাপড় এবং অন্যান্য আমাদানিকৃত দ্রব্য সামগ্রীর জন্য লালায়িত ছিল। তাদের নিষ্ঠুরতা ছিল অসীম, কম্বোডিয়াতে একজন মহিলাকে কিভাবে তার স্বামীর লিভার রান্না করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করেছিল, জীবিতাবস্থায় কেটে তা করতে হয়েছিল, ফাঁসি দেয়ার পূর্বে মহিলাদেরকে ধর্ষণ করা হত। আসলে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মিনিটে কমিউনিষ্টরা মানুষের অধিকারকে পদদলিত করত, তাদের চরিত্রকে নষ্ট করা হত এবং স্বাধীনতা ছিল অবরুদ্ধ। কমিউনিজম এবং সন্ত্রাসবাদ পারস্পারিক উদ্দেশ্য। খেমাররুজ প্রায় ২ মিলিয়ন কম্বোডিয়ানকে হত্যা করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রায় ৬১,০০০,০০০ মানুষকে হত্যা করে স্টালিন নিজে ৪৩০০০০০০ হত্যা করে। অধিকাংশ হত্যা সম্ভবত ৩৯০০০০০০ হবে প্রাণনাশক দিয়ে এবং কাজে শক্তি প্রয়োগ করে। অতএব, এখনকার দিনে কমিউনিষ্ট সরকার উদারনীতি বৃদ্ধি করছে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ক্ষমতা রাখার নীতি শিথিল করছে।

দ্বৈত মানদন্ডে ভারতের ভূমিকা
(Double Standard role of India)

দ্বৈত মানদণ্ড ভূমিকা এবং কার্যকলাপ দ্বারা ভারতে নেপালের জনগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা চালায়। আর একটি সন্দেহ সব সময় বিরাজমান যে মাওবাদীদের উত্থানের পিছনে ভারতের বিরাট মদদ আছে। শ্রীলংকা এবং সিকিমের বিরুদ্ধে ভারত যে অপকর্ম এবং অনৈতিক কাজ করছে, নেপাল ঘৃণাসহকারে তা পরিহার করে। অতএব নেপাল এঘটনা থেকে সতর্ক থাকার চেষ্টা করছে। নেপালের রাজতন্ত্র বহুভাষী, বাহু সম্প্রদায়, বহু ধর্মের সঙ্গে, বহু

www.pathagar.com

সংস্কৃতির দেশ হিসেবে নেপালের ঐক্য বজায় রেখে চলেছে। ভারত নেপালে তাঁর খুটি পুরাপুরি শক্ত করার জন্য রাজতন্ত্রকে বাধা মনে করছে। ভারত নেপালের রাজার বিরুদ্ধে ঘৃণা, দুর্নীতির বিষয়ে অসংযত ভাবে সর্বশক্তি দিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে। এসমস্ত ভুল বুঝা বুঝির অবস্থা থেকে আজকাল নেপালবাসী অনেক ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এটার একটা কারন হল নেপালের নাগরিকরা এখন ভারতের জন সংখ্যার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কাজ করছে। এখন নেপালের সীমান্ত এলাকায় ১৪০ হাজার বি.এস.এফ বাহিনী রয়েছে, অর্থাৎ প্রতি কিলোমিটারে ৭৫ জন। এমনকি নেপাল সীমান্তের পুলিশ এবং প্রশাসকদেরকে দমন করে রাখা হচ্ছে। তাঁরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোন কিছুই অর্জন করতে পারে নি। ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী যে কোন সময় নেপালের আমদানিকৃত মালামাল নিষিদ্ধ করে দিতে পারে শুধুমাত্র রাজস্ব আদায় দপ্তরগুলো ছাড়া। যে পতিত জমিতে কারও কোন অধিকার নেই, সেখান দিয়ে সমান্তরাল পথ তৈরি করেছে, যেখান দিয়ে সামরিক বাহিনীর পরিবহন আসা যাওয়া করে এবং ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রাদি এখনে এনে রেখেছে। বাস্তবিকপক্ষে আমেরিকাকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যায়িত করছে এবং ব্যক্তিগতভাবেও রাষ্ট্রদূত মারিয়াটিকে জোড়াল ঝাটার আঘাত করা হয়েছে, কারণ, যে মাওবাদীদের সম্পর্কে অতিরিক্তভাবে প্রচার করছে, মাওবাদীরা দাবী করছে প্রকৃতপক্ষেই কি আমেরিকা নেপাল সরকারকে সকল সময় সমর্থন করছে। তাহলে ইরাক, আফগানিস্তান, চিলি, ভিয়েতনাম এবং ফিলিপাইন প্রত্যেক রণক্ষেত্র থেকে আমেরিকার বিরুদ্ধে কার্যকর ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রবল আঘাত করে তাড়িয়ে দিতে হবে। ঠিক একই সাথে মাওবাদীরা ভারতের কোন কার্যকলাপ এবং আচরণের সমালোচনা করছে না। তারা চিন্তা করছে নেপালে যদি সফল হয় তবে ভারতের এক বিলিয়ন লোকের উপর এর প্রভাব পড়বে এবং চীনের উপরও বর্তাইবে। যদি দু অথবা আড়াই বিলিয়ন জনসংখ্যাকে জনসংখ্যায় এটা প্রভাবিত করে, তবে সমস্ত বিশ্বের উপর প্রভাব ফেলবে। এ বিষয়টি আমেরিকা, ই.ইউ এবং ভারত সর্বোপরি এস,পি.এ. বিশ্লেষণ করে দেখেনি। প্রথম তালিকাতে এদের শেষ করে দেয়ার জন্য নাম থাকবে।

মাওবাদীরা এবং বিরোধী রাজনৈতিক উভয়েই বলেছে তারা তীব্রভাবে যুদ্ধ চালাবে। কয়েক মাস পূর্বে মহামান্য রাজ্য কর্তৃক সরাসরি শাসন গ্রহণ করায় প্রতিবাদকারীরা এর অবসন চেয়েছে। এস, পি.এ.কে ঐক্যবদ্ধ করা এবং মাওবাদীসহ ভারতের সমর্থনের কারণ হল ভারতে বিভিন্ন ধরনের কায়েমী স্বার্থ আছে, কিন্তু আমি আশ্চর্যান্বিত হই এজন্য যে ধনতান্ত্রিক প্ররোচনাকারী ও সমর্থকদের গণমাধ্যম যেমন বিবিসি (চার্লস হ্যাভিল্যান্ড তখন কাঠমুন্ডুতে) সি.এন.এন ও অন্যান্য মিডিয়া জঘন্যতম মৈত্রীকে সমর্থণ করছে এবং ভারতের সংবাদপত্র এবং নেপালের গণমাধ্যমেগুলোকে ইন্ধন যোগচ্ছে। স্বদেশোদ্রোহীরা শেষ পর্যন্ত নিজেদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে দেশকে ও ধ্বংস করবে।

দু'জন শীর্ষ পর্যায়ের নেতা প্রচন্দ এবং বাবুরাম ভট্টরাই স্বাক্ষরিত এক বিকৃতিতে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে এস.পি.এ পরিচালিত হরতালকে তারা সমর্থন করছে। তারা আরও ঘোষণা করেছে যে এস.পি.এ'র আহ্বানকৃত হরতালে যোগ দিবে এবং দেশব্যাপী রাস্তার নিয়ন্ত্রাণ গ্রহণ করে রাজকীয় সকল মূর্তি এবং রাজ সরকারের

www.pathagar.com

নামের সকল সাইনবোর্ড ধ্বংস করে দিবে এবং যারা রাজাকে কর দিচ্ছে তাদেরকে ধরা হবে। বাস্তবতা ছিল যে প্রতিবাদ কারীদেরকে বন্দুকের গুলির ভয় দেখিয়ে জড় করা হয়েছিল। এবং অংশগ্রহণকারীরা এস.পি.এ'র সমর্থক বলে দাবী করেছিল যাদেরকে জনগণ নিন্দা করছিল এবং গত দেড় যুগধরে তারা যে অপকর্ম করছে তা ভুলতে পারছিল না। এটা প্রতিবাদের চেয়ে আন্দোলনের দিকেই যাচ্ছিল বেশী। তাঁরাই ছিল সকল দ্বন্দ্বের মূল।

কয়েক মাস পূর্বে রাজা সকল ক্ষমতা হাতে তুলে নেন, আশা করেছিল গণতন্ত্রের পতনের কারণে যে অবস্থা হয়েছে সে অবস্থার উন্নতি করা। রাজনৈতিক দলগুলো মাওবিদ্রোহ দমন এবং সাধারণ নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাতে হিন্দু রাষ্ট্র, রাজতন্ত্র এবং রাজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রভাব পড়েছে। রাজার গণতান্ত্রিক রীতিকে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ কারণে 'র' এবং দক্ষিণ ব্লকের কৌশলগত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। যদি নির্বাচন অনুষ্ঠানের রাজার পদক্ষেপকে সমর্থন করা হত তাহলে সাংবিধানিক সকল পথ খুলে যেত এবং বাহিরের নাক গলানোর প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেয়া সম্ভব হত; নেপালের রাজনীতিও বন্ধ হয়ে যেত। অতএব, মাওবাদ সমর্থন একদিন ভারতের ক্ষতি করবে। সর্বশেষে ২৪ এপ্রিল রাজা সংসদকে পুনঃবহাল করে, প্রধানমন্ত্রী সংসদ বিলুপ্ত করে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট পুনর্বহালকে যুক্তিযুক্ত বলে রায় দেয়। তাছাড়া সংসদ সেকেলে হয়ে গেছে, তারপরও নির্বাচন না করে পুনঃবহাল করা হয়। আদর্শগতভাবে এটা রাজতান্ত্রিক এবং বাস্তবিকপক্ষে নেপালের রাজনীতিতে ভারতের জোরপূর্বক প্রবেশ। এ সময়ে এটি একটি সুযোগ হয় ইউ.এস-কে দেখানর জন্য যে নেপাল সম্পর্কে সকল বিষয়ে ভারতের মাধ্যমে সমাধান করা হবে। ভারতের কারণে ইউ.এস, ইউ.কে এবং ই.ইউ সন্ত্রাস মুক্ত নেপাল থেকে তাদের সামরিক সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। বড় দেশগুলো ক্ষমতার বেশী সুযোগ দেয়, ন্যায়ের প্রতি কম দেখায়। নেপাল ন্যায় বিচারের প্রতি অনিহা দেখায়।

অরুন রাজনাথের মতে ১৬৫ জন মাওবাদী নিয়মিত সদস্যকে ভুটানে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল, কারণ ভূটানকে ভবিষ্যৎ মাওবাদী দেশের (ধানকারান্য দেশাম) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। উলফা (ইউ.এল.এফ.এ) এবং কে.এল.ও কর্তৃক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। গেরিলা যুদ্ধের জন্য নিয়োগের ব্যাপারে মাওবাদীদের প্রশিক্ষণ ক্যাপসুলগুলো দেয়া হচ্ছিল। বোম তৈরির কলাকৌশল এবং অস্ত্র প্রশিক্ষণ ছিল এর অন্তর্ভুক্ত উলফার সৈন্যবাহিনী এবং কে.এল.ও প্রশিক্ষণ প্রদান করছিল। বলা হয়েছিল যে মাওবাদী দলের এবং দক্ষিন এশিয়া সংস্থার (সি.সি.ও.এম.পি.ও.এস.এ) পরবর্তী সমন্বয় সভা এ বছরের শেষে বাংলাদেশে হতে পারে এবং সে সময় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠিক করা হবে। সম্ভবত বাংলাদেশের মাওবাদী পূর্ব বাংলা সর্বহারা দল (পি.বি.এস.পি) এ সভার সমন্বয় করছিল। এটা জেনে ভারত তাদের এখানে সামরিক অভিযান চালায় এবং সমস্যার এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ করে দেয়। সদ্যব্রতী ব্যক্তি কর্তৃক এ অভিযান শেষ করার জন্য বলা হয়েছিল এবং সকল প্রশিক্ষণ ছাউনি ধ্বংস করে দিয়েছিল। একই ব্যবস্থা ভারত নেপালে করতে পারত, কিন্তু ভারত সামাধান করে নি। এ ধরনের সকল সমাধান করার জন্য ভারত নেপালকে ভুটানের মত মর্যাদা দিতে ছেয়েছিল কিন্তু নেপাল তা গ্রহণ করে নি।

www.pathagar.com

মাওবাদীরা রাজার পক্ষের সংসদীয় পরিষদের সঙ্গে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় যে তাদের শিকড়সহ টেনে তুলে ফেলবে অথবা নিশ্চয়তা দেবে একই সাথে তারা ভুটানের রাজাকে সংরক্ষণ করবে। এটার জন্য ভুটান সম্পূর্ণরূপে ভারতের উপর নির্ভর করেছে জানা গেছে যে নেপালে ২০০০ হাজারেরও বেশী উদ্বাস্তু সজ্জিত মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাদান করে। মাওবাদ সন্ত্রাসীদেরকে সীমান্ত এলাকায় শত্রুতা বশত বাঁধা প্রদান করে এতে কোনকোন সময় ভারতের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে এবং ইউ.এস.এ ও ই.ইউ. এর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। যখন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে কোন মাওবাদী দলের সঙ্গে কোন আলোচনা করা হবে না, রাষ্ট্রীয় শাখা অথবা বিরোধীদল যদি না দ্ব্যর্থহীনভাবে অস্ত্রপরিত্যাগ করে (অজয় সাহসী); অন্যদিকে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শ্যাম চরন চাপ সৃষ্টি করে (দিঅন্নপূর্ণাপোস্ট, এপ্রিল ২০০৬) যা জনগণের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ (এস.পি.এ.), সশস্ত্র মাওবাদীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সাংবিধানিক সংসদের দশ বছরের পুরাতন বিলুপ্ত দাবী পূরণ করে পুনরুজ্জীবিত করার এস.পি.এ-র দাবী অসাংবিধানিক ছিল। ভারতের পরামর্শে এস.পি.এ পরিচলিত হয় এবং যথারীতি সমর্থন পায়।

ডঃ টমাস এ, মার্ক এর মতানুযায়ী বলা যাচ্ছে যে ভারত যুদ্ধ জয়ের পথ বেছে নেয়। এ ক্ষেত্রে আর.এম.এন ছিল সত্যিকার প্রতিবন্ধকতা যাদের ক্ষমতার লোভ ছিল। অতএব অল্প সময়ের মধ্যে তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় এস.পি.এ-কে গ্রেফতার করা হল, এটা বহু দিনের বিস্ফরণশীল বিপদ। ভারত প্রথমে প্রচন্দ ও ভট্টরাই এ দু'দলের মধ্যে সমঝোতার জন্য মধ্যস্থতা করে। তারপর এস.ই.এ'কে নতুন দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানায় এবং ১২ দফা চুক্তির ভিত্তিতে রাজার বিরুদ্ধে নিম্নাঞ্চলে যৌথভাবে যুদ্ধ চালাতে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। এস.পি.এ-র অপরকর্মের জন্য তাদের আহ্বনকে দু'বৎসরের জন্য জনগণ প্রত্যাখ্যান করে। শেষ পর্যন্ত ১২ দফা চুক্তি অনুযায়ী শহরতলীতে ও গ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী লোকদিগকে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং তাতে এস.পি.ও তাদের সফলতা দাবী করে। উভয় শক্তির পিছনে ভারতের কৌশলের হাতছিল, তাদের নাটকীয় এ কার্যকলাপের এরূপ পরিণতি যে কোন সচেতন লোক সহজেই বুঝতে পারে, ভারত সঠিক একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। নেপালকে তাদের নির্ভরশীল করার অবস্থা সৃষ্টি করতে যেমনটি বলা হয়েছিল তেমনি করা হবে, কৌশলগত পরিকল্পনা, অনুযায়ী ১৯৯০ সালের ১ এপ্রিল যেমনভাবে এস.কে. সিং সফর করেছিল, যখন এস.পি.এ.র 'বন্ধদ্' এর ফলে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল তখন ডঃ করণ সিংকে নেপালে ভারতের বিশেষ দূত হিসেবে প্রেরণ করে। এ উত্তেজনা হচ্ছিল যাদেরকে মাওবাদীরা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাদের ব্যাপারে। কৌশলগত ভুল সিদ্ধান্তের জন্য পুনরায় এ ঘটনা ঘটতে পারে। এ জন্য নেপালে জাতীয়তাবাদ বিপদাশংকাপূর্ণ ছিল। নেপালবাসীরা অনুধাবন করল যে এ.পি.এ'র কর্মীদের শক্তি আচ্ছন্ন করে ফেলতে পুলিশ এবং এ.এফ.পি যাই করুক না কেন কার্যক্ষেত্রে পিছনে ফিরে যাবে। মাওবাদী এবং এস.পি.এরা যখন গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল তখন ভারত এটাকেই গণতন্ত্র বলছিল, যখন রাজা নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য চেষ্টা করছিল তখন ভারত উত্তেজিত হয়ে বলেছিল 'গণতন্ত্রকে ধ্বংশ করা হচ্ছে'। অতএব, ভারতের ভূমিকা ছিল জড়িত না থাকার,

www.pathagar.com

যেমনটি ১৯৮৭ সালে শ্রীলঙ্কায় করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত চমকপ্রদভাবে দেখা যায় একই রকমভাবে প্রলুব্ধ হয়ে নেপালে ভারতের শান্তিরক্ষী বাহিনী (আই.পি.কে.এফ) প্রেরণ করতে চায়। এ সময় থেকে কে.জি.বি.র ১০০০ উপদেষ্টা আমদানি করার চিন্তা করেছে সেই মুহূর্ত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গোয়েন্দা কার্যকলাপে অংশীদার হওয়ার পর গোয়েন্দা কার্য আশ্চর্যজনকভাবে খারাপের দিকে গিয়েছে, ফলে ভারতের গোয়েন্দাদেরকে ফিরে যেতে হয়েছে, তাতে কিছুদিনের জন্য দেশের ক্ষতি হতে পারে।

নেপালে ইউ.এস এবং ভারতের স্বার্থ এখন প্রত্যেকের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এটা ভারত এবং ইউ.এস.এর আপোসে সম্পাদিত বন্ধুত্বের অগ্রগতি যা কাঠমুন্ডুকে নরকে পরিণত করার নয়াদিল্লীর কৌশলকে কাজে লাগাবে।

নেপাল যে সমস্ত উৎস থেকে এ খবর পেয়ে থাকে, তা শুনে তাকে বোকা ও বধির হয়ে থাকতে হবে যেমনটি শ্রীলঙ্কার এক বছর করেছিল। নেপালের বিদ্রোহের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল তা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠে। স্নায়ু যুদ্ধের সময় ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থক ছিল, আর এখন আমেরিকার বন্ধু, এখন ভারত যা বলছে ইউ.এস. সম্ভবত তাই অনুমোদন করছে । তারা এখন ভারতের মাধ্যমে নেপালের দিকে নজর দিচ্ছে। তারা ন্যায়ের এবং সত্যের পক্ষপতি নয়। ক্ষমতা লাভের পক্ষে। তারা এখন নেপালে ভারতের সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং দ্বিগুণ মানদণ্ডের দিকে দেখছে না। তারা ভুটানের মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের দিকে দেখছে কিন্তু নেপালে নয়, কারণ ভারত যেভাবে বলছে সেভাবেই মেনে নিচ্ছে। যখন তারা নূতন বন্ধু পাবে তখন পুরাতন ভুলে যাবে। তাদের অভ্যাস হল সব কিছু ভাসাভাসা দেখবে।

জে.এন. দীক্ষিত বারাংবার দাবী করছে যে আমেরিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভারত যে তথ্য পেয়েছে তা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। বাস্তবিকপক্ষে ওয়াশিংটন ডি.সি-তে অনুষ্ঠিত জুরির দায়িত্ব পালনের জন্য আহুত হতে পারেন এমন ব্যক্তিদের নামের তালিকায় ভারতের অংশ গ্রহণ যেমন এস.ডি মুনি নিজেদেরকে পৃথক করে রেখে উচ্ছাকৃতভাবে স্পাম এর রায়দান ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞানতা দেখিয়েছেন। ভারতীয়রা বারংবার দাবী করছে যে স্পাম কয়েকটি সর্ত সাপেক্ষে সাংবিধানিক রাজার সঙ্গে সংসদ কাঠামো গঠন সম্পর্কে ভূমিকা রাখার জন্য সমঝোতা করতে ইচ্ছুক। শর্তানুযায়ী দেখা যায় জনসম্পদ গ্রাস করা এবং নেপালের দেশরক্ষা নীতি সেটাই হবে যা রাজা অনুমোদন করবে। রাজা অনুমোদন করেনি, তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন।

ডঃ মধুকর এস.জে.বি. রানা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী যথাযথভাবে তাৎক্ষণিক মাথায় আঘাত করে লিখেছেন, ভারত সত্যিকার এবং বাস্তব বিপজ্জনক রাজনীতির খেলা খেলছেন, অন্যের হয়ে মাওবাদীদের নেপালে সেনা বাহিনীতে অবিশ্বাস্যভাবে প্রচার চালিয়ে শান্তি ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করবে এবং আসন্ন উদ্বাস্তু ভারতীয় অংশে অনুপ্রেবেশ বন্ধ করে দিবে। গভীরভাবে চিন্তা করা হয়েছে এবং কৌশলগত পরিকল্পনা ভারতের গবেষণা এবং বিশ্লেষণ শাখা 'র' তৈরি করেছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং ত্রিমুখী সংকট 'র' এর দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। ইউ.এ. যখন

www.pathagar.com

থেকে আর.এন.এ.কে অস্ত্র সরবরাহ স্থগিত করছে, (পোস্ট ফেব্রুয়ারী ১, ২০০০) ভারত ও অনুরূপ করেছে।

নেপালের সংকট সম্পর্কে ইউ.এস. এবং ভারত
(The US and India on Nepal's Crisis)

নেপালের রাজনীতিতে ইউ.এস.এর ভূমিকা সব সময় অনির্দিষ্ট এবং অস্পষ্ট। সর্বশেষ ইউ.এস. সমর্থন দিয়ে যাকে তাকে বলা হয় সন্ত্রাসবাদ, রাজতন্ত্র ও হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে। একটি ধর্ম যা সকল ধর্মকেই সমর্থন করে, সকল প্রকার সন্ত্রাস, দুর্নীতি দূর করার জন্য নৈতিক শিক্ষার চিন্তা প্রচার করে। অন্য দিকে এ ধর্ম ধর্মীয় শাসকদের সমর্থন করে যেমন-দালাই লামা, পোপ। আমেরিকার ক্ষুদ্র স্বার্থ যেখানে ভারতের বৃহৎ স্বার্থের ভিতর দিয়ে গুপ্তভাবে নেপালকে দেখা না গণতান্ত্রিক না যুক্তিসঙ্গত। বুলেটের ভয়ে তাড়িত ৫% মানুষে বিক্ষোভের জন্য ৯৫% মানুষের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে তাদের দাবীকে মেনে নেয়া হলে গণতন্ত্র কতদিন বেঁচে থাকবে। ইউ.এস কিভাবে চিন্তা করল যে ৯০% হিন্দু নেপালী জনগণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে ই.ইউ. দেশগুলোও তাই মনে করছে। আমেরিকা এবং ই.ইউ এর দেশগুলোকে বুঝতে হবে গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের পূর্ণ বাকস্বাধীনতা আছে, মুক্তভাবে বাঁধা বিপত্তিহীন ভাবে অভিমত লেখার অধিকার আছে। উপরোক্ত, যে সমস্ত অভিমত গণমাধ্যমে দেয়া হয় সেগুলি গণভোটের দ্বারা সংশোধন করে দেয়ার অধিকার আছে। বুলেটের দ্বারা তাড়িত প্রতিবাদকারী এবং তাদের সঠিক অসাংবিধানিক সরবাহের গণভোট দ্বারা সংশোধন না করে কোন কিছু বাতিল করার অধিকার তাদের নেই। এছাড়া ঐ গণভোট হতে পারবে না যতক্ষণ না বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রবিহীন হয় এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে এবং সরকার সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ না হয়।

অন্তর্নিহিত অবিশ্বাস
(Profound mistrust)

দুঃখজনক হল খুব কমই আছে এমুহূর্তে পৃথক করতে তা হল অন্তর্নিহিত অবিশ্বাসকে বাঁচান। রাজা সম্মত হয়েছে যে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের দ্বারা সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষা করা হবে। মাওবাদীরা দাবী করছে সংসদের দ্বারা যে ধরনের সিদ্ধান্ত হোক না কেন তারা গ্রহণ করবে। এস.পি.এ. বলেছে সত্যিকার সাংবিধানিক হতে হবে। স্পাম দাবী করেছে আনুষ্ঠানিক রাজতন্ত্র হবে এবং আর.এন.এ হবে সত্যিকার জাতীয় সেনাবাহিনী। এ অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে নেপালকে নিয়ে খেলার কৌশলগত পরিকল্পনা থেকে।

এন.সি হল সকল প্রকার সমস্যা সৃষ্টির শিকড় এবং এটা হচ্ছে ব্যক্তিবাদী নেতাদের কারণে। মাওবাদীদের ৪০ দফা অভিযোগ যখন এন.সি. সরকার শুনছিল না, তখন তারা গুপ্ত আন্দোলনে চলে যায়। কৈরালা তার দলের দু'জন সংসদ সদস্যকে তার সমর্থনে নিয়ে আসে, তার নিজের সরকারের উপর অনাস্থা এনে পতনের জন্য এ দু'জন যথেষ্ট ছিল। দেওবা সংসদ বাতিল করে দেয় এবং নির্বাচনের ঘোষণা প্রদান করেন। পাঁচটি দল নির্বাচন এক বছরের জন্য স্থগিত করার দাবী করে যদিও সংবিধানের বিরুদ্ধে হয়। রাজাকে সংবিধানের ১২৭ ধারা কার্যকরি করে ক্ষমতা গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে বাধ্য করে, এধারা অবশ্যম্ভাবী অবস্থায় কার্যকরি হয়। এতএব স্পামদের নেতারাই এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার জন্য দায়ী। 'র' এ জটিল অবস্থার পিছনে থেকে তিন দলকেই সমর্থন যোগাচ্ছিল, একদল এস.পি.এ, একদল মাওবাদ এবং প্রত্যক্ষও পরোক্ষভাবে সরকারকে।

কাঞ্চনগুপ্ত এর (ভারত) মত অনুযায়ী ভারতে আলোচনার পর নেপালে মাওবাদীরা যুদ্ধবিরতি করে, তিনি বলেছেন মাওবাদীদের তথাকথিত যুদ্ধবিরতি স্পষ্টভাবে, কার্যকরি হয়েছে, সব সময় যা সন্দেহ করা হত যে তারা পুনর্গঠিত হচ্ছে, নিয়োগ দিচ্ছে, পুনঅস্ত্রসজ্জিত হচ্ছে এবং পরিপূর্ণভাবে ভাণ্ডার সঞ্চিত করছে, স্পাম এর ১২ দফা অনুযায়ী আন্দোলন করছে যা নতুন দিল্লীতে রূপ দেয়া হয় এবং ২০০৫ সালের ২২ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করে জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর করা হয়। তাদের মতে এমন সাংবিধানিক সংসদ চাই যেখানে মানুষ বলতে পারবে যে "আমরা একজন কর্মঠ রাজা চাই"। এস.পি.এ জনসৈন্য গঠনে অবদান রাখে এবং তার পর তিন দলের শক্তিকে একত্র করে একটি বড় সুখী পরিবার গঠন করে। আশ্চার্যজনক হল সেখানে, মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনের কোন উল্লেখ ছিল না এবং জন যুদ্ধে যে ১৫০০০ হাজার লোক জীবন দিয়েছে যে বিষয়েও কোন কিছু উল্লেখ নেই।

প্রচন্দ বললেন তিনি কোন দলের সঙ্গে কথা বলবেন না, তিনি রাজার সাথে কথা বলবেন, কিন্তু তিনি সুন্দরভাবে ডিগবাজি খেয়ে উল্টোভাবে ভারতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি মাওবাদী বিদ্রোহের সঙ্গে ভারতের বহু দিক ভূমিকায় জড়িয়ে পড়েন, এ অবস্থাসহ মাওবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে পার্থক্যগুলো সাময়িকভাবে মিসিয়ে ফেলা হয় এবং রাজবিরোধী স্পাম চুক্তি সহজতর করা হয় ফাঁকাগুলি বাতিল করা হয়। গতানুগতিক পদ ব্যবহার করা হয় ঠিক যেন আহত আঙ্গুলের ছাপ। অতএব মহামান্য রাজাকে কঠিন স্থানে ফেলে দেয়া হয় বিশ্বের চাপ মোকাবেলা করে যেন তিনি নিষিদ্ধ ঘোষিত নেপালের (মাওবাদী) কমিউনিষ্ট পর্টির সঙ্গে আলোচনা করতে উদ্যোগী হন। প্রচন্দ এবং গণপতি সাধারণ সম্পাদক সি.পি.ই.ই (এম) স্বাক্ষরিত যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয় যে, 'আমরা যৌথ ভাবে যুদ্ধ করে নেপালে এবং ভারতে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করব। যৌথ বিবৃতি নেপালের জনগণকে এবং ভারতের মাওবাদীদেকে শপথ করে যৌথভাবে যুদ্ধকরে সম্রাজ্যবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা সৃষ্টি যড়যন্ত্রকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়ে দু'দেশের পল পট ধরনের সরকার গঠন করতে হবে। তাঁদের কৌশলের শেষ দাপ হল বোমাদি ফাটানোর জন্য তৎসংলগ্ন দাহ্য পদার্থ পূনর্দখল দিয়ে শহরের বিদ্রোহীদের দ্বারা গণযুদ্ধকে বাধা দিতে হবে।

নেপালের মাওবাদীরা অনুমান করেছে যে ভারতের উদ্দেশ্য হল তারা যদি ক্ষমতা দখল করে তবে তাঁদেরকে দখল করা হবে, ভারত চায়না নেপাল সংগ্রামের ঘাটিতে পরিনত হোক। বেইজিং হিমালয়ান দেশগুলোতে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে উদ্যগী হবে না কারণ তা হলে তিব্বত ভারত থেকে পৃথক হয়ে যাবে। বিষয়টি হল তথাকথিত শান্তির ঘোষণায়, নেপালের রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের দাবী পরিত্যাগ করার জন্য প্ররোচিত করেছে, সংসদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে নির্বাচন করার জন্য এবং একটি নূতন সংবিধান লেখার জন্য যেখানে রাজতন্ত্রের কোন স্থান

www.pathagar.com

থাকবেনা। অতএব, ভারত এব্যাপারে মধ্যস্থতা করছিল, তাহলে রাজা বাধ্য হবে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানাতে।

এন.সি. এবং সি.পি.এন.-ইউ.এম.এল দলগুলির সংবিধান থেকে 'রাজতন্ত্র' শব্দটি বিলুপ্ত করে দেয় এতে মাওবাদীদের কাছাকাছি চলে আসবে। দলগুলির কোন দূরদর্শিতা নেই, কারণ তারা জানে না যে মাওবাদীরা ক্ষতায় এলে তারাই হবে প্রথম লক্ষ্যবস্তু, যুদ্ধ বিরতিকে তারা সাধুবাদ জানবে, স্পষ্ট উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন লাভ করা। তাদের সমর্থন লাভ করার অর্থ হল তাদের অস্থিত্বকে নিঃশেষ করে দেয়া। নেপালের মাওবাদীরা সি.পি.আই (মাওবাদী) এর সঙ্গে সহযোগিরূপে কাজ করছিল, এটা জানা ছিল যে এতে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপরীতে প্রভাব ফেলবে, যা হোক, অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়াকে শেষ করার জন্য এস,পি.এ. এবং মাওবাদীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করা হয়। এ কারনে ভারতের স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়গুলো বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল যে কিভাবে নেপালের মাওবাদীদের সঙ্গে আলোচনা করবে। মিঃ গুপ্তার মতামত অনুযায়ী 'পররাষ্ট্র' বিষয়ক মন্ত্রনালয় মাওবাদীদের পক্ষে এবং রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধের পথ খুঁজছিল, অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রনালয় (মাওবাদী) প্রচন্দের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থার জন্য ওকালতি করছিল। যারা বিশ্বাস করে যে, কলহ শান্তির জন্য প্ররোচিত করা হলে নেপালের মাওবাদীরা বৈধভাবে রাজনীতিতে ফিরে আসবে তা হলে বিরাট ভুল করা হবে। এ প্ররোচনার জন্য তারা পুনঃ দলবদ্ধ হয়, পুনঃঅস্ত্রে সজ্জিত হয় এবং পুনঃআক্রমন আরম্ব করে। এ ধরনের বহু উদাহরন ভারতে আছে। ভারত এটা খুব ভালভাবেই জানে।

তামিল টাইগাদের পরিচালিত বেশীরভাগ প্রশিক্ষন কেন্দ্রগুলো ছিল ভারতের নারকাটিয়াগঞ্জ ঘোড়াসাহান জেলায়। ঘোড়াশাহান নেপালের নিকটবর্তী বিহারের সীমান্ত এলাকার সীতামারহি এবং চাম্পারান এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। তাঁরা মানব বোমে যাকে দালামস (কর্মরত ক্ষুদ্র সৈন্য দল) বলা হয় গঠনে উন্নীত করেছিল। যুবক বালকদের দালামস এবং মহিলাদের দালামস দ্বারা আত্মঘাতী ক্ষুদ্র সৈন্যদল পর্যন্ত গঠন করেছিল। ভারতীয় এবং নেপালের মাওবাদীদেরকে যৌথভাবে এ ছাউনিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হত। মিঃ অরুন রাজনাথ লেখেছেন, এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে ভারতের স্পর্শকাতর সংস্থাগুলো প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছে না। স্পর্শকাতর সংস্থাগুলো ভারতরে মাওবাদী শক্তির মধ্যে ক্ষতিকর দলগুলোর অক্ষমতা ও বিভক্তি সম্পর্কে গণমাধ্যমে প্রচারনাপূর্ণ প্রচার চালিয়ে কুৎসা রটনায় এখনও ব্যস্ত। সে যা হোক, ২০০৪ সালের ১৫ অক্টোবর মাওবিদ্রোহী এবং দলগুলোকে পি,ডব্লিউ,জি, এম,সি,সি,সহ সি,পি,আই,এম এর সঙ্গে একত্রীকরণ করা হয়। তারা নেপাল থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত বিপজ্জনক এলাকায় (আর.জেড) উন্নীত করতে রাজি হয়। আটটি দেশের সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী মাওবাদীদের কোলকাতায় অনুষ্ঠিত এক গোপন সভায় নেপালের মাওবিদ্রোহীদেরকে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত হয়।

পেরু, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, ফ্রান্স, জার্মানী, শ্রীলংকা নেপাল এবং ভারতের মাওবাদীরা একত্র হয়। উলফা এবং এল.টি.টি. ই.ও অংশ গ্রহন করেছিল। সি,সি,ও, এম,পি,ও,এস,এ, এর সভা পরবর্তী বছরে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় বিপ্লবের বন্ধুত্ব

www.pathagar.com

(এফ,ও,আই,আর) গঠন করা হয়েছিল। অরুন রাজনাথ লিখেছেন, 'এক সভাতে সাব্যস্থ হয় যে এল.টি.টি.ই ভারতের এবং নেপালের মাওবাদীদেরকে পূর্ণ সমর্থন দেবে, ভারতীয় মাওবাদীরা নেপালের মাওবিদ্রোহীদের আশ্রয় ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করবে। ভারত এ সমস্ত কার্যকলাপের বিষয় পুরাপুরি জানত। ফ্রান্সের প্রশিক্ষকগণ নেপালী বিদ্রোহীদেরকে উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য ভূখণ্ডে প্রশিক্ষণ কাজ চালাত। এসমস্ত প্রশিক্ষণ ছাউনিগুলো নেপাল সীমান্তের নিকটবর্তী ভারতের জেলাগুলোতে চালান হত, যেমন-তানাকপুর, পিযোরাগড়, বাগেশ্বর ইত্যাদি। এসমস্ত ছাউনিগুলো সম্পূর্ণরূপে নেপালি মাওবাদী বিদ্রোহীদের জন্য করা হয়েছিল এবং তত্ত্বধান করত ভারতের সহমর্মীরা। বিপজ্জনক এলাকা এবং নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা বিদ্রোহীরাই তৈরি করেছিল। এটা আরম্ভ হয়ে ছিল নেপাল থেকে এবং বিস্তৃত ছিল উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য এলাকা, পূর্ব উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, দক্ষিণ মধ্যে প্রদেশ, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ হয়ে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত।

১৯৯৬ সালে জনযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে ২০০১ সালের জুন মাস থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এবং ২০০৩ সালে জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। উভয়পক্ষই এযুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছিল এবং সে সঙ্গে শত্রু সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনার কথা হয়েছিল। সাতটি রাজনৈতিক দলের ২০৫জন বিলুপ্ত ঘোষিত সংসদের প্রতিনিধির মধ্যে থেকে ১০৯ জনকে নিয়ে একটি মৈত্রীবন্ধন গঠন করা হয়েছিল রাজা জ্ঞানেন্দ্রর বিরুদ্ধে। তারা রাজতন্ত্রকে দোষারোপ করেনি। তারা মাওবাদীদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে বিরোধীদের সঙ্গে সমন্বয় করে একনায়কত্বের প্রচলন করতে। নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি সজোরে ইট নিক্ষেপ করা হলে নিরাপত্তা বাহিনী টিয়ারগ্যাস শেল মেরে সমুচিত প্রতিশোধ গ্রহন করে এবং জনতার উপর লাঠিচার্জ করে। সম্ভবত জনতার মধ্যে মাওবাদীরাও ছিল। রাজা জ্ঞানেন্দ্র মাওবাদীদের যুক্তফ্রন্টের প্রধান ধারার দল গুলির ভয়েভীত হয়ে পড়ে। রাজা মাওবাদীদের জন্য বক্তব্য নাই বলে বিবেচনা করলেন। কমিউনিজম মৃত প্রায়-এ সমস্ত বিস্তৃত দৃশ্য উচ্চ ও তীক্ষ্ণ আওয়াজ ইউ.এস রাষ্ট্রদূত স্বীকার করল। মাওবাদীরা মনে করল এটাই তাদের শেষ পর্যায়। বলশেভিক কৌশল অচ্ছেদ্যভাবে শহরাঞ্চলের শ্রমিকদের সংস্থাকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে, ফলে ১৯১৭ সালে অক্টোবর সংঘটিত হয়। শীতকালীন রাজ প্রসাদে প্রচণ্ড আক্রমণ করে। জার সম্রাটকে উচ্ছেদ করা হয়।

অশোক কে মেহ্তা'র মত অনুযায়ী কাঠমুন্ডুর অবস্থা অত্যন্ত ঘনীভূত ও অনিশ্চিত ছিল। বিপরীতভাবে রাজার ভাগ্যের চাকা বন্ধ করে দেয়ার অবস্থা আরম্ভ হয়। সম্ভবত রাজা সার্বভৌম রাজতন্ত্র রক্ষার পরিকল্পনা ত্যাগ করে। অতএব রাজার প্রতি যে ভূল ধারণা ছিল তার পরিবর্তে ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসক এবং সরকারি কর্মচারীরা আন্দোলনে নেমে আসে। এককভাবে তৃতীয় বার যুদ্ধ বিরতি যোগদেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

ভারত মাওবাদী এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন স্থাপনের জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং তৃপক্ষীয় থেকে দ্বিপক্ষীয় যুদ্ধে পরিণত করে। ভারত সাংবিধানিক রাজতন্ত্র এবং বহুদলীয় গনতন্ত্র এ দ্বিবিধ নীতির ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা

www.pathagar.com

করে আর কিছু করছে না। রাজতন্ত্রের রেফারেন্স সতর্কতার সঙ্গে পরিত্যাগ করা হয়েছে, কিন্তু এখনও রাজা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিরোধ দূর করার কথা বলা হচ্ছে। অদক্ষতা রাজনৈতিক নেতাদের দূর্নীতির কারণ রাজাকে বাধ্য করা হয়েছিল সরাসরি শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য এবং নেপালকে ব্যর্থ রাষ্ট্র হওয়া থেকে নিরাপদ করার জন্য, এবং সংবিধানের ১২৭ ধারা অনযায়ী রাজাকে সরকার গঠনের অনুরোধ করা হয়। চীন, পাকিস্তান এবং রাশিয়া কোন ধরনের নৈতিক সমর্থন এবং বস্তুগত সহযোগিতা রাজাকে করেনি। রাজার একই মাত্র পথ খোলা ছিল তা হল সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন করা।

বি.রমন (মাওয়িস্ট গেইন মেমেনটাম ইন ইন্ডিয়া) এর মতামত অনুযায়ী প্রয়াত মাও জেডং এবং তার চিন্তাধারা অনুযায়ী সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কারণ বহু বেসামরিক নিরীহ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। শূন্য ফলাফলের প্রবণতার কারণে এন,সি./সি.পি.এন., ইউ.এম.এল এর নেতৃত্ব দেশকে অশান্তিতে পরিণত করেছে। এ অঞ্চলে এসমস্ত হওয়ার কারণ হতে পারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনগ্রসরতা, অবিচার, রাজ্যাদি শাসনে দারিদ্র্যতা, বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষের দুঃখের সময় সংবেদনশীলতা দেখা হয় না, আইনের প্রয়োগ অপর্যাপ্ত আদেশ ল্যান্ড মাইন এবং পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্বারা বাছ বিচারহীনভাবে বেসরকারি লোকদের হত্যা এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্য করে গুপ্তহত্যা, বিদ্রোহ এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মিশ্রিত ফল। বাদারমেইনহোফ এবং তৎকালীন জার্মানির রেড আর্মি, বিরোধীদল, ইটালির রেড ব্রিগেড, ফ্রান্সের সরাসরি কর্মশক্তি, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের কার্লোস দল ইত্যাদি পর্দার অন্তরালে ছিল। একইভাবে দক্ষিণ আমেরিকা এশিয়াতে ফিলিপাইন, ভারত এবং নেপালে মার্ক্সবাদী অথবা মাওবাদী আন্দোলন থাকে রাজনৈতিক বিপ্লব, বিদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদ অথবা মিশ্রিত বিদ্রোহ অথবা সন্ত্রাসবাদ বলা যেতে পারে। অতএব, কোন প্রকার প্রশ্ন উথাপন না করে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর উচিত সরকারকে সমর্থন করা। সি.পি.এন. (মাওবাদী) নেপালের জনগনের পাশে অবশ্যম্ভাবী দাঁড়াবে এবং ভারতের সম্প্রসারণবাদ এবং ইউ.এস. সাম্রাজ্যবাদ সামরিক শক্তি দ্বারা নেপালে হস্তক্ষেপ করায় প্রচন্দ প্রতিবাদ জানায়। বিপ্লবের শত্রুরা সাম্রজ্যবাদী, সামন্ততান্ত্রিক, এবং বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে দেশীয় দালাল আমলা, ধনতান্ত্রিক। তাৎক্ষনিক ভিত্তিগত কার্মসূচি জনগণকে বলা যায় তা হল অংশত ও পরিবেশিক, অংশত সামন্ততান্ত্রীক শাসন, বড় জমিদারের দালল, আমলা, গণতান্ত্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং সাম্রজ্যবাদ, কিন্তু ক্ষমতায় থাকা কালে কিছুই করে নি।

যখন গেরিলা এলাকাকে পরিবর্তন করে ঘাটি করা হবে এই প্রক্রিয়ায় পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি (পি.এল.পি.এ) কে অগ্রসর মান হওয়ার জন্য উন্নীত করে নিয়মিত পিপল'স লিবারেশন আর্মি (পি.এল.এ) করা হবে। প্রমোদ ভ্রমনের ব্যবসাকে উন্নয়ন করা হলে গরীব মানুষের জীবন ধারণের অবস্থার উন্নয়ন করা যাবে এবং যুবকদের বেকার সমস্যার সমাধান হবে এ বিষয়ে মাওবাদীরা চিন্তিত ছিল না। একমাত্র বাইয়াবাস্তিবাসী আদর্শ সকল মানের শিক্ষা সকল নাগরিককে দিতে পাবে এবং যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সমানভাবে সরকারি চাকরী বিতরণপূর্ণ সুযোগ করা যাবে।

www.pathagar.com

চূড়ান্তভাবে বলা যায় আইন শৃঙ্খলা কার্যকরি হতে পারে যখন রাজনৈতিক ব্যক্তিরা নিরাপত্তা বাহিনীর অন্য কোন নীতি অনুসরণ না করে এবং পুনরায় জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয়ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে নেপালের মত নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যাওয়ার পূর্বেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। এটা হতে পারে যদি আমরা সময়মত সজাগ হই এবং সঠিকভাবে কাজ করি। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে বুঝতে হবে যে এককভাবে একটি দেশকে প্রথমে গণতান্ত্রিক অধিকার পেতে হবে, তারপর নাগরিকরা সে অধিকার পাবে। অতএব, ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে যেন প্রতিবেশী দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করে। যদি ভারত সৎ হয় তাহলে এ অঞ্চলে গণতান্ত্রিক শান্তি অবশ্যই শীঘ্রই ফিরে আসবে। নেপালের মাওবাদীদেরকে ভারতের মনোভাব বুঝতে হবে। অতএব, সকল দেশের মাওবাদীদেরকে অনুধাবন করতে হবে। তাদেরকে শুধু অভিমতকে চাপা দিয়ে রাখলে চলবে না, তার চেয়ে বড় হল বর্তমান আধুনিক বিশ্বের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কিভাবে চলতে পারে তা তাদের শিক্ষা করতে হবে। বর্তমানে অনেক নেপালি যে কোন মূল্যে শান্তি চায়। বন্দুকের নল দেখিয়ে সত্যিকার ক্ষমতা অর্জন হয় না, সত্যিকার ক্ষমতা অর্জন করতে হলে মানুষের মন জয় করতে হবে।

সমাপ্তিতে বলা যায় সকল কার্যকলাপের আগাগোড়া সব কিছু স্পাম অস্ত্রবিহীন প্রতিবাদ অথবা সসস্ত্র সন্ত্রাসী কাজের দাবী ভারতের সহায়তায় করা হয়েছে। আমেরিকা এবং ই.ইউ. এর নেপাল সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, ভারতের কথার উপর নির্ভর করে অন্ধভাবে সমর্থন দিয়েছে। মুক্ত অর্থনীতিভিত্তিক ব্যবসা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, এবং গণতন্ত্রকে প্রভাবিত করেছে। ক্ষুদ্র এবং দুর্বল দেশগুলোর স্বাধীন এবং সার্বভৌম অধিকার নিয়ে বাঁচতে পাবে না এ ধারনা সম্পূর্ণ ভুল এবং অগণতান্ত্রিক। তারা গণতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসবাদ এবং নিজের মতবাদকে সমর্থন করছে। সকল প্রকার ঘোষণা বাস্তবায়িত হবে যখন সেগুলো গণভোটের দ্বারা অনুমোদন করা হবে। সরকারকে সকল মহলের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে হবে এবং নিরপেক্ষ থাকতে হবে। সাংবিধানিক সংসদ বন্দুকের গুলির দ্বারা করা যাবে না অথবা প্রতারণা করে অস্ত্র ফেলে দেয়ার নামেও হবে না। এমনকি আবেগ প্রবণতা এবং ভাব প্রবণতা অবস্থায় সঠিক রায় দেয়া যায় না।

রেফারেন্স -

১. বি.রামন - মাওয়িষ্ট গেইন মোমেনটাম ইন ইন্ডিয়া।
২. গ্রে লিউপ- নেপালী মাওয়িষ্ট এনাউন্সেস থ্রি মান্থ সিজফায়ার।
৩. সুধীর সরমা- দি মাওয়িস্ট মুভমেন্ট এ্যান ইভাল্যুশনরি পারস্পেক্টিভ।
৪. কমলা শরুপ- কমিউনিজম, ট্যাররিজম অর স্পিস।
৫. ডঃ টমাস এ. মার্কস- এক্সপ্লেইনিং মাওয়িষ্ট ষ্ট্রাটেজিঃ ইট'স অল ইন দি ইসক্রিপ্ট।
৬. অরুন রাজনাথ- তামিল টাইগারস ট্রেইনিং নেপালীজ রাইবেলস।
৭. অশোক, কে মেহ্তা - রিকনসিলিয়েসন, দি অনলি ওয়ে।
৮. ডঃ শাস্ত্র দত্ত পান্থ- কমপারেটিভ কনষ্টিটিউশন অফ নেপাল।

www.pathagar.com

শ্রীলঙ্কার জাতিগত বিরোধে ভারতের ভূমিকা
(India's role in the Ethnic crisis in Srilanka)

অবতারণিকা (Introduction)

স্নায়ুযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো অবিরতভাবে ভয়, পারস্পরিক আশ্বাস, বিরাজমান উত্তেজনার আবর্তে জড়িয়ে পড়ছে। এ সমস্ত দেশগুলো যে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করে তাতে আধিপত্য বিস্তার করতে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত দেশ শক্রিয় বিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিচ্ছে, ফলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। এটা বলা যাচ্ছে না যে অর্থনৈতিকভাবে একে অন্যের উপর নির্ভরশীলতাসহ ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন, উদার নীতিকরণ এবং বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থা এ অঞ্চলে আন্তদেশ সম্পর্কের উপর কোন প্রকার প্রভাব ফেলে না। আঞ্চলিক দেশগুলোর মধ্যে নতুনভাবে বিশ্বায়ন শাসন ব্যবস্থা, বহুমুখী বাণিজ্য এজেন্সিগুলো প্রদত্ত গতিময় সহযোগিতার সুযোগ এবং এশিয়ার বেশীরভাগ দেশেই ব্যবসা বিনিয়োগ, অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

এশিয়ার বেশীর ভাগ দেশেই ব্যবসা, বিনিয়োগ, অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধি এবং নতুনভাবে বিশ্বায়ন শাসন ব্যবস্থা, বহুমুখী বাণিজ্য এজেন্সিগুলো প্রদত্ত গতিময় সহযোগিতার সুযোগ দেয়ায় আঞ্চলিক দেশেগুলোর অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে উপলব্ধির পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও এঅঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে অন্য রাষ্ট্রের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের দায়িত্ব বহনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ বিষয়ে একে অপরের প্রতি খুব বেশী সন্দিহান।

পাকিস্তান ও ভারত একে অপরকে দোষারোপা করছে, একারণে যে ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (আই.এস.আই) এবং রিসার্চ এবং এনালাইশিস উইং 'র' এর মাধ্যমে যার যার মত সীমান্ত এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। নতুন দিল্লী ঢাকাকে দোষারোপ করছে একারণে যে সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণ ছাউনিগুলো নিষিদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের এলাকায় নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারছে না। এমনকি কাঠমুন্ডু নিরাপত্তা সহায়তার জন্য নতুন দিল্লীর উপর নির্ভরশীল, বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে ভারত উৎসাহ করছে বলে দোষারোপ করছে এবং এর পক্ষে দৃষ্টান্ত আছে। ভারতের উত্তরপূর্ব দিক থেকে বিদ্রোহী সৈন্যদের হাত থেকে ভুটান পরিত্রাণ লাভের জন্য বহুদিন থেকে চেষ্টা করছে। শ্রীলঙ্কার জাতিগত বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ভারতের জড়িয়ে পড়া অন্যতম একটি বিতর্কিত বিষয় ও বক্রাঘাতপূর্ণ দিল্লীর বৈদেশিক নীতির একটি বিয়োগান্ত ঘটনা।

একটি লক্ষণীয় বিষয় দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অংশে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে বিরোধ মাকড়ষার জালের মত দৃঢ়ভাবে জেকে বসেছে। ভূখণ্ড অর্জন বা নিয়ন্ত্রণ করার এক প্রতিযোগিতা চলছে, যেমন কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভারত পাকস্তান, ভারত চীন এবং বাংলাদেশের সীমান্ত বিতর্ক এবং শ্রীলঙ্কার উত্তরপূর্ব এলাকা। সীমান্ত অতিক্রমের ব্যাপ্তিতৎসহ জাতীয় পর্যায়ে অপরাধীদের বিষয় সমূহ যেমন মাদকদ্রব্য, ক্ষুদ্র অস্ত্রের প্রসার এবং সীমান্ত অতিক্রম করে সন্ত্রাসীদের কার্যক্রম চলানোর প্রশিক্ষণ

www.pathagar.com

এবং আশ্রয়স্থল নিয়ে সবচেয়ে বেশী বিরোধ চলছে। ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির বিষয়ে আংশিক জ্ঞান নিয়ে তাকালে বিরোধের জন্য ভৌগোলিক দিক দিয়ে কোন একটি এলাকাকে স্বতন্ত্র করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থা
(India and the regional order in South Asia)

ভূখণ্ডের আয়তন, জনসাংখ্যা এবং অর্থনৈতিকভাবে ভারত দক্ষিণ এশিয়ার সব চেয়ে বড় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিচিত। যাই হোক, আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী ভারত আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার জন্য অবিরতভাবে চেষ্টা করছে।

এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এবং জনগণের জন্য উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে নতুন দিল্লীর নীতি কাজ করছে। ভারতের অনাক্রমণের বিরাট ইতিহাস আছে এবং উপমহাদেশের বাহিরে সম্প্রসারণবাদী অথবা শোধনবাদী প্রবণতা কখনও প্রকাশ করেনি। কিন্তু নতুন দিল্লীর কিছু নীতি ছলনা করে অবিশংবাদিত নেতৃত্বের উচ্চকাঙ্ক্ষা এবং দক্ষিণ এশিয়ার 'সিকিউরিটি ম্যানেজার' হওয়ার বাসনা পোষণ করে। সঠিক অর্থে, আঞ্চলিক নেতৃত্ব অথাৎ একটি পৃথক ভৌগোলিক এলাকায় একক বৃহৎ শক্তি যার সমকক্ষ কোন রাষ্ট্রের সামরিক ক্ষমতা নেই যে তার সর্বোচ্চ ক্ষমতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ঐতিহাসিকভাবে ভারত তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে কঠোর এবং অসমজোতার আচরণ দেখিয়ে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছে এবং এ দেশগুলোকে নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক, কুটনৈতিক নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরোধিতা করছে। করণ, ভারত মনে করছে তার স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করছে।

একইভাবে, কোন বাহিরের শক্তি যাতে এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সে ব্যাপারে তাঁর উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ পর্যায়ে নতুন দিল্লী অস্ত্রের নির্দিষ্ট ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী প্রার্থিত আঞ্চলিক সহযোগিতা, রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং দমননীতি দ্বারা শাসন সাধন করতে চায়। নতুন দিল্লী, অতীতেও তার অতি পার্শ্ববর্তী দেশ তিব্বত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং পৃথক হওয়ার আন্দোলনকারীদেরকে সমর্থন করতে।

উদাহরণস্বরূপ, অভিযোগ করা হচ্ছে যে নতুন দিল্লী শ্রীলঙ্কার মধ্যে পৃথকরাষ্ট্র দাবীকারী তামিল সদস্যদেরকে ভারত প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, বিশেষ করে লিবারেশন টাইগার অব তামিল ইলিম(এলটিটিই)দেরকে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় হস্তক্ষেপসহ, নেপালের সঙ্গে বাণিজ্য বিষয়ের বিরোধ নিয়ে নতুন দিল্লী সন্দেহজনক উপনাম অর্জন করে তর্জন গর্জন দেখিয়ে ভারতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এ অঞ্চলের স্বাভাবিক অবস্থাকে কার্যকরিভাবে পরিবর্তন করতে চায়।

যা হোক, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে কর্তৃত্ব করার জন্য ভারতের আচরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা অশোভন দেখা যাবে। জাতীয় স্বার্থের যুক্তি ব্যতিরেকে প্রতিবেশীদের প্রতি নতুন দিল্লীর নীতি অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাচ্ছে যে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় ভারতের হস্তক্ষেপের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কোন সমর্থন ছিল না, তবে এর কারণ ছিল যে অসংখ্য উদ্বাস্তু এদেশে আগমনের ফলে এ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল।

www.pathagar.com

একই ধরনের অবস্থা শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে ঘটেছে, দু'টি বিষয়ে ভারতেয় সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, প্রথমতঃ শ্রীলঙ্কার তামিল সংস্যালঘুদের সঙ্গে বিরোধ খুব নিকটবর্তী দু'টি দেশের উপর বাড়তি লোক সংখ্যার উপস্থিতির কারণে এ অবস্থা ঐতিহাসিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার তামিলরা দ্বৈত নাগরিক সম্প্রদায়। শ্রীলঙ্কার তামিল সম্প্রদায় বিশেষ সংস্কতির অধিকারী এবং ভারতে বসবাসকারী তামিল পরিবার থেকে তারা বিভক্ত হয়ে আছে, কারণ শ্রীলঙ্কার উত্তর প্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে তামিল রাজ্যে বসবাসকারী তামিলরা দু'টি সমুদ্রের মধ্যে সংযোগকারী মাত্র ২২ মাইলের একটি জনপ্রবাহ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ঠিক স্বাধীনতার পর থেকে, ভারত সক্রিয়ভাবে ভারতে জন্মগ্রহণকারী তামিলদের নাগরিকত্ব ও অধিকারের বিষয়ে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ব্যস্ত রয়েছে।

শ্রীলঙ্কার তামিল সম্প্রদায়ের উদ্ভূত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং ১৯৫৬ সাল থেকে শ্রীলঙ্কার সিংহোলিদের প্রভাবিত কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদার অবনতিশীল বিষয়টি নতুন দিল্লী গুরুত্বের সাথে পর্যাবেক্ষণ করছে।

ভারত আরও পর্যবেক্ষণ করছে তাদের অপারগতা বা অনিচ্ছার কারণে পর পর সরকারগুলো ১৯৫৬ সাল থেকে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে পর্যালোচনা করেনি। সংস্কৃতিক অধিকার শ্রেণীর সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার কারণেই শুধু নয়, স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় তামিলরা জলপ্রবাহ দ্বারা বিচ্ছিন্ন, তাদের একই সংস্কৃতির অধিকারী ভাইদের জন্য প্রাদেশিক পর্যায়ে হোক অথবা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে হোক এ ব্যাপারে কিছু করার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

এলটিটি, তাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সম্পূর্ণরূপে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাচ্ছে যে এলটিটিই তামিলদের আবেগ অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার এবং স্বার্থ আদায়ের জন্য ভারতীয় তামিল সংস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক সখ্যতা স্থাপন করেছে। এই দলগুলো শ্রীলঙ্কার তামিলদের পক্ষে সমর্থন যোগাচ্ছে এবং কলম্বোর প্রতি নতুন দিল্লীর নীতিকে প্রভাবিত করছে। কখনও কখনও এ সমস্ত দলগুলো নতুন দিল্লীকে শ্রীলঙ্কায় হস্তক্ষেপ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করছে।

দ্বিতীয়তঃ অবস্থাগত কৌশলের দিক থেকে এবং শ্রীলঙ্কার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারতের নিরাপত্তার বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া শ্রীলঙ্কা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) একজন সদস্য ছিল, নতুন দিল্লীর সুবিধার জন্য শ্রীলঙ্কা ধীরে ধীরে পশ্চিমা ব্লকের দিকে ঝুঁকতে ছিল। শুধু আই নয়, এই বিরোধের জন্য অতিরিক্ত আঞ্চলিকতা দেখালে ভারতের অবস্থানের প্রেক্ষিতে ভৌগোলিকভাবে ভয়ের কারণ আছে। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে পাকিস্তান এবং চীনের সুসম্পর্ক আছে, দু'টি দেশ ভারতের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে যুদ্ধ করছে। শ্রীলঙ্কায় বিশেষ সংস্কৃতি অধিকার সর্ম্পকিত বিরোধে দু'টিদেশ কলম্বোকে সামরিক সহযোগিতা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ইউ.এস এর যুদ্ধজাহাজের জন্য শ্রীলঙ্কার বন্দর খুলে দেয়া, সামরিক সমর্থন, প্রশিক্ষণ এবং পশ্চিমাদের নিকট থেকে অস্ত্র এবং ইসলামাবাদের সঙ্গে কলম্বোর আন্তরিক সম্পর্ক ভারতের জন্য ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। পশ্চিমাদের গোয়েন্দা ও

www.pathagar.com

নিরাপত্তার লোকদের শ্রীলঙ্কার উপস্থিতি ভারতের উদ্বেগের বিষয় ছিল। ইউরোপিয়ান ও চায়নীজ সামরিক অস্ত্র ক্রয় এবং প্রাক্তন এস.এ.এস এর উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি, ইসরায়েলি নিরাপত্তা ও গোয়েন্দার লোকজন, দক্ষিণ আফ্রিকার ভাড়াটে সৈন্য এবং তামিল সৈন্যদেরকে যুদ্ধ করার জন্য পাকিস্তানী কমান্ডো অরক্ষিত দক্ষিণাংশে ভারতের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছিল। শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত প্রাক্তন হাইকমিশনার জে,এন দিক্ষীতের মতে, তামিল বিদ্রোহীরা তামিলনাড়ু ও কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট থেকে সমর্থন পেয়েছিল, শুধুমাত্র শ্রীলঙ্কার, তামিলদের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার সরকারের সামরিক দৃঢ় প্রত্যয়ই নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও পাকিস্তানের সঙ্গে কলম্বোর বাস্তব ও প্রসারিত, সামরিক ও গোয়েন্দা সহযোগিতার জবাব দেয়ার জন্য এটা করা হয়েছিল। স্থির করেছিল যে এ সমস্ত অতিরিক্ত আঞ্চলিক সংস্থাগুলো এবং যারা পাকিস্তান থেকে এসেছে তারা অনড় হয়ে ভারতকে কৌশলে কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব এর বিষয়ে ভারতের অভিজ্ঞতার নীতির প্রতি হুমকি প্রদান করবে ভারতের দক্ষিণ রাজ্যগুলোর মধ্যে ঐক্য নষ্ট করার জন্য এ আন্দোলন উৎসাহিত করবে।

অতএব, শ্রীলঙ্কার বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী শ্রেণীর বিরোধের প্রতি ভারতের সমর্থন সামাজিক এবং রাজনৈতিক কৌশল বিবেচনায় কর্তৃত্বভরে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ সিলোনিজদের বিরুদ্ধে তামিলদের যুদ্ধের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ছিল। দ্বিতীয়তঃ কলম্বোকে তার অভ্যন্তরীণ বিরোধে আটকানো, তাহলে বৈদেশিক নীতির বিষয়ে তারা বিরত থাকলে ভারতের সংশ্লিষ্ট হওয়ার সুবিধা হতো, ভারতের নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হলে দেখা যায় এই অঞ্চলে কর্তৃত্ব করার বহিঃপ্রকাশ। ঠিক একইভাবে নতুন দিল্লী পৃথক তামিল রাষ্ট্রের আর্বিভাব চায়না, কারণ তাহলে ভারতের তামিলনাড়ুর তামিল বিচ্ছিন্নবাদীদের আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠবে। ভারতের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দু'টি পথ বেছে নেয়ার আছে, হয় তাদেরকে মধ্যস্থতা করে সমাধান করতে হবে অথবা সামরিক হস্তক্ষেপ করতে হবে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় যে আমাদের দেখতে হবে শ্রীলঙ্কার বিরোধের সঙ্গে তাদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ আছে কিনা।

শ্রীলঙ্কার বিরোধ বিভিন্নভাবে অবলোকন
(Overview of the conflict in Srilanka)

শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যাতাত্ত্বিক পটভূমিতে দৃষ্টরূপরেখা পরস্পর সম্পর্কিত অংশ নিয়ে গঠিত দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশ মিলিয়নের বেশী জনসংখ্যার মধ্যে সিলোনিজ ৭৩% শতাংশ, শ্রীলঙ্কান তামিল ১১% শতাংশ, অভিবাসী তামিল ৮% শতাংশ, মূরস এবং মালেস (মুসলিম) ৭% শতাংশ, ডাচ এবং পর্তুগীজ বারগুরস নাগরিক ১% শতাংশ। ধর্মীয় দিক দিয়ে মোট জনসংখ্যার ৬৯% শতাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী (সকলই সিলোনিজ), ১৫% শতাংশ হিন্দু (বেশীর ভাগ তামিল) ৮% শতাংশ মুসলিম (মূরস এবং মালে) এবং ৭% শতাংশ খ্রিস্টান (সকলেই বারগুরস, কিছু সিলোনিজ এবং তামিল)। ভৌগোলিকভাবে উত্তর শ্রীলঙ্কার মনো-এ্যাথিনিক তামিলদের বসবাস, পূর্ব শ্রীলঙ্কা বিভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী মানুষ (সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব আছে) অভিবাসী তামিলদের দ্বারা কেন্দ্রের উঁচুভূমিতে বসবাস

www.pathagar.com

করে এবং দক্ষিণ শ্রীলঙ্কা মূখ্যতঃ সিলোনিজদের দ্বারা অধিকৃত (রাজধানী কলম্বো ব্যতিক্রম, সেখানে সকল সংস্কৃতির লোকেরই বসবাস)।

শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারীদের মধ্যে প্রথম থেকেই রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিল ও বিশৃঙ্খল অবস্থা অতিতের ঔপনিবেশিক শাসনকালেরই সাক্ষ্য বহন করে। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতালাভের পূর্বে সংখ্যালঘু তামিলরা আমলাতান্ত্রিক ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনে অযৌক্তিক প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

১৯৫৬ সালে সিলোনিজ প্রাধান্য সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর নাগরিক সমাজ থেকে ঔপনিবেশিক অতীতকে মুছে ফেলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে, বিশেষ করে তামিল সংখ্যালঘুদেরকে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে। এ কারণেই দ্বীপটির সিলোনিজ অধিবাসিদের সঙ্গে তামিলদের মধ্যে গভীর অস্থিরতার সৃষ্টি হয়।

সিলোনিজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে তামিলদের ভিন্ন সংস্কৃতি অধিকারের চাঁপা উত্তোজনার ফলস্বরূপ তামিল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করার জন্য তামিল জাতীয়তাবাদের বেশ কিছু দলের আর্বিভাব ঘটে। তামিল সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে পক্ষপাতিত্বের জন্য সিলোনিজ প্রভাবিত কর্তৃপক্ষকে তারা দায়ী করে। শ্রীলঙ্কায় ফেডারেল সিস্টেম অব গর্ভমেন্ট প্রবর্তন না করার কারণে তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট (টিইউএলএফ) বিশেষভাবে সরকারের সমালোচনা করে। ১৯৭৬ সালে (টিইউএলএফ) তামিল জাতির স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক প্রচার কার্য চালায় এবং এর উপর ভিত্তি করেই তামিলদের স্বাধিকারের আন্দোলন গড়ে উঠে।

টিইউএলএফ এর উৎপীড়িত অবস্থাগুলো স্বীকার না করে কলম্বো কর্তৃপক্ষ ক্রমাগতভাবে দাবী প্রত্যাখান করার ফলে বিভিন্ন তামিল গেরিলা দল গঠন হয়। এসব দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো (এলটিটিই) প্রথম দিকে এ দলের নাম ছিল তামিল নিউ টাইগারস (টিএনটি), দলটি অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত তামিল কৃষি শ্রমিক যারা ১৯৭০ সালে অর্থনৈতিক সংস্থানের কারণে জীবিকা নির্বাহের উপায় হারিয়েছে তাদের সমর্থন পেয়েছে। সিলোনিজ প্রাধান্য ক্ষমতাকে একচেটিয়া অধিকারের ফলে শহরের বেকার তামিল যুব সম্প্রদায় যারা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অবরুদ্ধ হয়েছিল তাদের সমর্থন পেয়েছে। উত্তর এবং পূর্ব-শ্রীলঙ্কার তামিল প্রভাবিত এলাকা পৃথক করার দাবী জানায় এবং সার্বভৌম রাজনৈতিক তামিল ইলিম রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। টিইউএলএফ কর্তৃক তালি জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে এবং স্বাধীনতার প্রতি বিদ্যমান সমর্থন নিয়ে এল টিটিই ১৯৮৩ সালে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করে।

যদিও প্রথম পর্যায়ে দলটি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে তামিল রাজনীতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বদের যারা সরকারের সংঙ্গে অবির্ভূক্ত হয়েছে, এই সময়ে এলটিটিই পরিমিতভাবে ক্রিয়া পদ্ধতি আরম্ভ করে এবং কৌশল উন্নত করে বৃহৎ আকারে খোলাখুলিভাবে শ্রীলঙ্কার সামরিক শক্তির সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়। সহযোগী সংস্কৃতির অধিকারী শ্রেণীরে সঙ্গে প্রতিযোগীদেরকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে এবং সফলতার সঙ্গে শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনীকে ব্যস্ত করে রাখে, এলটিটিই সরকারকে সুযোগ গ্রহণ এবং দেশের উত্তরপূর্ব প্রদেশকে নিয়ন্ত্রণ করা থেকে বিরত করে। ১৯৮৭

www.pathagar.com

সাল থেকে এলটিটিই কার্যকরভাবে উত্তর উপদ্বীপের শাসন শুরু করে– করারোপ করতে থাকে, তাদের নিজেদের নীতি বাস্তবায়িত করণ এবং পরিবহন ও শিক্ষার মত জনসেবা আরম্ভ করে।

কলম্বো কর্তৃপক্ষ এলটিটিই'র বিদ্রোহীদের গঠনাত্মক সময়ে বিভিন্ন কারণে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়নি। প্রথম কারণ, শ্রীলঙ্কান বাহিনী সাধারণভাবে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য প্রশিক্ষিত ছিল যার ফলে সামরিক হুমকি মোকাবেলায় অপারগ ছিল। পরবর্তীতে সামরিক বাহিনীকে কার্যকরভাবে পেশাগত সামরিক বাহিনীতে উন্নয়ন করা হয়। এদিকে এলটিটিই উন্নত গেরিলা যুদ্ধের তীব্রতর প্রস্তুতি গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীলঙ্কান সরকার উত্তর উপদ্বীপের উপর কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ খটাতে পারেনি অথবা দলের নির্দেশনায় ছাউনিগুলো শক্তি প্রয়োগে ব্যহত করতে সক্ষম হয়নি।

তৃতীয়তঃ ঘৃণা ও অসত্য বলে ঘোষণা করার পরও ভারত ১৯৮৩-১৯৮৪ সালে এলটিটিই দলের স্থায়ী কর্মচারীদের অস্ত্র ও সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া আরম্ভ করে। তৎসত্ত্বেও ১৯৭২ সালে তামিলনাড়ু সরকার এবং শ্রীলঙ্কার সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী তামিলদের মধ্যে প্রাথমিক সম্পর্ক স্থাপন হয়। তামিল মানাভী পেরাভী থেকে তামিল ছাত্রদের একটি প্রতিনিধি দল শপথ করে যে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার কাছ থেকে তামিলদের স্বাধীনতা নিয়ে আসবে, তারা মাদ্রাজ ভ্রমন করে এবং তৎকালীন তামিল নাড়ু নেতা ই.ভি.আর. পিরিয়ার সঙ্গে দেখা করে। চার সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দলকে পিরিয়া বলেছে যে যদি শ্রীলঙ্কায় তামিলরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে থাকে তবে তারা দক্ষিণ ভারত আসতে পারে। আমরা তোমাদেরকে কৃষি কাজ করার জন্য প্রচুর জায়গা দিব। ১৯৭০ সালে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী তামিল যুবকরা শ্রীলঙ্কার পুলিশের গ্রেফতার এড়ানোর জন্য তামিলনাড়ুকে আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করে।

১৯৭০ সালের শেষের দিকে এলটিটিই তামিলনাড়ুর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। এ সমস্ত দলের মধ্যে ছিল ভীরা মানির নেতৃত্বাধীন দ্রাভিডা কাজাগাম, নেদুমারনের নেতৃত্বাধীন কামরাজ কংগ্রেস এবং পেরিনচিন্তা নারায়ননের নেতৃত্বাধীন পিউর তামিল মুভমেন্ট দল। ভীরামানী তার দলের সকল প্রধান প্রধান সংগঠককে তামিলনাড়ুর এক সভায় ডেকে এলটিটিই-কে সমর্থন করার জন্য বলে দিয়েছে। পেরিন চিন্তানারায়ণ তার সমস্ত সম্পত্তি এলটিটিই-কে ব্যবহারের জন্য দিয়ে দিয়েছে। তারপর থেকে এলটিটিই অত্যন্ত চমৎকার সম্পর্ক গড়ে তুলে, তন্মধ্যে আছে এম.জি রামাচন্দ্রন, এম করুননিধী যারা একে অন্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল।

যদিও তামিল বিদ্রোহীরা ১৯৮২ সালে তামিলনাড়ুতে কয়েকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে, আগস্ট ১৯৮৩ সালের পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোন সরকারি সহযোগতা পায়নি। ১৯৮৩ সালের জুলাইয়ে দাঙ্গা তামিল জনগণের অনুভূতিতে ইন্ধন যোগায়। ফলে তামিলনাড়ু রাজ্য সরকার শ্রীলঙ্কান উদ্বাস্তুদেরকে মানবিক সহযোগিতা প্রদান করে, এতে দুর্ভাগ্যবশত বিদ্রোহীরা সংঘাত এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। এভাবে শ্রীলঙ্কার বিদ্রোহীদের জন্য তামিলনাড়ু প্রয়োজনীয় বাহিরের ঘাটি হিসেবে গড়ে উঠে, সৈন্য চলাচল ও সংগ্রামরতদের জন্য অস্ত্রসস্ত্র গোলাবারুদ

www.pathagar.com

সরবরাহের আর্দশ স্থান এবং শ্রীলঙ্কা থেকে যে সমস্ত তামিল বিদ্রোহী আসে তাদের পালানোর আশ্রয় স্থল। তামিলদের সংখ্যা বৃদ্ধি, শক্তি আহরন ও শক্তি প্রয়োগের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অর্জনে এই সুযোগ সহায়ক হয়।

১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ২০,০০০ শ্রীলঙ্কান তামিল বিদ্রোহীকে আশ্রয়, আর্থিক সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার, তামিলনাড়ু রাজ্য সরকার অথবা বিদ্রোহী দল নিজেরাই সংস্থান করেছিল। তখন অধিকাংশ প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ভারতের উত্তর প্রদেশের সামরিক এবং আধাসামরিক ছাউনিগুলোতে সীমাবদ্ধছিল, 'র' এর সাথে সম্পৃক্ত ভারতীয় শিক্ষাদানকারীদের দ্বারা নতুন দিল্লী, বোম্বে এবং ভিজাগাপ্টমে, শ্রীলঙ্কার বিদ্রোহীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, ভারতের প্রধান সামরিক একাডেমী যেখানে সামরিক বাহিনীর লোকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যেখানে থেকে'র' বাংলা, পাকিস্তান ও তিব্বতের ভিন্নমতালম্বীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল, অত্যন্ত গোপনীয় সে ডেরাডুনের 'চাক্রাতায়' তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সেই সময় এলটিটিই তামিল নাড়ুতে তাদের ক্রিয়াকলাপ চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় দফতর প্রতিষ্ঠা করে। বিদ্রোহী নেতা ভিল্ল পিল্লাই প্রভাকরণ ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেছে, তারপর ভারতে রাজনৈতিক আবহাওয়া দৃঢ় প্রত্যয় বিশ্বাসী হলে শ্রীলঙ্কায় ফিরে যায়। এলটিটিই এর দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য ভারতের প্রতিশ্রুতি কঠোর ছিল এবং শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনীকে ব্যস্ত রেখেছিল। এলটিটিইর লড়াই করার দক্ষতা অবাধ ছিল কারণ ১৯৮৭-১৯৯০ সাল পর্যন্ত আইপিকেএফ এলটিটিই এর অংশগ্রহণ করে তাদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাচ্ছে যে, দীপেন্দ্র সিং যিনি ভারতীয় আর্মি জেনারেল এবং আইপিকেএফ এর সেনাপতি ছিলেন, তিনি খোলাখুলি ভাবে এলটিটিই এর সমুদ্র বক্ষের যোদ্ধাদের আধুনিকতম প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে দেখে আশ্চর্য হয়েছেন। উপরন্তু গেরিলা প্রশিক্ষণ অর্জন করে এবং আধুনিকতম যুদ্ধাস্ত্র গোলাবরুদ পেয়ে তারা ভারতও শ্রীলঙ্কার মধ্যে অবাধে যাতায়াতের সুযোগ করতে পেরেছে।

বিদ্রোহীদলকে তাদের বিভিন্ন সংস্কৃতিক অধিকারী শ্রেণীদেরকে একটি সমঝোতায় আনার জন্য ভারতের রাজনৈতক মধ্যস্থতা এবং পরম্পরাগত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তামিল টাইগারস এবং শ্রীলঙ্কার সরকার উভয়েই বিরোধের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রস্তুত নয়। ফলে প্রত্যেক দিকেই বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করে প্রতিযোগিদের মধ্যে সামরিক সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্র তৈরি হয়। এলটিটিই একটি নির্বাচিত কেন্দ্রিয় সরকারকে দুর্বল করার জন্য চেষ্টা করে এবং নিরপত্তা বাহিনীর চলাচল সীমাবদ্ধ করার কর্তৃত্ব জাহির করার ও অতর্কিত আক্রমণার্থে গোপন অবস্থান এবং বিস্ফোরক দ্বারা আক্রমণ করার ঘোষণা দেয়। শ্রীলঙ্কার নিরাপত্তা বাহিনী সাব্যস্ত করে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হল সাময়িক সমস্যা, সুতরাং সামরিক ভাবেই তা সামাধান করতে হবে। অনুসন্ধান কর এবং কার্যক্রম ধংসকর, নীতি বাস্তবায়ন আরম্ভ করে, উদ্দেশ্য হলো এলটিটিই এর নিয়মিত নিম্নতম পদস্থ সৈনিকবর্গ ও বিদ্রোহীদেরকে যে সমস্ত তামিল নাগরিক সৈন্য চলাচলের ও সরবাহের বিদ্যায় সমর্থন দিচ্ছে উভয়কেই ধ্বংস করে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নিয়মিত সামরিক বাহিনী অনিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে ঘন বসতিপূর্ণ বেসামরিক এলাকার

www.pathagar.com

নিয়োজিত হয় এবং শ্রীলঙ্কা সামরিক বাহিনী দেশটির উত্তর পূর্বাংশ উল্লেখযোগ্যভাবে বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংস চালাতে সক্ষম হয়।

১৯৮৩ সালের জুলাই মাসের দাঙ্গা ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী শ্রেণীর লোকদের ধৈর্য দুই বিপরীতমুখী গন্ডিতে বিভক্তকরণ অধিকতর রূপ লাভ করে এবং দেশটির ইতিহাসের এক চরম মুহূর্ত শুরু হয়। এলটিটিই কর্তৃক ১৩ জন সিলোনিজ সৈন্যকে অতর্কিত আক্রমণ করে হত্যা করার কারণই এ বিশৃঙ্খলার মূল কারণ, এতে নিরিহও দুর্ঘটনা কবলিত আহত মানুষ তামিলদের দ্বারা কষ্টভোগ করে ফলে দাঙ্গা হাঙ্গামাকারী সিলোনিজরা লুণ্ঠন, ব্যাপকভাবে তাড়িত উদ্বাস্তু, সম্পদের ধ্বংস এবং হত্যা সাধন করে। উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী শ্রেণীর তামিলদেরকে খতম করে দেওয়ার জন্য এই দাঙ্গাকে গণহত্যা, সুসংগঠিতভাবে হত্যা সাধন ও লুণ্ঠনকারীদের খতম করে দেয়ার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। সরকার বা নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক এটা কোন সংগঠিত উদ্দেশ্য ছিল না। সরকার এ হিংস্রতাকে প্রতিরোধ করার জন্য কোন কিছু করেনি। যখন দাঙ্গা আরম্ভ হল তখন বেশ কিছু দুস্কৃতকারী দ্রুততার সঙ্গে সংগঠিত হয়ে নিয়মাবদ্ধভাবে তামিলদের বসতবাড়ীতে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ করে।

অদূরদর্শী উৎকট স্বদেশভক্ত সিলোনিজ দল বিশ্বাস করেছিল যে তামিলরা সিলোনিজ এলাকা থেকে চলে গেলেই তাদের বিজয়। দুঃখজনক হল তাদের মধ্যে কেউ বুঝতে পারে নি যে, নিপীড়িত যারা দেশ ছেড়ে চলে গেছে তাঁরা সন্ত্রাসীদের প্রচারণার জন্য অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে দাঁড়াবে। দাঙ্গার পরবর্তীতে শ্রীলঙ্কা ভৌগোলিকভাবে অধিকার বলে হোক বা না হোক দেশের কিছু অংশে সন্দেহাতীত কিছু সম্প্রদায় বসবাস করে তাদেরকে নিয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে জাতিগত বিরোধের দেশে পরিণত হয়েছে কিন্তু অন্যেরা নয়। এ ধরনের অবস্থার ফলে শ্রীলঙ্কার তামিল ও সিলোনিজদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র পরিচিতির আভাস দানা বাঁধতে থাকে। সমস্ত সিলোনিজরা যারা উত্তরে বসবাস করত, তাদের সংখ্যা প্রায় ৫০০০, জাফনা উপদ্বীপ ত্যাগ করে দেশের দক্ষিণে চলে আসে। কমপক্ষে ৫০% তামিল জাফনা উপদ্বীপের বাহিরে বাস করে তারা হয় উত্তরপূর্ব দিকে চলে আসে না হয় উদ্বাস্তু হয়ে অন্য দেশে বেশীর ভাগই ভারতে চলে যায়। দলবদ্ধভাবে সমুদ্র অতিক্রম চলে যাওয়া তীব্রতর হওয়ায় প্রায় ২২৫,০০০ শ্রীলঙ্কান তামিলরা তামিল নাড়ুর ছাউনিতে নিবাসিত জীবন যাপন করে অথবা কেহ কেহ বন্ধুদের সঙ্গে এবং আত্মীয় স্বজদের সঙ্গে বাস করতে থাকে।

ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশকারী বিপুল পরিমাণ সংগ্রামরত মানুষ এবং উদ্বাস্তু আইন শৃঙ্খলার সমস্যা সৃষ্টি করে। তামিলনাড়ুর সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ উল্লেখযোগ্যভাবে স্ফীত হতে থাকে, শ্রীলঙ্কান তামিলদের সমর্থনে ভারতকে শ্রীলঙ্কায় সামরিক হস্তক্ষেপ করার জন্য আহবান জানায়। যখন তামিল উদ্ধাস্তুদের অবস্থা দুর্দশাপূর্ণ হয়ে ঘরোয়াভাবে মুখরোচক বির্তকে পরিনত হয়, নতুন দিল্লী তখন এই বিপদজ্জনক অবস্থার জন্য কৌশল অবলম্বন করে। ভারত শক্তি প্রয়োগের জন্য লঘু চাপের মধ্যে ছিল, কিন্তু কিছু করা হলে শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার শামিল হবে বিধায় তা করা হয় নি। ঠিক অনুরূপভাবে বলা যাবে যে নিরাপত্তার অবনতি ঘটেছিল এবং শ্রীলঙ্কার বিরোধে বাহিরের ক্ষমতাবান শক্তির জড়িত হওয়ার

www.pathagar.com

ন্যায়তা প্রতিপন্ন করার প্রতি দৃষ্টি ও ছিল। সে সময়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী কলম্বোকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন ইচ্ছা ভারতের নেই। শ্রীলঙ্কার সম্পর্কে নতুন দিল্লীর এই বক্তব্যকে জোরাল করার জন্য সংকট উত্তরণের ব্যাপারে শ্রীলঙ্কা, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে সামরিক সাহায্য চান। ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয় যে কোন বাহিরের শক্তি বিজড়িত হলে উভয় দেশের জন্য জটিলতা হতে পারে।

বিরোধের তীব্রতার সময় গুপ্ত উদ্দেশ্যাদি সাধনার্থে জি, পার্থসারশিকে প্রেরণ করে এবং শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক নেতাদেরকে যুক্তি পরামর্শ দিয়ে বিরোধের রাজনৈতিক সামাধান করানো। ধারাবাহিকভাবে ও কুটনৈতিক বিনিময় হয়েছে এবং উভয় দেশের নেতাদের উচ্চ পর্যায়ে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বিরোধের শান্তিপূর্ণ সামাধানের চেষ্টা বৃদ্ধি করা নিয়েও আলোচনা হয়। কিন্তু সিনহোলিজ নেতারা শক্ত অবস্থান গ্রহন করায় ভারত শ্রীলঙ্কার সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং ঐ সম্পর্কে শ্রীলঙ্কা ভারতের জড়িত হওয়াকে বিশেষ করে ভারত তাদের মাটিতে তামিল সন্ত্রাসীদেরকে আশ্রয় দেয়ার কারণে তীব্র নিন্দা করে। সংবাদপত্র ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুমান করে যে ভারত সামরিক হস্তক্ষেপ করার জন্য পরিকল্পনা করছিল। ঠিক একই সময়ে শ্রীলঙ্কা সরকার জাতিগত সঙ্কটে ভারতের জড়িত হওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত ছিল না। রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধনের মন্তব্য থেকে প্রতিফলিত হয় যে শ্রীলঙ্কা তামিলদের সমস্যার বিষয়ে ভারতের কোন ভূমিকা বিবেচনা করে নি, তামিল সমস্যা শ্রীলঙ্কার নিজস্ব ব্যাপার, সুতরাং ভারতের সুদৃষ্টির কোন প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধনে আরও গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন যে নতুন দিল্লীর চাপ প্রয়োগের কৌশলকে প্রতিহত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং একই উদ্দেশ্য বিশিষ্ট শক্তির নিকট থেকে সাহায্য চাইবেন।

শ্রীলঙ্কার জাতিগত বিরোধে জড়িত হওয়ার জন্য পশ্চিমা কোন শক্তির নিকট থেকে স্পষ্টভাবে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। বাস্তবিক পক্ষে ওয়াশিংটন বরং নতুন দিল্লীর মধ্যেস্থতাকে প্রশংসনীয় মনে করেছে। নতুন দিল্লী একথার উপর স্পষ্টভাবে 'ইন্দ্রিরা মতার্দশ' দ্বারা দখল করতে চায়– ভারতীয় মতাদর্শ মনের মতো মতাদর্শের সমকক্ষ। এই মতাদর্শ অনুযায়ী ভারত এ অঞ্চলের কোন রাষ্ট্রের নিজস্ব ব্যাপারে অনুরোধ না করলে নাগ গলানের পক্ষপাতি ছিল না, তখন বাইরের কোন শক্তি হস্তক্ষেপ করুক এটা ভারত সহ্য করতে নারাজ। নতুন দিল্লী জোর দিয়ে বলেছে' যদি অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসনের জন্য বাহিরের সাহায্য প্রয়োজন মনে করে তবে রাষ্ট্রগুলোকে আঞ্চলিক সাহার্যের কথা প্রথমে ভেবে দেখতে হবে।

এ সময়ের মধ্যে নতুন দিল্লী উভয় পক্ষকে সমঝোতায় বসানো এবং রাজনৈতিকভাবে সমাধানে রাজি করানোর জন্য বহুবার চেষ্টা করেছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রী পি. চিদামবারাম এর উদ্যেগে ভারত সরকার তামিল বিদ্রোহীদেরকে যুক্তিতর্ক দ্বারা দমন করার চেষ্টা করে যেন তারা সমঝোতার প্রক্রিয়া বিপন্ন না করে। যা হোক, এলটিটিই প্রাদেশিক কাউন্সিল সম্পর্কিত কলম্বোর প্রস্তাবকে নাকোচ করে দেয় এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলে যে, কোন ধরনের অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে শ্রীলঙ্কান সরকারকে অবিভাজ্য একক অঞ্চল তামিলদের

www.pathagar.com

মাতৃভূমি হবে এটা জেনে নিতে হবে। ঠিক একইভাবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য যুক্তিসহ টিইউএলএফ পরিকলাপনা সরকার প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৮৬ সালের প্রারম্ভে তামিল এবং শ্রীলঙ্কান সামরিক বাহিনী এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সামাধান সুদূর পরাহত হয়ে যায়। এ সময় কলম্বো পুনরায় ওয়াশিংটনের নিকট সরকারকে সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়।

১৯৮৬ সালের শেষে নতুন দিল্লী মধ্যেস্থতার চেষ্টা চালায়। তৎসত্ত্বেও শ্রীলঙ্কার জাতিগত সংকটের অবস্থা খারাপ হতে থাকে, এবং উভয়পক্ষ মুখোমখি সামরিক সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। ১৯ ডিসেম্বরের প্রস্তাবসমূহে কোন সুফল আনে নি, নতুন দিল্লী এবং কালম্বো তা স্বীকার করে। এলটিটিই'র উত্তরের অসামরিক প্রশাসন দখল করার উদ্দেশ্যর অর্থ হোক 'একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা' কলম্বো অর্থনৈতিক অবরোধসহ আরও একটি বৃহৎ আকারে সামরিক আক্রমণ চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। নতুন দিল্লী অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নেয়ার জন্য দাবী জানায়, কারণ এতে বড় আকারে মানবিক সঙ্কট তৈরী হবে। নতুন দিল্লী তামিল বিদ্রোহীদেরকে হিংস্রতা ত্যাগ এবং শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করার আহ্বান জানায়। এতে কোন ফল হয়নি, কারণ উভয়পক্ষ তাদের নিজ নিজ অবস্থানে অটল ছিল। ১৯৮৭ সালের ১০ এপ্রিল শ্রীলঙ্কা সরকার ভারতের দৃঢ় প্রত্যয়ের কারণে এক তরফাভাবে ১০ দিনের জন্য যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। তামিল বিদ্রোহীরা যুদ্ধ বিরতি অবজ্ঞা করায় পূর্ণ সামরিক আক্রমন চালায় এবং জাফনাতে আকাশ পথে বিমান আক্রমণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধনে ঘোষণা করেন যে তার সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে হয় তারা বিজয়ী হবে, না হয় আমরা' তার সরকার এটা গ্রহণ করে এবং তামিল সন্ত্রসীদের সঙ্গে যুদ্ধ চলবে এতে প্রয়োজন হলে অদৃশ্য সাহায্য আসবে।

১৯৮৭ সালের মধ্যেভাগে, শ্রীলঙ্কার বিরোধ নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেখে ভারত উদ্ধিগ্ন হয়ে উঠে। প্রায় ২১টি ক্ষুদ্র ভারতীয় তামিল রাজনৈতিক ও বিদ্রোহী দল দ্রাভিদস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচার চালায় অথবা ভারতে একটি স্বাধীন তামিল রাজ্য গঠন করতে চায়। চাপের মধ্যে নতুন দিল্লী জাফনাতে বিপদকালীন সাহায্য প্রেরণ করে এবং কলম্বো যখন তাদের জলসীমায় ভারতের ক্ষুদ্র জাহাজের বহর প্রবেশে বাধা দিল, তখন ভারত তার বিমান বাহিনী প্রেরণ করল এবং বিমানবাহিনী শ্রীলঙ্কার আকাশসীমার ভিরত প্রবেশ করে বিমান থেকে জাফনায় সাহায্য সরবরাহ করে। এধরনের কাজকে কলম্বো শ্রীলঙ্কার সার্বভৌমত্ব এবং সীমান্ত লংঘনের জন্য অনভিপ্রেত অপমান বলে নিন্দা জানায়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী সত্যিকার ভাবেই ভারতের দীর্ঘদিনের জাতিগত ও ধর্মীয় বিরোধকে মিটিয়ে ফেলার প্রতি আশাবাদী ছিল। জুম্মু ও কাশ্মীর পাঞ্জাব ও আসাম রাজ্যের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য এমনিই তাঁরা ভারাগ্রস্ত হয়ে আছে এবং তার নিজের দেশে বাহিরের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের হুমকি, রাজিব গান্ধী অনুধাবন করতে পেরেছে যে অন্যদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন করা অনেক ক্ষতিকর। তিনি পাঞ্জাবের শিখদের এবং আসামের বিক্ষোভ সৃষ্টিকারীদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেন। তিনি শ্রীলঙ্কার জাতিগত জটিল ও বিশৃঙ্খল অবস্থার সুরাহা করতে আগ্রহী ছিলেন।

www.pathagar.com

শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধ ক্রমাগতভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে দেখে ভারত বিকল্প চিন্তা শুরু করে তবে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের কোন প্রশ্নই উঠে না। নূতন দিল্লী শান্তি প্রক্রিয়ার হস্তক্ষেপ করার একটি পথ খুজে পায়। ১৯৮৭ সালের ২৯ মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী এবং শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি জে,আর জয়বর্ধনের সঙ্গে ইন্দো-শ্রীলঙ্কা শান্তিচুক্তি সই হয়। এই শান্তি চুক্তির উদ্দেশ্য হল শ্রীলঙ্কার তামিল এলাকার ব্যাপক স্বায়ত্বশাসন এবং ভারতের ভৌগোলিক সীমা সংরক্ষণ এবং এ অঞ্চলের কৌশলের স্বার্থ রক্ষা করা। এই চুক্তি অনুযায়ী শ্রীলঙ্কার সরকার এবং তামিল বিদ্রোহীদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার জন্য ভারতের তথাকথিত ইন্ডিয়ান পিস কিপিং ফোর্স (আই.পি.কে.এফ) নামে ১০০,০০০ ভারতীয় সৈন্য সেখানে প্রেরণ করা হয়। রাজনৈতিক এই সমঝোতার ফলে তামিল জাতীয়তাবাদী এবং বিদ্রোহী দল রাজনৈতিক প্রধান ধারায় যুক্ত হয়ে যায়। এল.টি.টি.ই. অবিরত ভাবে বাধা দিতে থাকে এবং স্বস্তিহীন শান্তির তিন মাস পর প্রভাকরণ আই.পি.কে.এফ সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাঁরা তাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে এল.টি.টি.ই বলেছে যে, আমাদের যুদ্ধের মৌলিক অধিকার, কর্মপদ্ধতি হল স্বাধীনতার সংগ্রাম, এটা ইন্দো-শ্রীলঙ্কা চুক্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ, এটা হল আমাদের স্বাধীকারের সংগ্রাম। আমাদের জাতীয় সংগ্রামকে সম্পূর্ণ ভাবে বিভ্রান্তিকর অবস্থায় ফেলে সমস্যার গুরুত্ব বহুজাতিক সামাজিক কাঠামোকে একটি সংখ্যালঘু দল হিসেবে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। এমনকি বিরাট সামরিক চাপ দেয়া সত্ত্বেও প্রভাকরণ সমঝোতা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। এটা করার কারণ হল এল.টি.টি.ই.র সাংগঠনিক কাঠামো শক্ত ছিল। সন্ত্রাসী বিরাট দল গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক ছত্র-ছায়ায় আর এল.টি.টি.ই প্রথম থেকেই সসস্ত্রভাবে গড়ে উঠেছে। এ সমস্ত দলের মূল চিন্তাভাবনা অস্বস্তিপূর্ণ ও কষ্টকর হলেও বিদ্রোহী কার্যকলাপ থেকে রাজনীতিতে উত্তোরণে কখনো বদলায়নি।

দু'টি বছর এল.টি.টি.ই'র যুদ্ধ খুব শক্তিশালী হয়েছে, তাতে তারা শক্তিশালী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীকে বিরাটভাবে পরাজিত করেছে। এটা দেখা গিয়েছে যে গেরিলা কলাকৌশল এবং সাময়িক যুদ্ধ কৌশল এই উভয় দিক দিয়ে ভারতীয়রা এল.টি.টি.ইকে দৃঢ়তার সঙ্গে ছোট করে দেখেছিল।

দু'টি সংস্থার সাদৃশ্যতার পূর্ববতী কারণে এই ফলাফল হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যরা এ কাজের জন্য প্রস্তুত ছিল না। গহীন জঙ্গলের ভিতর থেকে তাদের কার্যকলাপ শুরু করে, এল.টি.টি.ই যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করে প্রতারণাপূর্ণ কৌশল এবং অকল্পনীয় সন্ত্রাসের নিয়ম পালন করে ভারতের সামরিক বাহিনীর ৫০০০ সদস্যকে হতাহত করে। যুগ্ম নৌবাহিনীর অবরোধ, আকাশ পথে অতন্ত্র তত্ত্বাবধান এবং সমুদ্র তীরবর্তী পর্যবেক্ষণ চৌকি থাকা সত্ত্বেও এল.টি.টি.ই ভারতের দক্ষিণে এবং উত্তর শ্রীলঙ্কার মধ্যে অবিরতভাবে যাতায়াত করতে সক্ষম হয়। এল.টি.টি.ই নৌকাগুলো আহত সৈন্যদলের সদস্যদেরকে তামিলনাড়ুতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতো এবং ফিরে আসত সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে। জরুরি অবস্থায় হাতের কাছে পাওয়া উপাদানাদির দ্বারা তৈরি বিস্ফোরক, নব প্রবর্তিত বস্তুর কৌশল, কেবল মানুষকে হতাহত করার জন্য উদ্দিষ্ট শত্রুর দুর্গ জাহাজ প্রভৃতি ধ্বংস করার বিস্ফোরক দ্রব্যবিশেষ, স্থলে ও জলে ব্লাক টাইগার আত্মঘাতী দল দিয়ে আক্রমণ করে ভারতীয় সৈন্যদেরকে নৈতিকভাবে দুর্বল

www.pathagar.com

করে দেয়ায় তারা গেরিলা যুদ্ধ করতে আপারগ হয়, ফলে প্রচুর হতাহত হয়। এতে জ্ঞানহীনভাবে তারা প্রতিশোধস্বরূপ সাধারণ নাগরিকদের নিগ্রহ, ধর্ষণ ও অত্যাচার করে।

ভারত কর্তৃক সামরিক হস্তক্ষেপ আরও একটি অনভিপ্রেত ফলাফল। ১৯৭১ সালে একটি ব্যর্থ বিদ্রোহের জন্য জে.ভি.পি. দায়ী, আক্রমণকারী বাহিনী ভারতের সম্প্রসারণবাদীতার বিরুদ্ধে প্রচার চালায় এবং স্বদেশ ভক্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে আহত করে। তারা অভিযুক্ত করে যে আই.পি কে এফ একটি সামরিক দল এবং একটি জাতির সার্বভৌমত্বের সঙ্গে সমঝোতার জন্য সরকারকে দায়ী করে। তাদের পরবর্তী বিদ্রোহ, বিস্তৃতভাবে সন্ত্রাসী, কৌশল প্রয়োগ, যন্ত্রণাদায়ক ভীতিকর মানসিক ক্রিয়াকলাপ দেশকে অরাজকতার মধ্যে ফেলে দেয়।

শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক নেতৃত্ব অদূরদর্শীতার পরিচয় দিতে থাকে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে সিলোনিজ নাগরিকদের মধ্যে ভীতিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করবে শেখ আই.পি.কে.এফ শান্তি রক্ষী বাহিনী হিসেবে আসছে। পূর্ববর্তী দশকগুলোতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে যে ভুল উপলব্ধি করেছে তা স্পষ্টত প্রতীয়মান করার জন্য ভারত পিছিয়ে আসার ইচ্ছা গ্রহণ করে। এ থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে কেন জয়বর্ধনের উত্তরসূরী রাষ্ট্রপতি রানাতুঙ্গা প্রেমাদাসা এল.টি.টি.ই. র সঙ্গে ন্যায় ব্যবহারের আলোচনা করে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আর্থিক সহযোগিতা ও যুদ্ধাস্ত্র এল.টি.টিকে দেয়া হয় আই পি.কে. এফ এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বলা হয় যা ছিল দ্বীপরাষ্ট্র সরকারকে সাহায্য করা এবং তামিল বিদ্রোহীদেরকে ধ্বংস করে দেয়া। এ সময়ের মধ্যে এল.টি.টি.ই উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়ে যায়। এমন কি বহু হতাহত হয়, ভারতীয় বাহিনী এল.টি.টি.ইকে নিঃসঙ্গ করতে সমর্থ হয়। এক বিরাট প্রশিক্ষিত দলকে উত্তর ও পূর্ব দিকে গহীন বনে আবদ্ধ করে ফেলে। ভারতীয় বিশেষ বাহিনী এল.টি.টি.ই.র গভীর বনাঞ্চলে আক্রমণ চালায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রেমাদাসা এল.টি.টি.ই.কে বুঝতে ব্যর্থ হয়, ভারতের অভিসন্ধি সন্দেহজনক ও অযৌক্তিক, তাই তিনি ভারতের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উক্তি করায় জে.ভি.পি.কে নিরপেক্ষ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এটা ছিল অল্প সময়ের জন্য রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার। একাজের জন্য তাকে পরবর্তীতে মূল্য দিতে হয়েছে, আই,পি.কে এফ ফিরে আসার পর এল.টি.টি.ই একই ধারায় তামিল বিদ্রোহীদের উচ্ছেদ করে দেয় এবং তারপর সরকারী সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

১৯৯০ সালের ২৪ মার্চ, রাষ্ট্রপতি প্রেমাদাসা আই.পি.কে এফ ও এল.টি.টি.ইর দীর্ঘদিনের লজ্জাকর সামরিক অচল অবস্থা থেকে আই.পি.কে.এফ কে প্রত্যাহারের ব্যাপারটি অবলোকন করছিলেন। এমনকি দেশের উত্তর পূর্বে যুদ্ধ করার জন্য ভারতীয় প্রশিক্ষিত প্রতিনিধিত্বকারী সামরিক সদস্য ভারতীয় বাহিনী ফিরে এসেছিল, এই বাহনীকে খুব দ্রুত ও সহজেই এল.টি.টি.ই ধ্বংস করে দিয়েছিল। এল.টি.টি.ই জাফনা উপদ্বীপের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় অর্জন করে এবং প্রায় পাঁচ বছরের জন্য প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯০ সালের চুক্তির তিন মাসের মধ্যে এল.টি.টি. ই কলম্বো সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে ৪০০ পুলিশ সদস্যকে হত্যা করে, তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আত্মসমর্পণ করিয়েছিল। সরকারের সঙ্গে এল.টি.টি.ই যুদ্ধ ঘোষণা

www.pathagar.com

সত্য বলে স্বীকার করে এবং সাফল্যের সঙ্গে বিশ্বাস করে যে এল.টি.টি.ই শান্তির প্রতীকগুলো কৌশলে ব্যবহার করে স্বার্থ উদ্ধার করে। তাঁরা নেতাদের গুপ্ত হত্যার সারিবদ্ধ তালিকা করে, কৌশলে হুমকি প্রদান করে, আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি আদায় করছে, মত ও নীতির প্রচার প্রসারের জন্য সঙ্ঘ ক্রিয়া কলাপ পরিকল্পনা একত্র করে তহবিল গঠন, সরঞ্জাম সংগ্রহ, অভিজ্ঞা অর্জন পুনঃদল গঠন, পুনঃপ্রশিক্ষণ ও নিয়োগ ব্যবস্থা করে। গৃহযুদ্ধ অবিরত চলতে থাকে। প্রেমাদাসার দুর্ভাগ্য যে এল.টি.টি.ই কে সাহায্য করেছিল আই.পি.কে.এফ কে জোরে আঘাত করার জন্য, কিন্তু মিত্র শক্তি তা না করে অল্প সময়ে কৌশলে নিজেকে বাঁচানোর পথ অবলম্বন করে।

কেন ভারতের উদ্যোগ ব্যর্থ হল?
(Why the Indian initiative failed)

জে.এন.দীক্ষিত শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত ভারতের হাই-কমিশনার থাকাকালে তার লিখিত পুস্তকের "কলম্বোর দায়িত্বাদি" সম্পর্কে আরোপ করা রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধনের মনের পরিবর্তন সম্পর্কে ভারতের অতিরিক্ত আশাবাদ এবং শ্রীলঙ্কার তামিলদের মধ্যে বিচার বুদ্ধির অভাব থাকার কারণে নতুন দিল্লীর উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। দীক্ষিত আরও স্বীকার করেছেন যে এল.টি.টি.ই.র স্থির সংকল্পকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি বিশ্বাসে ভুল করা হয়েছে, এল.টি.টি.ই শ্রীলঙ্কার তামিলদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে এবং শ্রীলঙ্কা সরকারের মনে বিদেশীদের সম্বন্ধে অহেতুক ভয় মূলবিষয়। যাই হোক, অন্য আর একজন বিশ্লেষকের মতে শ্রীলঙ্কার চরম ব্যর্থতা প্রাপ্য ছিল, কারণ সমঝোতার উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, দ্বীপের ঘটনাগুলোতে প্রভাবিতকরণ, শ্রীলঙ্কার সরকারের পক্ষে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে নতুন দিল্লী টাইগারদেরকে শান্তি প্রক্রিয়ায় আনতে ব্যর্থ হয়েছে, ঠিক একইভাবে অন্যরা যুক্তি দেখাচ্ছে যে ভারত রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগে এবং তামিল জাতীয়তাবাদীদের অধিকার অংশের সনির্বন্ধ আবেদন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে, "যদি শ্রলঙ্কা রাজ্যের হিংস্রতা, অবিশ্বসের জন্য প্রথম দিকেই তামিল জাতীয়তাবাদের উত্থান হয়ে থাকে তাহলে ইলিমদেরকে দেয়া জনপ্রিয় প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে ভারতের সাথে তামিলদের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও একত্র করে কঠিন ভাবে মোকাবেলা করা যেতো"।

শান্তি আলোচনা প্রক্রিয়ায় সমঝোতার আচার আচরন আরও স্পষ্ট হবে যেমন নতুন দিল্লী শ্রীলঙ্কার নিরাপত্তাহীনতার সুযোগ কিভাবে গ্রহণ করে তার নিজের স্বার্থে কৌশলে অগ্রসর হয়েছে তখন। জে.এন. দীক্ষিত নিজেই স্বীকার করেছেন, সমঝোতার সময়, শ্রীলঙ্কাকে বিশেষভাবে বলা হয়েছিল যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, ইসরাইল, দক্ষিণ আফ্রিকার যে সমস্ত সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা শ্রীলঙ্কায় আছে তাদেরকে পর্যায়ক্রমে কমিয়ে ফেলতে হবে, যুক্তরাষ্ট, পাকিস্তান, চীন, ইসরাইল, দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক কমাতে হবে, এবং ভারতকে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে তাদের সমুদ্রবন্দর এবং বিমানবন্দর কোন বিদেশী শক্তিকে ব্যবহার করতে দেয়া হবে না, শ্রীলঙ্কার নেতৃত্ব এটাকে অত্যন্ত অতিরিক্ত বলে উপলব্ধি করেছে এবং এটা সমঝোতার কোন অংশ ছিল না, বরং নূতন দিল্লীর উদ্যোগের মধ্যে অবিশ্বাস অনুভূতির আভাস পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

ভারতের হস্তক্ষেপের পরিণতি
(Consequences of Indian Intervention)

অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ আদর্শগতভাবে শেষ হয়ে গেছে, একজন হয়তো অনিশ্চিত ক্রমাবনত হতে পারে। ভারতের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে, অতএব অবাঞ্ছিত হস্ত ক্ষেপের হঠকারিতা স্পষ্টভাবে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করবে এবং দ্রুততার সঙ্গে বিচার্য ক্ষেত্রের ধ্রুবক এদিক ওদিক চলবে। ভারতের হস্তক্ষেপের বহু পরিণতি আছে। শ্রীলঙ্কার জাতিগত সংকটের সামাধানের জন্য ভারতের রাজনৈতিক চেষ্টা বিরোধকে আরো বেশী বিপজ্জনক অবস্থায় ফেলেছে। তামিল বিদ্রোহীদের সমর্থন এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, এল.টি.টি.ইকে অত্যন্ত হিংস্র সন্ত্রাসী সংগঠনে পরিনত করেছে। স্বাধীন ভারতের অন্যতম শক্তিশালী নেতা রাজিব গান্ধীকে যখন এই দলটি হত্যা করে তখন এই হিংস্রতার বিস্তৃত প্রচার হয়।

শ্রীলঙ্কার আই.পি.কে.এফ. এর ভূমিকা ও রাজনৈতিক স্পর্শকাতর বিষয় রূপে পরিগণিত হয়। প্রায় ১০০০০০ পরিবার অথবা ৫০০০০০ সাধারণ মানুষ উপদ্বীপের প্রায় ৫০% অধিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বসতবাড়ী ধ্বংস হয়ে যায়। এই কর্মকাণ্ডের জন্য এল.টি.টি.ই.কে দোষী করার পরিবর্তে তামিল সম্প্রদায় তাদের রাগকে আই.পি.কে.এফ এর প্রতি নির্দেশ করে, কোন এক সময় উষ্ণ অভ্যর্থনা দেয়া শক্তিকে কলঙ্কজনক চিহ্ন দিয়ে পি.আই.কে এফকে "ইন্নোসেন্ট পিপল কিলিং ফোর্স" নামে অভিহিত করা হয়েছে। গার্ডিয়ান যে ভাবে বলেছে, "তিন মাসের মধ্যে ভারতীয়রা এখনকার মাল্যভূষিত বীরদের যারা তামিলদের রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছে তদেরকে পরিবর্তন করে ঘৃণিত উৎপীড়ক বলবে। অনেক বিদেশী তামিল আই.পি.কে.এফ এবং এল.টি.টি ইর মুখোমুখি সংঘর্ষকে অতিশয় ঘৃণা করে, কারণ ভারত শ্রীলঙ্কার তামিলদের সঙ্গে গতানুগতিক মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ। যাই হোক, আই.পি.কে.এফ. কতৃক সাধারণ নাগরিক হত্যাকে এল.টি.টি.ই সকলের চোখের সামনে তুলে ধরে আন্ত র্জাতিক প্রচার যন্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষুব্দ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে ঐ ছিন্নাংশ তামিল ডায়াসপোরা এল.টি.টি.ইকে আই.পি.কে.এফ এর বিরুদ্ধে সমর্থন করে।

আই.পি.কে.এফ. ফিরে আসার পরও এল.টি.টি.ই তামিলনাড়ুর রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাকে। এই অবস্থা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিরাটভাবে গোপনে ক্ষতিসাধন করার প্রয়াস। যখন এল.টি.টি.ই জ্যাক সিভারাসন এর দলকে আঘাত করে, এল.টি.টি.ই ই.পি.আ.এল.এফ বিরোধী নেতা পদ্মনাভাও তার সহকর্মিকে তামিলনাড়ুতে গুপ্ত হত্যা করে তখন মূখ্যমন্ত্রী করুনানিধী তামিলনাড়ু পুলিশকে এবং রাজ্য সংস্থাগুলোকে নিভৃতভাবে দেখার নির্দেশ প্রদান করেন। কয়েক মাস পর, এল.টি.টি. ই. তামিলনাড়ুতে একই ধরনে সুসংহত ব্যবস্থায় রাজিব গান্ধীকে হত্যা করে। তামিলনাড়ুর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নাক গলানের প্রচেষ্টা এত উন্নত ছিল যে নতুন দিল্লীতে এল.টি.টি.ই বিরোধী গোয়েন্দাসহ উচ্চপর্যায়ের এক সভায় একটি সিদ্ধান্ত পৌঁছে এবং এ বিষয়টির সংবাদ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের দলের কাছে পৌছে যায়।

এছাড়া শ্রীলঙ্কার অধিবাসীদের মধ্যে ভারতের অভিসন্ধিকে সন্দেহের চোখে দেখে। ভারতের মাটিতে সংগঠিত বিদ্রোহী কার্যকলাপকে নিরুৎসাহিত করার জন্য নতুন দিল্লীর অপারগতা অকৃত্রিম সত্য দালাল হিসেবে দৃঢ় প্রত্যয়ী শ্রীলঙ্কাকে সাহায্য

www.pathagar.com

করতে পারেনি। ভারতে স্থাপিত তামিল ইলিম এর দপ্তর এবং অবিরাম আত্মরক্ষামূলক প্রতিবন্ধক, দক্ষিণ ভারত থেকে ইলিম এর প্রচারণার ফলে সিংহলের অবস্থা প্রতিফলিত হচ্ছে। ভারতের জনগণের জন্য আই.পি.কে.এফ. এর অভিজ্ঞতা মর্মপীড়াদায়ক। এটা সহজে ভুলে যাওয়ার মত নয়। সামরিক পরিমাণাদির এককরূপে অবলম্বনকারী মূল্য মানুষের জীবন নষ্ট এবং দু:খজনক ঘটনা হল একজন মহান নেতাকে জ্ঞানহীনভাবে হত্যার ঘটনা রাজনৈতিক নেতাদের চিন্তাভাবনার অসাড়তা প্রমাণ করে। ভিয়েতনামের লক্ষণসমূহের সহাবস্থান যখন স্পষ্ট, রাষ্ট্রপতি কুমারাতুঙ্গা ২০০০ সালে ভারতের হস্তক্ষেপের প্রমাণ দেখালে নতুন দিল্লী নিশ্চতভাবে তার জড়ানোর থাকার বিষয়টি প্রত্যাখান করল। ২০০০ সালের মে মাস এল.টি.টি.ই. এর হাতে জামসার পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে শ্রীলঙ্কার সৈন্যদের এক রক্তক্ষয়ী সংর্ঘষের মুখোমুখি হতে হয়, কলম্বো নতুন দিল্লীর কাছে সাহায্য চায়। চরম দুর্দশার সময় এ আহব্বান ছিল সম্পূর্ণভাবে সামরিক বাহিনী জড়িতকরণের, শ্রীলঙ্কার জনগণ ব্যাপকভাবে সমর্থন করে, ১৯৮৭-১৯৯০ সালে আই.পি.কে.এফ এর উপস্থিতিকে খোলাখুলিভাবে যারা বিরোধিতা করেছিল সে দলও সমর্থন করে। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক নেতারা শ্রীলঙ্কার সংকটে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের পক্ষে ছিল না। সরকারিভাবে জানায় শ্রীলঙ্কায় সামরিক হস্তক্ষেপের কোন বিষয় তাদের হাতে ছিল না। এই অনিচ্ছা ভারতকে আঞ্চলিক সর্বোচ্চতাকে নিচের দিকে নামিয়ে দেয়। ভারতের এই অনিচ্ছা পাকিস্তান ও ইসরাইলের মত দেশেকে জড়িত হওয়ার সুযোগ করে দেয় এবং ভারতের সঙ্গে বিপক্ষের দেশসমূহের সঙ্গে আরও সখ্যতা স্থাপনের জন্য শ্রীলঙ্কাকে উৎসাহিত করে। ফলে ভারত সত্য দালালের ভূমিকা পালন করে এবং মানবিক সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা করে।

উপসংহার (Conclusion)

১৯৮০ সাল থেকে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতির চিত্র উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন হচ্ছে। স্নায়ুযুদ্ধ শেষ। ভারত আর শক্তিশালী দেশগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বি নয় এবং সেই দৃষ্টি দিয়ে এ অঞ্চলের উন্নয়নে তারা মনে মনে উপলব্ধি সুকৌশলে প্রয়োগ করতে পারছে না। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা প্রত্যেক দেশকে বিপরীতধর্মী শক্তি সন্ত্রাসবাদ এবং মুক্তি সংগ্রামীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সাহায্য করবে। অভ্যন্তরীন দিক থেকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কৌশল দক্ষিণ এশিয়াতে পরিবর্তন হয়েছে। একই ঘটনা এল.টি.টি.ই এর ব্যাপারেও খাটে, কিন্তু এর কারণ ধরার বাহিরে, ফলে আন্ত র্জাতিকভাবে হৃদয়াঙ্গম করা সহজ নয়।

সন্ত্রাসবাদ এ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার ফলে নূতনভাবে নিরাপত্তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। ১১ সেপ্টেম্বর এবং ওয়ার অন টেরর' গুপ্ত অবস্থা থেকে পুন:প্রকাশ দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক খেলওয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিকল্প নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিস্তৃত অংশ গ্রহণে দু:চিন্তা এ অঞ্চলে দেশগুলোর জন্য কমে যায়। বিশেষ করে ভারত পাকিস্তান ক্ষেত্রে আরও প্রযোজ্য।

তাছাড়া ভারত বিশ্ববাণিজ্যের দিকে অর্থ বিনিয়োগের দ্বারা খুলে দেয় বর্তমানে কার্যকরিভাবে পশ্চিমের সঙ্গে একযোগে অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে একযোগে কাজ

www.pathagar.com

করছে। ভারত সুদূর প্রসারি কৌশলগতভাবে শান্তি রক্ষা এবং শান্তি স্থাপনে আগ্রহী অন্যদিকে শক্তির দ্বারা প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে অনাগ্রহী হয়ে ক্রমে পুন:কল্পনা প্রসুত হয়ে উঠছে। নতুন দিল্লী প্রতিবেশীদের ব্যাপারে অত্যন্ত কম হস্তক্ষেপ করছে অতএব ভারতের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বে শ্রীলঙ্কার ব্যাপারেও আর আগ্রহী নয়। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে গেছে। পৃষ্টপোষকতা মধ্যস্থকারী এবং একজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দর্শক হিসেবেও। এর অর্থ হল শ্রীলঙ্কার তামিল গুপ্ত বাহিনী যারা তামিল ইলমদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে ভারত সকল প্রকার সমর্থন বন্ধ করে দেয়।

বর্তমানে শ্রীলঙ্কার এবং এল.টি.টি.ই এর মধ্যে পুনঃশত্রুতা অভ্যন্তরীণভাবে তারা আশঙ্কা করছে আরও একটি সংঘর্ষের, কুটনৈতিক তৎপরতা থেকে সরে গিয়ে ভারত শ্রীলঙ্কাকে সামরিক সহযোগিতা দিচ্ছে। নতুন দিল্লীকে সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে যেন অতীতের মত ভুল আর না হয়। এ অঞ্চলের দেশগুলো উন্নতি লাভ করবে যদি তারা কোন বিরোধ থেকে দূরে থাকে, শোষণ না করে, যা কিনা সকলকেই দু:খে ফেলে দেয়।

www.pathagar.com

Map of South Asia

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের ৩১শে মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাব উপস্থাপক ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী

(Resolution of the Indian parliament 31 march 1971 Moved by: Prime Minister Indira Gandhi, India.)

পূর্ব বঙ্গে সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটেছে তাতে ভারতের লোকসভা গভীর উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করছে। সামরিক বাহিনী বৃহদায়তনে আক্রমণ করেছে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দ্রুত তাদেরকে আনা হয়েছে, পূর্ব বঙ্গের সমস্ত জনগণের বিরুদ্ধে তাদের প্রেরণা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষ দমন করার জন্য সামরিক বাহিনী ছেড়েছে। জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান না দেখিয়ে ভুলবশতঃ ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানে নির্বাচনের ঘোষণা দেয়া হয়। পাকিস্তান সরকার জনগণের প্রদত্ত অধিকারকে অবজ্ঞা করার পথ বেছে নেয়। পাকিস্তান সরকার আইগতভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করে শুধু প্রত্যাখ্যানই করে নি বরং বিধিবহির্ভূতভাবে জাতীয় সংসদের ন্যায়সঙ্গত এবং সার্বভৌম ভূমিকা পালন করতে বাধার সৃষ্টি করে। পূর্ব বঙ্গের জনগণের দাবিকে দমন করার জন্য উম্মুক্তভাবে সঙিন দিয়ে বিদ্ধ করে, মেশিনগান, ট্যাংক গোলন্দাজ সৈনিক ও বিমান ব্যবহার করে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করছে।

ভারত সরকার এবং জনগণ পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি, নিয়মমাফিক এবং ভ্রত্রোচিতভাবে কাজ করতে ইচ্ছুক। যদিও উপমহাদেশের মানুষ ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক দিয়ে শত বছরের বন্ধনে পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করছে, এ লোকসভা ভীতিপূর্ণ দুঃখজনক ঘটনায় উদাসীন থাকতে পারে না, কারণ বিধিবদ্ধভাবে আমাদের সীমান্তের অতি নিকটবর্তী। আমাদের সমগ্র দেশের সর্বত্র জনগণ এ কাজের নিন্দা করছে, সন্দেহাতীতভাবে রুচিবিগর্হিত নৃশংসতা অকল্পনীয় মাত্রায় নিরীহ মানুষের উপর সামরিক হস্তক্ষেপ করছে। এ লোকসভা পূর্ববঙ্গের জনগণের প্রতি অন্তর্নিহিত সহমর্মীতা সংহতি প্রকাশ করছে এবং গণতান্ত্রিক জীবন যাত্রার প্রতিপূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। ভারত স্থায়ী শান্তির কথা মনে রেখে মানবাধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতিকে উর্দ্ধে তুলে ধরতে চায়, এ লোকসভা অনতিবিলম্বে শক্তি প্রয়োগ এবং নিরীহ মানুষকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা থেকে বিরত থাকার দাবী জানাচ্ছে। এ লোকসভা বিশ্বের সকল সরকার ও জগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে অতি শ্রীঘ্রই গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে পাকিস্তান সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে যেন তাৎক্ষণিকভাবে এ কাজ বন্ধ করে, যা নিয়মানুগভাবে বলা যায় বিপুল পরিমাণে ধ্বংস যাকে গণহত্যা বলা যায়। এ লোকসভা স্মরণ করছে যে, অন্তর্নিহিত দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ববঙ্গের ৭৫ মিলিয়ন মানুষের ঐতিহাসিক উত্থান বিজয় লাভ করবে। এ লোকসভা আশ্বাস দিচ্ছে যে তাদের সংগ্রাম ও ত্যাগের প্রতি ভারতের জনগণ সম্পুর্ণভাবে সহমর্মিতা ও সমর্থন জানাচেছ।

www.pathagar.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এবং প্রজাতন্ত্র ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং শান্তি চুক্তি

(Treaty of Friendship, cooperation and peace between the People's Republic of Bangladesh and the Republic of India)

শান্তি, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ সার্বজনীন আদর্শ অনুপ্রাণিত করে ঐ সমস্ত আদর্শ অনুধাবনের জন্য এক সঙ্গে সংগ্রামের ফলে বন্ধুত্বে বন্ধন দৃঢ় হয়েছে, একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ও আত্মোৎসর্গের পর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভব হয়েছে।

ভ্রাত্রোচিত এবং ভাল প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক বজায় এবং সীমান্ত এলাকাকে শান্তি ও বন্ধুত্বের প্রতীকে পরিণত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, জোট নিরপেক্ষতার মতবাদের ভিত্তিতে অবিচল ভাবে দৃঢ় থাকতে হবে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করা এবং দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে, শান্তি রক্ষা, সুস্থির ও নিরাপত্তা এবং সকল প্রকার পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা দেশের অগ্রসরমান উন্নয়নের সম্ভবপর উপায়ের প্রতি দৃঢ় থাকতে হবে।

বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারণর উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে দৃঢ়তা থাকতে হবে। বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার অধিকতর উন্নয়ন করে উভয় দেশের স্বার্থের জন্য কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করতে হবে এবং এশিয়া ও বিশ্বের শান্তি রক্ষার স্বার্থে কাজ করতে হবে।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ উদ্দেশ্যে অবদান রাখার জন্য স্থির সংকল্প এবং বিশ্বের উত্তেজনা প্রশমণের জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং চূড়ান্তভাবে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজবাদীতার পদচিহ্ন দূর করে ফেলতে হবে।

বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সমস্যা সমাধানের দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করে কোনপ্রকার দ্বন্দ্ব অথবা মুখোমুখি সংঘর্ষে না যেয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে করতে হবে, একদিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অন্যদিকে প্রজাতন্ত্রী ভারত এ চুক্তির উপসংহার টানতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

ধারা-১ ঃ রাষ্ট্রসমূহের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত হতে হবে। কারণ, আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণ সংগ্রাম করেছে এবং আত্মউৎসর্গ করেছে। শপথ গ্রহণ করে বলতে হবে যে, উভয় দেশে এবং জনগণের মধ্যে শান্তিও বন্ধুত্ব অটল থাকবে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বাধীনতা, সার্বভৌত্ব এবং দেশের অখণ্ডতার প্রতি সম্মান দেখাবে এবং কেউ কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

রাষ্ট্রসমূহের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বন্ধুত্ব ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান সহযোগিতা আরও উন্নতি ও শাক্তিশালী করবে, উপরোল্লিখিত নীতিগুলোর উপযুক্ত সাহস, শক্তি ও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নীতিই হবে এর ভিত্তি।

www.pathagar.com

ধারা-২ পরম বিশ্বস্তভাবে তাদের সেবাই নীতির উপযুক্ত সাহস ও শক্তি পরিচালিত করবে, জনগণ ও রাষ্ট্র, গোত্র ও ধর্মমত এখানে নিরপেক্ষ থাকবে, উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ঔপনিবেশিক এবং যে কোন ধরনের এবং গোত্রীয়তা এবং সমবেতভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনকে ঘৃণা করবে, চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে বিরোধীতাকে পরিহার করার জন্য তাঁদের দৃঢ় সংকল্প পুনঃব্যক্ত করবেন।

রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ উদ্দেশ্য এবং সমর্থন পাওয়ার জন্য অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং ঔপনিবেশিক এবং গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামকে স্বাধীনতার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সাহায্য করবে।

ধারা-৩ ঃ জোট নিরপক্ষেনীতি এবং শান্তিতে সহবস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা বিশ্বে উত্তেজনা হ্রাস করবে, আন্তর্জাতিকভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করবে সেজন্য রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ তাদের বিশ্বাসকে পুনঃদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করবেন।

ধারা-৪ ঃ রাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উভয় দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সমস্যার বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন এবং সকল পর্যায়ে আলোচনা ও মতামত বিনিময় করবেন।

ধারা-৫ ঃ রাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ে কর্মকর্তাগণ অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কৌশলগত ক্ষেত্রে তাঁদের পারস্পরিক সুযোগ সুবিধা ও সকল প্রকার সহযোগিতা শক্তিশালী ও সম্প্রসারণের জন্য অবিরত ভাবে চেষ্টা করবেন। দু'দেশই বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নয়ন, সমঝোতা, পারস্পরিক স্বার্থ এবং সবচেয়ে অনুকূল জাতীয় নীতির জন্য সহযোগিতা করবেন।

ধারা-৬ ঃ রাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী অববাহিকার উন্নয়ন এবং তাপ বিদ্যুৎ শক্তি এবং জনসচেতনতার ক্ষেত্রে যৌথভাবে পরীক্ষা নিরিক্ষা করে কার্যকরি ব্যবস্থা করবেন।

ধারা-৭ ঃ রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ব্যবহারিক বিদ্যা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধূলাও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ধারা-৮ ঃ বিদ্যমান বন্ধুত্বের বন্ধন অনুযায়ী দু'দেশের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ শপথ করে ঘোষণা করবেন যে কেহ কোন সামরিক মিত্রতায় প্রবেশ করবে না বা অংশগ্রহণ করবে না যা একে অন্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতে পারে। রাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রত্যেকেই অন্য দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন থেকে বিরত থাকবেন এবং সামরিক শক্তি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে এমন কোন কাজ করার জন্য রাজ্যাংশ ব্যবহার করতে অনুমতি দিবে না যা অন্য কর্মকর্তাদের জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।

ধারা-৯ ঃ রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কোন তৃতীয় পক্ষকে যারা অন্য দেশের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত তাদেরকে কোন সাহায্য করা থেকে বিরত

www.pathagar.com

থাকবেন। যদি কোন পক্ষ আক্রান্ত হয় অথবা আক্রমণের হুমকি আসে, তবে উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অতি দ্রুত পারস্পরিক আলোচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং হুমকিকে পরিহার করে তাদের দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

ধারা-১০ ঃ চুক্তিবদ্ধ প্রত্যেক পক্ষ শপথ করে ঘোষণা করবে যে তাঁরা কোন গোপন অথবা প্রকাশ্যভাবে এক বা একের অধিক কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিবে না যা বর্তমান চুক্তির সঙ্গে আসমাজস্যপূর্ণ।

ধারা-১১ ঃ এ চুক্তিটি ২৫ বছর মেয়াদের জন্য স্বাক্ষরিত হল এবং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য এবং রাষ্ট্রীয় উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ কাজ করবেন। এ চুক্তিটি স্বাক্ষর হওয়ার পর থেকেই তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে।

ধারা-১২ ঃ কোন ধারার ব্যাখ্যার মধ্যে কোন পার্থক্য হলে অথবা বর্তমান এ চুক্তির অন্যান্য ধারায় পার্থক্য হলে উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ পারস্পরিক সম্মানবোধ ও বোঝা পড়ার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পন্থায় দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে সমাধা করবেন।

১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ ঢাকায় এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

শেখ মুজিবুর রহমান	ইন্দিরাগান্ধী
প্রধানমন্ত্রী	প্রধানমন্ত্রী
পক্ষে ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	পক্ষে ঃ প্রজাতন্ত্রী ভারত

www.pathagar.com